বার্ষিক বসুমতী ১৩৩৪

সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির সহজ উপায়।

বিধাতার দান এবং শোভাই প্রকৃতির প্রাণ। প্রতি ঋতুতে প্রকৃতির তাই নব নব সজ্জা। নারী-প্রকৃতির মধ্যেও এই শোভা এবং সৌন্দর্য্যসৃষ্টির প্রবল আকাঙ্ক্ষা, সেই বিধাতারই অভিপ্রায় এবং সৌন্দর্য্য দ্বারা হৃদয় আকর্ষণ করিবার ইচ্ছা, ইহার একটি অতি স্বাভাবিক এবং মজ্জাগত স্বধর্ম্ম।

স্বাভাবিক কোমলতা এবং হৃদয়ের মাধুর্য্য বাহির হইতে বোঝা যায় না, তাই দৈহিক শ্রী দিয়াই অনেক সময় রমণীর সম্বন্ধে প্রথম ধা· ।করা হয়। চর্ম্মের স্বাস্থ্যই সেই সৌন্দর্য্য-বিচারের মূল উপাদান। সুন্দর হইয়া জন্মান ম ষের আয়ত্তাধীন নহে কিন্তু শারীরিক শ্রী এবং লাবণ্য বৃদ্ধি করিতে স· ল সময়ে দৈবের উপর নির্ভর করিতে হয় না।

সৌন্দর্য্য-চর্চ্চায় অধিক সময় ক্ষেপণ করা সকল রমণীর পক্ষে সম্ভব নয় বিবেচনায়, নর-নারীর শরীরের স্বাস্থ্যোজ্জ্বল শ্রী কিসে অক্ষুণ্ণ থাকে, তার উপায় চর্ম্মতত্ত্ববিৎ বিশেষজ্ঞের সাহায্যে স্থিরীকৃত হইয়াছে। প্রতি রাত্রে সামান্য মাত্র যত্ন এবং অনুশীলনের দ্বারা প্রত্যেক রমণীই আপন আপন কমনীয় শ্রী বৃদ্ধি করিতে পারেন।

প্রসাধনে সকল দেশে সাবানই বেশী প্রচলিত, কিন্তু, সাবানে শুধু শরীরের উপরটাই পরিষ্কার হয়, লোমকূপের ময়লা যেমন তেমনই থাকিয়া যায়। কিন্তু নির্ম্মল এবং নিয়মিত ভাবে পরিষ্কৃত লোমকূপের উপরই চর্ম্মের স্বাস্থ্য এবং মুখশ্রীর উজ্জ্বলতা অধিক পরিমাণে নির্ভর করে।

ওটীন ক্রীম।

প্রতি রাত্রে নিয়মিত ভাবে অল্প গরম জলে হাত মুখ ভাল করিয়া ধুইয়া ওটীন ক্রীম ব্যবহার করাই এই ধূলিমলিন লোমকূপগুলি পরিষ্কারের একমাত্র উপায়। সামান্য ক্রীম আঙুলে করিয়া লইয়া চর্ম্মের উপর ধীরে ধীরে ঘর্ষণ করুন। কিছুক্ষণ পরে তোয়ালেতে মুছিয়া ফেলিলে দেখিবেন— ন্নান জলে যে ময়লা দূর করিতে পারে নাই, সেই সমস্ত ময়লা তোয়ালেতে উঠিয়াছে।

সাবান যে ময়লা পরিষ্কার করিতে অক্ষম, ওটীন ক্রীম সেই অন্তর্নিহিত মলিনতা দূর করিয়া লোমকূপগুলির নিজ নিজ বৃত্তির সহায়তা করে। সুন্দর এবং স্বাস্থ্যোজ্জ্বল শ্রী যাঁহারা কামনা করেন, তাঁহাদের পক্ষে ওটীন ক্রীম অপরিহার্য্য। শীতের বাতাসে চামড়া কর্কশ হইয়া ফাটিয়া যায় এবং গ্রীষ্মের রৌদ্রে অনেক সময় লাল হইয়া জ্বালা করে। এই দুইটি বিপরীত-ধর্ম্মী উপসর্গই ওটীন ক্রীম শীঘ্র ও অতি সহজভাবেই দূর করে। স্বাস্থ্য রক্ষার পক্ষে, বিশেষভাবে দেহের সুস্থ মসৃণতা রক্ষার জন্য তৈল একেবারে অপরিহার্য্য—ইহা শীত এবং গ্রীষ্ম প্রধান দেশের বৈজ্ঞানিকেরা এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু অধিক শীত বা গ্রীষ্মে আমাদের দেহের সেই স্বাভাবিক তৈল নষ্ট হইয়া যায় এবং সেই অপ্রীতিকর অবস্থা হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায় ওটীন ক্রীম। এই জন্যই আইস্‌ল্যাণ্ড, এবং ভারতবর্ষ উভয় স্থলেই ইহার সমান আদর।

ওটীন ক্রীম বিশুদ্ধ তৈলে প্রস্তুত। ইহাতে গ্লীসেরীণ অথবা চর্ব্বিজাতীয় কোনও পদার্থ না থাকায় অনাবশ্যক কেশাধিক্যের আশঙ্কা নাই। অধিক শীত এবং তাপ হইতে শরীর রক্ষা করিতে যতটুকু তৈলের প্রয়োজন, ওটীন ক্রীম নিয়মিত ভাবে ব্যবহার করিলে তাহা পাওয়া যায়। রাত্রিই ওটীন ক্রীম ব্যবহারের উপযুক্ত সময়। ইহাতে মুখের যাবতীয় কর্কশ ভাব এবং মলিনতা মন্ত্রপ্রয়োগের মত অতি সহজেই বিদূরিত হয়।

কার্য্যগতিকে যাঁহাদের ঘরের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে হয় অথবা যাঁহাদের বাহিরে বাহিরে শীতাতপ সহ্য করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়, এই উভয় শ্রেণীর লোকের পক্ষেই ওটীন ক্রীম সমান উপকারী।

দাড়ি-কামানোর পর, তজ্জনিত জ্বালা এবং অস্বস্তি দূর করিতে ওটীন ক্রীমের মত আরাম-প্রদ প্রলেপ আর কিছুই নাই। ওটীন ক্রীম যে শুধু সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে তাহা নহে। ব্রণ, মেচ্ছেতা প্রভৃতি চর্ম্মরোগ ইহার ব্যবহারে নিরাময় হয়।

শিশুদিগের চর্ম্মে ঋতু-পরিবর্ত্তনের প্রভাব অতি সহজেই প্রকাশ পায়। শীতের বাতাস লাগিয়া তাহাদের চামড়া শুষ্ক ও কর্কশ হইয়া যায় এবং রৌদ্র লাগিলে সেইগুলি আবার ফাটিয়া, উঠিয়া যাইতে থাকে।

ওটীন ক্রীমই এই কষ্টদায়ক অবস্থা হইতে শিশুদিগকে রক্ষা করিবার একমাত্র নিরাপদ
মশা, মাছি বা অন্য কোনও পোকা-মাকড়ের কামড়ও ওটীন ক্রীম ব্যবহার করিলে সারিয়া য
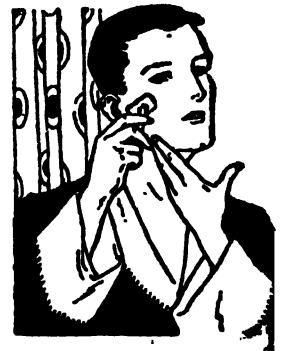
তুষার-কণার মত ইহা শীতল, সুন্দর এবং ক্ষণস্থায়ী বলিয়াই ইহার নাম “স্নো”।

অল্প পরিমাণ ওটীন স্নো লইয়া চাম্‌ড়ার উপর ঘর্ষণ করিলে ইহা অবিলম্বে মিলাইয়া যায় এবং তাহার ফলে সেই স্থানটি চমৎকার শীতল, কোমল এবং উজ্জ্বল হইয়া উঠে। রৌদ্র এবং শীতল বাতাস হইতে রক্ষা পাইবার জন্য দিনের বেলাতেই ইহার বহুল প্রচলন। কিন্তু দিনে ওটীন স্নো ব্যবহার করিলেও চর্ম্মের একান্ত আবশ্যকীয় তৈল-সরবরাহের এবং লোমকূপগুলি পরিষ্কার করিবার জন্য রাত্রে ওটীন ক্রীম ব্যবহার করা একান্ত প্রয়োজনীয়।

যে সমস্ত গুণ থাকিলে যে কোনও ফেস্‌ পাউডার উচ্চ শ্রেণীর মুখরাগ বলিয়া পরিগণিত হয়, ওটীন ফেস্‌ পাউডারে সে সমস্তগুণই প্রচুর পরিমাণে আছে। মুখের উপরকার তৈলাক্ত ভাব দূর করিবার জন্যই পাউডার ব্যবহৃত হয়। ওটীন ফেস্‌ পাউডারে তাহা অতি উত্তম ভাবেই সম্পন্ন হয়। ইহা অতি মৃদু সৌরভযুক্ত এবং এত মোলায়েম যে মুখের রঙের সঙ্গে প্রায় মিলাইয়া যায় এবং অনেকক্ষণ থাকে। সেইজন্যই অন্যান্য পাউডারের মত ইহা বারে বারে মাখিতে হয় না। চর্ম্ম-স্বাস্থ্যের হানি হইতে পারে এমন কোনও পদার্থ ইহাতে নাই।
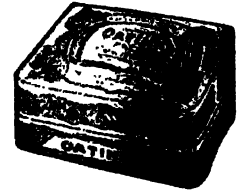
শরীরের দুর্গন্ধ নষ্ট করিয়া ঘামাচি, প্রভৃতি চর্ম্মের যাবতীয় প্রদাহ আরাম করিতে ওটীন ট্যাল্‌কম্‌ পাউডার অদ্বিতীয়। সুকুমার শিশুদের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী এবং একান্ত প্রয়োজনীয়।

প্রসাধনের জন্য এ পর্য্যন্ত যত প্রকার সাবান আবিষ্কৃত হইয়াছে, ওটীন সাবান তাহাদের সকলের শ্রেষ্ঠ। যাবতীয় বিশুদ্ধ পদার্থ হইতে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ইহা প্রস্তুত হয়। চর্ম্মের ক্ষতি করে এরূপ কোনও ক্ষারজাতীয় বা অন্য কোনও পদার্থ বা রং করিয়া মন ভুলাইবার কোনও আয়োজন ইহাতে নাই। এই সাবান অতি মৃদু সুগন্ধযুক্ত এবং সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ বলিয়া শিশুদের জন্যও অনায়াসে ব্যবহৃত হইতে পারে।
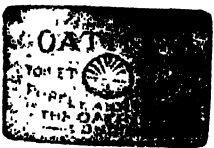
রমণীর সৌন্দর্য্য কেশে, সেই কেশের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে ওটীন "শ্যাম্পু পাউডার"। সকলের চুল সমান নয়, কাহারও চুল শুষ্ক ও কর্কশ, কাহারও বা তৈলাক্ত। সুতরাং সাধারণ শ্যাম্পু পাউডার বা মাথা ঘষায় সমান উপকার প্রত্যাশা করা যায় না। বহুদিনব্যাপী এই অভাব দূর করিবার জন্য ওটীন কোম্পানী এই দুই শ্রেণীর চুলের উপযোগী পৃথক্ পৃথক্ শ্যাম্পু পাউডার প্রস্তুত করিয়াছেন।

বিশুদ্ধ নারিকেল তৈলে ইহা প্রস্তুত হয়। ইহার ব্যবহারে মাথার মরা মাস, খুস্কি প্রভৃতি দূর হয় এবং অতি অল্পদিনের মধ্যেই কেশের বর্ণ এবং গুচ্ছের উন্নতিতে ইহার উপকারিতা বেশ বোঝা যায়। ইহা অতি চমৎকার সৌরভযুক্ত। লাল এবং সবুজ খামে পাওয়া যায়।

[illegible]

উচ্চ শ্রেণীর কেশতৈলের সকল গুণই ইহাতে বর্ত্তমান অথচ মাথায় মাখিলে ইহা দেখা যায় না। ব্রীলিয়্যান্‌টাইন্ ব্যবহারে কেশ উজ্জ্বল এবং পুষ্ট হয়। চুলের রঙ গাঢ় হয়।

[illegible]

মুখের দুর্গন্ধ এবং যাবতীয় দূষিত বীজাণু বিনষ্ট করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ইহাতে দন্ত মুক্তার মত সুন্দর এবং উজ্জ্বল হয় অথচ দন্তের উপরকার এনামেল নষ্ট হইবার কোনও আশঙ্কা নাই। ওটীন দন্ত-মঞ্জন ব্যবহার করার পর চমৎকার আরাম বোধ হয়।

[illegible]

দাড়ি কামাইবার অন্যান্য সাবান হইতে ইহাতে অধিক আরামপ্রদ এবং বেশীক্ষণ স্থায়ী ফেনা হয় এবং ওটীন ক্রীম মিশ্রিত থাকায় অন্য সাবানের পক্ষে যাহা অসম্ভব কামাইবার পর সেই আরাম এবং তৃপ্তি পাওয়া যায়।

[illegible]

ইহাতে প্রচুর পরিমাণে ফেনা হয় এবং সহজে মুখের উপর শুকাইয়া যায় না। দাড়ি কামাইবার জন্য এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত ক্রীম আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহা তাহাদের সকলের শ্রেষ্ঠ।

ওটীন লিপ্ স্যাল্ভ্ বা ওষ্ঠ প্রলেপ।

ওষ্ঠাধরের সৌন্দর্য্য এবং নবীনতা আনয়ন করিতে ইহার মত প্রীতিপ্রদ আর কিছুই প্রস্তুত হয় নাই। যে কোনও প্রকারের প্রদাহ ইহার প্রলেপে শীঘ্র দূর হয়।

ওটীন বাম।

ফাটা হাত মুখ সারাইতে ইহার মত উপকারী ঔষধ আর নাই। লোমকূপস্থিত ময়লা পরিষ্কার করিয়া কঠিন কর্কশ চাম্‌ড়া কোমল, মসৃণ এবং উজ্জ্বল করিতে ওটীন বাম অদ্বিতীয়।

=হোম সেভিং স্কিম=

আপনি কি আমাদের হোম সেভিং ব্যাঙ্ক স্কিম জানেন? ব্যবসায়ীদিগের পক্ষে সঞ্চয় করিবার এরূপ প্রকৃষ্ট উপায় আর নাই। প্রত্যহ কিছু করিয়া সঞ্চয় করিবার বেশ সুবিধা। গৃহিণীরা ঘরে বসিয়া বেশ পয়সা জমাইতে পারিবেন।

একটি হোম সেফ বাড়ীতে রাখুন এবং কিছু কিছু করিয়া জমাইতে আরম্ভ করুন, বিপদের সময় লাগিবে। বালকবালিকাদিগকেও সঞ্চয় বৃত্তি শিক্ষা দিন। তাহাদের নামে আমাদের ব্যাঙ্কে হিসাব খুলিয়া দিন।

আমাদিগকে জানাইলে আমরা আপনাকে এই সেফ পাঠাইয়া দিব। এক বৎসর পরে সঞ্চয় দেখিলে আপনি চমৎকৃত হইয়া যাইবেন।

শুভকার্য্যে বিলম্ব করা ভাল নহে, এখনই প্রস্তুত হউন; কল্যকার জন্য অপেক্ষা করিবেন না।

দশ তোলা খাঁটী সোনার বার
৫ তোলা খাঁটী সোনার বার

আমরা দশ তোলা ওজনের খাঁটী সোনার বার সম্প্রতি বাজারে প্রচলন করিয়াছি। এই ওজনের বারের উপর **H. M. S. MINT.** কথাগুলি অঙ্কিত আছে। এই কথাকয়টি অঙ্কিত দেখিলেই বুঝিতে হইবে সোনা খাঁটী এবং ওজন ঠিক, সুতরাং ক্রেতার মনে কোনও সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে না। এই বার শুভদিনে প্রিয়জনকে উপহার দিবার পক্ষে

এবং অলঙ্কার প্রস্তুতেও

সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাঁটী।

দি সেনট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড

হেড অফিস—বোম্বে, কলিকাতা অফিস—১০০নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, বড়বাজার ব্রাঞ্চ—৭১ ক্রস ষ্ট্রীট,

---

এন, কে, মজুমদার এণ্ড কোংর

হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়

প্রধান ঔষধালয়—৩৪ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, বনফিল্ডস্ লেনের মোড়, কলিকাতা। ব্রাঞ্চ ঔষধালয় সমূহ—৮৩নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট। ২৯৭নং অপার চিৎপুর রোড, শোভাবাজার। ২৫৩।১নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, শিয়ালদহ। ৬৬।৪ নং রসা রোড, ভবানীর, কলিকাতা।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ড্রাম /৫ ও /১০ পয়সা! মাদার টিঞ্চার ড্রাম ।০ আনা।

কলেরা চিকিৎসার ও গৃহচিকিৎসার বাক্স, পুস্তক, ড্রপারসহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০, ১০৪ শিশি ২৲, ৩৲, ৩৷০, ৫৷০, ৬৷৶০, ১০৷৶০ আনা। মাশুল অতিরিক্ত দিতে হয়। হোমিওপ্যাথিক—গার্হস্থ্য চিকিৎসা (বাঁধান) মূল্য ৷৶০ আনা, মাঃ ।০ আনা। ওলাউঠা চিকিৎসা (বাঁধান) মূল্য ।০, মাঃ ।৶০ আনা। চিকিৎসা-রত্নাকর (বাঁধান) ২৷০, মাঃ ৷০ আনা। স্ত্রী-চিকিৎসা (বাঁধান) ১।০, মাঃ ৵০।

ডাঃ উমেশচন্দ্র রায় এল, এম, এস মহাশয়ের

পাগলের মহৌষধ

৫০ বৎসর যাবৎ আবিষ্কৃত হইয়া শত সহস্র দুর্দ্দান্ত পাগল ও সর্ব্বপ্রকার বায়ুগ্রস্ত রোগ আরোগ্য হইয়াছে, মূর্চ্ছা, মৃগী, অনিদ্রা, হিষ্টিরিয়া, অক্ষুধা, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা প্রভৃতি রোগে আশু ফলপ্রদ ও অব্যর্থ মহৌষধ, পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠাই, প্রতি শিশি মূল্য ৫৲

এস, সি, রায় এণ্ড কোং

১৬৭।৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নাট্যসাহিত্য-জগতে যথার্থই যুগান্তর!

সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত—

মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত—সেই মর্ম্মস্পর্শী সামাজিক নাটক

বাঙ্গালী

প্রত্যেক বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে বিরাজ করুক্—এই আমাদের প্রার্থনা!

"বাঙ্গালী"—সংসারের একেবারে নিখুঁত ফটোগ্রাফ! "বাঙ্গালী" পড়িয়া আপনি কখনো প্রাণ ভরিয়া হাসিবেন, কখনো মর্ম্মান্তিক দুঃখে চখের জলে বুক ভাসাইবেন, কখনো ভয়ে ও আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিবেন! বিলাসিতা ও আধুনিক সভ্যতার মোহে বাঙ্গালীর তরুণ সম্প্রদায়কে যে কেমন করিয়া ধীরে ধীরে অধঃপতনের পথে লইয়া যাইতেছে,—বুঝিতে চান তো "বাঙ্গালী" নাটক পড়ুন। নিজের দোষ লোকে নিজে বুঝিতে পারে না, তাই আজীবন সে দোষ তাহার থাকিয়া যায়। "বাঙ্গালী" নাটকখানি পাঠ করিয়া বাঙ্গালী নিজের নিজের দোষ শোধরাইবার যথেষ্ট সুযোগ পাইবেন। আর যাঁহারা অবৈতনিক নাট্যসম্প্রদায় গঠন করিয়া "সখের" অভিনয় করিয়া থাকেন,—তাঁহারা যেন—"বাঙ্গালী" নাটকই অভিনয় করেন। কারণ,—

(১) অতি অল্প খরচে অভিনয় করিয়া আনন্দলাভ হইবে;—(২) একাধারে শিক্ষিত ও নিরক্ষর, আবালবৃদ্ধবনিতা, ধনবান,—গৃহস্থ ও নির্ধন—ইত্যাদি, সকল শ্রেণীর দর্শকবৃন্দ অভিনয় দেখিয়া—আনন্দ উপভোগে সক্ষম হইবেন;—(৩) "বাঙ্গালী" নাটকাভিনয়ে অভিনেতার কৃতিত্ব দেখাইবার যথেষ্ট সুযোগ পাইবেন;—(৪) আর সকলের উপর—এই কারণ—যে, আপনি যদি যথার্থই স্বদেশভক্ত হন,—তাহা হইলে—"বাঙ্গালী" নাটক অভিনয় করিয়া আপনি "বাঙ্গালী সংসারের", "বাঙ্গালী সমাজের", "বাঙ্গালী জাতির" অনেক মঙ্গলসাধন করিতে পারিবেন। ভারতের মধ্যে বিদ্যা, বুদ্ধি ও স্বদেশহিতৈষণায় শ্রেষ্ঠ জাতি "বাঙ্গালী"। বাঙ্গালীর সুখ-দুঃখের কথা, দোষগুণেব কথা, ভবিষ্যতের কথায় "বাঙ্গালী" নাটক পরিপূর্ণ। "বাঙ্গালী"—নাটকখানি আদর্শ বাঙ্গালী "দেশবন্ধুর" নানা ভাবের মূর্তিতে সুশোভিত।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র!

প্রকাশক—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ,

২৪ নং চোরবাগান সেকেণ্ড লেন।

প্রাপ্তিস্থান—মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্ মিনার্ভা থিয়েটার। কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয় ও প্রকাশকর নিকট।

এক বৎসরের মধ্যে প্রথম সংস্করণের পঞ্চসহস্র প্রায় নিঃশেষ।

মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত—

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত নূতন নাট্যলীলা

❋ যুগ-মাহাত্ম্য ❋

প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ॥০ আট আনা।

এই জাগরণের যুগে—বঙ্গ-সমাজের একটা দিক্ লক্ষ্য না করাতে,—একটা ভীষণ গলদকে তুচ্ছ জ্ঞানে উপেক্ষা করাতে, দেশের এবং জাতির কি সর্ব্বনাশ হইতেছে,—এই "যুগমাহাত্ম্য" নাট্যলীলায় বেশ স্পষ্টরূপে তাহা দেখানো হইয়াছে। হাসির সঙ্গে হাড়-ভাঙ্গা শিক্ষা!

—মনোমোহন থিয়েটারে অভিনীত—ভুপেন বাবুর
—নূতন ধরণের কৌতুক নাটিকা—

"ডারবি-টিকিট"

প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ॥০ আট আনা।

মাত্র আট আনা খরচে আপনি যদি ঘরে বসিয়া আঠারো লক্ষ টাকার আমোদ উপভোগ করিতে চান ত'—ভুপেন বাবুর "ডারবি-টিকিট" একখানি কিনিয়া রাখুন।

খুব আনন্দের সংবাদ

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

মিনার্ভা থিয়েটারে মহাসমারোহে যাহার অভিনয় চলিতেছে—

সেই হাসিরাশিমাখা অপূর্ব্ব নাট্যলীলা—

"জোর বরাত"

পড়িয়াছেন কি? মুল্য ॥০ আট আনা।

মিনার্ভায় অভিনীত ভুপেনবাবুর ভক্তিরসাশ্রিত নূতন পৌরাণিক নাটিকা

"নারী-রাজ্যে" প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ॥০

মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত
দেশাত্মবোধপূর্ণ—তিন অঙ্কে সমাপ্ত সেই অলৌকিক নাটক

"কৃতান্তের বঙ্গদর্শন"

দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

আর্ট থিয়েটার ও মিনার্ভা থিয়েটার, কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়।

ওগো মশাই !
সুখবর শুনেছেন কি ? যার জন্যে এতদিন হাঁ করে চেয়েছিলেন—যার জন্যে ছটফট্ করছিলেন—সেই

এ
সত্যি সত্যি বাজারে বেরিয়েছে
মূল্য ২৲ টাকা
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

সোণার খোকা—বঙ্গদেশে চিত্রজগতে—উপন্যাসরাজ্যে অপূর্ব্ব ব্যাপার ! এমন চমৎকার চিত্রোপন্যাস ও চিত্রাভিনয়—বঙ্গদেশে এই প্রথম ! এমনটী আর কখনও হয়নি !

সেই সর্ব্বজনপ্রিয়া বালিকা অভিনেত্রী—মিনার্ভা থিয়েটারের—

সেই "রেণুবালা" (সুখ)—এই সোণার খোকার সমস্ত চরিত্রেই ভিন্ন ভিন্ন রূপে এবং নানাপ্রকার সাজসজ্জায় কিরূপ অপূর্ব্ব অভিনয় করিয়াছে,—বাঙ্গালী প্রত্যেকেরই তাহা দেখিবার জিনিষ ! পঁচিশখানি চিত্রে অভিনীত—এই সোণার খোকা—একবার হাতে লইলে—আর তাহাকে ছাড়িতে চাহিবেন না !

"সোণার খোকার" গল্পাংশ ?—সাহিত্য-জগতে ইহা এক অভিনব ব্যাপার ! ইহার প্রত্যেক কথার মূল্য কোটী টাকা ! ইহার প্রত্যেক ছত্রে ছত্রে বাঙ্গালী সংসারের হাড়ভাঙ্গা শিক্ষা ! "সোণার খোকা" পড়িলে—আপনাকে খানিকক্ষণ বসিয়া সংসারের অনেক কথা ভাবিতে হইবে। বিজ্ঞাপনের আড়ম্বরে ভুলাইতে চাহি না ! ভাল জিনিসের তাহা আবশ্যক হয় না। মাত্র দুইটা টাকা আশীর্ব্বাদী দিয়া "সোণার খোকাকে" ঘরে লইয়া যায়।

নিঃসঙ্কোচে—পিতা পুত্রের হাতে দিতে পারিবেন—এই সোণার খোকা !

নিঃসঙ্কোচে—একত্রে বসিয়া মাতা—পুত্র, কন্যা, পুত্রবধূ প্রভৃতি এই "সোণার খোকা" লইয়া আনন্দ উপভোগ করিবেন।

নিঃসঙ্কোচে—ভাই ভগ্নীকে, ভগ্নী ভাইকে উপহার দিবেন এই "সোণার খোকা !"

এ "সোণার খোকা" সকলেরই দরকার। শীঘ্র সোণার খোকা একখানি হস্তগত করুন, বিলম্বে হতাশ হইবেন। ঝক্-ঝকে তক্-তকে বাঁধাই ! মূল্যবান আর্ট পেপারে ছবি !! চমৎকার এ্যান্টিক কাগজে উপন্যাস ছাপা ! "সোণার খোকা" সর্ব্বাঙ্গসুন্দর !!!!

প্রাপ্তিস্থান—মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
আর্ট থিয়েটার ও মিনার্ভা থিয়েটার। কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়।

ঢাকাই শাঁখা আইভরির জিনিষ।

সুর ব্রাদার্স এণ্ড কোং

সোনার শাঁখা আমাদের বিশেষত্ব।

খাঁটী গিনি সোনার অলঙ্কার নির্ম্মাতা। ২০৩।৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১। লাইন-মোরী রুলী—হস্তীদন্তের উপর গিনি সোনায় বাঁধান। দেখিতে সুন্দর ও মজবুত। মূল্য প্রমাণ ১২, ১১, ৯৸০।

২। তারপ্যাঁচ বালা—
ঐ প্রঃ ১৭।০, ১৬।০, ১২।০ টাকা।

৩। পল বালা—হস্তীদন্তের উপর গিনি সোনার এনগ্রেভ পাত দ্বারা বাঁধান। মূল্য প্রঃ ২২৷৵০, ১৯।০, ১৫৲ টাকা।
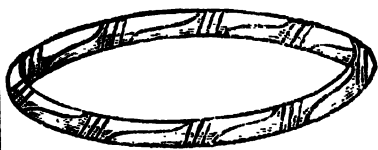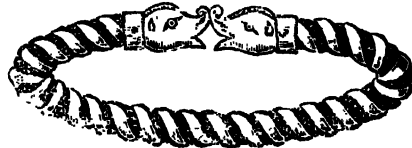
৪। সোনার মুখ-বালা—হস্তীদন্তের উপর গিনি সোনায় বাঁধান। ইহা আমাদের নিজস্ব আবিষ্কার দেখিতে অতি মনোহর সোনার মুখ দেওয়া। মূল্য প্রঃ ২৭।০ টাকা।

কল্পপেড মাকড়ি—

মূল্য—১৮৲।

ফেন্সী প্যাটার্ণ আংটী
মূল্য—১৮৲।

ঐ—১০৲

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—আমরা নিজ কারখানায় তাগা, বালা, হার, হীরা, মুক্তা, সেট, জড়োয়ার গহনা ও অন্যান্য অলঙ্কার প্রস্তুত করি। বিবাহের গহনা দরকারানুযায়ী ২৪ ঘণ্টায়ও দিয়া থাকি। পান কম দেওয়া আমাদের বিশেষত্ব। প্রত্যেক জিনিসে গ্যারাণ্টি দেওয়া হয়। ব্যবহারান্তে পান-মরা বাদে আমাদের জিনিষ গিনি সোনার বাজার দরে ক্রয় করিয়া থাকি। মফঃস্বলে ভিঃ পিঃতে মাল পাঠাই। ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

স্থাপিত সন ১২৬৩ সাল।

—বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বপুরাতন বন্দুকওয়ালা—

কে, সি, বিশ্বাস এণ্ড কোং

১ নং চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা।

সস্তায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সর্ব্বপ্রকার বন্দুক, রাইফেল, রিভল্‌ভার, টোটা, বারুদ, গুলী, গোলা প্রভৃতি সরঞ্জাম আমদানীকারক এবং পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা। পুরাতন বন্দুক, অবিকল নতনের মত রং পালিশ ও মেরামত করা হয়। সচিত্র ক্যাটলগের জন্য পত্র লিখুন।

স্মৃতি

তোমার প্রীতি করুণ স্মৃতি
যেন চামেলি-কলিকা
নয়ন জলে পরান তলে
উঠিল দুলদুলিয়া।
সজল ঘন মেঘের ছায়ে
মৃদু সুবাস দিলো বিছায়ে,
না-দেখা কোন পরশ-ঘায়ে
পড়িলো টল-টলিয়া

তোমার বাণী সুরের খানি
আজি বাদল পবনে
নিশীথে বারি-পতনসম
ধ্বনিছে মম শ্রবণে।
সে বাণী যেন গানেতে লেখা
দিয়েছে আঁকি সুরের রেখা
যে পথ দিয়ে তোমার, প্রিয়ে,
চরণ গেল চলিয়া॥

১২ আষাঢ়
১৩৩৪

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ধনঞ্জয় ও প্রজাগণ

প্রজা

থাক্‌তে পারলুম না যে ঠাকুর। তাই তোমাকে ধ'রে নিয়ে চলেচি।

ধনঞ্জয়

আমাকে নিয়ে তোদের কি হবে বল্‌ ত।

প্রজা

মাঝে মাঝে তোমাকে না দেখ্‌তে পেলে যে—

ধনঞ্জয়

তোরা ভাবচিস তোরাই আমাকে ধ'রে এনেচিস। তা নয় রে— আমিই তোদের খবর দিতে বেরিয়েচি—

প্রজা

কিসের খবর ঠাকুর?

ধনঞ্জয়

দুঃখের দিন আস্‌চে।

প্রজা

বলো কি প্রভু?

ধনঞ্জয়

হাঁ রে আমি ধরণীর কান্না শুন্‌তে পাই যে!

প্রজা

কোথায় পালাবো?

ধনঞ্জয়

পালাবো না রে, তাকে বুঝে নেব—ভিতরে এসে দুঃখটাকে দেখব বাইরে।

গান

তুমি বাহির থেকে দিলে বিষম তাড়া।
তাই ভয়ে ঘোরায় দিক্‌ বিদিকে
শেষে অন্তরে পাই সাড়া।

আমি তোদের ডাকচি—সবাই আমার বুকের ভিত আয়, সেইখান থেকে নির্ভয়ে দেখবি তুফানের দাপট, মর চোখ-রাঙানী।

প্রজা

তুমি যেখানে ডাক দাও ঠাকুর, সেখানে যাবার পাইনে যে।

ধনঞ্জয়

যখন হারাই বন্ধ-ঘরের তালা,
যখন অন্ধ নয়ন শ্রবণ কালা,
তখন অন্ধকারে লুকিয়ে দ্বারে
শিকলে দাও নাড়া।

ঘুম যখন ভাঙবে, তখনি দরজা খোলবার সময় আ রে।

প্রজা

ঘুম যে ভাঙে না।

ধনঞ্জয়

সেই জন্যেই তাড়া লাগ্‌চে নইলে দুঃখ আসবে কেন?

যত দুঃখ আমার দুঃস্বপনে,
সে যে ঘুমের ঘোরেই আসে মনে,—
ঠেলা দিয়ে মায়ার আবেশ
করো গো দেশছাড়া।

অজ্ঞান হয়ে থাকিস বলেই তো স্বপ্নের চোটে তোরা গুমরে মরিস।

প্রজা

রাজার পেয়াদা এসে যখন মার লাগায়। সেটাকে তুমি স্বপ্ন বলো না কি?

ধনঞ্জয়

তা না তো কি? স্বপ্নের হাজার লক্ষ মুখোষ আছে—রাজার মুখোষ পরেও আসে—তোদের অচৈতন্য নিয়েই তোদের সে মারে, তার হাতে আর কোনো অস্ত্র নেই।

আমি আপন মনের মারেই মরি
শেষে দশ জনারে দোষী করি—
আমি চোখ বুজে পথ পাইনে ব'লে
কেঁদে ভাসাই পাড়া।

দেখ আমি এই কথা তোদের বল্‌তে এসেচি—সংসারে তোরাই দুঃখ এনেচিস।

প্রজা

সে কি কথা ঠাকুর, আমরা দুঃখ পাই, আমরা তো দুঃখ দিইনে। আমাদের সে শক্তিই নেই।

ধনঞ্জয়

ওরে বোকা, মার খাবার জন্যে যে তৈরি হয়ে আছে মারের ফসল ফলাবার মাটি সে যে চষে রেখেচে। তোদেরই অপরাধ সব চেয়ে বেশি—তোরা তোদের অন্তর্যামী ঠাকুরকে লজ্জা দিয়েচিস, তাই এত দুঃখ!

প্রজা

আমরা কি করব ব'লে দাও।

ধনঞ্জয়

আর কত বলব? বারবার বলচি ভয় নেই, ভয় নেই, ভয় নেই।

নাই ভয়, নাই ভয় নাই রে।
থাক্ পড়ে থাক্ ভয় বাইরে!
জাগো মৃত্যুঞ্জয় চিত্তে
থৈ থৈ নর্ত্তন নৃত্যে,
ওরে মন বন্ধন-ছিন্ন
দাও তালি তাই তাই তাই রে॥

প্রজা

ঠাকুর, ঐ যেন কে আসচে?

ধনঞ্জয়

আস্‌তে দে।

প্রজা

কি জানি, খুনে হবে, কি ডাকাত হবে, এই অন্ধকার রাত্তিরে বেরিয়েচে।

ধনঞ্জয়

খুনেকে তোরাই খুনে করিস্, ডাকাতকে ক'রে তুলিস ডাকাত। খাড়া দাঁড়িয়ে থাক্!

প্রজা

প্রভু বিপদ ঘটতে পারে! আমরা বরঞ্চ একটু স'রে দাঁড়াই—একেবারে সাম্‌নে এসে পড়বে—তখন—

ধনঞ্জয়

ওরে বোকারা, পিছন দিকে বিপদ যখন মারে তখন আর বাঁচোয়া নেই—বুক পেতে দিতে পারিস্, বিপদ তা হ'লে নিশ্চয়ই পিছন ফিরবে।

(বসন্ত রায় ও একজন পাঠানের প্রবেশ)

পাঠান

কোন্ হায় রে!

প্রজা

দোহাই বাবা, আমরা চাষী লোক—

পাঠান

রাত্তিরে কি কর্‌তে বেরিয়েচিস্?

ধনঞ্জয়

রাত্তিরে যারা বেরোয়, তাদের সঙ্গে মিলন হবে বলেই বেরিয়েছি। দিনে মিলি কাজের লোকের সঙ্গে, রাত্তিরে মিলি অকাজের লোকের সঙ্গে।

পাঠান

ভয় ডর নেই?

ধনঞ্জয়

দাদা, তোমারো তো ভয় ডর নেই দেখচি। দুই নির্ভয়ে সাম্‌নাসাম্‌নি দেখা সাক্ষাৎ হোলো—এই তো পরম

আনন্দ। (প্রজাদের প্রতি) যাস্ কোথায় তোরা! চেনাশোনা করে নে না।

বসন্ত রায়

ভাবে বোধ হচ্ছে, তুমিই ধনঞ্জয় ঠাকুর, কেমন, ঠিক ঠাউরেচি কি না?

ধনঞ্জয়

ধরা পড়েচি। রাত-কানা নও তুমি।

বসন্ত রায়

তেমন মানুষ অন্ধকারেও চোখে পড়ে।

ধনঞ্জয়

তুমিও তো অন্ধকারে ঢাকা পড়বার লোক নও, খুড়ো মহারাজ!

পাঠান

যাঃ চলে! সব ফেঁসে গেল!

ধনঞ্জয়

কি ফাঁসলো দাদা!

পাঠান

মহারাজের সঙ্গে ঠিক যে সময়টিতে একলা আলাপ জমিয়েছিলুম, তুমি এসে বাগ্ড়া দিলে।—

ধনঞ্জয়

খাঁ সাহেব তুমি জানো না, বাগড়া দিয়েই আলাপ জমান যিনি বড়ো আলাপী।

আমার পথে পথেই পাথর ছড়ানো।
তাইতো তোমার বাণী বাজে
ঝরণা-ঝরানো।
আমার বাঁশি তোমার হাতে
ফুটোর পরে ফুটো তাতে,
তাই শুনি সুর অমন মধুর
পরাণ-ভরানো॥
তোমার হাওয়া যখন জাগে
আমার পালে বাধা লাগে,
এমন ক'রে গায়ে পড়ে
সাগর-তরানো॥
ছাড়া পেলে একেবারে
রথ কি তোমার চল্‌তে পারে?
তোমার হাতে আমার ঘোড়া
লাগাম-পরানো॥

বসন্ত

খাঁ সাহেব, এই তো জমে গেল। আজ পথে বাধা পেয়েছিলুম বলেই তো। যিনি বাগ্ড়া দেন জয় হোক্ তাঁর।

ধনঞ্জয়

আজ বেরিয়েচ কোন্ ডাকে মহারাজ?

বসন্ত রায়

যশোরে চলেছিলুম। ঠাকুর, গ্রামে ডাকাতি পড়েচে খবর পেয়ে লোকজনদের সব পাঠিয়ে দিয়েচি। তাই খাঁ সাহেবকে নিয়ে এই রাস্তার মধ্যেই মজলিশ জমে গেল।

ধনঞ্জয়

রাস্তায় মাঝখানে হঠাৎ মজলিশেই মজা, মহারাজ। আমিও তোমার এই সভায় হঠাৎ দরবারী।

গান

তুমি হঠাৎ হাওয়ায় ভেসে আসা ধন—
তাই হঠাৎ পাওয়ায় চম্‌কে ওঠে মন।

বসন্ত রায়

বেশ, বেশ, ঠাকুর। যা নিত্যি জোটে তা থাক্ পড়ে—এই হঠাতের টানেই তো বাঁধন কাটে।

ধনঞ্জয়

গান

গোপন পথে আপন মনে
বাহির হও যে কোন্ লগনে,
হঠাৎ গন্ধে মাতাও সমীরণ!

বসন্ত রায়

হায় হায় ঠাকুর—বড় শুভক্ষণেই বেরিয়েছিলুম—দেহ-মন শিউরে উঠচে।

ধনঞ্জয়

গান

নিত্য যেথায় আনাগোনা
হয় না সেথায় চেনাশোনা,
উড়িয়ে ধুলো আস্‌চে কতই জন।

বসন্ত রায়

আহা, ভিড়ের মধ্যে হোলো না দেখা! দিন বৃথা গেল।

ধনঞ্জয়

গান

কখন পথের বাহির থেকে
হঠাৎ বাঁশি যায় যে ডেকে
পথ-হারাকে করে সচেতন ॥

বসন্ত

এসো ঠাকুর, একবার কোলাকুলি ক'রে নিই।

প্রজা

কোথায় চলেচ মহারাজ?

বসন্ত

প্রতাপ আমাকে ডেকেচে তাই যশোরে চলেচি।

প্রজা

রায়গড়ে ফিরে যাও আজ রাত্তিরেই।

বসন্ত

কেন বলো দেখি?

প্রজা

নানারকম গুজব কানে আসে। ভালো লাগে না।

ধনঞ্জয়

কোথাকার অযাত্রা এরা সব? নিজেরাও চলবিনে ভয়ে, অন্যকেও চলতে দিবিনে?

প্রজা

দেখচ না, ঠাকুর, পাঠানটা হঠাৎ কখন্ স'রে গেল?

ধনঞ্জয়

তোদের সঙ্গ ওর ভালো লাগল না, তাতে আর আশ্চর্য্য কী রে! সবাই কি তোদের সহ্য করতে পারে?

প্রজা

তোমার সাদা মন, তুমি বুঝবে না—ওর যে কি মৎলব ছিলো তা বোঝাই যাচ্চে।

ধনঞ্জয়

সাদা মনে বোঝা যায় না, ময়লা মনে বোঝা সহজ হয় এ কথা নতুন শোনা গেল। বিশ্বাস নেই, উপর থেকে দেখিস্ দীঘির পানা, বিশ্বাস ক'রে নীচে ডুব মারিস, দেখবি স্বচ্ছ-জল। তোরা ডাঙা থেকেই মুখ ফিরিয়ে যাস, আমি না তলিয়ে দেখে ছাড়িনে।

প্রজা

প্রভু, রাগ যে হয়।

ধনঞ্জয়

সেই জন্যেই সংসারে কেবল রাগীকেই দেখিস্—না রাগতিস, তা হ'লে যে রাগে না, তাকেও দেখতে পেতিস্।

(পাঠানের পুনঃ প্রবেশ)

বসন্ত রায়

এই যে খাঁ সাহেব ফিরেচে। তুমি যে ফারসি বয়েদ্‌গুলি শুনিয়েছিলে, ওগুলি আমাকে লিখে দিতে হবে।

পাঠান

দেবো হুজুর, কিন্তু একটা কথা নিবেদন করি। (প্রজাদিগকে দেখাইয়া) এই এদের স'রে যেতে বলো।

প্রজা

না, সে হবে না। আমরা ওঁকে ফেলে যাবো না।

ধনঞ্জয়

কেন যাবিনে রে? ভারি অহঙ্কার তোদের দেখি। তোরা হলি রক্ষাকর্ত্তা, না?

প্রজা

তুমি যদি হুকুম করো তো যাই।

ধনঞ্জয়

রক্ষা করবার যদি দরকার হয়, খাঁ সাহেব একলা রক্ষা করতে পারবেন। [প্রজাদের প্রস্থান।

পাঠান

মহারাজ, আমাকেই রক্ষা করো।

বসন্ত রায়

সে কি কথা? কিছু বিপদ হয়েচে?

পাঠান

হয়েচে। আমি যদি আজ যশোরে ফিরে যাই, আমার প্রাণ থাকবে না।

বসন্ত রায়

সর্ব্বনাশ! কেন, কি অপরাধ করেচ?

পাঠান

প্রতাপাদিত্য রাজা কাল যখন আমাদের দুই ভাইকে রওনা ক'রে দিলেন, তখন পথের মধ্যে আপনাকে খুন করবার হুকুম ছিল।

বসন্ত রায়

কি বলো খাঁ সাহেব?

পাঠান

হাঁ, কিন্তু গোপনে। গোপনও রইল না, তা ছাড়া আপনাকে মারা আমার দ্বারা হবে না, মনিবের হুকুমেও না। এখন আপনার মেহেরবাণী চাই।

বসন্ত রায়

এখনি চলে যাও রায়গড়ে। তোমার কোনো ভয় নেই। (সেলাম করিয়া প্রস্থান) বুকে বড় বাজলো ঠাকুর!

ধনঞ্জয়

বাজ্‌বে বই কি ভাই। ভালোবাসো যে—না বাজলে কি ভালো হতো?

গান

কাঁদালে তুমি মোরে ভালোবাসারি ঘায়ে—
নিবিড় বেদনাতে পুলক লাগে গায়ে।

বসন্ত রায়

আহা, সার্থক হোক্ কান্না আমার।

ধনঞ্জয়

গান

তোমার অভিসারে
যাবো অগম পারে
চলিতে পথে পথে বাজুক ব্যথা পায়ে॥

বসন্ত রায়

এই ব্যথার পথেই আমাকে চালাও প্রভু! আমি আর কিছুই চাইনে।

ধনঞ্জয়

গান

পরাণে বাজে বাঁশি নয়নে বহে ধারা—
দুখের মাধুরীতে করিলো দিশাহারা।
সকলি নিবে কেড়ে
দিবে না তবু ছেড়ে,—
মন সরে না যেতে ফেলিলে এ কি দায়ে॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

মন্ত্র-গৃহে প্রতাপাদিত্য ও মন্ত্রী

মন্ত্রী

মহারাজ কাজটা কি ভাল হবে?

প্রতাপাদিত্য

কোন্ কাজটা?

মন্ত্রী

যেটা আদেশ করেছেন—

প্রতাপ

কি আদেশ করেছি?

মন্ত্রী

আপনার পিতৃব্য সম্বন্ধে—

প্রতাপ

আমার পিতৃব্য সম্বন্ধে কি?

মন্ত্রী

মহারাজ আদেশ করেছিলেন, যখন রাজা বসন্ত যশোরে আসবার পথে শিমুলতলীর চটিতে আশ্রয় নে তখন—

প্রতাপ

তখন কি? কথাটা শেষ ক'রেই ফেল।

মন্ত্রী

তখন দুজন পাঠান গিয়ে—

প্রতাপ

হাঁ।

মন্ত্রী

তাকে নিহত করবে।

প্রতাপ

নিহত করবে! অমরকোষ খুঁজে বুঝি আর কে কথা খুঁজে পেলে না? নিহত করবে! মেরে যে কথাটা মুখে আন্‌তে বুঝি বাধছে?

মন্ত্রী

মহারাজ আমার ভাবটি ভাল বুঝতে পারেন নি।

প্রতাপ

বিলক্ষণ বুঝতে পেরেছি।

মন্ত্রী

আজ্ঞে মহারাজ আমি—

প্রতাপ

তুমি শিশু! খুন করাটা যেখানে ধর্ম্ম, সেখানে করাটাই পাপ, এটা এখনো তোমার শিখতে বাকি অ পিতৃব্য বসন্ত রায় নিজেকে ম্লেচ্ছের দাস বলে স্বী করেছেন। ক্ষত হ'লে নিজের বাহুকে কেটে ফেলা সে কথা মনে রেখো মন্ত্রী।

মন্ত্রী

যে আজ্ঞে।

প্রতাপ

অমন তাড়াতাড়ি "যে আজ্ঞে" বল্লে চল্‌বে না। তুমি মনে করচ নিজের পিতৃব্যকে বধ করা সকল অবস্থাতেই পাপ। 'না' বোলো না, ঠিক এই কথাটাই তোমার মনে জাগচে। কিন্তু মনে কোরো না এর উত্তর নেই। পিতার অনুরোধে ভৃগু তাঁর মাকে বধ করেছিলেন, আর ধর্ম্মের অনুরোধে আমি আমার পিতৃব্যকে কেন বধ করবো না?

মন্ত্রী

কিন্তু দিল্লীশ্বর যদি শোনেন, তবে—

প্রতাপ

আর যাই কর, দিল্লীশ্বরের ভয় আমাকে দেখিয়ো না!

মন্ত্রী

প্রজারা জান্‌তে পারলে কি বল্‌বে?

প্রতাপ

জান্‌তে পারলে ত।

মন্ত্রী

এ কথা কখনই ছাপা থাক্‌বে না।

প্রতাপ

দেখ মন্ত্রী, কেবল ভয় দেখিয়ে আমাকে দুর্ব্বল ক'রে তোল্‌বার জন্যই কি তোমাকে রেখেছি?

মন্ত্রী

মহারাজ, যুবরাজ উদয়াদিত্য—

প্রতাপ

দিল্লীশ্বর গেল, প্রজারা গেল, শেষকালে উদয়াদিত্য! সেই স্ত্রৈণ বালকটার কথা আমার কাছে তুলো না। দেখদেখি মন্ত্রী, সে পাঠান দুটো এখনো এল না!

মন্ত্রী

সেটা ত আমার দোষ নয় মহারাজ।

প্রতাপ

দোষের কথা হচ্চে না। দেরি কেন হচ্চে তুমি কি অনুমান কর তাই জিজ্ঞাসা করচি।

মন্ত্রী

শিমুলতলী ত কাছে নয়। কাজ সেরে আসতে দেরি ত হবেই।

(এক জন পাঠানের প্রবেশ)

প্রতাপ

কি হোলো?

পাঠান

মহারাজ, এতক্ষণে কাজ নিকেশ হয়ে গেছে।

প্রতাপ

সে কি রকম কথা? তবে তুমি জান না?

পাঠান

জানি বৈ কি। কাজ শেষ হয়ে গেছে ভুল নেই, তবে আমি সে সময়ে উপস্থিত ছিলুম না। আমার ভাই হোসেন খাঁর উপর ভার আছে সে খুব হুসিয়ার। মহারাজের পরামর্শমতে আমি খুড়া রাজা সাহেবের লোকজনদের তফাৎ করেই চলে আস্‌চি।

প্রতাপ

হোসেন যদি ফাঁকি দেয়।

পাঠান

তোবা! সে তেমন বেইমান নয়। মহারাজ! আমি আমার শির জামীন রাখ্‌লুম।

প্রতাপ

আচ্ছা, এইখানে হাজির থাক, তোমার ভাই ফিরে এলে বক্‌শিষ মিলবে। (পাঠানের বাহিরে গমন) এটা যাতে প্রজারা টের না পায়, সে চেষ্টা করতে হবে।

মন্ত্রী

মহারাজ, এ কথা গোপন থাক্‌বে না।

প্রতাপ

কিসে তুমি জান্‌লে?

মন্ত্রী

আপনার পিতৃব্যের প্রতি বিদ্বেষ আপনি ত কোনো দিন লুকোতে পারেন নি। এমন কি, আপনার কন্যার বিবাহেও আপনি তাঁকে নিমন্ত্রণ করেন নি—তিনি বিনা নিমন্ত্রণেই এসেছিলেন। আর আজ আপনি অকারণে তাঁকে নিমন্ত্রণ করলেন, আর পথে এই কাণ্ডটি ঘটল, এমন অবস্থায় প্রজারা আপনাকেই এর মূল ব'লে জান্‌বে।

প্রতাপ

তা'হলেই তুমি খুব খুসি হও। না?

মন্ত্রী

মহারাজ, এমন কথা কেন বল্‌চেন? আপনার ধর্ম্ম অধর্ম্ম পাপ পুণ্যের বিচার আমি করিনে, কিন্তু রাজ্যের ভাল-মন্দর কথাও যদি আমাকে ভাবতে না দেবেন, তবে আমি আছি কি করতে? কেবল প্রতিবাদ ক'রে মহারাজের জেদ বাড়িয়ে তোল্‌বার জন্যে?

প্রতাপ

আচ্ছা, ভালমন্দর কথাটা কি ঠাওরালে, শুনি!

মন্ত্রী

আমি এই কথা বলচি, পদে পদে প্রজাদের মনে অসন্তোষ বাড়িয়ে তুল্‌বেন না! দেখুন মাধবপুরের প্রজারা খুব প্রবল এবং আপনার বিশেষ বাধ্য নয়। তারা রাজ্যের সীমানার কাছে থাকে, পাছে আপনার প্রতিবেশী শত্রুপক্ষের সঙ্গে যোগ দেয়, এই ভয়ে তাদের গায়ে হাত তোলা যায় না। সেই জন্য মাধবপুর-শাসনের ভার যুবরাজের উপর দেবার কথা আমিই মহারাজকে বলেছিলেম।

প্রতাপ

সে ত বলেছিলে। তার ফল কি হ'ল দেখ না। আজ দুবৎসরের খাজনা বাকি। সকল মহল থেকে টাকা এল, আর ওখান থেকে কি আদায় হ'ল?

মন্ত্রী

আজ্ঞে আশীর্ব্বাদ। তেমন সব বজ্জাত প্রজাও যুবরাজের পায়ের গোলাম হয়ে গেছে। টাকার চেয়ে কি তার কম দাম? সেই যুবরাজের কাছ থেকে আপনি মাধবপুরের ভার কেড়ে নিলেন। সমস্তই উল্টে গেল। এর চেয়ে তাঁকে না পাঠানোই ভাল ছিল! সেখানকার প্রজারা ত হ'য়ে কুকুরের মত ক্ষেপে রয়েছে—তার পরে আবার যদি এই কথাটা প্রকাশ হয়, তা'হলে কি হয় বলা যায় না। রাজকার্য্যে ছোটোদের অবজ্ঞা করতে নেই মহারাজ! অসহ্য হলেই ছোটোরা জোট বাঁধে, জোট বাঁধলেই ছোটোরা বড় হয়ে ওঠে।

প্রতাপ

সেই ধনঞ্জয় বৈরাগী ত মাধবপুরে থাকে!

মন্ত্রী

আজ্ঞে হাঁ।

প্রতাপ

সেই বেটাই যত নষ্টের গোড়া। ধর্ম্মের ভেক ধ'রে সেই ত যত প্রজাকে নাচিয়ে তোলে। সেই ত প্রজাদের পরামর্শ দিয়ে খাজনা বন্ধ করিয়েছে। উদয়কে বলেছিলুম যেমন ক'রে হোক তাকে আচ্ছা ক'রে শাসন ক'রে দিতে। কিন্তু উদয়কে জান ত? এ দিকে তার না আছে তেজ, না আছে পৌরুষ, কিন্তু একগুঁয়েমির অন্ত নেই। ধনঞ্জয়কে শাসন দূরে থাক্ তাকে আস্পর্দ্ধা দিয়ে বাড়িয়ে তুলেছে। এ বারে তার কণ্ঠিসুদ্ধ কণ্ঠ চেপে ধরতে হচ্চে, তার পরে দেখা যাবে তোমার মাধবপুরের প্রজাদের কতবড় বুকের পাটা! আর দেখ, লোকজন আজই সব ঠিক করে রাখ—খবরটা পাবামাত্রই রায়গড়ে গিয়ে বস্‌তে হবে। সেইখানেই শ্রাদ্ধশান্তি করব—আমি ছাড়া উত্তরাধিকারী আর ত কাউকে দেখিনে।

(বসন্ত রায়ের প্রবেশ। প্রতাপাদিত্য চমকিয়া উঠিয়া দণ্ডায়মান)

বসন্ত রায়

আমাকে কিসের ভয় প্রতাপ? আমি তোমার পিতৃব্য, তাতেও যদি বিশ্বাস না হয় আমি বৃদ্ধ, তোমার কোনো অনিষ্ট করি এমন শক্তিই নেই। (প্রতাপ নীরব) প্রতাপ একবার রায়গড়ে চল—ছেলেবেলা কতদিন সেখানে কাটিয়েছ—তারপরে বহুকাল সেখানে যাও নি!

প্রতাপ

(নেপথ্যের দিকে চাহিয়া সগর্জ্জনে) খবরদার ঐ পাঠানকে ছাড়িস্‌নে!

[দ্রুত প্রস্থান।

(বসন্ত রায়ের প্রস্থান, প্রতাপ ও মন্ত্রীর পুনঃ প্রবেশ)

প্রতাপ

দেখ, মন্ত্রী, রাজকার্য্যে তোমার অত্যন্ত অমনোযোগ দেখা যাচ্চে।

মন্ত্রী

মহারাজ, এ বিষয়ে আমার কোনো অপরাধ নেই।

প্রতাপ

এ বিষয়ের কথা তোমাকে কে বল্‌চে? আমি বল্‌চি রাজকার্য্যে তোমার অত্যন্ত অমনোযোগ দেখচি। সে দিন

তোমাকে চিঠি রাখতে দিলাম হারিয়ে ফেল্লে! আর এক দিন মনে আছে উমেশ রায়ের কাছে তোমাকে যেতে বলেছিলুম, তুমি লোক দিয়ে কাজ সেরেছিলে।

মন্ত্রী

আজ্ঞে মহারাজ—

প্রতাপ

চুপ কর! দোষ কাটাবার জন্যে মিথ্যে চেষ্টা কোরো না। যাহোক্ তোমাকে জানিয়ে রাখচি রাজকার্য্যে তুমি কিছুমাত্র মনোযোগ দিচ্চ না। আর একটা কথা তোমাকে ব'লে দিচ্চি মন্ত্রী, সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে উদয় আছে। এমনি ক'রে সে নিজের চারদিকে জাল জড়াচ্চে—এর পরে আমাকে দোষ দিতে পারবে না।

তৃতীয় দৃশ্য

উদয়াদিত্যের শয়নকক্ষ

উদয়াদিত্য ও সুরমা

উদয়াদিত্য

যাক্, চুক্‌ল!

সুরমা

কি চুক্‌ল?

উদয়াদিত্য

আমার উপর মাধবপুর শাসনের ভার মহারাজ রেখেছিলেন। টাকায় আট আনা বৃদ্ধি ধরে খাজনা আদায়ের হঠাৎ হুকুম এলো। বৃষ্টি নেই, এবারে সেখানে অজন্মা—তাই আমি—

সুরমা

আমিত তোমাকে আমার গহনাগুলো দিতে চেয়েছিলুম। তার থেকে—

উদয়াদিত্য

তোমার গহনা কেনে এত বড় বুকের পাটা এরাজ্যে আছে? আমি মহারাজকে বল্লুম, মাধবপুর থেকে বৃদ্ধি খাজনা আমি কোনমতেই আদায় করতে পারব না! শুনে তিনি মাধবপুর আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছেন। তিনি এখন কেবলি সৈন্য বাড়াচ্চেন, অস্ত্র কিনচেন, টাকা তাঁর নিতান্ত চাই, তা প্রজা বাঁচুক আর মরুক।

সুরমা

পরগণা ত কেড়ে নিলেন, কিন্তু তুমি চলে এলে প্রজারা যে মর্‌বে!

উদয়াদিত্য

আমি ঠিক করেছি, যে করে হোক্ তাদের পেটের ভাতটা জোগাব! শুন্‌তে পেলে মহারাজ খুসি হবেন না—নিশ্চয় ভাববেন, আমি তাদের প্রশ্রয় দিচ্চি। উনি মনে করেন, আমি দয়া দিয়ে নাম কিনি। কিন্তু তোমার ঘরে আজ ফুলের মালার ঘটা কেন?

সুরমা

রাজপুত্রকে রাজ-সভায় যখন চিন্‌ল না, তখন যে তাকে চিনেছে, সে তাকে মালা দিয়ে বরণ কর্‌বে।

উদয়াদিত্য

সত্যি নাকি! তোমার ঘরে রাজপুত্র আসা যাওয়া করেন? তিনি কে শুনি? এ খবরটা জান্‌তুম না।

সুরমা

রামচন্দ্র যেমন ভুলেছিলেন তিনি অবতার, তোমারও সেই দশা। কিন্তু ভক্তকে ভোলাতে পার্‌বে না!

উদয়াদিত্য

রাজপুত্র! রাজার ঘরে কোনো জন্মে পুত্র জন্মাবে না, বিধাতার এই অভিশাপ!

সুরমা

সে কি কথা?

উদয়াদিত্য

রাজার ঘরে উত্তরাধিকারীই জন্মায়, পুত্র জন্মায় না।

সুরমা

এ তুমি মনের ক্ষোভে বল্‌চ।

উদয়াদিত্য

কথাটা কি নূতন যে ক্ষোভ হবে? যখন এতটুকু ছিলুম, তখন থেকে মহারাজ এইটেই দেখচেন যে, আমি তাঁর রাজ্যভার বইবার যোগ্য কি না? কেবলই পরীক্ষা, স্নেহ নেই।

সুরমা

প্রিয়তম, দরকার কি স্নেহের! খুব কঠোর পরীক্ষাতেও তোমার জিত হবে। তোমার মত রাজার ছেলে কোন রাজা পেয়েছে?

উদয়াদিত্য

বল কি ? পরীক্ষক তোমার পরামর্শ নিয়ে বিচার কর্বেন না, সেটা বেশ বুঝতে পারচি।

সুরমা

কারো পরামর্শ নিয়ে বিচার করতে হবে না—আগুনের পরীক্ষাতেও সীতার চুল পোড়ে নি। তুমি রাজ্যভার বহনের উপযুক্ত নও, এ কথা কি বল্লেই হল ? এত বড় অবিচার কি জগতে কখনো টিকতে পারে!

উদয়াদিত্য

রাজ্যভারটা নাই বা ঘাড়ের উপর পড়ল, তাতেই বা দুঃখ কিসের ?

সুরমা

না, না, ওকথা তোমার মুখে আমার সহ্য হয় না। ভগবান তোমাকে রাজার ছেলে করে পাঠিয়েছেন, সে কথা বুঝি অমন করে উড়িয়ে দিতে আছে! না হয় দুঃখই পেতে হবে—তা বলে—

উদয়াদিত্য

আমি দুঃখের পরোয়া রাখিনে! তুমি আমার ঘরে এসেছ, তোমাকে সুখী করতে পারিনে, আমার পৌরুষে সেই ধিক্কার!

সুরমা

যে সুখ দিয়েছ তাই যেন জন্ম-জন্মান্তরে পাই!

উদয়াদিত্য

সুখ যদি পেয়ে থাক ত নিজের গুণে, আমার শক্তিতে নয়। এ ঘরে আমার আদর নেই বলে তোমারও যে অপমান ঘটে! এমন কি মাও যে তোমাকে অবজ্ঞা করেন!

সুরমা

আমার সব সম্মান যে তোমার প্রেমে, সে ত কেউ কাড়তে পারে নি।

উদয়াদিত্য

তোমার পিতা শ্রীপুররাজ কিনা যশোরের অধীনতা স্বীকার করেন না—সেই হয়েছে তোমার অপরাধ—মহারাজ তোমার উপর রাগ দেখিয়ে তার শোধ তুলতে চান!

(নেপথ্যে) দাদা, দাদা!

উদয়াদিত্য

কেও! বিভা বুঝি ? (দ্বার খুলিয়া) কি বিভা ? কি

বিভা

একটা কাণ্ড হয়ে গেচে। আমি আর বাঁচিনে! (মুখ ঢাকিয়া কান্না)।

সুরমা

(বিভার গলা জড়াইয়া ধরিয়া) কি হয়েচে ভাই, বল্!

বিভা

আরবারে যখন উনি এখানে এসেছিলেন, ঠাট্টার সম্পর্ক ধরে ওঁকে কে ঠাট্টা করেছিল।

সুরমা

সে তো জানি, ঐ লক্ষ্মীছাড়া ছোঁড়া মাখনটা ওঁর কাপড়ের সঙ্গে একটা ল্যাজ জুড়ে দিয়েছিল—বলেছিল উনি রামচন্দ্র নন্, রামদাস।

বিভা

সে কথা তাঁরা ভুলতে পারেন নি। এবার এসে ঠাট্টায় জিততে পণ করে ওঁর রমাই ভাঁড়কে মেয়ে সাজিয়ে বাড়ীর মধ্যে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন—মাকে কি একটি যা-তা বলেচে!

উদয়াদিত্য

সর্ব্বনাশ!

বিভা

আমি তাকে দেখেই চিনতে পেরেছিলুম—মোহনমালকে বলে তখনি তাকে বিদায় করে দিয়েছি। কিন্তু কি জানি যদি কেউ বুঝতে পেরে থাকে!

উদয়াদিত্য

তোমার কি মনে হয় মা টের পেয়েছিলেন ?

বিভা

হতেও পারে মা হয়তো টের পেয়েছেন, কিন্তু অপমানটা পাছে ছড়িয়ে পড়ে, তাই চুপ করে গেলেন।

উদয়াদিত্য

মা কখনো এত বড় সর্ব্বনেশে কথাটা বাবাকে বল্বেন না।

বিভা

তা বল্বেন না, কিন্তু কেমন করে বুঝব আর কেউ জেনেচে কি না।

সুরমা

বিভা ভয় পাসনে, নিশ্চয় কেউ টের পায়নি। পেলে

উদয়াদিত্য

ব্যাপারটা তো কাল হয়ে গেছে ?

বিভা

হাঁ।

উদয়াদিত্য

তা হলে আমি বলে দিচ্ছি ফাঁড়া কেটে গেছে। বিচার করতে মহারাজের এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হয় না। খবর পেলে কাল্‌কের রাতটা কাট্‌ত না। তবু এক কাজ কর্‌, বিভা, তুই এখনি যা। রামচন্দ্রকে বল, এ বাড়ী থেকে চলে যেতে, যেন কিছুমাত্র বিলম্ব না করেন।

বিভা

তুমি বলোনা, দাদা, আমার কথা যদি না শোনেন।

উদয়াদিত্য

না,আমি তাকে যেতে বললে সে অপমান বোধ করবে।

[বিভার প্রস্থান।

সুরমা

রাজা হলেই কি মানুষ নিজের খেয়াল ছাড়া আর কিছুই দেখ্‌তে পায় না ?

উদয়াদিত্য

সামান্য একটা মেয়েলি ঠাট্টার হার জিতের কথা এই যশোরের রাজবাড়ীতে স্বপ্নেও ভাবতে পারে, এত বড় নির্ব্বোধ! এখানেও খেয়ালের রাজত্ব বটে, কিন্তু কত বড়ো সব খেয়াল—বিধির লিখনকে মুছে ফেলে রক্তের অক্ষরে নতুন লিখন বসিয়ে দেওয়ার খেয়াল।

(বসন্ত রায়ের প্রবেশ)

উদয়াদিত্য

একি, দাদামশায় যে! স্বপ্ন ? না মতিভ্রম ?

বসন্ত রায়

গান

আজ তোমারে দেখতে এলেম
অনেকদিনের পরে।
ভয় কিছু নেই, সুখে থাকো,
অধিকক্ষণ থাকবো নাকো—
এসেছি এক নিমেষের তরে॥
দেখব শুধু মুখখানি,
শুনব দুটি মধুর বাণী,
আড়াল থেকে হাসি দেখে
চলে যাবো দেশান্তরে॥

সুরমা

দাদামশায়, কারো মুখে হাসি দেখবার জন্যে তোমাকে কোনোদিন আড়ালে থাক্‌তে হয় নি।

উদয়াদিত্য

তুমি যাই বলো, হাসি দেখে দেশান্তরে যেতে ইচ্ছে হয়, এমন হাসি আমরা কেউ হাসিনে।

সুরমা

তুমি যে এলে আমরা কোনো খবর জানতুম না।

বসন্ত রায়

দিদি, এ সংসারে প্রত্যক্ষ এসে না পৌঁছলে কে আসবে কে না আসবে, তার ঠিক খবরটি তো পাওয়া যায় না!

সুরমা

ওটা শঙ্করাচার্য্যের মতো কথা হলো। তোমার ঐ হাসি-মুখে এমন কথা মানায় না।

বসন্ত রায়

সে কথা মিথ্যে বলিস্‌নি, ভাই। সংসার অনিত্য, জীবন অনিশ্চিত, এ সব কথা ঘোর মিথ্যে। তোদের মুখ যখনি দেখি, তখনি সংসার নিত্য, তখনি জীবন চিরদিনের, তা যেদিন মরি আর যেদিন বাঁচি।

সুরমা

যে অমৃত-মুখের কথা বললে, সেটিকে তোমার তৃষিত চক্ষু খুঁজে বেড়াচ্চে আমি কি বুঝতে পারচিনে ?

বসন্ত রায়

ওটা ভাই মিথ্যে অভিমানের কথা বললি, মহাদেব বুকের মধ্যে রেখেচেন অন্নপূর্ণাকে, আর মাথার উপরে রেখেচেন গঙ্গাকে—কাউকেই তাঁর ছাড়লে একদণ্ড চলে না—তাঁর প্রাণের অন্নজল দুইই সমান চাই।

সুরমা

আর আমার ঠাকুরুণদিদি: এখানে এসেই বুঝি ভুললে ?

বসন্ত রায়

তিনি তো আমার চাঁদ। বিধাতা আমার কপালে লিখে দিয়েচেন। তাঁকে ভুলেও ভোলবার যো নেই।

সুরমা

তিনি চাঁদের মতই চুপ করে থাকেন বটে, আমি বোধ হয় গঙ্গার মতোই মুখরা।

বসন্ত রায়

সে কথা অস্বীকার করতে পারিনে। চক্ষু বুজে ঐ স্নিগ্ধ কলকণ্ঠ নিয়তই মনে মনে শুনতে পাই।

সুরমা

এত স্তুতিবাক্যও চতুর্ম্মুখ তোমার একমুখে জোগান কি করে?

বসন্ত রায়

সে আমার এই বাগ্‌বাদিনীর গুণে,—বিধিরও নয়, আমারও নয়।

সুরমা

আর নয় দাদামশায়, মিষ্টির পরিমাণটা একলার পক্ষে কিছু বেশী হয়ে উঠেচে।

(বিভার দ্রুত প্রবেশ)

বসন্ত রায়

বিভা! কি হয়েচে দিদি, তোমার মুখ অমন কেন?

বিভা

মহারাজের কানে গিয়েচে।

উদয়াদিত্য

কি সর্ব্বনাশ! কেমন করে গেলো? মা কিছু বলেচেন না কি?

বিভা

না, মা বলেন নি। ওঁরা নিজেই থাকতে পারেন নি। এই নিয়ে আমাদের রাজবাড়ির লোকদের কাছে বড়াই করতে গিয়েচেন—তার থেকেই রাষ্ট্র হয়েচে।

বসন্ত রায়

কি হয়েচে ব্যাপারটা?

উদয়াদিত্য

রামচন্দ্র ছেলেমানুষী করে অন্তঃপুরে তার ভাঁড়কে পাঠিয়েছিল মেয়ে সাজিয়ে। সে কথা মহারাজের কানে উঠেচে, এখন কি হয় কিছুই বলা যায় না।

বসন্ত রায়

আমি একবার প্রতাপের কাছে যাই।

উদয়াদিত্য

এখন কিছু বোলো না—উল্টো হবে। আগে দেখি মহারাজ কি হুকুম দেন।

সুরমা

হুকুম যাই দিন্, এখনি যশোর ছেড়ে ওঁদের পালানো চাই।

(রামমোহন মালের প্রবেশ)

রামমোহন

(বিভার প্রতি) তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্চি মা, ঘরে দেখতে পেলুম না, তাই এখানে এলুম।

বিভা

(সভয়ে) কেন, কেন, কী হয়েছে!

রামমোহন

কিছুই হয় নি। আজ কতকাল পরে মায়ের দেখা পেয়েচি—চারজোড়া শাঁখা এনেচি—তুমি পরো, আমি দেখে যাই।

উদয়াদিত্য

রামমোহন, তোমাদের নৌকো সব তৈরী আছে?

রামমোহন

এখনি কিসের তৈরী যুবরাজ, কতদিন পরে আমাদের আসা, এখন তো শীগগির মাকে ছেড়ে যাচ্চিনে।

বিভা

মোহন, এখনি নৌকো তৈরী কর গে—একটুও দেরী করিস্ নে।

রামমোহন

কেন মা?

বিভা

বিপদ ঘটিয়েছে—তুই তো সব জানিস। ঐ যে ভাঁড় এসেছিল অন্তঃপুরে। সে কথা মহারাজের কানে গিয়েছে।

রামমোহন

বেশ তো, এখনি তার মুণ্ডু নেন্ না—তার নোংরা মুখটা বন্ধ হলে আমরাও বাঁচি। আমি ধরে এনে দেব তাকে—ভাবনা নেই।

উদয়াদিত্য

রামমোহন, সে কাটটাকে কেউ ছোঁবেও না, তার চেয়ে বড়ো বিপদের ভয় আছে। তোমাদের সব চেয়ে বড়ো যে ছিপ নৌকো তার দাঁড়ী কত?

রামমোহন

চৌষট্টি জন।

উদয়াদিত্য

সেই নৌকাটা আমার এই জানালার সাম্‌নের ঘাটে এখনি তৈরি ক'রে আনো। আজ রাত্তিরেই কোনো মতে রওনা ক'রে দিতে হবে।

রামমোহন

দেরি হবে না যুবরাজ, দণ্ড দুয়েকের মধ্যে সব তৈরি ক'রে রেখে দেব। কি করতে হবে ব'লে দাও।

উদয়াদিত্য

এই জান্‌লা দিয়ে তাঁকে নাবিয়ে দিতে হবে, তার পরে রাতারাতি তোরা দাঁড় টেনে চলে যাবি।

[রামমোহনের প্রস্থান।

(বিভা বসিয়া পড়িয়া মুখে অঞ্চল দিয়া রোদন)

বসন্ত রায়

দিদি, ভয় করিস্‌নে, ভগবানের কৃপায় সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি বেঁচে থাক্‌তে তোর ভয় নেই রে।

বিভা

ভয় না, দাদা মশায়, লজ্জা! ছি ছি কি লজ্জা! রাজার ছেলে হয়ে এমন ব্যবহার তো আমি ভাবতে পারিনে। জন্মের মতো আমার যে মাথা হেট হয়ে গেলো।

বসন্তরায়

এখন ও সব কথা ভাবিস্‌নে, আপাততঃ—

বিভা

অপরাধ করলে আমি নিজে মহারাজের কাছে মাপ চাইতে যেতুম। কিন্তু এ যে তারো বেশি। এ যে নীচতা। আমার মাপ চাইবার মুখ রইল না।

সুরমা

বিভা, এখন মনটা বিচলিত করিস্ নে।

বিভা

বৌ দিদি, যদি মহারাজ শাস্তি দেন, আমার তো কিছুই বলবার থাকবে না! তাঁর সম্মান তাঁর মেয়ে জামাইয়ের সুখ-দুঃখের চেয়ে অনেক বড়ো, তাঁর মেয়ে হয়ে এ কথা কি আমি বুঝতে পারি নে?

বসন্ত রায়

এখন রামচন্দ্র আছেন কোথায়?

বিভা

বাইরের বৈঠকখানায় নাচ-গান জমিয়েছেন, সহর থেকে তিনি সব নাচওয়ালী আনিয়েছেন, আজ দু'দিন ধরে এই সব চল্‌চে।

বসন্ত রায়

কলি যখন সর্ব্বনাশ করে, তখন আমোদ করতে করতেই করে। যেমন ক'রে পারো, বিভা, তুমি এখনি তাকে ডাকিয়ে আনাও।

[বিভার প্রস্থান।

(নেপথ্যে) উদয়, উদয়!

উদয়াদিত্য

ঐ যে মহারাজ আস্‌চেন।

[সুরমার পলায়ন।

(প্রতাপাদিত্যের প্রবেশ)

প্রতাপ

শুনেছ সব কথা?

উদয়াদিত্য

শুনেছি।

প্রতাপ

লছমন সর্দ্দারকে হুকুম করেচি, কাল সকালে রামচন্দ্র যখন শয়নঘর থেকে বেরিয়ে আস্‌বে, তখন তার মুণ্ডু কাটা যাবে। আজ রাত্রে অন্তঃপুরের পাহারার ভার তোমার উপরে।

উদয়াদিত্য

আমার উপরে মহারাজ? এ যে আমাকে শাস্তি।

প্রতাপ

শাস্তি আমাকেও নয়? তা ব'লে রাজার কর্ত্তব্য করতে হবে না?

বসন্ত রায়

বাবা প্রতাপ!

(প্রতাপাদিত্য নিরুত্তর)

বসন্ত রায়

বাবা প্রতাপ, এ-ও কি সম্ভব ?

প্রতাপ

কেন সম্ভব নয় ?

বসন্ত রায়

ছেলেমানুষ, সে তো অবজ্ঞার পাত্র, সে কি তোমার ক্রোধের যোগ্য ?

প্রতাপ

আগুনে হাত দিলে হাত পুড়ে যায়, এ কথা যে বোকা নাও বোঝে, তারো হাত পোড়ে। দুর্ব্বুদ্ধি যার মাথায় জোগাতে পারে, সে বুদ্ধির ফলটা কি হবে, সে কি তার মাথায় জোগায় না ? দুঃখ এই, বুদ্ধিটা যখন মাথায় জোগাবে, মাথাটা তখন দেহে থাকবে না।

বসন্ত রায়

অপরাধ যে করে সে দুর্ব্বল, ক্ষমা যে করে শক্তি তারই, এ কথা ভুলো না।

প্রতাপ

দেখো পিতৃব্য ঠাকুর, রায় বংশের কিসে মান অপমান সে বোধ যদি তোমার থাকবে, তা'হলে পাকা মাথায় আজ মোগল-বাদশার শিরোপা জড়িয়ে বেড়াতে পারতে কি ? তোমারো লাঞ্ছিত মাথার স্থান এই ধূলায়, আমারি দুর্ভাগ্য তোমাকে বাঁচিয়ে দিলে। এই তোমাকে স্পষ্ট বল্লুম। খুড়ো মশায়, এখন আমার নিদ্রার সময়।

বসন্ত রায়

বুঝেছি প্রতাপ, একবার যে ছুরি তোমার খাপ থেকে বেরোয়, রক্ত না নিয়ে সে ফিরবে না। তা নিক, যে তার প্রথম লক্ষ্য ছিলো, এখনো তো সে সামনেই আছে। প্রতাপ, একবার বিভার কথা ভেবে দেখো।

প্রতাপ

আচ্ছা তবে ডাকো বিভাকে। (বিভার প্রবেশ) ঐ যে এসেছে। বিভা !

বিভা

মহারাজ !

প্রতাপ

সকল কথা শুনেচ বিভা ?

বিভা

হাঁ।

প্রতাপ

তোমার মাকে, আমাদের অন্তঃপুরকে কি রকম অপমান করেচে, তা তো জানো ?

বিভা

জানি।

প্রতাপ

আমি যদি তার প্রাণদণ্ড দিই, তবে সেটা অন্যায় হবে কি ?

বিভা

না।

বসন্ত রায়

দিদি, কি বল্লি দিদি ! মহারাজের পায়ে ধরে মাপ চেয়ে নে !

(বিভা নিরুত্তর)

প্রতাপ

খুড়া মহারাজ, মনে রেখো, বিভা আমারি মেয়ে !

উদয়াদিত্য

মহারাজ, আপনি দণ্ডদাতা, আপনিই শাস্তি দিন কিন্তু এ শাস্তির দণ্ডভার আমাদের উপরে দেবেন না।

প্রতাপ

কি বল্‌তে চাও তুমি ?

উদয়াদিত্য

পাহারা দেবার লোক মহারাজের অনেক আছে। তাদের স্নেহ নেই, এই জন্যে তাদের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়েই কর্ত্তব্য পালন করবে। আমার উপরে পাহারা দেবার ভার দেবেন না।

প্রতাপ

লোক থাকবে আমার, কিন্তু দায় থাকবে তোমার।

উদয়াদিত্য

আমি আমার স্নেহকে অতিক্রম করতে পারবো না।

প্রতাপ

না পারো তো তারো জবাবদিহী আছে।

[প্রস্থান।

উদয়াদিত্য

কোথায় ফাঁক আছে, একবার দেখে আসি।

বসন্ত রায়

কিন্তু, দাদা, তুমি এতে হাত যদি দাও তা হলে—

উদয়াদিত্য

তা হলে যা হবে সেটা তো এখনকার কথা নয় —এখনকার কথা হচ্চে হাত দেওয়াই চাই।

চতুর্থ দৃশ্য

নৃত্যসভা

রামচন্দ্র

নট-নটীর দল

(রামমোহনের প্রবেশ)

রামমোহন

একবার উঠে আসুন।

রামচন্দ্র

এখন না, যাঃ বিরক্ত করিস্ নে। গান ছেড়ো না।

রামমোহন

শুনতেই হবে।

রামচন্দ্র

কাল সকালে শুনব। দেখ বিরক্ত করিস্ নে।

রামমোহন

যুবরাজ ডাকচেন, জরুরি কাজ আছে।

রামচন্দ্র

বুঝেচি, শালা বুঝি ঠাট্টার জবাব দিতে চায়! পারবে না আমার সঙ্গে।

রামমোহন

ঠাট্টা শেষ হয়ে গেছে, এখন বিপদের পালা। শীঘ্র এসো।

রামচন্দ্র

আর ভয় দেখাতে হবে না, এখন আমার সময় নেই!

রামমোহন

এ দিকেও সময় একটুও নেই। আচ্ছা এই দিকে আসুন, বলচি! (রামচন্দ্র জনান্তিকে) প্রতাপাদিত্য মহারাজ সব কথা শুনেচেন।

রামচন্দ্র

না শুনলে মজাটা কি!

রামমোহন

কি বলেন মহারাজ, মজা! তিনি আপনার শ্বশুর, আপনার ঠাট্টার সম্পর্ক ত নন।

রামচন্দ্র

আমার ঠাট্টা চল্‌চে শালাদের নিয়ে। তিনি সেটা যদি গায়ে মাখেন সেটা কি আমার দোষ?

রামমোহন

সে বিচার এখন নয়। আপাতত প্রাণদণ্ডের হুকুম হয়েচে, কাল সকালেই—

রামচন্দ্র

তুমি শুন্‌লে কোথা থেকে?

রামমোহন

যুবরাজের নিজের মুখ থেকে।

রামচন্দ্র

তোর মতো বোকা ত দুনিয়ায় নেই রে! যুবরাজ ঠাট্টা করেচে বুঝতে পারিস্ নে! প্রাণদণ্ড!

রামমোহন

দোহাই তোমার, একটুও ঠাট্টা নয়।

রামচন্দ্র

আমাকে ঠাট্টায় ওরা হারাতে পারবে না। তুই এখন যা।

রামমোহন

আচ্ছা আমি যুবরাজকে ডেকে আনচি!

[প্রস্থান।

রামচন্দ্র

(নটীদের প্রতি) ধরো গান।

নাচ ও গান

(আমার) নয়ন তোমার নয়নতলে
মনের কথা খোঁজে!
(সেথায়) কালো ছায়ার মায়ার ঘোরে
পথ হারালো ও যে।
নীরব দিঠে শুধায় যত
পায় না সাড়া মনের মতো,
অবুঝ হয়ে রয় সে চেয়ে
অশ্রুধারায় ম'জে॥
তুমি আমার কথার আভাখানি
পেয়েছ কি মনে?
এই যে আমি মালা আনি
তার বাণী কেউ শোনে

পথ দিয়ে যাই, যেতে যেতে
হাওয়ায় ব্যথা দিই যে পেতে,
বাঁশি বিছায় বিষাদ ছায়া
তার ভাষা কেউ বোঝে ?

রামচন্দ্র

বেটা রামমোহন আমার মনটা মিছিমিছি খারাপ করে দিয়ে গেলো। এ কেমন গোঁয়ারগোছের ঠাট্টা এ বাড়ির ? শ্যালাদের রসের জ্ঞান একটুও নেই। খেমোনা, আর একটা গান ধরো। একটু দ্রুততালে।

(গান)

না বলে যেয়োনা চলে মিনতি করি।
গোপনে জীবন মন লইয়া হরি।
সারা নিশি জেগে থাকি
ঘুমে ঢ'লে পড়ে আঁখি,
ঘুমালে হারাই পাছে সে ভয়ে মরি ॥
চকিতে চমকি বঁধু তোমারে খুঁজি,
থেকে থেকে মনে হয় স্বপন বুঝি !
নিশিদিন চাহে হিয়া,
পরাণ পসারি দিয়া,
অধীর চরণ তব বাঁধিয়া ধরি ॥

(রামচন্দ্র মাঝে মাঝে বাহবা দিতেছেন, মাঝে মাঝে উৎকণ্ঠিত ভাবে দ্বারের দিকে চাহিতেছেন।)

(উদয়াদিত্যের প্রবেশ)

উদয়াদিত্য

উঠে এসো শীঘ্র।

রামচন্দ্র

একেবারে জোর তলব যে !

উদয়াদিত্য

দেরি কোরো না, এসো শীগগির !

রামচন্দ্র

বোনের পেয়াদা হয়ে এসেচ বুঝি, তলব দিতে ?

উদয়াদিত্য

থাকো। বিধাতা যাকে মারেন, তাকে কেউ বাঁচা পারে না।

[প্রস্থা

রামচন্দ্র

আওয়াজটা ঠাট্টার মতো শোনাচ্চে না। একব দেখেই আসি গে। (নটীদের প্রতি) তোমরা গান থামি না—এখনো রাত আছে বাকি। আমি এখনি আসচি।

[প্রস্থান

গান।

ফুল তুলিতে ভুল করেছি
প্রেমের সাধনে।
বঁধু তোমায় বাঁধব কিসে
মধুর বাঁধনে।
ভোলাব না মায়ার ছলে,
রইব তোমার চরণতলে,
মোহের ছায়া ফেল্‌ব না মোর
হাসি কাঁদনে ॥
রইল শুধু বেদনভরা আশা,
রইল শুধু প্রাণের নীরব ভাষা।
নিরাভরণ যদি থাকি,
চোখের কোণে চাইবে না কি,
যদি আঁখি নাই বা ভোলাই
রঙের ধাঁদনে ॥

নটীগণ

প্রথমা

কই, এখনো ত ফিরলেন না !

দ্বিতীয়া

আর ত ভাই পারি নে ! ঘুম পেয়ে আসচে !

তৃতীয়া

ফের কি সভা জমবে না কি ?

প্রথমা

কেউ যে জেগে আছে তা ত বোধ হচ্ছে না ! এত ব

দ্বিতীয়া

চাকররাও সব হঠাৎ কে কোথায় যেন চলে গেল !

তৃতীয়া

বাতিগুলো সব নিবে আসচে, কেউ জ্বালিয়ে দেবে না ?

প্রথমা

আমার কেমন ভয় করচে ভাই !

দ্বিতীয়া

(বাদকদিগকে দেখাইয়া দিয়া) ওরাও যে সব ঘুমুতে লাগল—কি মুস্কিলেই পড়া গেল ! ওদের তুলে দে না। কেমন গা ছম্ ছম্ করচে !

তৃতীয়া

মিছে না ভাই ! একটা গান ধর ! ওগো তোমরা ওঠ ! ওঠ !

বাদকগণ

(ধড় ফড় করিয়া উঠিয়া) অ্যাঁ অ্যাঁ। এসেছেন না কি ?

প্রথমা

তোমরা একবার বেরিয়ে গিয়ে দেখ না গো, কেউ কোথাও নেই। আমাদের আজকে বিদায় দেবে না—না কি !

একজন বাদক

(বাহিরে গিয়া ফিরিয়া আসিয়া) ওদিকে যে সব বন্ধ !

প্রথমা

অ্যাঁ ! বন্ধ ! আমাদের কি কয়েদ করলে না কি ?

দ্বিতীয়া

দূর ! কয়েদ করতে যাবে কেন ?

প্রথমা

ভাল লাগচে না ! কি হল বুঝতে পারচি নে। চল ভাই, আর এখানে নয়। একটা কি কাণ্ড হচ্চে ।

[প্রস্থান।

(রাজমহিষীর প্রবেশ)

রাজমহিষী

কই এদের মহলেও তো মোহনকে দেখতে পাচ্চিনে। কি হল বুঝতে পাচ্চিনে। বামী !

(বামীর প্রবেশ)

এদিক্‌কার খাওয়া দাওয়া ত সব শেষ হল, মোহনকে খুঁজে পাচ্চিনে কেন ?

বামী

মা, তুমি অত ভাবচ কেন ? তুমি শুতে যাও, রাত যে পুইয়ে এল, তোমার শরীরে সইবে কেন ?

রাজমহিষী

সে কি হয় ! আমি যে তাকে নিজে বসিয়ে খাওয়াব বলে রেখেছি।

বামী

নিশ্চয় রাজকুমারী তাকে খাইয়েছেন। তুমি চল, শুতে চল।

রাজমহিষী

আমি ঐ মহলে খোঁজ করতে যাচ্ছিলুম, দেখি সব দরজা বন্ধ—এর মানে কি, কিছুই বুঝতে পারচি নে !

বামী

বাড়িতে গোলমাল দেখে রাজকুমারী তার মহলের দরজা বন্ধ করেছেন। অনেকদিন পরে জামাই এসেছেন, আজ লোকজনের ভিড় সইবে কেন ? চল তুমি শুতে চল।

রাজমহিষী

কি জানি বামী, আজ ভাল লাগচে'না। প্রহরীদের ডাকতে বল্লুম তাদের কারো কোনো সাড়াই পাওয়া গেল না।

বামী

যাত্রা হচ্চে, তারা তাই আমোদ করতে গেছে।

রাজমহিষী

মহারাজ জানতে পারলে যে তাদের আমোদ বেরিয়ে যাবে। উদয়ের মহলও যে বন্ধ, তারা ঘুমিয়েছে বুঝি !

বামী

ঘুমবেন না ! বল কি ! রাত কি কম হয়েছে !

রাজমহিষী

গান বাজনা ছিল, জামাইকে নিয়ে একটু আমোদ আহ্লাদ করবে না ? ওরা মনে কি ভাব্‌বে বল ত ! এ সমস্তই ঐ বৌ-মার কাণ্ড ! একটু বিবেচনা নেই ! রোজই ত ঘুমচ্চে—একটা দিন কি আর—

বামী

যাক্, সে সব কথা কাল হবে—আজ চল !

রাজমহিষী

মঙ্গলার সঙ্গে তোর দেখা হয়েচে ত ?

বামী

হয়েছে বৈ কি ?

রাজমহিষী

ওষুধের কথা বলেছিস ?

বামী

সে সব ঠিক হয়ে গেছে।

[প্রস্থান।

(প্রতাপ, প্রহরী, পীতাম্বর ও অনুচরের প্রবেশ)

প্রতাপ

কত রাত আছে ?

পীতাম্বর

এখনো চার দণ্ড রাত আছে।

প্রতাপ

কি যেন একটা গোলমাল শুন্‌লুম।

পীতাম্বর

আজ্ঞে তাই শুনেই আমি আসছি।

প্রতাপ

কি হয়েছে ?

পীতাম্বর

আসবার সময় দেখলুম বাইরের প্রহরীরা দ্বারে নেই।

প্রতাপ

অন্তঃপুরের প্রহরীরা।

পীতাম্বর

হাত পা বাঁধা পড়ে আছে।

প্রতাপ

তারা কি বল্লে ?

পীতাম্বর

আমার কথার কোনো জবাব দিলে না—হয়ত অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে।

প্রতাপ

রামচন্দ্র রায় কোথায় ? উদয়াদিত্য, বসন্ত রায় কোথায় ?

পীতাম্বর

বোধ করি তাঁরা অন্তঃপুরেই আছেন।

প্রতাপ

বোধ করি ! তোমার বোধ করার কথা কে জিজ্ঞাসা করচে ! মন্ত্রীকে ডাক।

[পীতাম্বরের প্রস্থান।

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী

মহারাজ রাজজামাতা,—

প্রতাপ

রামচন্দ্র রায়—

মন্ত্রী

হাঁ, তিনি রাজপুরী পরিত্যাগ করে গেছেন।

প্রতাপ

পরিত্যাগ করে গেছেন, প্রহরীরা গেল কোথা ?

মন্ত্রী

বহির্দ্বারের প্রহরীরা পালিয়ে গেছে।

প্রতাপ

(মুষ্টি বদ্ধ করিয়া) পালিয়ে গেছে ? পালাবে কোথায় ? যেখানে থাকে তাদের খুঁজে আন্‌তে হবে ! অন্তঃপুরের প্রহরীদের এখনি ডেকে নিয়ে এস। অন্তঃপুরের পাহারায় কে কে ছিল ?

মন্ত্রী

সীতারাম আর ভাগবত !

প্রতাপ

ভাগবত ছিল ? সে ত হুঁসিয়ার , সেও কি উদয়ের সঙ্গে যোগ দিলে ?

মন্ত্রী

সে হাত পা বাঁধা পড়ে আছে।

প্রতাপ

হাত পা বাঁধা আমি বিশ্বাস করিনে। হাত পা ইচ্ছে করে বাঁধিয়েছে। আচ্ছা সীতারামকে নিয়ে এস, সেই গর্দ্দভের কাছ থেকে কথা বের করা শক্ত হবে না।

(মন্ত্রীর প্রস্থান ও সীতারামকে লইয়া পুনঃ প্রবেশ)

প্রতাপ

অন্তঃপুরের দ্বার খোলা হল কি করে ?

সীতারাম

(করযোড়ে) দোহাই মহারাজ, আমার কোন দোষ নেই।

প্রতাপ

সে কথা তোকে কে জিজ্ঞাসা করচে!

সীতারাম

আজ্ঞা না, মহারাজ,—যুবরাজ—যুবরাজ আমাকে বলপূর্ব্বক বেঁধে—

(ব্যস্তভাবে বসন্ত রায়ের প্রবেশ)

সীতারাম

যুবরাজকে নিষেধ করলুম, তিনি—

বসন্ত রায়

হাঁ হাঁ সীতারাম কি বল্লি? অধর্ম্ম করিস্ নে সীতারাম, উদয়াদিত্যের এতে কোন দোষ নেই।

সীতারাম

আজ্ঞা না, যুবরাজের কোন দোষ নেই।

প্রতাপ

তবে তোর দোষ।

সীতারাম

আজ্ঞে না।

প্রতাপ

তবে কার দোষ?

সীতারাম

আজ্ঞা যুবরাজ—

প্রতাপ

তাঁর সঙ্গে আর কে ছিল?

সীতারাম

আজ্ঞে বউরাণী মা—

প্রতাপ

বউরাণী? ঐ সেই শ্রীপুরের—(বসন্ত রায়ের দিকে চাহিয়া) উদয়াদিত্যের এ অপরাধের মার্জ্জনা নেই।

বসন্ত রায়

বাবা প্রতাপ, এতে উদয়ের কোনো দোষ ছিল না।

প্রতাপ

দোষ ছিলো না। দেখ, তুমি তার পক্ষ নিয়ে যদি কথা কও তাতে তার ভালো হবে না—এই আমি বলে দিলুম।

(বসন্ত রায় কিয়ৎকাল চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মাধবপুরের পথ

ধনঞ্জয় ও প্রজাদল

ধনঞ্জয়

একেবারে সব মুখ চুন করে আছিস্ কেন? মেরেছে বেশ করেছে! এতদিন আমার কাছে আছিস বেটারা, এখনো ভাল করে মার খেতে শিখলিনে? হাড়গোড় সব ভেঙে গেছে নাকি রে?

প্রথম

রাজার কাছারিতে ধরে মার্‌লে সে বড় অপমান!

ধনঞ্জয়

আমার চেলা হয়েও তোদের মানসম্ভ্রম আছে! এখনো সবাই তোদের গায়ে ধূলো দেয় না রে? তবে এখনো তোরা ধরা পড়িসনি? তবে এখনো আরো অনেক বাকি আছে!

দ্বিতীয়

বাকি আর রইল কি ঠাকুর? এদিকে পেটের জ্বালায় মরচি, ওদিকে পিঠের জ্বালাও ধরিয়ে দিলে!

ধনঞ্জয়

বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে—একবার খুব করে নেচে নে।

গান

আরো প্রভু আরো আরো!
এমনি করে আমায় মারো!
লুকিয়ে থাকি আমি পালিয়ে বেড়াই,
ধরা পড়ে গেছি আর কি এড়াই?
যা কিছু আছে সব কাড়ো কাড়ো!
এবার যা কর্‌বার তা সারো সারো!
আমি হারি কিম্বা তুমিই হারো।
হাটে ঘাটে বাটে করি মেলা
কেবল হেসে খেলে গেছে বেলা,
দেখি কেমনে কাঁদাতে পার!

দ্বিতীয়

আচ্ছা ঠাকুর, তুমি কোথায় চলেছ বল দেখি ?

ধনঞ্জয়

যশোর যাচ্ছি রে !

তৃতীয়

কি সর্ব্বনাশ ! সেখানে কি করতে যাচ্ছ ?

ধনঞ্জয়

একবার রাজাকে দেখে আসি ! চিরকাল কি তোদের সঙ্গেই কাটাব ? এবার রাজদরবারে নাম রেখে আসব।

চতুর্থ

তোমার উপরে রাজার যে ভারি রাগ। তার কাছে গেলে কি তোমার রক্ষা আছে ?

পঞ্চম

জান ত যুবরাজ তোমাকে শাসন করতে চায় নি বলে তাকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল।

ধনঞ্জয়

তোরা যে মার সইতে পারিসনে ! সেই জন্যে তোদের মারগুলো সব নিজের পিঠে নেবার জন্যে স্বয়ং রাজার কাছে চলেছি। পেয়াদা নয় রে পেয়াদা নয়—যেখানে স্বয়ং মারের বাবা বসে আছে, সেইখানে ছুটেছি।

প্রথম

না, না, সে হবে না, ঠাকুর, সে হবে না।

ধনঞ্জয়

খুব হবে—পেট ভরে হবে, আনন্দে হবে।

প্রথম

তবে আমরাও তোমার সঙ্গে যাব।

ধনঞ্জয়

পেয়াদার হাতে আশ মেটেনি বুঝি ?

দ্বিতীয়

না ঠাকুর, সেখানে একলা যেতে পারচ না, আমরাও সঙ্গে যাব।

ধনঞ্জয়

আচ্ছা যেতে চাস ত চল্! একবার সহরটা দেখে আসবি।

তৃতীয়

কিছু হাতিয়ার সঙ্গে নিতে হবে ?

ধনঞ্জয়

কেন রে ? হাতিয়ার নিয়ে কি করবি ?

তৃতীয়

যদি তোমার গায়ে হাত দেয় তা হলে—

ধনঞ্জয়

তা হলে তোরা দেখিয়ে দিবি হাত দিয়ে না মেরে কি করে হাতিয়ার দিয়ে মারতে হয় ! কি আমার উপকারটা করতেই যাচ্ছ ! তোদের যদি এই রকম বুদ্ধি হয়, তবে এই-খানেই থাক্।

চতুর্থ

না, না, তুমি যা বল্বে তাই করব, কিন্তু আমরা তোমার সঙ্গে থাক্ব।

তৃতীয়

আমরাও রাজার কাছে দরবার করব।

ধনঞ্জয়

কি চাইবি রে ?

তৃতীয়

আমরা যুবরাজকে চাইব।

ধনঞ্জয়

বেশ, বেশ, অর্দ্ধেক রাজত্ব চাইবি নে ?

তৃতীয়

ঠাট্টা করচ ঠাকুর !

ধনঞ্জয়

ঠাট্টা কেন করব ? সব রাজত্বটাই কি রাজার ? অর্দ্ধেক রাজত্ব প্রজার নয় ত কি ? চাইতে দোষ নেই রে ! চেয়ে দেখিস।

চতুর্থ

যখন তাড়া দেবে ?

ধনঞ্জয়

তখন আবার চাইব। তুই কি ভাবিস রাজা একলা শোনে ? আরো এক জন শোনবার লোক দরবারে বসে থাকেন—শুনতে শুনতে তিনি একদিন মঞ্জুর করেন, তখন রাজার তাড়াতে কিছুই ক্ষতি হয় না !

গান

আমরা বসব তোমার সনে।
তোমার সরিক হব রাজার রাজা
তোমার আধেক সিংহাসনে।
তোমার দ্বারী মোদের করেছে শির নত,
তারা জানে না যে মোদের গরব কত,
তাই বাহির হতে তোমায় ডাকি
তুমি ডেকে লও গো আপন জনে॥

প্রথম

বাবা ঠাকুর, রাজার কাছে যাচ্ছ কিন্তু তিনি তোমাকে সহজে ছাড়বেন না।

ধনঞ্জয়

ছাড়বেন কেন বাপ সকল! আদর করে ধরে রাখবেন।

প্রথম

সে আদরের ধরা নয়।

ধনঞ্জয়

ধরে রাখতে কষ্ট আছে বাপ্—পাহারা দিতে হয়—যে-সে লোককে কি রাজা এত আদর করে? রাজ-বাড়িতে কত লোক যায়, দরজা থেকেই ফেরে—আমাকে ফেরাবে না।

গান

আমাকে যে বাঁধবে ধরে এই হবে যার সাধন,
সে কি অমনি হবে!
আপনাকে সে বাঁধা দিয়ে আমায় দেবে বাঁধন!
সে কি অমনি হবে!
আমাকে যে দুঃখ দিয়ে আনবে আপন বশে—
সে কি অমনি হবে!
তার আগে তার পাষাণ হিয়া গলবে করুণরসে
সে কি অমনি হবে!
আমাকে যে কাঁদাবে তার ভাগ্যে আছে কাঁদন
সে কি অমনি হবে!

দ্বিতীয়

বাবা ঠাকুর, তোমার গায়ে যদি রাজা হাত দেন, তা হলে কিন্তু আমরা সইতে পারবো না।

ধনঞ্জয়

আমার এই গা যাঁর, তিনি যদি সইতে পারেন বাবা, তবে তোমাদেরও সইবে। যেদিন থেকে জন্মেছি, আমার এই গায়ে তিনি কত দুঃখই সইলেন—কত মার খেলেন, কত ধুলোই মাখলেন—হায় হায়—

কে বলেছে তোমায় বঁধু এত দুঃখ সইতে?
আপনি কেন এলে বঁধু আমার বোঝা বইতে?
প্রাণের বন্ধু বুকের বন্ধু
সুখের বন্ধু দুখের বন্ধু
(তোমায়) দেব না দুখ পাব না দুখ
হেরব তোমার প্রসন্ন মুখ
(আমি) সুখে দুঃখে পারব বন্ধু
চিরানন্দে রইতে—
তোমার সঙ্গে বিনা কথায় মনের কথা কইতে।

তৃতীয়

বাবা, আমরা রাজাকে গিয়ে কি বলব?

ধনঞ্জয়

বলব আমরা খাজনা দেব না!

তৃতীয়

যদি শুধোয় কেন দিবি নে?

ধনঞ্জয়

বলব, ঘরের ছেলে-মেয়েকে কাঁদিয়ে যদি তোমাকে টাকা দিই, তা'হলে আমাদের ঠাকুর কষ্ট পাবে। যে অন্নে প্রাণ বাঁচে, সেই অন্নে ঠাকুরের ভোগ হয়; তিনি যে প্রাণের ঠাকুর। তার বেশি যখন ঘরে থাকে তখন তোমাকে দিই—কিন্তু ঠাকুরকে ফাঁকি দিয়ে তোমাকে খাজনা দিতে পারব না।

চতুর্থ

বাবা, একথা রাজা শুনবে না।

ধনঞ্জয়

তবু শোনাতে হবে। রাজা হয়েছে বলেই কি সে

এমন হতভাগা যে ভগবান্ তাকে সত্য কথা শুন্‌তে দেবেন না? ওরে জোর করে শুনিয়ে আসব।

পঞ্চম

ও ঠাকুর, তাঁর জোর যে আমাদের চেয়ে বেশি—তাঁরই জিত হবে।

ধনঞ্জয়

দূর বাঁদর, এই বুঝি তোদের বুদ্ধি! যে হারে তার বুঝি জোর নেই! তার জোর যে একেবারে বৈকুণ্ঠ পর্য্যন্ত পৌঁছয় তা জানিস্!

ষষ্ঠ

কিন্তু ঠাকুর, আমরা দূরে ছিলুম, লুকিয়ে বাঁচতুম—একেবারে রাজার দরজায় গিয়ে পড়ব, শেষে দায়ে ঠেক্‌লে আর পালাবার পথ থাক্‌বে না।

ধনঞ্জয়

দেখ পাঁচকড়ি, অমন চাপাচুপি দিয়ে রাখলে ভাল হয় না। যত দূর পর্য্যন্ত হবার তা হতে দে, নইলে কিছুই শেষ হতে চায় না। যখন চূড়ান্ত হয়, তখনি শান্তি হয়।

সপ্তম

তোরা অত ভয় কর্‌চিস্ কেন? বাবা যখন আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন, উনি আমাদের বাঁচিয়ে আন্‌বেন।

ধনঞ্জয়

তোদের এই বাবা যার ভরসায় চলেছে, তার নাম কর্। বেটারা কেবল তোরা বাঁচতেই চাস্—পণ করে বসেচিস্ যে মরবি নে। কেন, মর্‌তে দোষ কি হয়েছে! যিনি মারেন তাঁর গুণগান কর্‌বি নে বুঝি! তোরা একটু দাঁড়া, চারিদিকের ভাবগতিকটা একটু বুঝে নিয়ে আসি।

[প্রস্থান।

(উদয়াদিত্যের প্রবেশ)

উদয়াদিত্য

ওরে মর্‌তে এসেচিস এখানে? মহারাজ খবর পেলে রক্ষা রাখবেন না। পালা পালা!

প্রথম

আমাদের মরণ সর্ব্বত্রই। পালাব কোথায়?

দ্বিতীয়

তা মর্‌তে যদি হয় তোমার সামনে দাঁড়িয়ে মরব!

উদয়াদিত্য

তোদের কি চাই বল দেখি!

অনেকে

আমরা তোমাকে চাই।

উদয়াদিত্য

আমাকে নিয়ে তোদের কোনো লাভ হবে নারে—দুঃখই পাবি।

তৃতীয়

আমাদের দুঃখই ভাল কিন্তু তোমাকে আমরা নিয়ে যাব।

চতুর্থ

আমাদের মাধবপুরে ছেলে মেয়েরা পর্য্যন্ত কাঁদচে, সে কি কেবল ভাত না পেয়ে? তা নয়! তুমি চলে এসেছ বলে! তোমাকে আমরা ধরে নিয়ে যাব!

উদয়াদিত্য

আরে চুপ কর্, চুপ কর্! ও কথা বলিস নে!

পঞ্চম

রাজা তোমাকে ছাড়বে না! আমরা তোমাকে জোর করে নিয়ে যাব। আমরা রাজাকে মানিনে—আমরা তোমাকে রাজা কর্‌ব।

(প্রতাপাদিত্যের প্রবেশ)

প্রতাপ

কাকে মানিস্ নে রে! তোরা কাকে রাজা কর্‌বি?

প্রজাগণ

মহারাজ পেন্নাম হই।

প্রথম

আমরা তোমার কাছে দরবার কর্‌তে এসেছি।

প্রতাপ

কিসের দরবার?

প্রথম

আমরা যুবরাজকে চাই।

প্রতাপ

বলিস্ কি রে?

সকলে

হাঁ মহারাজ, আমরা যুবরাজকে মাধবপুরে নিয়ে যাব।

প্রতাপ

আর ফাঁকি দিবি? খাজনা দেবার নামটি কর্‌বি নে।

সকলে

অন্ন বিনে মর্‌ছি যে।

প্রতাপ

মর্‌তে ত সকলকেই হবে। বেটারা রাজার দেনা বাকি রেখে মর্‌বি?

প্রথম

আচ্ছা আমরা না খেয়েই খাজনা দেব, কিন্তু যুবরাজকে আমাদের দাও। মরি ত ওঁরি হাতে মর্‌ব।

প্রতাপ

সে বড় দেরি নেই। তোদের সর্দ্দার কোথায় রে।

দ্বিতীয়

(১মকে দেখাইয়া) এই যে আমাদের গণেশ সর্দ্দার।

প্রতাপ

ও নয়—সেই বৈরাগীটা।

প্রথম

আমাদের ঠাকুর! তিনি ত পুজোয় বসেছেন। এখনি আস্‌বেন। ঐ যে এসেছেন।

(ধনঞ্জয় বৈরাগীর প্রবেশ)

ধনঞ্জয়

দয়া যখন হয় তখন সাধনা না করেই পাওয়া যায়। ভয় ছিল কাঙালদের দরজা থেকেই ফিরতে হয় বা! প্রভুর কৃপা হল, রাজাকে অমনি দেখতে পেলুম। (উদয়াদিত্যের প্রতি) আর এই আমাদের হৃদয়ের রাজা। ওকে রাজা বল্‌তে যাই বন্ধু বলে ফেলি!

উদয়াদিত্য

ধনঞ্জয়!

ধনঞ্জয়

কি রাজা! কি ভাই!

উদয়াদিত্য

এখানে কেন এলে?

ধনঞ্জয়।

তোমাকে না দেখে থাকৃতে পারি নে যে!

উদয়াদিত্য

মহারাজ রাগ কর্‌চেন।

ধনঞ্জয়

রাগই সই! আগুন জ্বলচে তবু পতঙ্গ মরতে যায়।

প্রতাপ

তুমি এই সমস্ত প্রজাদের ক্ষেপিয়েছ?

ধনঞ্জয়

ক্ষ্যাপাই বই কি! নিজে ক্ষেপি ওদেরও ক্ষ্যাপাই এই ত আমাদের কাজ।

আমারে পাড়ায় পাড়ায় ক্ষেপিয়ে বেড়ায়
কোন্ ক্ষেপা সে!
ওরে আকাশ জুড়ে মোহন সুরে
কি যে বাজে কোন্ বাতাসে!

ওরে ক্ষ্যাপার দল, গান ধর রে—হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? রাজাকে পেয়েছিস আনন্দ করে নে! রাজা আমাদের মাধবপুরে. নৃত্যটা দেখে নিক্।

সকলে মিলিয়া নৃত্যগীত—

গেল রে গেল বেলা, পাগলের কেমন খেলা,
ডেকে সে আকুল করে দেয় না ধরা!
তারে কানন গিরি খুঁজে ফিরি
কেঁদে মরি কোন্ হুতাশে!

(প্রতাপাদিত্যের মুখের দিকে চাহিয়া) আহা, আহা, রাজা আমার, অমন নিষ্ঠুর সেজে একি লীলা হচ্চে! ধরা দেবে না বলে পণ করেছিলে, আমরা ধরব বলে কোমর বেঁধে বেরিয়েছি!

প্রতাপ

দেখ বৈরাগী, তুমি অমন পাগলামি করে আমাকে ভোলাতে পারবে না! এখন কাজের কথা হোক্। মাধবপুরের প্রায় দু বছরের খাজনা বাকি—দেবে কি না বল?

ধনঞ্জয়

না মহারাজ দেব না।

প্রতাপ

দেবে না! এত বড় আস্পর্দ্ধা!

ধনঞ্জয়

যা তোমার নয়, তা তোমাকে দিতে পারব না।

প্রতাপ

আমার নয়!

ধনঞ্জয়

আমাদের ক্ষুধার অন্ন তোমার নয়। যিনি আমাদের প্রাণ দিয়েছেন এ অন্ন যে তাঁর, এ আমি তোমাকে দিই কি বলে!

প্রতাপ

তুমিই প্রজাদের বারণ করেছ খাজনা দিতে?

ধনঞ্জয়

হাঁ মহারাজ, আমিই ত বারণ করেছি। ওরা মুর্খ, ওরা ত বোঝে না—পেয়াদার ভয়ে সমস্তই দিয়ে ফেলতে চায়। আমিই বলি, আরে আরে এমন কাজ করতে নেই—প্রাণ দিবি তাঁকে, প্রাণ দিয়েছেন যিনি—তোদের রাজাকে প্রাণ-হত্যার অপরাধী করিস নে।

প্রতাপ

দেখ ধনঞ্জয়, তোমার কপালে দুঃখ আছে।

ধনঞ্জয়

যে দুঃখ কপালে ছিল তাকে আমার বুকের উপর বসিয়েছি মহারাজ—সেই দুঃখইত আমাকে ভুলে থাক্‌তে দেয় না। যেখানে ব্যথা সেইখানেই হাত পড়ে—ব্যথা আমার বেঁচে থাক্‌।

প্রতাপ

দেখ বৈরাগী তোমার চাল নেই চুলো নেই—কিন্তু এরা সব গৃহস্থ মানুষ, এদের কেন বিপদে ফেল্‌তে চাচ্চ? (প্রজাদের প্রতি) দেখ্‌ বেটারা, আমি বলচি তোরা সব মাধবপুরে ফিরে যা। বৈরাগী তুমি এইখানেই রইলে!

প্রজাগণ

আমাদের প্রাণ থাক্‌তে সে ত হবে না।

ধনঞ্জয়

কেন হবে নারে! তোদের বুদ্ধি এখনো হল না। রাজা বল্লে বৈরাগী তুমি রইলে, তোরা বল্লি না তা হবে না—আর বৈরাগী লক্ষ্মীছাড়াটা কি ভেসে এসেছে? তার থাকা

(গান)

রইল বলে রাখলে কারে
হুকুম তোমার ফলবে কবে?
(তোমার) টানাটানি টিকবে না ভাই
র'বার যেটা সেটাই রবে।
যা খুসি তাই করতে পার—
গায়ের জোরে রাখ মার—
যাঁর গায়ে সব ব্যথা বাজে
তিনি যা স'ন সেটাই সবে!
অনেক তোমার টাকা কড়ি,
অনেক দড়া অনেক দড়ি,
অনেক অশ্ব অনেক করী
অনেক তোমার আছে ভবে।
ভাবচো হবে তুমিই যা চাও,
জগৎটাকে তুমিই নাচাও,
দেখবে হঠাৎ নয়ন খুলে,
হয় না যেটা সেটাও হবে!

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

প্রতাপ

তুমি ঠিক সময়েই এসেছ। এই বৈরাগীকে এইখানেই ধরে রেখে দাও। ওকে মাধবপুরে যেতে দেওয়া হবে না।

মন্ত্রী

মহারাজ—

প্রতাপ

কি! হুকুমটা তোমার মনের মত হচ্ছে না বুঝি!

উদয়াদিত্য

মহারাজ বৈরাগী ঠাকুর সাধুপুরুষ!

প্রজারা

মহারাজ, এ আমাদের সহ্য হবে না। মহারাজ অকল্যাণ হবে!

ধনঞ্জয়

আমি বল্‌চি তোরা ফিরে যা। হুকুম হয়েছে আমি

প্রজারা

আমরা এই জন্মেই কি দরবার করতে এসেছিলুম? আমরা যুবরাজকেও পাব না, তোমাকেও হারাব?

ধনঞ্জয়

দেখ্ তোদের কথা শুন্‌লে আমার গা জ্বালা করে! হারাবি কি রে ব্যাটা! আমাকে তোদের গাঁঠে বেঁধে রেখেছিলি? তোদের কাজ হ'য়ে গেছে, এখন পালা সব পালা!

প্রজারা

মহারাজ, আমরা কি আমাদের যুবরাজকে পাব না?

প্রতাপাদিত্য

না।

দ্বিতীয় দৃশ্য

অন্তঃপুর

সুরমা ও বিভা

সুরমা

বিভা, ভাই বিভা, তোর চোখে যদি জল দেখ্‌তুম, তা হ'লে আমার মনটা যে খোলসা হ'ত। তোর হ'য়ে যে আমার কাঁদ্‌তে ইচ্ছা করে ভাই, সব কথাই কি এমনই ক'রে চেপে রাখতে হয়!

বিভা

কোনো কথাই ত চাপা রইল না বৌরাণী। ভগবান্ ত লজ্জা রাখলেন না!

সুরমা

আমি কেবল এই কথাই ভাবি যে, জগতে সব দাহই জুড়িয়ে যায়। আজকের মত এমন কপাল-পোড়া সকাল ত রোজ আস্‌বে না; সংসার লজ্জা দিতেও যেমন, লজ্জা মিটিয়ে দিতেও তেম্‌নি! সব ভাঙাচোরা জুড়ে আবার দেখতে দেখতে ঠিক হ'য়ে যায়।

বিভা

ঠিক নাও যদি হ'য়ে যায় তাতেই বা কি। যেটা হয় সেটা ত সইতেই হয়।

সুরমা

শুনেছি ত বিভা, মাধবপুর থেকে ধনঞ্জয় বৈরাগী এসেছেন। তাঁর ত খুব নাম শুনেছি, বড় ইচ্ছা করে তাঁর গান শুনি। গান শুন্‌বি বিভা? ঐ দেখ,—কেবল অতটুকু মাথা নাড়লে হবে না। লোক দিয়ে ব'লে পাঠিয়েছি আজ যেন একবার মন্দিরে গান গাইতে আসেন, তা হ'লে আমরা উপরের ঘর থেকে শুনতে পাব। ও কি—পালাচ্ছিস্ কোথায়?

বিভা

দাদা আস্‌চেন!

সুরমা

তা এলই বা দাদা।

বিভা

না আমি যাই বৌ-রাণী।

[প্রস্থান।

সুরমা

আজ ওর দাদার কাছেও মুখ দেখাতে পার্‌চে না।

(উদয়াদিত্যের প্রবেশ)

সুরমা

আজ ধনঞ্জয় বৈরাগীকে আমাদের মন্দিরে গান গাবার জন্মে ডেকে পাঠিয়েছি।

উদয়াদিত্য

সে ত হবে না।

সুরমা

কেন?

উদয়াদিত্য

তাঁকে মহারাজ কয়েদ করেচেন।

সুরমা

কি সর্ব্বনাশ, অমন সাধুকে কয়েদ করেছেন?

উদয়াদিত্য

ওটা আমার উপর রাগ করে। তিনি জানেন আমি বৈরাগীকে ভক্তি করি—মহারাজের কঠিন আদেশেও আমি তাঁর গায়ে হাত দিই নি—সেই জন্মে আমাকে দেখিয়ে দিলেন রাজকার্য্য কেমন ক'রে কর্‌তে হয়।

সুরমা

কিন্তু এগুলো যে অমঙ্গলের কথা—শুন্‌লে ভয় হয়। কি করা যাবে!

উদয়াদিত্য

মন্ত্রী আমার অনুরোধে বৈরাগীকে গারদে না দিয়ে

তাঁর বাড়িতে লুকিয়ে রাখতে রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু ধনঞ্জয় কিছুতেই রাজি হলেন না। তিনি বল্লেন আমি গারদেই যাব, সেখানে যত কয়েদী আছে, তাদের প্রভুর নাম গান শুনিয়ে আস্‌ব। তিনি যেখানেই থাকুন তাঁর জন্যে কাউকেই ভাবতে হবে না—তাঁর ভাবনার লোক উপরে আছেন।

সুরমা

মাধবপুরের প্রজাদের জন্যে আমি সব সিধে সাজিয়ে রেখেছি—কোথায় সব পাঠাবো?

উদয়াদিত্য

গোপনে পাঠাতে হবে। নির্ব্বোধগুলো আমাকে রাজা রাজা করে চেঁচাচ্ছিল, মহারাজ সেটা শুন্‌তে পেয়েছেন—নিশ্চয় তাঁর ভাল লাগেনি। এখন তোমার ঘর থেকে তাদের খাবার পাঠানো হলে মনে কি সন্দেহ করবেন বলা যায় না।

সুরমা

আচ্ছা সে আমি বিভাকে দিয়ে পাঠিয়ে দেব! কিন্তু আমি ভাবচি, কাল রাত্রে যারা পাহারায় ছিল সেই সীতারাম ভাগবতের কি দশা হবে!

উদয়াদিত্য

মহারাজ ওদের গায়ে হাত দেবেন না—সে ভয় নেই।

সুরমা

কেন?

উদয়াদিত্য

মহারাজ কখনো ছোট শিকারকে বধ করেন না। দেখলে না, রমাই ভাঁড়কে তিনি ছেড়ে দিলেন।

সুরমা

কিন্তু শাস্তি ত তিনি একজন কাউকে না দিয়ে থাক্‌বেন না।

উদয়াদিত্য

সে ত আমি আছি।

সুরমা

ও কথা বোলো না।

উদয়াদিত্য

বল্‌তে বারণ কর ত বলব না। কিন্তু বিপদের জন্যে কি প্রস্তুত হতে হবে না?

সুরমা

আমি থাক্‌তে তোমার বিপদ্ ঘটবে কেন? সব বিপদ আমি নেব।

উদয়াদিত্য

তুমি নেবে? তার চেয়ে বিপদ আমার আর আছে না কি? যাই হোক সীতারাম ভাগবতের অন্নবস্ত্রের একটা ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

সুরমা

তুমি কিন্তু কিছু কোরো না! তাদের জন্যে যা করবার ভার সে আমি নিয়েছি।

উদয়াদিত্য

না, না, এতে তুমি হাত দিয়ো না।

সুরমা

আমি দেব না ত কে দেবে? ও ত আমারি কাজ। আমি সীতারাম ভাগবতের স্ত্রীদের ডেকে পাঠিয়েছি।

উদয়াদিত্য

সুরমা, তুমি বড় অসাবধান।

সুরমা

আমার জন্যে তুমি কিছু ভেবো না। আসল ভাবনার কথা কি জান?

উদয়াদিত্য

কি বল দেখি!

সুরমা

ঠাকুর জামাই তাঁর ভাঁড়কে নিয়ে যে কাণ্ডটি করলেন, বিভা সে জন্যে লজ্জায় মরে গেছে।

উদয়াদিত্য

লজ্জার কথা বই কি।

সুরমা

এতদিন স্বামীর অনাদরে বাপের ’পরেই তার অভিমান ছিল—আজ যে তার সেই অভিমান করবারও মুখ রইল না। বাপের নিষ্ঠুরতার চেয়ে তার স্বামীর এই নীচতা তাকে অনেক বেশি বেজেছে। একে ত ভারি চাপা মেয়ে—তার পরে এই কাণ্ড! আজ থেকে দেখো, ওর স্বামীর কথা আমার কাছেও বলতে পারবে না। স্বামীর গর্ব্ব যে স্ত্রীলোকের ভেঙেছে, জীবন তার পক্ষে বোঝা, বিশেষতঃ বিভার মত মেয়ে।

উদয়াদিত্য

ভগবান্ বিভাকে দুঃখ যথেষ্ট দিলেন, তেমনি সহ্য করবার শক্তিও দিয়েছেন।

সুরমা

সে শক্তির অভাব নেই—বিভা তোমারি ত বোন বটে!

উদয়াদিত্য

আমার শক্তি যে তুমি।

সুরমা

তাই যদি হয় ত সেও তোমারি শক্তিতে।

উদয়াদিত্য

আমার কেবলি ভয় হয় তোমাকে যদি হারাই তা হলে—

সুরমা

তা হলে তোমার কোনো অনিষ্ট হবে না। দেখো একদিন ভগবান্ প্রমাণ করিয়ে দেবেন যে, তোমার মহত্ত্ব একলা তোমাতেই।

উদয়াদিত্য

আমার সে প্রমাণে কাজ নেই।

সুরমা

ভাগবতের স্ত্রী অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে।

উদয়াদিত্য

আচ্ছা চল্লুম কিন্তু দেখো।—

[প্রস্থান।

(ভাগবতের স্ত্রীর প্রবেশ)

সুরমা

ভোর রাত্রে আমি যে টাকা আর কাপড় পাঠিয়েছি, তা তোদের হাতে গিয়ে পৌঁছেচে ত?

ভাগবতের স্ত্রী

পৌঁচেছে মা, কিন্তু তাতে আমাদের কতদিন চল্‌বে? তোমরা আমাদের সর্ব্বনাশ কর্‌লে!

সুরমা।

ভয় নেই কামিনী! আমার যত দিন খাওয়া পরা জুটবে তোদেরও জুটবে। আজও কিছু নিয়ে যা! কিন্তু এখানে বেশিক্ষণ থাকিস্ নে!

[উভয়ের প্রস্থান।

(রাজমহিষী ও বামীর প্রবেশ)

রাজমহিষী

এত বড় একটা কাণ্ড হয়ে গেল, আমি জান্‌তেও পারলুম না।

বামী

মহারাণী মা, জেনেই বা লাভ হত কি! তুমি ত ঠেকাতে পার্‌তে না!

রাজমহিষী

সকালে উঠে আমি ভাবছি হল কি—জামাই বুঝি রাগ করেই গেল! এদিকে যে এমন সর্ব্বনাশের উদ্যোগ হচ্ছিল, তা মনে আন্‌তেও পারিনি। তুই সে রাত্রেই জান্‌তিস্ আমাকে ভাঁড়িয়েছিলি!

বামী

জান্‌লে তুমি যে ভয়েই মরে যেতে! তা মা, আর ওকথায় কাজ নেই—যা হয়ে গেছে সে হয়ে গেছে।

রাজমহিষী

হয়ে চুকলে ত বাচতুম—এখন যে আমার উদয়ের জন্যে ভয় হচে।

বামী

ভয় খুব ছিল, কিন্তু সে কেটে গেছে।

রাজমহিষী

কি করে কাটল।

বামী

মহারাজার রাগ বৌরাণীর উপর পড়েছে। তিনিও আচ্ছা মেয়ে যা হোক্—আমাদের মহারাজের ভয়ে যম কাঁপে কিন্তু ওঁর ভয় ডর নেই। যাতে তাঁরই উপরে সব রাগ পড়ে তিনি ইচ্ছে করেই যেন তার জোগাড় কর্‌চেন।

রাজমহিষী

তার জন্যে ত বেশী জোগাড় কর্‌বার দরকার দেখিনে। মহারাজ যে ওকে বিদায় করতে পারলেই বাঁচেন। এবারে আর ত ঠেকিয়ে রাখতে পারা যাবে না। তা তোকে যা বলেছিলুম, সেটা ঠিক আছে ত!

বামী

সে সমস্তই তৈরী হয়ে রয়েছে, সে জন্যে ভেবো না।

রাজমহিষী

আর দেরী করিস্ নে, আজকেই যাতে—

বামী

সে আমাকে বল্‌তে হবে না, কিন্তু—

রাজমহিষী

যা হয় হবে—অত ভাব্‌তে পারি নে—ওকে বিদায় করতে পার্‌লেই আপাতত মহারাজের রাগ পড়ে যাবে, নইলে উদয়কে বাঁচাতে পারা যাবে না। তুই যা শীঘ্র কাজ সেরে আয়।

বামী

আমি সে ঠিক করেই এসেছি—এতক্ষণে হয় ত—

[প্রস্থান।

রাজমহিষী।

কি জানি বামী, ভয়ও হয়!

(প্রতাপাদিত্যের প্রবেশ)

প্রতাপ

মহিষী!

মহিষী

কি মহারাজ!

প্রতাপ

এ সব কাজ কি আমাকে নিজের হাতে করতে হবে?

মহিষী

কি কাজ!

প্রতাপ

ঐ যে আমি তোমাকে বলেছিলুম শ্রীপুরের মেয়েকে তার পিত্রালয়ে দূর করে দিতে হবে—এ কাজটা কি আমার সৈন্য সেনাপতি নিয়ে করতে হবে?

মহিষী

আমি তার জন্যে বন্দোবস্ত করছি।

প্রতাপ

বন্দোবস্ত! এর আবার বন্দোবস্ত কিসের! আমার রাজ্যে ক'জন পাল্কীর বেহারা জুটবে না—না কি?

মহিষী

সে জন্যে নয় মহারাজ!

প্রতাপ

তবে কি জন্যে?

মহিষী

দেখ তবে খুলে বলি! ঐ বউ আমার উদয়কে যেন জাদু করে রেখেছে সে ত তুমি জান। ওকে যদি বাপে বাড়ি পাঠিয়ে দিই তা' হলে—

প্রতাপ

এমন জাদু ত ভেঙে দিতে হবে—এ বাড়ি থেকে মেয়েটাকে নির্ব্বাসিত করে দিলেই জাদু ভাঙবে।

মহিষী

মহারাজ, এ সব কথা তোমরা বুঝবে না—সে আমি ঠিক করেছি।

প্রতাপ

কি ঠিক করেছ জান্‌তে চাই।

মহিষী

আমি বামীকে দিয়ে মঙ্গলার কাছ থেকে ওষুধ আনিয়েছি।

প্রতাপ

ওষুধ কিসের জন্যে?

মহিষী

ওকে ওষুধ খাওয়ালেই ওর জাদু কেটে যাবে। মঙ্গলার ওষুধ অব্যর্থ, সকলেই জানে।

প্রতাপ

আমি তোমার ওষুধ টষুধ বুঝিনে- আমি এক ওষুধ জানি—শেষকালে সেই ওষুধ প্রয়োগ করব। আমি তোমাকে বলে রাখচি কাল যদি ঐ শ্রীপুরের মেয়ে শ্রীপুরে ফিরে না যায়, তা'হলে আমি উদয়কে শুদ্ধ নির্ব্বাসনে পাঠাব এখন যা করতে হয় করগে!

মহিষী

আর ত বাঁচিনে! কি যে করব মাথামুণ্ডু ভেবে পাই নে!

[প্রস্থান

(উদয়াদিত্যের প্রবেশ)

প্রতাপ

সীতারাম ভাগবতের বেতন বন্ধ হয়েছে, সে কি রাজকোষে অর্থ নেই বলে?

উদয়

না মহারাজ, আমি বল পূর্ব্বক তাদের কর্ত্তব্যে বাধা দিয়েছি, আমাকে তারি দণ্ড দেবার জন্যে।

প্রতাপ

বৌমা তাদের গোপনে অর্থ সাহায্য করছেন।

উদয়

আমিই তাঁকে সাহায্য করতে বলেছি।

প্রতাপ

আমার ইচ্ছার অপমান কর্‌বার জন্যে ?

উদয়

না মহারাজ, যে দণ্ড আমারই প্রাপ্য, তা নিজে গ্রহণ কর্‌বার জন্যে।

প্রতাপ

আমি আদেশ করচি, ভবিষ্যতে তাদের আর যেন অর্থ-সাহায্য না করা হয়।

উদয়

আমার প্রতি আরো গুরুতর শাস্তির আদেশ হল।

প্রতাপ

আর বৌমাকে বোলো, তিনি আমাকে একেবারেই ভয় করেন না—দীর্ঘকাল তাঁকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে বলেই এ রকম ঘটতে পেরেছে, কিন্তু তিনি জান্‌তে পারবেন স্পর্দ্ধা প্রকাশ করা নিরাপদ নয়। তিনি মনে রাখেন যেন আমার রাজবাড়ি আমার রাজত্বের বাইরে নয় !

[উভয়ের প্রস্থান।

(মহিষী ও বামীর প্রবেশ)

মহিষী

ওষুধের কি কর্‌লি ?

বামী

সে ত এনেছি—পানের সঙ্গে সেজে দিয়েছি।

মহিষী

খাঁটি ওষুধ ত ?

বামী

খুব খাঁটি !

মহিষী

খুব কড়া ওষুধ হওয়া চাই, এক দিনেই যাতে কাজ হয়। মহারাজ বলেছেন কালকের মধ্যে যদি সুরমা বিদায় না হয়, তা'হলে উদয়কে শুদ্ধ নির্ব্বাসনে পাঠাবেন। আমি যে কি কপাল করেছিলুম !

বামী

কড়া ওষুধ ত বটে। বড় ভয় হয় মা, কি হতে কি ঘটে !

মহিষী

ভয় ভাবনা করবার সময় নেই বামী। একটা কিছু কর্‌তেই হবে। মহারাজকে ত জানিস্—কেঁদেকেটে মাথা খুঁড়ে তাঁর কথা নড়ানো যায় না। উদয়ের জন্যে আমি দিনরাত্রি ভেবে মর্‌চি। ঐ বউটাকে বিদায় কর্‌তে পার্‌লে তবু মহারাজের রাগ একটু কম পড়বে। ও যেন ওঁর চক্ষুশূল হয়েছে।

বামী

তা ত জানি ! কিন্তু ওষুধের কথা বলা ত যায় না। দেখো, শেষকালে মা আমি যেন বিপদে না পড়ি ! আর আমার বাজুবন্দর কথাটা মনে রেখো।

মহিষী

সে আমাকে বল্‌তে হবে না। তোকে ত গোট্‌ ছড়াটা আগাম দিয়েছি।

বামী

শুধু গোট্‌ নয় মা—বাজুবন্দ চাই !

[প্রস্থান।

(উদয়াদিত্যের প্রবেশ)

মহিষী

বাবা উদয়, সুরমাকে বাপের বাড়ি পাঠান যা'ক !

উদয়

কেন মা, সুরমা কি অপরাধ ক'রেছে ?

মহিষী

কি জানি বাছা, আমরা মেয়েমানুষ কিছু বুঝি না, বৌমাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে মহারাজার রাজকার্য্যের যে কি সুযোগ হ'বে, মহারাজই জানেন !

উদয়

মা ! রাজবাড়িতে যদি আমার স্থান হয়ে থাকে তবে সুরমার কি হবে না ? কেবল স্থানটুকু মাত্রই তার ছিল, তার বেশি ত আর কিছু সে পায়নি !

মহিষী

(সরোদনে) কি জানি বাবা, মহারাজ কখন কি যে করেন কিছু বুঝতে পারি নে। কিন্তু তাও বলি বাছা, আমাদের বৌমাও বড় ভাল মেয়ে নয়। ও রাজবাড়িতে প্রবেশ করে অবধিই এখানে আর শান্তি নেই। হাড় জ্বালাতন হয়ে গেল ! তা, ও দিনকতক বাপের বাড়িতেই

যাক না কেন, দেখা যাক, কি বল বাছা? ও দিনকতক এখান থেকে গেলেই দেখতে পা'বে, বাড়ীর শ্রী ফেরে কি না!

[উদয় নীরব থাকিয়া কিয়ৎকাল পরে প্রস্থান।

(সুরমার প্রবেশ)

সুরমা

কই এখানে ত তিনি নেই!

মহিষী

পোড়ামুখী, আমার বাছাকে তুই কি কল্লি? আমার বাছাকে আমায় ফিরিয়ে দে। এসে অবধি তুই তা'র কি সর্ব্বনাশ না কল্লি? অবশেষে সে রাজার ছেলে তা'র হাতে বেড়ী না দিয়ে কি তুই ক্ষান্ত হ'বি নি?

সুরমা

কোনো ভয় নেই মা। বেড়ী এবার ভাঙ্‌ল। আমি বুঝ্‌তে পারচি আমার বিদায় হবার সময় হয়ে এসেছে— আর বড় দেরি নেই। আমি আর দাঁড়াতে পারচিনে! বুকের ভিতর যেন আগুনে জ্বলে যাচ্ছে। তোমার পায়ের ধুলো নিতে এলুম। অপরাধ যা কিছু করেছি মাপ কোরো! ভগবান্ করুন যেন আমি গেলেই শান্তি হয়!

[পদধূলি লইয়া প্রস্থান।

মহিষী

ওষুধ খেয়েছে বুঝি! বিপদ কিছু ঘটবে না ত? যে যা বলুক, বৌমা কিন্তু লক্ষ্মী মেয়ে। ওকে এমন জোর করে বিদায় করলে কি ধর্ম্মে সইবে? বামী, বামী!

(বামীর প্রবেশ)

বামী

কি মা!

মহিষী

ওষুধটা কি বড্ড কড়া হয়েছে?

বামী

তুমি ত কড়া ওষুধের কথাই বলেছিলে।

মহিষী

কিন্তু বিপদ ঘটবে না ত?

বামী

আপদ্ বিপদের কথা বলা যায় কি!

মহিষী

সত্যি বল্‌চি বামী, আমার মনটা কেমন করচে ওষুধটা কি খেয়েছে ঠিক জানিস্?

বামী

বেশিক্ষণ নয়— এই খানিকক্ষণ হল খেয়েচে।

মহিষী

দেখ্‌লুম, মুখ একেবারে শাদা ফেকাসে হয়ে গেছে? কি করলুম কে জানে! হরি রক্ষা কর।

বামী

তোমরা ত ওকে বিদায় করতেই চেয়েছিলে!

মহিষী

না, না, ছি ছি—অমন কথা বলিস্ নে। দেখ্ আমি তোকে আমার এই গলার হার গাছটা দিচ্চি তুই শীগ্‌গির দৌড়ে গিয়ে মঙ্গলার কাছ থেকে এর উল্টো ওষুধ নিয়ে আয়গে। যা বামি, যা! শীগ্‌গির যা!

[বামীর প্রস্থান

(বিভার সরোদনে প্রবেশ)

বিভা

মা, মা, কি হল মা?

মহিষী

কি হয়েছে বিভু।

বিভা

বৌদিদির এমন হল কেন মা! তোমরা তাকে কি করলে মা! কি খাওয়ালে!

মহিষী

(উচ্চস্বরে) ওরে, বামী, বামী, শীগগির্ দৌড়ে যা— ওরে ওষুধ নিয়ে আয়!

(উদয়াদিত্যের প্রবেশ)

মহিষী

বাবা, উদয়, কি হয়েছে বাপ!

উদয়াদিত্য

সুরমা বিদায় হয়েছে মা, এবার আমি বিদায় হতে এসেছি—আর এখানে নয়।

মহিষী

(কপালে করাঘাত করিয়া) কি সর্ব্বনাশ হল রে, কি সর্ব্বনাশ হল!

উদয়

(প্রণাম করিয়া) চল্লুম তবে !

মহিষী

(হাত ধরিয়া) কোথায় যাবি বাপ ! আমাকে মেরে ফেলে দিয়ে যা !

বিভা

(পা জড়াইয়া) কোথায় যাবে দাদা ! আমাকে কার হাতে দিয়ে যাবে !

উদয়াদিত্য

তোকে কার হাতে দিয়ে যাব ! আমি হতভাগা ছাড়া তোর কে আছে ! ওরে বিভা, তুইই আমাকে টেনে রাখলি —নইলে এ পাপ বাড়িতে আমি আর এক মুহূর্ত্ত থাকতুম না।

বিভা

বুক ফেটে গেল দাদা, বুক ফেটে গেল।

উদয়াদিত্য

দুঃখ করিস্ নে বিভা, যে গেছে সে সুখে গেছে! এ বাড়িতে এসে সেই সোনার লক্ষ্মী এই আজ প্রথম আরাম পেল। ওখানে কিসের গোলমাল। (বাতায়ন হইতে নীচে চাহিয়া) প্রজারা এসেচে দেখচি। ওদের বিদায় করে দিয়ে আসি গে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

নীচের আঙিনায় মাধবপুরের প্রজাদল

প্রথম

(উচ্চস্বরে) আমরা এখানে হত্যা দিয়ে পড়ে থাকব।

দ্বিতীয়

আমরা এখানে না খেয়ে মরব।

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী

এরা সব বৈরাগী ঠাকুরের চেলা, এদের গায়ে হাত দিতে ভয় করে। কিন্তু যে রকম গোলমাল লাগিয়েছে— এখনি মহারাজের কানে যাবে—মুস্কিলে পড়ব। কি বাবা তোমরা মিছে চেঁচামেচি করচ কেন বল ত।

সকলে

আমরা রাজার কাছে দরবার করব।

প্রহরী

আমার পরামর্শ শোন্ বাবা—দরবার করতে গিয়ে মরবি। তোরা নেহাৎ ছোট বলেই মহারাজ তোদের গায়ে হাত দেন নি—কিন্তু হাঙ্গামা যদি করিস্ ত একটি প্রাণীও রক্ষা পাবিনে।

প্রথম

আমরা আর ত কিছু চাইনে, যে গারদে বাবা আছেন, আমরাও সেখানে থাক্‌তে চাই।

প্রহরী

ওরে চাই বল্লেই হবে এমন দেশ এ নয় !

দ্বিতীয়

আচ্ছা, আমরা আমাদের যুবরাজকে দেখে যাব।

প্রহরী

তিনি তোদের ভয়েই লুকিয়ে বেড়াচ্চেন।

তৃতীয়

তাঁকে না দেখে আমরা যাব না।

সকলে

(উর্দ্ধস্বরে) দোহাই যুবরাজ বাহাদুর !

(উদয়াদিত্যের প্রবেশ)

উদয়াদিত্য

আমি তোদের হুকুম করচি, তোরা দেশে ফিরে যা !

প্রথম

তোমার হুকুম মানব—আমাদের ঠাকুরও হুকুম করেছে, তাঁর হুকুমও মানব—কিন্তু তোমাকে আমরা নিয়ে যাব।

উদয়াদিত্য

আমায় নিয়ে কি হবে ?

প্রথম

তোমাকে আমাদের রাজা করব।

উদয়াদিত্য

তোদের ত বড় আস্পর্দ্ধা হয়েছে। এমন কথা মুখে আনিস্। তোদের কি মর্‌বার জায়গা ছিল না ?

দ্বিতীয়

মরতে হয় মরব, কিন্তু আমাদের আর দুঃখ সহ হয় না।

তৃতীয়

আমাদের যে বুক কেমন করে ফাটচে, তা বিধাতা পুরুষ জানেন।

চতুর্থ

রাজা, তোমার দুঃখে আমাদের কলিজা জ্বলে গেল।

পঞ্চম

আমরা জোর ক'রে নিয়ে যাব, কেড়ে নিয়ে যাব।

উদয়াদিত্য

আচ্ছা শোন্ আমি বলি - তোরা যদি দেরি না করে এখনি দেশে চলে যাস্, তা হলে আমি মহারাজের কাছে নিজে মাধবপুরে যাবার দরবার করব।

প্রথম

সঙ্গে আমাদের ঠাকুরকেও নিয়ে যাবে?

উদয়াদিত্য

চেষ্টা কর্‌ব। কিন্তু আর দেরি না—এই মুহূর্ত্তে তোরা এখান থেকে বিদায় হ।

প্রজারা

আচ্ছা, আমরা বিদায় হলুম। জয় হোক্! তোমার জয় হোক।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মন্ত্রী ও প্রতাপাদিত্য

মন্ত্রী

যুবরাজ কারাদণ্ড তো এত দিন ভোগ করলেন, এখন ছেড়ে দিন।

প্রতাপ

কারাদণ্ড দেবার কারণ ঘটেছিল, ছেড়ে দেবার তো কারণ ঘটে নি।

মন্ত্রী

কেবল সন্দেহ মাত্রে ওঁকে শাস্তি দিয়েছেন। প্রমাণ তো পান নি।

প্রতাপাদিত্য

মাধবপুরের প্রজারা দরখাস্ত নিয়ে দিল্লীতে চলেছিল—হাতে হাতে ধরা পড়েছিল, সেও কি তুমি অবিশ্বাস কর?

মন্ত্রী

আজ্ঞে না, মহারাজ, অবিশ্বাস করচি নে।

প্রতাপাদিত্য

ওরা তাতে লিখেছে আমি দিল্লীশ্বরের শত্রু—ওদের ইচ্ছা আমাকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে উদয়কে সিংহাসন দেওয়া হয়—এ কথাগুলো ত ঠিক?

মন্ত্রী

আজ্ঞে হাঁ, সে দরখাস্ত ত আমি দেখিছি।

প্রতাপাদিত্য

এর চেয়ে তুমি আর কি প্রমাণ চাও?

মন্ত্রী

কিন্তু এর মধ্যে আমাদের যুবরাজ আছেন, এ কথা আমি কিছুতে বিশ্বাস করতে পারিনে।

প্রতাপ

তোমার বিশ্বাস কিম্বা তোমার আন্দাজের উপর নির্ভর করে ত আমি রাজকার্য্য চালাতে পারি নে। যদি বিপদ্ ঘটে, তবে, "ঐ যা' মন্ত্রী আমার ভুল বিশ্বাস করেছিল" বলে ত নিষ্কৃতি পাব না।

মন্ত্রী

কিন্তু ন্যায়বিচার করা রাজত্বের অঙ্গ মহারাজ। যুবরাজকে যে সন্দেহে কারাদণ্ড দিয়েছেন তার যদি কোনো মূল না থাকে তা'হলেও রাজকার্য্যের মঙ্গল হবে না।

প্রতাপ

রাজ্য রক্ষা সহজ ব্যাপার নয় মন্ত্রী। অপরাধ নিশ্চয় প্রমাণ হলে তার পরে দণ্ড দেওয়াই যে রাজার কর্ত্তব্য তা আমি মনে করিনে। যেখানে সন্দেহ করা যায় কিম্বা যেখানে ভবিষ্যতেও অপরাধের সম্ভাবনা আছে, সেখানেও রাজা দণ্ড দিতে বাধ্য।

মন্ত্রী

আপনি রাগ করবেন, কিন্তু আমি এ ক্ষেত্রে সন্দেহ কিম্বা ভবিষ্যৎ অপরাধের সম্ভাবনা পর্য্যন্ত কল্পনা করতে পারি নে।

প্রতাপ

মাধবপুরের প্রজারা এখানে এসেছিল কি না?

মন্ত্রী

হাঁ।

প্রতাপ

তারা ওকেই রাজা করতে চেয়েছিল কি না?

মন্ত্রী

হাঁ চেয়েছিল।

প্রতাপ

তুমি বল্‌তে চাও এ সকলের মধ্যে উদয়ের কোনো হাত ছিল না?

মন্ত্রী

যদি হাত থাকৃত তা'হলে এত প্রকাশ্যে এ কথার আলোচনা হত না।

প্রতাপ

আচ্ছা আচ্ছা তোমার নিঃসংশয় নিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত হয়েই বসে থাক—বিপদটা একেবারে ঘাড়ে এসে পড়ার জন্যে পথ চেয়ে বসে থাকৃব না। রাজার দায়িত্ব মন্ত্রীর দায়িত্বের চেয়ে ঢের বেশি। অন্যায়ের দ্বারা অবিচারের দ্বারাও রাজাকে রাজধর্ম্ম পালন করতে হয়।

মন্ত্রী

অন্ততঃ বৈরাগীঠাকুরকে ছেড়ে দিন মহারাজ! প্রজা-দের মনে এক সঙ্গে এতগুলো বেদনা চাপাবেন না!

প্রতাপ

আচ্ছা সে আমি বিবেচনা করে দেখবো।

মন্ত্রী

চলুন না মহারাজ, একবার স্বয়ং ভিতরে গিয়ে যুব-রাজকে দেখে আসুন না। ওঁর মুখ দেখলে, ওঁর দুটো কথা শুনলেই বুঝতে পারবেন, গোপনে অপরাধ ওঁর দ্বারা কখনো ঘটতেই পারে না।

প্রতাপ

যারা মুখের ভাব দেখে, আর হায় হায় আহা উহু করতে করতে রাজ্যশাসন করে, তারা রাজা হবার যোগ্য নয়।

(বসন্ত রায়ের প্রবেশ)

বসন্ত রায়

বাবা প্রতাপ, উদয়কে আর কেন কষ্ট দাও!—পদে পদেই যদি সে তোমাদের কাছে অপরাধ করে—তবে তা'কে এই বুড়োর কাছে দাও না। (প্রতাপ নিরুত্তর) তুমি যা মনে ক'রে উদয়কে শাস্তি দিচ্ছ, সেই অপরাধ যে যথার্থ আমার। আমিই যে রামচন্দ্র রায়কে রক্ষা করবার জন্যে চক্রান্ত করেছিলুম।

প্রতাপ

খুড়োমশায়, বৃথা কথা বলে আমার কাছে কোন দিন কেউ কোনো ফল পায় নি।

বসন্ত রায়

ভাল, আমার আর একটা ক্ষুদ্র প্রার্থনা আছে। আমি একবার কেবল উদয়কে দেখে যেতে চাই—আমাকে তার সেই কারাগৃহে প্রবেশ করতে কেউ যেন বাধা না দেয় এই অনুমতি দাও।

প্রতাপ

সে হতে পারবে না।

বসন্ত রায়

তাহ'লে আমাকে তার সঙ্গে বন্দী করে রাখ। আমা-দের দুজনেরই অপরাধ এক—দণ্ডও এক হোক্—যতদিন সে কারাগারে থাকবে আমিও থাকব।

[নীরবে প্রতাপের প্রস্থান।

(রামমোহনের প্রবেশ)

বসন্ত রায়

কি মোহন? কি খবর?

রামমোহন

মাকে আমাদের চন্দ্রদ্বীপে আসবার কথা বল্‌তে এসেছিলুম।

বসন্ত রায়

প্রতাপকে জানিয়েছিস্ না কি?

রামমোহন

তাঁকে জানাবার আগে একবার স্বয়ং মাকে নিবেদন করতে গিয়েছিলুম।

বসন্ত রায়

তা বিভা কি বল্লে?

রামমোহন

তিনি বল্লেন, তিনি যেতে পারবেন না।

বসন্ত রায়

কেন, কেন? অভিমান করেচে বুঝি? সেটা মিছে অভিমান, রামমোহন, সে বেশিক্ষণ থাকবে না, একটু তুমি সবুর করো।

রামমোহন

তিনি বল্লেন, দাদাকে ছেড়ে আজ আমি যেতে পারব না।

বসন্ত রায়

আহা, সে কথা বল্‌তে পারে বটে।

রামমোহন

বড়ো বুক ফলিয়ে এসেছিলেম। মহারাজ নিষেধ করেছিলেন—বলেছিলেম, মা লক্ষ্মী আমাকে বড়ো দয়া করেন আমার কথা ঠেল্‌তে পারবেন না। আমাদের রাজা বল্লেন, প্রতাপাদিত্যের ঘরের মেয়েকে নিতে পারবো না। আমি বল্লেম, তিনি কি কেবল প্রতাপাদিত্যের ঘরের মেয়ে? আপনার ঘরের রাণী নন? শ্বশুরের উপর রাগ করে নিজের সিংহাসনকে অপমান করবেন? এই বলে চলে এসেছি, আর আমি ফিরব কোন্ মুখে?

বসন্ত রায়

বিভাকে দোষ দিয়ো না রামমোহন।

রামমোহন

না, খুড়ো মহারাজ, আমাদের মহারাজার ভাগ্যকেই দোষ দিই,—এমন লক্ষ্মীকে পেয়েও হেলায় হারাতে বসেচেন?

বসন্ত রায়

হারাবে কেন রামমোহন? শুভদিন আস্‌বে, আবার মিলন হবে।

রামমোহন

কুপরামর্শ দেবার লোক যে ঢের আছে। ওরা বল্‌চে যাদবপুরের ঘরের মেয়ে এনে তাকে ওঁর পাটরাণী করবে।

বসন্ত রায়

এও কি কখনো সম্ভব? আমাদের বিভাকে ত্যাগ করবে?

রামমোহন

সেই চক্রান্তই হয়েচে, তাই আমি ছুটে এলুম। অপরাধ করলেন নিজে, আর যিনি সতীলক্ষ্মী, তাঁকে দণ্ড দিলেন! এও কি কখনো সইবে? হোক্ না কলি, ধর্ম্ম কি একেবারে নেই? চল্লুম মহারাজ, আশীর্ব্বাদ করবেন, আমাদের রাজার যেন সুমতি হয়।

বসন্ত রায়

এখানকার বিপদ কেটে গেলে আমি নিজে যাব তোমাদের ওখানে। এমন অন্যায় হতে দেবো কেন?

[রামমোহনের প্রণাম করিয়া প্রস্থান।

(সীতারামের প্রবেশ)

কি সীতারাম, খবর কি?

সীতারাম

কারাগারে আমরা আগুন লাগিয়ে দিয়েচি, এখনি যুবরাজ বেরিয়ে আসবেন।

বসন্ত রায়

আবার আর একটা উৎপাত ঘট্‌বে না তো? একটা ফাঁড়া কাটাতে গিয়ে আর-একটা ফাঁড়া ঘাড়ে চাপে যে। আমার ভালো ঠেকচে না।

সীতারাম

কাছেই নৌকো তৈরি আছে খুড়ো মহারাজ, তাঁকে নিয়ে এখনি আপনাকে পালাতে হবে। এ ছাড়া আর কোনো গতি নেই।

বসন্ত রায়

তার আগে বিভার সঙ্গে একবার দেখা করে আসি গে।

সীতারাম

না, তার সময় নেই।

বসন্ত রায়

দেরি করব না সীতারাম, তার সঙ্গে জীবনে আর তো দেখা হবে না!

সীতারাম

তা হলে সমস্ত আমাদের বৃথা হয়ে যাবে। ঐ দেখুন না আগুনের শিখা জ্বলে উঠেচে।

বসন্ত রায়

আগুন থেকে বেরিয়ে আস্‌তে পারবে ত রে?

সীতারাম

কারাগারের মধ্যেই আমাদের চর আছে; এই এলেন বলে দেখুন না।

(উদয়াদিত্যের প্রবেশ)

উদয়াদিত্য

দাদামশায় যে!

বসন্ত রায়

আয় ভাই আয়।

উদয়াদিত্য

সমস্তই স্বপ্ন না কি? আমি তো বুঝতে পারচিনে!

সীতারাম

যুবরাজ এই দিকে নৌকো আছে, শীঘ্র আসুন।

উদয়াদিত্য

কেন নৌকো কেন ?

সীতারাম

নইলে আবার প্রহরীরা ধরে ফেল্‌বে !

উদয়

কেন, আমি কি পালিয়ে যাচ্চি ?

বসন্ত রায়

হাঁ ভাই, আমি তোকে চুরি করে নিয়ে চলেচি।

সীতারাম

কয়েদখানায় আমিই আগুন লাগিয়েচি।

উদয়

কি সর্ব্বনাশ! মরবি যে রে!

সীতারাম

যতদিন তুমি কয়েদে ছিলে, প্রতিদিন আমি মরেচি !

উদয়

না, আমি পালাব না।

বসন্ত রায়

কেন দাদা ?

উদয়

নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে অন্যদের বিপদের জালে জড়া'তে পারব না।

বসন্ত

অন্যদের যে তাতেই আনন্দ। তোমার তাতে কোনো অপরাধ নেই।

উদয়

সে আমি পারব না। কারাগারের বন্ধন আমার পক্ষে তার চেয়ে অনেক ভালো। যদি পালাই তবে মুক্তি আমার দাস হবে। আমি কারাগারে ফিরব।

বসন্ত

কারাগার তো গেছে ছাই হয়ে, তুমি ফিরবে কোথায়।

উদয়

ঐ দিকে একখানা ঘর বাকি আছে।

বসন্ত

তা হলে আমিও যাই।

উদয়

না, তুমি যেতে পারবে না। কিছুতেই না।

বসন্ত

আচ্ছা তা হলে আমি বিভার কাছে যাই। তার প্রাণটা যে কি রকম করচে, সে আমিই জানি।

উদয়

সীতারাম, আমার জন্যে যে নৌকো তৈরি আছে, সে নৌকোয় চড়ে এখনি তুই রায়গড়ে চলে যা !

সীতারাম

(উদয়কে প্রণাম করিয়া) তা ছাড়া আমার আর গতি নেই। প্রভু, যদি কোনো পুণ্য করে থাকি, আর জন্মে যেন তোমার দাস হয়ে জন্মাই !

[উভয়ের প্রস্থান।

(ধনঞ্জয়ের প্রবেশ—নৃত্য ও গীত)

ওরে আগুন আমার ভাই
আমি তোমারি জয় গাই।
তোমার, শিকলভাঙা এমন রাঙা মূর্ত্তি দেখি নাই !
তুমি দুহাত তুলে আকাশ পানে
মেতেছ আজ কিসের গানে,
একি আনন্দময় নৃত্য অভয় বলিহারি যাই !
যেদিন ভবের মেয়াদ ফুরাবে ভাই
আগল যাবে সরে—
সেদিন হাতের দড়ি পায়ের বেড়ি
দিবিরে ছাই করে !
সেদিন আমার অঙ্গ তোমার অঙ্গে
ঐ নাচনে নাচবে রঙ্গে,
সকল দাহ মিটবে দাহে
ঘুচবে সব বালাই !

[প্রস্থান।

(প্রতাপ ও মন্ত্রীর প্রবেশ)

প্রতাপ

দৈবাৎ আগুন লাগার কথা আমি এক বর্ণ বিশ্বাস করিনে। এ'র মধ্যে চক্রান্ত আছে। খুড়ো কোথায় ?

মন্ত্রী

তাঁ'কে দেখা যাচ্ছে না।

প্রতাপ

হুঁ। তিনিই এই অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়ে ছোঁড়াটাকে নিয়ে পালিয়েছেন।

মন্ত্রী

তিনি সরল লোক—এ সকল বুদ্ধি তো তাঁর আসে না।

প্রতাপ

বাইরে থেকে যাকে সরল বলে বোধ হবে না তার কুটিল বুদ্ধি বৃথা।

মন্ত্রী

কারাগার ভস্মসাৎ হয়ে গেছে। আমার আশঙ্কা হ'চ্ছে যদি--

প্রতাপ

কোনও আশঙ্কা নেই, আমি বলছি উদয়কে নিয়ে খুড়ো মহারাজ পালিয়েছেন। সেই বৈরাগীটার খবর পেয়েছ?

মন্ত্রী

না মহারাজ!

প্রতাপ

সে বোধ হয় পালিয়েচে। সে যদি থাকে ত আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়ো।

মন্ত্রী

কেন মহারাজ, তাকে আবার কিসের প্রয়োজন।

প্রতাপ

আর কিছু নয়—সেই ভাঁড়টাকে নিয়ে একটু আমোদ করতে পারতুম—তার কথা শুন্‌তে মজা আছে।

(ধনঞ্জয়ের প্রবেশ)

ধনঞ্জয়

জয় হোক্ মহারাজ. আপনি ত আমাকে ছাড়তেই চান না, কিন্তু কোথা থেকে আগুন ছুটির পরোয়ানা নিয়ে হাজির; কিন্তু না বলে যাই কি করে! তাই হুকুম নিতে এলুম।

প্রতাপ

ক'দিন কাটল কেমন?

ধনঞ্জয়

সুখে কেটেছে—কোনো ভাবনা ছিল না। এ সব তারই লুকো-চুরি খেলা—ভেবেছিল গারদে লুকবে, ধরতে পারব না—কিন্তু ধরেছি, চেপে ধরেছি, তারপরে খুব হাসি খুব গান। বড় আনন্দে গেছে—আমার গারদ ভাইকে মনে থাকবে!

(গান)

ওরে শিকল তোমায় অঙ্গে ধ'রে
দিয়েছি ঝঙ্কার!
(তুমি) আনন্দে ভাই রেখেছিলে
ভেঙে অহঙ্কার।

তোমায় নিয়ে করে' খেলা
সুখে দুঃখে কাট্‌ল বেলা,
অঙ্গ বেড়ি' দিলে বেড়ি
বিনা দামের অলঙ্কার।

তোমার পরে করিনে রোষ,
দোষ থাকে ত আমারি দোষ,
ভয় যদি রয় আপন মনে
তোমায় দেখি ভয়ঙ্কর।

অন্ধকারে সারা রাতি
ছিলে আমার সাথের সাথী,
সেই দয়াটি স্মরি তোমায়
করি নমস্কার!

প্রতাপ

বল কি বৈরাগী, গারদে তোমার এত আনন্দ কিসের?

ধনঞ্জয়

মহারাজ, রাজ্যে তোমার যেমন আনন্দ, তেমনি আনন্দ। . অভাব কিসের? তোমাকে সুখ দিতে পারেন আর আমাকে পারেন না?

প্রতাপ

এখন তুমি যাবে কোথায়?

ধনঞ্জয়

রাস্তায়।

সরকারী সহানুভূতি

প্রতাপ

বৈরাগী, আমার এক একবার মনে হয় তোমার ঐ রাস্তাই ভাল—আমার এই রাজ্যটা কিছু না।

ধনঞ্জয়

মহারাজ, রাজ্যটাও ত রাস্তা! চলতে পারলেই হল। ওটাকে যে পথ বলে জানে সেই ত পথিক; আমরা কোথায় লাগি? তা'হলে অনুমাত যদি হয় ত এবারকার মত বেরিয়ে পড়ি।

প্রতাপ

আচ্ছা, কিন্তু মাধবপুরে যেয়ো না।

ধনঞ্জয়

সে কেমন করে বলি, যখন নিয়ে যাবে তখন কার বাবার সাধ্য বলে যে যাব না?

[প্রস্থান।

মন্ত্রী

মহারাজ। ঐতো দেখি যুবরাজ আসচেন।

প্রতাপ

তাইতো, পালায়নি তবে!

(উদয়াদিত্যের প্রবেশ)

প্রতাপ

কি! তুমি যে মুক্ত দেখি?

উদয়াদিত্য

কেমন করে বলব মহারাজ? কারাগার পুড়লেই কি কারাগার যায়?

প্রতাপ

তুমি যে পালিয়ে গেলে না?

উদয়াদিত্য

মেয়াদ না ফুরোলে পালাব কি করে? মহারাজের সঙ্গে আমার যে চিরবন্ধনের সম্বন্ধ, সেটা যখন নিজে ছিন্ন করে দেবেন, সেই দিনই তো ছাড়া পাবো।

প্রতাপ

তোমাকে ত্যাগ করে?

উদয়াদিত্য

তা ছাড়া আর কি বলব? আমাকে গ্রহণ করে আমাদের তো কারো কোনো সুখ নেই।

প্রতাপ

তুমি অথচ সিংহাসনের যোগ্য নও, সেই সিংহাসনে তোমার অধিকার আছে এর থেকেই যত দুঃখ। যেখানে যার স্থান নয়, সেইখানেই তার বন্ধন।

উদয়

না মহারাজ, আমি যোগ্য নই। আপনার এই সিংহাসন হ'তে আমাকে অব্যাহতি দিন এই ভিক্ষা।

প্রতাপ

তুমি যা বলছ তা' যে সত্যই তোমার হৃদয়ের ভাব তা কি করে জান্‌বো?

উদয়

আজ আমি মা-কালীর চরণ স্পর্শ ক'রে শপথ করব আপনার রাজ্যের সূচ্যগ্র ভূমিও আমি কখনও শাসন করবো না; সমরাদিত্যই আপনার রাজ্যের উত্তরাধিকারী।

প্রতাপ

তুমি তবে কি চাও?

উদয়াদিত্য

মহারাজ, আমি আর কিছুই চাই নে—কেবল আমাকে পিঞ্জরের পশুর মত গারদে পুরে রাখবেন না। আমাকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করুন, আমি একাকী কাশী চ'লে যাই।

প্রতাপ

আচ্ছা, বেশ! আমি এর ব্যবস্থা করছি!

উদয়াদিত্য

আমার আর একটি প্রার্থনা আছে মহারাজ! আমি বিভাকে নিজে তার শ্বশুরবাড়ি পৌঁছে দিয়ে আস্‌বার অনুমতি চাই।

প্রতাপ

তার আবার শ্বশুরবাড়ি কোথায়?

উদয়াদিত্য

তাই যদি মনে করেন তবে সেই অনাথা কন্যাকে আমার কাছে থাক্‌বার অনুমাত দিন। এখানে ত তার সুখও নেই কর্ম্মও নেই।

প্রতাপ

তার মাতার কাছে অনুমতি নিতে পার।

[মন্ত্রীর প্রস্থান।

(মহিষী ও বিভার প্রবেশ)

মহিষী

উদয় কি বেঁচে আছে?

প্রতাপ

ভয় নেই। বেঁচে আছে! তুমি এখানে যে?

মহিষী

পারব কেন থাক্‌তে? শুনলুম কারাগারে আগুন লেগেচে। উদয়, বাবা আমার, এখন ঘরে চল্‌।

উদয়

আমার ঘর নেই। আমি যাচ্চি কাশী।

মহিষী

সে কি কথা? তাহলে আমাকে মেরে ফেলে যা!

উদয়

মা, এত দিনে তুমি কি ঠাউরেচ তোমার আশ্রয়েই ছেলে নিরাপদে থাক্‌বে? আমার তো শিক্ষার আর কিছু বাকি নেই? আজ তোমাদেরই কল্যাণে বিশ্বনাথের আশ্রয় পেয়েছি। কারাগারের সঙ্গে সঙ্গে আমার অন্য সব আশ্রয়ই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। কেঁদে কি হবে, মা, আজই চোখের জল মোছবার সময়।

বিভা

দাদা, আমাকে ফেলে যেতে পারবে না।

উদয়

কিছুতে না। (মাতার প্রতি) বিভারও তো আর জায়গা নেই—এখন তুমি অনুমতি করো আমার সঙ্গে ওকেও অভয় আশ্রয়ে নিয়ে যাই।

মহিষী

তুই যদি যাবি উদয়, তো ও যাক্‌, তোর সঙ্গে—তোর মায়ের হয়ে ওই তোকে দেখতে শুন্‌তে পারবে। ইতিমধ্যে ওর শ্বশুর বাড়ীতে খবর পাঠিয়ে দিই—যদি তারা—

প্রতাপ

চুপ করো, ওর আবার শ্বশুরবাড়ি কোথায়?

মহিষী

গর্ভে ধরে সংসারে কি দুঃখই এনেছি! রাজার বাড়িতে এরা জন্মেছিল এই জন্যেই? এখন একবার বাড়িতে চল্‌—তার পরে—

উদয়াদিত্য

না, মা, ও বাড়িতে আর নয়—রাস্তা বেয়ে সো[জা] চলে যাব, আমাদের পিছনে তাকাবার কিছুই নেই।

মহিষী

তোরা রাস্তায় বেরিয়ে যাবি, আর এই রাজবাড়ির স[ব] যে আমার বিষের মত ঠেকবে।

উদয়াদিত্য

এখন আমাদের আশীর্ব্বাদ করে বিদায় করো।

মহিষী

বুঝতে পারচি তোদের দুঃখের দিন ঘুচল। এবা[র] ঈশ্বর তোদের সুখেই রাখবেন। তবু দুর্ব্বল মন মানে না যে। আজ থেকে মায়ের যোগ্য সেবা তোদের আর তো কিছু করতে পারব না, তোদের জন্যে যশোরেশ্বরীর কাছে রোজ পুজো দেব।

বিভা

দাদামহাশয় কোথায় দাদা।

উদয়াদিত্য

তিনি কাছেই কোথাও আছেন—এখনি দেখা হবে।

প্রতাপ

না, দেখা হবে না। কোনো দিন না।

উদয়াদিত্য

কেন, তাঁর কি হল?

প্রতাপ

তাঁর বিচার বাকি আছে। সে সব কথা তোমাদের ভাববার কথা নয়।

উদয়াদিত্য

না হতে পারে কিন্তু এই বলে গেলুম মহারাজ, রাজ্য তো মাটির নয়, রাজ্য হোলো পুণ্যের, সে পুণ্য রাজাকে নিয়ে, প্রজাকে নিয়ে, সকলকে নিয়ে। বিভা, আর কাঁদিস নে। দাদামশায় তো মহাপুরুষ, ভয়ে তাঁর ভয় নেই, মৃত্যুতে তাঁর মৃত্যু নেই। আমাদের মতো সামান্য মানুষই ঘা খেয়ে মরে।

প্রতাপ

এখন এসো উদয়, কালীর মন্দিরে এসো, মায়ের পা ছুঁয়ে শপথ করতে হবে।

———

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বরবেশে রামচন্দ্র

রমাই

আপনি যেই চলে এলেন, এদিকে যুবরাজ বাবাজি বিষম গোলে পড়লেন।

মন্ত্রী

কি রকম, হে রমাই।

রমাই

রাজার অভিপ্রায় ছিলো, কন্যাটি বিধবা হ'লে হাতের নোয়া আর বালা দু'গাছি বিক্রি করে রাজকোষে কিঞ্চিৎ অর্থাগম হয়। যুবরাজ তাতে ব্যাঘাত করাতে তর্ণী করতো।

মন্ত্রী

মহারাজ, শুনতে পাই প্রতাপাদিত্য আপশোষে সারা হচ্চেন। এদিকে একটু ইসারা করলেই নিজের খরচে এখনো মেয়েটিকে পৌঁছিয়ে দিতে রাজি!

রমাই

সেটা বিনি-খরচায় হতে পারে কিন্তু ফিরে পাঠাবার খরচাটা মহারাজের নিজের গাঁট থেকে দিতে হবে।

মন্ত্রী

সে তো বটেই। বিবাহ করেচেন তাঁদের বাড়িতে, কিন্তু নিজের বাড়িতে আনবার বেলা তো বিচার করতে হয়! কী বলো রমাই?

রমাই

সে তো বটেই। পাঁকে যদি মহারাজা পা দিয়ে থাকেন তো পাঁকের বাবার ভাগ্যি, তা বলে ঘরে ঢোকবার পা ধুয়ে আসবেন না?

মন্ত্রী

বেশ বলেচ রমাই।

রমাই

মন্ত্রিবর, শুভকর্ম্মে মহারাজের যশুরে শ্বশুর মশায়কে থানা নিমন্ত্রণ পত্র পাঠানো হয়েচে তো? কি জানি ন দুঃখ করতেও পারেন। (সকলের হাস্য)

রমাই

বরণ করবার জন্যে এয়ো-স্ত্রীদের মধ্যে শাশুড়ি ঠাক্রুণকেও ভুললে চলবে না। মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ, সেটাও চাই—অতএব সেখানে যখন মিষ্টান্ন পাঠানো হবে তখন সেই সঙ্গে ছুতার ছড়া কাঁচা রম্ভাও পাঠানো ভালো। কী বলো মন্ত্রী।

মন্ত্রী

তার উপরে কথা! (উচ্চহাস্য)

রমাই

আর দেখেন মহারাজ, যুবরাজকে একখানা পত্র লিখে জানাবেন যে, তোমাদের রাজত্ব রাজকন্যা তোমাদেরি থাক, প্রজাপতির কৃপায় জগতে শালা শ্বশুরের অভাব নেই। কি বলেন আপনারা?

(সকলের উচ্চ হাস্য)

রামচন্দ্র

রমাই, তুমি যাও লোকজনদের দেখ গে।

[রমাইয়ের প্রস্থান।

সেনাপতি, তুমি এইখানে বোসো, রমাইয়ের হাসি আমার ভালো লাগচে না।

সেনাপতি

মহারাজ, রমাইয়ের হাসি গন্ধকের ধোঁয়ার মতো, তার ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে আসে।

রামচন্দ্র

ঠিক বলেচ সেনাপতি, আমার ইচ্ছে হচ্ছিল উঠে চলে যাই। আজ গান বাজনা ভালো জমচে না, ফর্ণাণ্ডিজ।

ফর্ণাণ্ডিজ

না মহারাজ, জমচে না, আমার বুকে বাজছে—আর একদিনের কথা মনে পড়চে।

রামচন্দ্র

গুজবটা কি সত্য?

ফর্ণাণ্ডিজ

কিসের গুজব?

রামচন্দ্র

ঐ তাঁরা কি যশোর থেকে আসচেন?

ফর্ণাণ্ডিজ

হাঁ মহারাজ, শুনেচি বটে। আদেশ করেন তো তাঁদের এগিয়ে আনি গে।

রামচন্দ্র

এগিয়ে আনবে? তাহলে কিন্তু মন্ত্রী রমাই সবাই হাসবে।

ফর্ণাণ্ডিজ

আদেশ করেন তো ওদের হাসিসুদ্ধ মুখ একেবারে চেঁচে পরিষ্কার করে দিই।

রামচন্দ্র

না, না, গোলমাল করে কাজ নেই। কিন্তু সেনাপতি আমি তোমাকে গোপনে বলচি, কাউকে বোলো না, আমি তাকে কিছুতে ভুলতে পারচি নে। কালই রাত্রে তাকে স্বপ্নে দেখেচি।

ফর্ণাণ্ডিজ

মহারাজ, আমি আর কি বলব—তাঁর জন্যে প্রাণ দিলে যদি কোনো কাজেও না লাগে তবুও দিতে ইচ্ছা হচ্ছে।

রামচন্দ্র

দেখ সেনাপতি, এক কাজ করলে হয় না?

ফর্ণাণ্ডিজ

কি বলুন।

রামচন্দ্র

মোহন যদি একবার খবর পায় যে, তাঁরা আস্‌চেন, তা'হলে সে আপনি ছুটে যাবে। একবার কোন মতে তাকে সংবাদটা জানাও না! কিন্তু দেখো আমার নাম কোরো না।

ফর্ণাণ্ডিজ

যে আজ্ঞা মহারাজ!

(রমাইয়ের প্রবেশ)

রমাই

মহারাজ, যশোর থেকে ত কেউ নিমন্ত্রণ রাখতে এল না। রাগ করলে বা।

রামচন্দ্র

হা, হা, হা, হা!

রমাই

আপনার প্রথম পক্ষের শ্বশুর ত সেবার তাঁর কন্যার সিঁথির সিঁদুরের উপর হাত বুলাবার চেষ্টায় ছিলেন—এবারে তাঁকে—

(রামমোহন দ্রুত আসিয়া)

রামমোহন

চুপ! আর একটি কথা যদি কও তা'হলে—

রমাই

বুঝেছি বাবা, আর বলতে হবে না।

রামমোহন

মহারাজ, হাসবেন না মহারাজ! আজকের দিনে অনেক সহ্য করেছি, কিন্তু মহারাজার ঐ হাসি সহ্য করতে পারচি নে।

রামচন্দ্র

ফের বেয়াদবি করচিস।

রামমোহন

আমার বেয়াদবি! বেয়াদবি কে করলে বুঝলে না!

ফর্ণাণ্ডিজ

মোহন, একটা কথা আছে ভাই, একটু এ দিকে এস।

[উভয়ের প্রস্থান।

রামচন্দ্র

ওরা সব গান বন্ধ করে হাঁ করে বসে রইল কেন? ওদের একটু গাইতে বল না! আজ সব যেন কেমন ঝিমিয়ে পড়চে! গান ধরো!

গান

চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেচে
উছলে পড়ে আলো।
ও রজনীগন্ধা, তোমার
গন্ধ সুধা ঢালো।
পাগল হাওয়া বুঝতে নারে
ডাক পড়েচে কোথায় তারে,
ফুলের বনে যার পাশে যায়
তারেই লাগে ভালো।
নীলগগনের ললাটখানি
চন্দনে আজ মাখা,
বাণীবনের হংসমিথুন
মেলেছে আজ পাখা।
পারিজাতের কেশর নিয়ে
ধরায়, শশি, ছড়াও কি এ?
ইন্দ্রপুরীর কোন রমণী
বাসর প্রদীপ জ্বালো?

দ্বিতীয় দৃশ্য

পথে

উদয়াদিত্য ও ধনঞ্জয়

ধনঞ্জয়

আজ রাস্তায় মিলন—আজ বড় আনন্দ। আজ আর আমির কোনো দরকার নেই—আজ আর যুবরাজ নয়। আজ ত তুমি ভাই! আয় ভাই কোলাকুলি করে নিই! (কোলাকুলি) দাদা, যেখানে দীন দরিদ্র সবাই এসে মেলে, সেই দরাজ জায়গাটাতে এসে দাঁড়িয়েছ, আজ আর কিছু ভাবনা নেই!

(গান)

সকল ভয়ের ভয় যে তারে
কোন্ বিপদে কাড়বে?
প্রাণের সঙ্গে যে প্রাণ গাঁথা
কোন্ কালে সে ছাড়বে?
না হয় গেল সবই ভেসে—
রইবে ত সেই সর্ব্বনেশে!
যে লাভ সকল ক্ষতির শেষে
সে লাভ কেবল বাড়বে!
সুখ নিয়ে ভাই ভয়ে থাকি
আছে আছে দেয় সে ফাঁকি,
দুঃখে যে সুখ থাকে বাকি
কেই বা সে সুখ নাড়বে?
যে পড়েছে পড়ার শেষে
ঠাঁই পেয়েছে তলায় এসে,
ভয় মিটেছে বেঁচেছে সে
তারে কে আর পাড়বে?

উদয়াদিত্য

বৈরাগী ঠাকুর, আমি তোমার সঙ্গ ধরলুম, আর ছাড়ছিনে!

ধনঞ্জয়

তুমি ছাড়লে আমি ছাড়ি কই ভাই। মনে বেশ আনন্দ হ'ত? খুঁৎখুৎ কিছু নেই ত?

উদয়াদিত্য

কিছু না—বেশ আছি!

ধনঞ্জয়

তবে দাও একটু পায়ের ধুলো!

উদয়াদিত্য

ও কি কর! ও কি কর! অপরাধ হবে যে!

ধনঞ্জয়

দাদা, এত বড় বোঝা নিজের হাতে ভগবান্ যার কাঁধ থেকে নামিয়ে দেন, সে যে মহাপুরুষ! তোমাকে দেখে আমার সর্ব্ব গায়ে কাঁটা দিচ্চে। একবার দিদিকে আন—তাকে একবার দেখি!

উদয়াদিত্য

সে তোমাকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছে—তাকে ডেকে আন্‌চি!

(বিভার প্রবেশ ও বৈরাগীকে প্রণাম)

ধনঞ্জয়

ভয় নেই দিদি, ভয় নেই, কোনো ভয় নেই! এই দেখ্‌না আমাকে দেখ্‌না—আমি তাঁর রাস্তার ছেলে—রাস্তার কোলে কোলেই দিন কেটে গেল—দিন রাত্রি একেবারে ধুলোয় ধুলোময় হয়ে বেড়াই—মায়ের আদরে লাল হয়ে উঠি। আমার মায়ের ওই ধুলোঘরে আজ তোমার নতুন নিমন্ত্রণ—কিন্তু মনে কোনো ভয় রেখো না।

বিভা

বৈরাগী ঠাকুর, তুমি কোথায় যাচ্চ? তুমি কি আমাদের সঙ্গে যাবে?

ধনঞ্জয়

কোথায় যাব সে কথা আমার মনেই থাকে না। ঐ রাস্তাই ত আমাকে মজিয়েছে! এই মাটি দেখলে আমাকে মাটি করে দেয়।

গান

(সারিগানের সুর)

গ্রামছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ
আমার মন ভুলায় রে!
(ওরে) কার পানে মন হাত বাড়িয়ে
লুটিয়ে যায় ধুলায় রে!

(ও যে) আমায় ঘরের বাহির করে,
পায়ে পায়ে পায়ে ধরে—
(ও যে) কেড়ে আমায় নিয়ে যায় রে
যায় রে কোন্ চুলায় রে!
(ও) কোন্ বাঁকে কি ধন দেখাবে,
কোন্ খানে কি দায় ঠেকাবে,
কোথায় গিয়ে শেষ মেলে যে—
ভেবেই না কুলায় রে!

উদয়াদিত্য

ঠাকুর, তুমি কি ভাবচ, বিভা আমার পথের সঙ্গিনী? ওকে আমি ওর শ্বশুরবাড়ি পৌঁছে দিতে যাচ্চি।

ধনঞ্জয়

বেশ, বেশ, হরি যেথানে নিয়ে যান সেইখানেই ভাল। দেখি তিনি কোন্‌খানে পৌঁছিয়ে দেন্—আমিও সঙ্গে আছি।—কোনো ভয় নেই দিদি, কোনো ভয় নেই।

[প্রস্থান।

বিভা

দাদা ঐ যে মোহন আসচে। ওর সঙ্গে আমি একটু আলাদা কথা কইতে চাই।

উদয়াদিত্য

আচ্ছা, আমি একটু সরে যাচ্চি।

[প্রস্থান।

(রামমোহনের প্রবেশ)

বিভা

মোহন!

রামমোহন

মা, আজ তুমি এলে?

বিভা

হাঁ মোহন, তুই কি আমায় নিতে এলি?

রামমোহন

না, মা, অত ব্যস্ত হয়ো না, আজ থাক্।

বিভা

কেন মোহন, আজ কেন নয়?

রামমোহন

আজ দিন ভালো নয় যে মা, আজ দিন ভালো নয়।

বিভা

ভাল দিন নয়? তবে আজ এত উৎসবের আয়োজন কেন? বরাবর দেখলুম রাস্তায় আলোর মালা—বাঁশি বাজ্‌চে। আজ বুঝি শুভ লগ্ন পড়েছে!

মোহন

শুভ লগ্ন! মিথ্যা কথা! সমস্ত ভুল।

বিভা

মোহন, তোর্ কথা আমি বুঝ্‌তে পার্‌চিনে, কি হয়েছে আমাকে সত্যি করে বল! মহারাজ কি রাগ করেচেন?

মোহন

রাগ করেচেন বৈ কি!

বিভা

তিনি ত আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন!

মোহন

দেরি হয়ে গেছে, মা, দেরি হয়ে গেছে! অনেক দেরি হয়ে গেছে। সময় গেলে আর ফেরে না।

বিভা

কে বল্লে ফেরে না? আমি তপস্যা করে ফেরাব—আমি জীবন মন দিয়ে ফেরাব। মোহন, এখনি তুই আমাকে নিয়ে যা! দেরি যদি হয়ে থাকে, আর এক মুহূর্ত্ত দেরি কর্‌ব না!

মোহন

যুবরাজ কোথায় গেছেন?

বিভা

তিনি এখনি আসবেন।

মোহন

তিনি ফিরে আসুন না!

বিভা

না মোহন, আর বিলম্ব নয়। তিনি কি খবর পেয়েছেন আমি এসেছি? দাদা বল্লেন, তিনি নৌকার ছাত থেকে দেখেছেন। ময়ুরপংখী সাজানো হচ্চে!

মোহন

হাঁ সাজানো হচ্চে বটে—

বিভা

এখনো কি সাজানো শেষ হয় নি?

মোহন

ঐ ময়ুরপংখীর সাজসজ্জায় আগুন লাগুক্, আগুন লাগুক্!

বিভা

মোহন, তোর মুখে এ কি কথা! তুই যখন আন্‌তে গেলি আস্‌তে পারিনি বলে এত রাগ করেছিস্? তুইও আমার দুঃখ বুঝতে পারিস্‌নি মোহন?

(মোহন নিরুত্তর)

বিভা

এই দেখ্‌ তোর দেওয়া সেই শাঁখা জোড়া পরে এসেছি —আজকেব দিনে তুই আমার উপর রাগ করিস্ নে!

মোহন

আমাকে আর দগ্ধ কোরো না! মিথ্যে দিয়ে তোমার কাছে আর কথা চাপা দিতে পারলুম না! মা জননি, এ রাজ্যের লক্ষ্মী তুমি, কিন্তু এ রাজ্যে তোমার আজ আর স্থান নেই! চল মা, তুমি ফিরে চল—তোমার এই পাদ-পদ্মের দাস, এই অধম সন্তান তোমার সঙ্গে যাবে!

বিভা

মোহন, যা তোর বলবার আছে সব তুই বল্! আমি যে কত দুঃখ সইতে পারি, তা কি তুই জানিস্‌নে?

মোহন

সন্তান যখন ডাক্‌তে গেল তখন কেন এলিনে—তখন কেন এলিনে—আমার পোড়া কপাল, তোকে কেন আন্‌তে পারলুম না!

বিভা

ওবে মোহন, জগতে এমন কোনো সুখ নেই যার লোভে আমি সে দিন দাদাকে ফেলে আস্‌তে পারতুম—এতে আমার কপালে যা থাকে তাই হবে!

মোহন

তবে শোন্ মা, সেই ময়ূরপংখী তোর জন্যে নয়!

বিভা

নাই হল মোহন, দুঃখ কিসের! আমি হেঁটে চলে যাব!

মোহন

যাবি কোথায়? সেখানে যে আজ আর এক রাণী সচে!

বিভা

আর এক রাণী!

মোহন

হাঁ আর এক রাণী! আজ মহারাজের বিবাহ!

বিভা

ওঃ—আজ বিবাহের লগ্ন!

মোহন

এক বিবাহের লগ্নে মহারাজ তোমাদের ঘরে গিয়ে-ছিলেন—আজ কোন্ বিবাহের লগ্নে তুমি তাঁর ঘরের সাম্‌নে এসে পৌঁছলে। আর, আমার এমন কপাল, আজ আমি বেঁচে আছি! চল্ মা, ফিরে চল, আর এক দণ্ড নয়—ঐ বাঁশি আমার কানে বিষ ঢাল্‌চে! ওরে, আর একদিন কি বাঁশি শুনেছিলুম, সেই কথা মনে পড়্‌চে! চল্ চল্ ফিরে চল্! অমন চুপ করে বসে রইলে কেন মা? কেমন করে যে কাঁদ্‌তে হয় তাও কি একেবারে ভুলে গেছ?

বিভা

মোহন, আমার একটি কথা রাখ্‌তে হবে।

মোহন

কি কথা?

বিভা

আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হবে। যদি না যাস্ আমি একলা যাব।

মোহন

সে আজ ময়ূরপংখীতে চড়বে, আর তুমি আজ হেঁটে যাবে?

বিভা

হেটে যাওয়াই আমাকে সাজে—আমি হেঁটেই যাব। তুই সঙ্গে যাবিনে?

মোহন

আমি সঙ্গে যাব না, ত কে যাবে? কিন্তু মা, সে সভায় আজ তুমি কিসের জন্যে যাবে?

বিভা

তা বটে, কেন যাব? মোহন, আমাকে দুঃখ সইতে হবে সে কথাটা হঠাৎ আমি ভুলে গিয়েছিলুম—ভেবে-ছিলুম, যা ভোগ হবার তা বুঝি হয়ে চুকে গেছে!

মোহন

কেন মা, তুমি সতী লক্ষ্মী, তুমি দুঃখ কেন পাও!

বিভা

মোহন, সেদিন অপরাধ যে সত্যি হয়েছিল। সে অপরাধের শাস্তি না হয়ে ত মিট্‌বে না, সে শাস্তি আমিই নিলুম--প্রায়শ্চিত্ত আমাকে দিয়েই হবে।

মোহন

মা, তোমার পিতার হাতের আঘাত সেও তুমিই মাথায় করে নিয়েছ--আবার তোমার স্বামীর হাতের আঘাত সেও তুমিই নিলে। কিন্তু আমি বল্‌চি মা, সকলের চেয়ে বড় দণ্ড পেলে তোমার স্বামী। সে আজ দ্বারের কাছ থেকেও তোমাকে হারাল!

(উদয়াদিত্যের প্রবেশ)

উদয়

ওরে বিভা!

বিভা

দাদা সব জানি। কিছু ভেবো না!

উদয়

এখন কি করবি বোন?

বিভা

ভেবেছিলুম রাজবাড়িতে একবার যাব, কিন্তু যাব না।

মোহন

মা, যেয়ো না, যেয়ো না! গেলে তোমার অপমান হত—সেই অপমানে তোমার স্বামীর পাপ আরো বাড়ত।

বিভা

আমার মান অপমান সব চুকে গেছে। কিন্তু দাদার অপমান হত যে। দাদা, এবার নৌকা ফেরাও!

উদয়াদিত্য

তুই কোথায় যাবি বিভা!

বিভা

তোমার সঙ্গে কাশী যাব। আমি আজ মুক্তি পেয়েছি! এখন তোমার চরণসেবা করে আমার জীবন আনন্দে কাটবে। মোহন, তুই তোর প্রভুর কাছে ফিরে যা!

মোহন

ঐ দেখ মা, ফেরবার পথে আগুন লেগেছে, ঐ যে ময়ূরপংখী চলেছে। ও পথ আমার পথ নয়।

(ধনঞ্জয়ের প্রবেশ)

বিভা

বৈরাগী ঠাকুর!

ধনঞ্জয়

কেন দিদি?

বিভা

আমাকে তোমাদের সঙ্গ দিয়ো ঠাকুর!

উদয়াদিত্য

ঠাকুর, শেষকালে বিভাকেও আমাদের পথ নিতে হল!

ধনঞ্জয়

সে ত বেশ কথা! দয়াময় হরি! কি আনন্দ—তোমার এ কি আনন্দ! ছাড় না, কিছুতেই ছাড় না! শ্বশুরবাড়ির রাস্তার ধারেও ডাকাতের মত বসে আছে! দিদি, এই মাঝ রাস্তায় আমাদের পাগল প্রভুর তলব পড়েছে। একেবারে জোর তলব! চল্ চল্! চল্ চল্। পা ফেলে চল্! খুসি হয়ে চল! হাস্‌তে হাস্‌তে চল। রাস্তা এমন ক'রে পরিষ্কার করে দিয়েছে—আর ভয় কিসের!

(গীত)

আমি ফিরব না রে, ফিরব না আর ফিরব না রে—
এখন হাওয়ার মুখে ভাসল তরী
কূলে ভিড়ব না আর ভিড়ব না রে।
ছড়িয়ে গেছে সূতো ছিঁড়ে
তাই খুটে আজ মরব কি রে!
এখন ভাঙা ঘরের কুড়িয়ে খুঁটি
বেড়া ঘিরব না আর ঘিরব না রে!
ঘাটের রসি গেছে কেটে
কাঁদ্‌ব কি তাই বক্ষ ফেটে?
এখন পালের রসি ধরব কসি
এ রসি ছিঁড়ব না আর ছিঁড়ব না রে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"—অন্তরেতে অশ্রু বাদল ঝরে"

—এক—

দুপুরবেলা আহারান্তে বাহিরের দালানে একখানি ডেক্-চেয়ারে বসিয়া প্রভাত অন্যমনস্ক ভাবে কত কি ভাবিতেছিল।

প্রায় একমাস সে ওয়াল্‌টেয়ারে তার বন্ধু সুধীরদের বাড়ী আসিয়াছে। সুধীরের স্ত্রী কমলা ও বৌদি সুহাসিনী দেবীর সহিত এই ক'দিনেই তার নিজের বৌদিদিদের ন্যায় ঘনিষ্ঠতা ও আন্তরিক শ্রদ্ধা ভালবাসা পুঞ্জীভূত হইয়াছে,— সুধীরের জ্যেঠামশাই শরৎ বাবু তো তাকে নিজের সন্তানের ন্যায়ই স্নেহ করেন! বিচিত্র লাগে তার শুধু—সুধীরের ছোট বোন সুধাকে। সুধাকে সে বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

এই সুন্দরী তন্বী তরুণী মেয়েটির পরিশ্রমের ক্ষমতা অসাধারণ। সেবা-নৈপুণ্যও অদ্ভুত! বৃদ্ধ জ্যেঠামশাইকে সে যেন কোলের শিশুর মত সদা সর্ব্বদা শুশ্রূষা ও যত্ন দিয়া ঘিরিয়া রাখিয়াছে! দিনের মধ্যে অধিকাংশ সময়ই তার জ্যেঠাম'শায়ের নিকটেই কাটে,—কিন্তু তবুও বাড়ীর এমন একটিও লোক নাই, যে সুধার হস্তের গভীর যত্ন ও সুমিষ্ট সেবা না পাইতেছে!

প্রভাতকেও সুধা খুবই যত্ন করে,—হাস্যে-পরিহাসে গল্পে-গানে মূর্ত্তিমতী সেবা ও আনন্দস্বরূপিণী হইয়া বাড়ীর প্রত্যেক জনের মনের গভীর অন্তস্তলটুকু পর্য্যন্ত সে অধিকার করিয়াছে।

প্রভাত আজ একান্তে বসিয়া সুধারই কথা ভাবিতেছিল। খানিকটা নীলরংয়ের পশম হাতে ঘুরাইয়া গোলা পাকাইতে পাকাইতে সুধা দালানে বাহির হইয়া আসিয়া, প্রভাতের পানে তাকাইয়া হাসিমুখে বলিল—"প্রভাত বাবু! আকাশের পানে চেয়ে কি ভাবছেন? বাড়ীর লোকদের জন্য মন কেমন ক'রছে বুঝি? কিন্তু আমরা তো আপনাকে এখন ছাড়বো না!—আপনার কাছে আমাদের একটা আর্জ্জি আছে যে—"

প্রভাত চেয়ারে ভাল করিয়া উঠিয়া বসিয়া সহাস্যে বলিল—"আর্জ্জি কেন, আদেশ বলুন!"

সুধা হাসিয়া বলিল "যা' আপনার অভিরুচি! কিন্তু আমাদের কথা রাখবেন কি না আগে বলুন?"

"অবশ্যই রাখবো।"

"বৌদিরা সীমাচলে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়েছেন। আপনি নিয়ে যেতে পারবেন কি?"

"হ্যাঁ। এ ত অতি উত্তম প্রস্তাব।"

"প্রস্তাব ত উত্তম, কিন্তু ছোড়্‌দা বলছে, দু'সপ্তাহ পরে যেতে। কিন্তু বৌদি, ছোট বৌদি দু'জনেই আজ কালের মধ্যে যেতে চায়।"

"জ্যেঠামশাই কি বলেন?"

"তাঁকে রাজী করার ভার আমার।"

"সুধীর কোথায়?"

"ঐ ত মজা! বৌদিরা ছোড়্‌দার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে আপনাকে মুরুব্বি ধরেছেন! আমাকে দিয়ে জিজ্ঞেস ক'রে পাঠালেন। আচ্ছা বসুন, বৌদিদের ডেকে আনি।"

সুধা স্মিতমুখে হাতের অবশিষ্ট পশমটুকু দ্রুত হাত ঘুরাইয়া জড়াইতে জড়াইতে চলিয়া গেল।

প্রভাত মুগ্ধনেত্রে সেই দিকে তাকাইয়া ভাবিতে লাগিল — সুধা এখানকার সকল আমোদ-প্রমোদ আনন্দ-উৎসাহের মধ্যে আছে তাই যেন এই পরিবারের আনন্দ এত মধুর! কিন্তু এই হাসিখুসী গান-গল্পের মধ্য দিয়া সুধাকে এত নিকটে পাওয়া গেলেও প্রভাতের কাছে সে যেন অনেকখানি সুদূর!

অল্পক্ষণ পরেই কমলা ও সুহাসিনীকে লইয়া সুধা ফিরিয়া আসিল। প্রভাত বলিল—"বৌদি! সত্যই সীমাচলে যাওয়া হবে না কি?"

বৌদি বলিলেন—"সে আপনাদের অনুগ্রহ!"

কমলা বলিয়া উঠিল—"বহুবচনে নয় দিদি, এক বচনে বলো।...ওঁকে ত আমরা ঝগড়া ক'রে বাদই দিয়েছি,—প্রভাত বাবুই এখন আমাদের সীমাচলে নিয়ে যাওয়ার মুরুব্বি।"

প্রভাত হাসিয়া বলিল—"কিন্তু আমার বন্ধু ব্যতীত আমি যে অচল!"

বৌদি বলিলেন—"শেষ রাত্রে বগ্‌গির বন্দোবস্ত করতে হবে, তা হ'লে ভোর বেলাই সীমাচলের নীচে পৌছানো যাবে। উপরে উঠে পূজো-টুজো দিয়ে—দেখে-শুনে সেই দিনই সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরবো।"

—"তা বন্দোবস্ত ত বেশ করেছেন, কিন্তু খাওয়া-দাওয়ার কি হবে?"

সুধা বলিল—"ইক্‌মিক্ আর ষ্টোভ নেবো না কি, বৌদি?"

বৌদি বলিলেন—"না, সেখানে বেশ ভাল খিচুড়ি ভোগ কিন্‌তে পাওয়া যায়। চায়ের সরঞ্জাম ষ্টোভ আর খান দুই পাউরুটি নিলেই ঢের হবে!"

রাত্রি প্রায় তিনটা হইতে সকলে জাগিয়া বাহিরের দালানে প্রস্তুত হইয়া বগ্‌গির অপেক্ষায় বসিয়া আছে। সুধীর ও প্রভাত দুইখানা ক্যাম্বিসের চেয়ারে অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় বসিয়া ছিল। কমলা ও বৌদি একখানি বড় চৌকীর উপরে বসিয়া আছে। সুধা সিঁড়ির চাতালের পাশে উঁচু বেদীর নিকট পা ঝুলাইয়া বসিয়া চন্দ্রালোকসিক্ত শুক্লা চতুর্দ্দশীর জোয়ার-উচ্ছ্বসিত সমুদ্রের পানে তাকাইয়া ছিল।

প্রভাত, সুধীর, বৌদি ও কমলা চার জনের মৃদু গল্প বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। ঘরের ভিতর হইতে মাঝে মাঝে জ্যেঠা মহাশয়ের কাসির শব্দ আসিতেছে। উজ্জ্বল চন্দ্রকিরণে সসাগরা নৈশ প্রকৃতির কালো নারিকেল কুঞ্জগুলি স্বপ্নময় হইয়া উঠিয়াছে। সমুদ্রের গর্জ্জন ঝরণার প্রপাতধ্বনির মত, দূরাগত সঙ্গীত-সুরের মত, গভীর মধুর মন্দ্রে নিশীথাকাশ ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছিল। চারিদিক্ নিস্তব্ধ।

কমলা অধীরকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"এখনও চারটে বাজল না? নিশ্চয়ই ঘড়ি খারাপ। জ্যোৎস্নাতে ভোরের আলো বোঝা যাচ্ছে না, বোধ হয়।"

সুধীর গম্ভীর ভাবে বলিল-"ঘড়িটাতে কাঁটা ঘুরিয়ে এখুনি সকাল ক'রে দিতে পারি,-কিন্তু চাঁদটাকে ধাক্কা দিয়ে আকাশ থেকে সরিয়ে দিই কি ক'রে?"

সুহাসিনী মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিলেন—"কিন্তু এই হতভাগা চাঁদই আবার এক এক দিন চ'খের নিমিষে কোথা দিয়ে পালিয়ে গিয়ে এক নিমেষে ভোর এনে দেয়,—সেও কমলই সব চেয়ে ভাল জানে।"

সুধীর বলিল—"ঠিক বলেছো, বৌদি! চাঁদের 'ডিউটি' ফাঁকি দেওয়া সম্বন্ধে কমলকে অভিযোগ করতে আমিও শুনেছি ব'লে মনে পড়ছে!"

কমলা রাগিয়া উঠিল। অল্পক্ষণের মধ্যে সুধীর, কমলা ও সুহাসিনীর মধ্যে একটা কপট কলহ বেশ জমিয়া উঠিল। প্রভাত অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় ইহাদের মধুর কলহ উপভোগ করিতে করিতে তন্দ্রাবেশে চক্ষু মুদিত করিতেছিল।

কমলা রাগ করিয়া চলিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরে সুধীরও কুপিতা কমলার অনুসরণ করিল। বৌদি ঢুলিতে ঢুলিতে চৌকির একপাশে বাহুতে মাথা রাখিয়া গাঢ় নিদ্রামগ্ন হইলেন।

মশকদংশনে নিবিড় তন্দ্রাটুকু হঠাৎ ছুটিয়া যাওয়ায় প্রভাত সচকিতে চক্ষু মেলিতেই চ'খে পড়িল,—অদূরে সিঁড়ির বেদীতে উপবিষ্টা সুধার দুইটি নির্নিমেষ তৃষিত আঁখি। শুকতারার মত উজ্জ্বল, সাগরেরই মত অতল গভীর দৃষ্টিটুকু প্রভাতের নিদ্রিত মুখের উপর ঘন-নিবদ্ধ হইয়া ছিল। প্রভাত সচকিতে উঠিয়া বসিতেই সুধা অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরাইল। প্রভাত কিন্তু নিস্তব্ধ চঞ্চল-নেত্রে তাহার পানে তাকাইয়া রহিল।

এ ব্যাপার আজ নূতন নয়। সে আরও অনেকবার লক্ষ্য করিয়াছে, সুধা তাহাকে দেখিতে ভালবাসে। সুধা গল্প করিতে করিতে প্রভাতের মুখের পানে তাকাইয়া হঠাৎ কথার খেই হারাইয়া ফেলিয়া অতিরিক্ত অন্যমনস্ক হইয়া পড়ে! কিন্তু আজ রাত্রির এই চুরি করিয়া দেখা প্রভাতকে যেন হঠাৎ বিহ্বল করিয়া ফেলিল।

সুধা কিন্তু ব্যাপারটিকে মুহূর্ত্ত মধ্যে সহজ করিয়া লইয়া হাসিয়া বলিল—"প্রভাতবাবু! আপনারা সকলেই বেশ

ক'রে ঘুমিয়ে নিলেন দেখলুম ; আমিই কেবল একা রয়েছি- "

শান্তপ্রকৃতি প্রভাত কোনও দিন সুধাকে বড় একটা পরিহাস করিত না,– কমলা ও সুহাসিনীকে লইয়া ভ্রাতৃ-জায়া সম্পর্কে তাহার যৎসামান্ত রঙ্গ-পরিহাস চলিত। আজ হঠাৎ বলিয়া ফেলিল– "ঘুমহারা সুধাংশুর সাথী হ'য়ে জেগে থাকা সুধা দেবীরই কায ; আমাদের নয়।"– কথাটা বলিয়া ফেলিয়া পরমুহূর্ত্তে প্রভাত অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া পড়িল।

সুধা আরক্তিম হইয়া উঠিয়া—তখনই কিন্তু সহজ ভাবে হাসিয়া বলিল—"তা হ'লে সকাল হ'লেই আমাদের লুকিয়ে পড়া উচিত। যেহেতু প্রভাতের সঙ্গী প্রভাত বাবুরই হওয়া সমীচীন।"

সুধা এত সহজ পরিহাসের সুরে কথাগুলি বলিল যে— প্রভাত সঙ্কোচ হইতে অনেকটা যেন স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিল। হাসিয়া উত্তর দিল—"হার মানলুম !"

ছুইখানি বগি গাড়ী আসিয়া গেটের বাহিরে দাঁড়াইল। সুধীর ও কমলা বাহির হইয়া আসিল। শরৎ বাবু বাহিরের দিকের জানালা খুলিয়া বিছানার উপর হইতে চাদর মুড়ি দিয়া উঁকি মারিয়া বলিতে লাগিলেন—"সন্ধ্যার মধ্যে ফিরো —বেশী রাত কোরো না যেন—সুধা, তুই গায়ে একখানা র‍্যাপার নিলি নে কেন মা ? শেষ রাত্রির ঠাণ্ডা—প্রভাত, ছাতা নিয়েছো তো ?—" ইত্যাদি। জ্যেঠামহাশয়ের প্রত্যেক কথার উত্তরে সংক্ষিপ্ত "আজ্ঞে হ্যা" বলিয়া সকলে গাড়ীতে উঠিল।

সুধা জ্যাঠামহাশয়ের ঘরে বিছানার পাশে গিয়া ক্ষুণ্ন বলিল—"আপনাকে রেখে গিয়ে একটুও স্বস্তি পাবো জ্যেঠামশাই !–এত ক'রে বললুম 'আমি থাকি'— পনারা কেউই তা' শুনলেন না !"

"—না রে না পাগলি ! তা কি হয় ? তুই থাকলে বৌমারা ব কেন ? আমি বেশ থাকবো, তুই তো আমার সবই হয়ে রেখে গেলি রে !– ঠাকুর রইল, দাই রইল, বিশুয়া া, আমার কিচ্ছু কষ্ট হবে না।"

—দুই—

া-শেষের বিবর্ণ জ্যোৎস্নাধারায় পর্ব্বতশ্রেণী এবং .নী-প্রদেশ যেন কোন রূপকথার রূপার কাঠি ছোঁয়ানো ন্ত পরীরাজ্যের ন্তায় দেখাইতেছিল। নিষ্প্রভ আকাশে এক একটা মরণোন্মুখী তারা দপ্ দপ্ করিয়া তখনও শেষ দীপ্তি বিকীর্ণ করিয়া লইতেছিল।

সহরের রাস্তা ছাড়াইয়া সুধাদের বগি দুইখানি গ্রামের পথে আসিয়া পড়িয়াছে। পথের ডান পাশে কালো রংয়ের পাহাড় ! ঘন বন্যবৃক্ষ ও পার্ব্বত্য লতা-গুল্মে পর্ব্বত-গাত্র সমাচ্ছন্ন। মধ্যে মধ্যে পাহাড়ের গায়ে জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া ছোট ছোট শস্যক্ষেত্র প্রস্তুত করা হইয়াছে। শুক্লা নিশি-শেষে নিদ্রিতা পার্ব্বত্য প্রকৃতির মৌন. শান্ত শোভায় সকলেরই চিত্ত বিমুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। সুধা ও কমলা পথিপার্শ্বের অচেনা পার্ব্বত্য ফুলের গাছ হইতে ফুল সংগ্রহের ছলে বগি হইতে নামিয়া আনন্দ কলহাস্যে হাঁটিতে হাঁটিতে চলিল।

সুধীর অন্য গাড়ী হইতে মুখ বাহির করিয়া ধমক দিয়া বলিল—"এই সুধা ! ফুল তুলতে যাস্ নি ! সাপ-টাপ আছে হয় তো ! গাড়ীতে ওঠ তোরা—"

কমলা দুষ্ট শিশুর মত চপল হাসিয়া দৃঢ়স্বরে উত্তর দিল—"আমরা গাড়ীতে উঠবো না—হাঁটবো।"

সুধা হাসিতে হাসিতে বলিল—"দোহাই ছোড়দা ! ভগবানের দেওয়া পা নামক অঙ্গটির চলৎশক্তিরূপ গুণ আছে, সেটা একদিনের জন্যও আমাদের ভাল ক'রে জানতে দাও, ভাই ! সাপকে ভয় ক'রে কি ওই গাড়ীর গহ্বরে বন্দী হয়ে যেতে হবে ?"

সুহাসিনী এ গাড়ী হইতে বলিলেন—"হাটার মজা বেরুবে ! হাজার ধাপ্ সিঁড়ি উঠতে-নামতে হবে— মনে থাকে যেন ! গাড়ীর ভিতরে উঠে আয় বলছি—"

সুধা অকারণ হাস্যে কুটি-কুটি হইয়া বালিকার ন্যায় কৌতুকতরলকণ্ঠে কহিল—"ছোট বৌদি ! তুমি গাড়ীতে ওঠো—জলদি--" তাহার পর গুজরাটী গরবা'র সুরে সুমিষ্ট কণ্ঠে গাহিতে গাহিতে অগ্রসর হইল –

—"পারব না একলাটি আজ ঘরে পারব না রইতে !"
চাঁদ ডাকে পাপিয়াকে দু'টো কথা কইতে !
নিরালার কোল ভরা ফুল জাগে আলো-করা
যেচে কার খুনসুড়ি সইতে !
অথই পাথার পারা জ্যোছনায় মাতোয়ারা
দিশেহারা হ'ল হাওয়া চৈতে !" *

* কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত রচিত গুজরাটী গরবা সুরের গান।

প্রভাত গাড়ী হইতে মুখ বাহির করিয়া বলিল—"ছোট বৌদি! রাস্তা এখনও অনেক বাকী। এখন থেকেই যদি আপনারা হাঁটতে সুরু করেন, তা হ'লে সীমাচলের নীচে থেকেই ফিরে আসতে হবে। উঠতে আর পারবেন না।"

সুধা প্রভাতের দিকে মুখ ফিরাইয়া হাসিয়া বলিল— "আপনারা নিজেরা পুরুষমানুষ হ'য়ে গাড়ী চ'ড়ে যাচ্ছেন, আর আমরা মেয়েমানুষ হাঁটছি, তাই লজ্জা করছে বুঝি?"

প্রভাত এবার গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল। সুধীরও নামিতে উদ্যত হইয়াছে দেখিয়া সুধা কমলার হাত ধরিয়া নিজেদের বণ্ডিতে উঠিয়া পড়িল এবং খিল খিল্ করিয়া হাসিয়া বলিল—"আপনারা যা করবেন, আমরা ঠিক তার উল্‌টো করবো। প্রভাত বাবু! আপনারা দু'জনে হাঁটুন এইবার!"

সুধীর অবতরণোদ্যত পা গাড়ীর মধ্যে টানিয়া লইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—"প্রভাত! উঠে আয়, শয়তান দু'টোর সঙ্গে পেরে উঠবি নে।"

সুধা বণ্ডি'র মধ্যে বসিয়া বলদের গলার ঘণ্টার টুং-টাং আওয়াজের মধ্যে আবার মিষ্ট কণ্ঠে গর্‌বা গাহিতে সুরু করিল—

"চল্‌ল রে দখিণার হিল্লোলে সাগরেরি ছন্দ!
কোন্ বনে চন্দন · কোন্ বনে গন্ধ!—"

প্রাচীপট আরক্তিম হইয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে বিহঙ্গমের মধুর কলকূজনে পার্ব্বত্য-প্রকৃতি মুখরিত হইয়া উঠিল। বণ্ডি দুইখানি যে পথে অগ্রসর হইতেছিল, সে পথটি পাহাড় ঘুরিয়া অপর পার্শ্বে চলিয়া গিয়াছে। পাহাড় ঘুরিয়া গাড়ী দুইখানি সীমাচল গ্রামে উপস্থিত হইল। গ্রামখানি অতি সুন্দর—পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছবির মত। দুইটি একটি করিয়া লোক জাগিতে সুরু হইয়াছে। গাড়ী গিয়া একবারে সীমাচল পাহাড়ের পাদদেশে থামিল।

একটি তেলেগু তরুণের শিরে জিনিষপত্রগুলি তুলিয়া দিয়া প্রভাতরা সি'ড়িতে উঠিতে সুরু করিয়া দিল। এই সোপান বাহিয়া সীমাচলের উপরে উঠিবার সময়ে প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। প্রভাত "ক্যামেরা" লইয়াছিল,—মধ্যে মধ্যে সোপানের উপরে স্থানে স্থানে প্রাকৃতিক দৃশ্যের "ফটো" তুলিয়া লইতে লাগিল।

সুধা ও কমলা সিঁড়ির দুই পাশে জঙ্গলে হাত বাড়াইয়া ফুল তুলিতেছিল,—গান গাহিয়া, ভিখারীদের পয়সা দিয়া পর্ব্বতগাত্রে প্রবাহিতা ক্ষীণস্রোতা নির্ঝরিণীর মধ্যে ঢিল নিক্ষেপ করিয়া, হাস্য পরিহাসে কৌতুকে মুখরা ছোট বালিকার মত মহা উৎসাহে অবলীলাক্রমে দ্রুত উঠিতে লাগিল।

সুধীর তরুণী পত্নী ও ভগিনীর সহিত সিঁড়ি ওঠার পাল্লা দিল। তিন জনের কলহাস্যে ও কৌতুকালাপে নির্জ্জন অরণ্য-প্রকৃতি মুখর হইয়া উঠিল। বিভিন্ন দেশীয় যাত্রিগণ পাহাড়ে উঠিতেছিল। সকলেই কৌতুকোজ্জ্বল নেত্রে এই তরুণ-সম্প্রদায়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল।

অপেক্ষাকৃতা স্থূলকায়া বৌদিদি ধীরে ধীরে সিঁড়ি উঠিয়াও অত্যন্ত পরিশ্রান্তা হইয়া পড়িতেছিলেন। প্রভাত বৌদিদির সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে উঠিতেছিল।

সুধা উপর হইতে পিছন ফিরিয়া নীচের দিকে তাকাইয়া বলিল—"ওমা, বৌদি আর প্রভাত বাবু যে একেবারে নীচে পেছিয়ে পড়েছেন! ছোট বৌদি! এসো এইখানে আমরা একটু ওঁদের জন্য দাঁড়াই!"

সিঁড়ির উপরে মাঝে মাঝে পাথরের দেব-দেবীর মূর্ত্তি আছে। একটা অর্দ্ধভগ্ন সিন্দুরপ্রলিপ্ত দেবমূর্ত্তির পাশে পাথরের উপর বসিয়া পড়িয়া সুধীর বলিল "সুধা, এইবার এইখানে একটু চা তৈরী কর, দিদি!"

কমলা বলিল—"এখানে দেবমূর্ত্তির কাছে চা' খাওয়া হবে না, আরও একটু উঁচুতে চলো—"

আরও ধাপ কতক সিঁড়ি উঠিয়া সিঁড়ির একপা[illegible] গাছের ছায়ায় বসিয়া সুধা তেলেগু বাহকের মাথা হইতে জিনিষপত্র নামাইয়া ষ্টোভ জ্বালিয়া চা প্রস্তুত করিতে লাগিল। বৌদি তখনও অনেক দূরে। তিনি বিশ ত্রি[illegible] ধাপ সিঁড়ি উঠিয়া খানিকটা করিয়া বসিয়া জিরাইয়া লইতেছিলেন। প্রভাত বাবুও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ধীরপদে উঠিতেছিলেন। কমলা হাসিয়া লুটাইয়া পড়িয়া বলিল—"সুধা দিদির সঙ্গে প্রভাত বাবুর শুদ্ধ দুরবস্থা দেখ—"

সুধীর উপর হইতে হাঁকিল—"কি বৌদি, কপিক[illegible] নামিয়ে টেনে তুলব না কি?"

প্রভাত ও বৌদি আসিয়া পৌঁছিলে সুধা বলিল—"বৌ[illegible] তুমি একটু চা খাও, ভাই! নইলে তুমি মারা যাবে, এ[illegible] মধ্যেই তোমার মুখ চোখ যেন কেমন হ'য়ে গেছে—"

"না রে, না। তোরা সব ছেলেমানুষ, তোরা খা'। মি নৃসিংহদেবকে দর্শন ক'রে পুজো দিয়ে তারপরে খাব।"

সুধীর বলিল, "বৌদি, তোমার হ'য়ে আমি না হয় উপোস ক'রছি। চা' না খাও, কিছু জল-টলও খাও, লে উঠতে পারবে না।"

"আচ্ছা গো মশাই, উঠতে পারবো কি না, তোমায় ত ভাবতে হবে না!"

সুধা নিপুণ হস্তে কেটলীতে সুগন্ধি চা' প্রস্তুত করিয়া পেয়ালা পিরিচগুলি ধুইয়া ফরসা 'ন্যাপকিনে' ঝক্ঝকে করিয়া মুছিয়া—পেয়ালায় চা ঢালিয়া দুধ-চিনি মিশ্রিত করিয়া সুধীর, প্রভাত ও কমলার হাতে তুলিয়া দিল। তাহার পর ক্ষিপ্রহস্তে পাঁউরুটী কাটিয়া 'শ্লাইস্'গুলি মাখম মাখাইয়া স্টোভে টোষ্ট করিয়া গরম গরম প্রত্যেকের প্লেটে দিল।

প্রভাত একটু ইতস্ততঃ করিয়া সুধাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল —"আপনিও এক কাপ চা' নিলেন না কেন? জুড়িয়ে যাবে।"

সুধীর বলিল—"ও চা' খায় না।"

সুন্দর বাসন্তী রংয়ের জেলি চামচে করিয়া ডিসের উপর দিয়া সুধা সন্দেশপূর্ণ অ্যালুমিনিয়মের কৌটা খুলিতে খুলিতে বলিল—"প্রভাত বাবু! জেলিটা কিসের তৈরী বলতে পারেন?"

প্রভাত রুটীতে কামড় দিয়া বলিল—"ফলের।"

"জেলি ফল ভিন্ন অন্য কিছুর হয় না, কিন্তু কি ফল ?"

"তা' ঠিক বলতে পারছি নে। ঘ'রে তৈরী না কি? স্বাদ টেষ্ট কিন্তু!"

"উহুঁ, কেনা।"

"বেশ সুন্দর তো! আগে এমন খাইনি। রংটিও ।"

কমলা হাসিয়া বলিল—"সুধা তৈরী করেছে। আনা-জেলি, তাই রং অমন সুন্দর হয়েছে!"

প্রভাত এ কথা শুনিয়া যেন অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিল, "বলেন কি? উনি হাতে তৈরী করেছেন? ভারি কার হয়েছে তো!"

সুধা অপ্রস্তুত হইয়া উঠিল। প্রভাতের বিস্মিত প্রশংসা ঢাকা দিবার উদ্দেশ্যে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল—"ছোড়দা, আর দু' শ্লাইস্ রুটী নেবে? সন্দেশ আর চাই?"

সুধীর বলিল—"আমরা যথেষ্ট খেয়েছি, এইবার তুই নিজে কিছু খা দেখি।"

—"খাব অপন্। এখন ক্ষিধে পায় নি।"

কমলা নাছোড়বান্দা হইয়া ধরিল। সুধা কমলার পীড়াপীড়িতে একটা সন্দেশ খাইয়া জল খাইল।

আবার সিঁড়ি ওঠা সুরু হইল। উপরে উঠিতে 'হনুমান-তোরণে'র পার্শ্ব দিয়া, 'আকাশগঙ্গা'র প্রপাত বিপুল বেগে পাথরের উপরে আছড়াইয়া পড়িতেছিল ও সেই জল সোপানশ্রেণী প্লাবিত করিয়া বহিয়া যাইতেছিল। এখানকার পিচ্ছিল সিঁড়িগুলি অতিক্রম করিতে করিতে সাবধানতা সত্ত্বেও কমলা সজোরে আছাড় খাইল।

হাসির অট্টরোলের মধ্যে সকলে উপরে পৌছিল। ছত্রের মধ্যে একখানি ঘরে জিনিষপত্র রাখিয়া বিশ্রাম করিতে বসিলে, সুধা স্নানের তেলের শিশি হইতে অল্প তেল লইয়া কমলার আঘাতপ্রাপ্ত পায়ে জোরে মালিশ করিয়া দিতে লাগিল। তাহার পর সকলে মিলিয়া মহানন্দে 'গঙ্গাধারা' নামক সুন্দর প্রপাতটিতে স্নানসমাপনান্তে সিংহাচলের নৃসিংহ দেবের মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ও পূজা দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিচিত্র শিল্প-কারুপূর্ণ মন্দিরগুলি এবং অসংখ্য দেবদেবীর সঙ্গে রম্ভা, মেনকা, উর্ব্বশী প্রভৃতি অপ্সরার প্রস্তরময়ী মূর্ত্তিগুলি পর্য্যন্ত দর্শন করিয়া ফিরিলেন। ফিরিবার পথে পূজারী ব্রাহ্মণদিগকে উপযুক্ত অর্থ দক্ষিণা দিয়া নৃসিংহদেবের উৎকৃষ্ট খিচুড়ি ভোগ সংগ্রহ পূর্ব্বক ছত্রে আহারে বসিলেন।

সুধা খুঁৎ খুঁৎ করিতে লাগিল,—"ইক্‌মিক্‌টা আনলেই বেশ হ'ত, ঐ খিচুড়ী খেয়ে তোমাদের অসুখ-বিসুখ না করলে বাঁচি!"

বৌদি স্নানান্তে দেবতাদের পূজা দিয়া এখন একবারেই ক্লান্তিতে অবসন্না হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি শ্রান্তকণ্ঠে বলিলেন—"সুধা, তুই এখন আর অত হাঙ্গামা তুলিস্ নে বোন্,—ওদের খেতে দে।"

বড় বড় পদ্মপাতায় করিয়া গরম গরম খিচুড়ী সুধা প্রত্যেককে বণ্টন করিয়া দিল। পাতিলেবু, লবণ, কাঁচা-লঙ্কা, চাটনি ও আচার বাহির করিয়া প্রত্যেকের পাতে দিয়া স্টোভে পাঁপর এবং বড়ী ভাজিতে বসিল।

সুধীর সবিস্ময়ে বলিল—"এ কি ? তুই আচার, কাঁচা-লঙ্কা, বড়ী, পাঁপর পর্য্যন্ত সঙ্গে এনেছিলি না কি রে ?"

সুধা বলিল—"যখন শুনলুম, খিচুড়ী ভোগ কিনে খাওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে, তখন বুঝলাম, খিচুড়ীর আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি না নিলে কেউই তোমরা ভাল ক'রে খেতে পারবে না ! তাই সব জোগাড় করে বেতের বাক্সটার মধ্যে পূরে নিয়েছিলুম। বৌদি জানতে পারলে অযাত্রা বলে বড়ী আচার এ সব নিতে চাইতেন না !

প্রভাত পরম তৃপ্তির সহিত কুড় কুড় করিয়া পাঁপর ভাজা চিবাইতে চিবাইতে বলিল—"বড়ী পাপর ও আচারের মধ্যে যে কি অপূর্ব্ব সুস্বাদ আছে—তা' এই সিংহাচলম্ পাহাড়ের উপরে পদ্মপাতায় খিচুড়িভোগের সঙ্গে এ রকম ভাবে না খেলে বোধ হয় জীবনেও এই অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা যেত না !"

সুধীর গম্ভীর মুখে বলিল—"যেস্থলে যে জিনিষ যত দুর্ল্লভ এবং দুষ্প্রাপ্য, সেস্থলে সেই জিনিষটি অতি তুচ্ছ হ'লেও মহা মূল্যবান্ এবং লোভনীয় !"

সকলের আহারাদি শেষ হইলে সুধা খানিকটা শুখনো কাপড় গরম করিয়া বৌদির পায়ে ও কোমরে সেক্ দিয়া আবার সরিষার তেল ডলিতে বসিল। কমলা প্রথমটা অসম্মতা হইলেও শেষে সুধার জিদে পরাভূতা হইয়া চুপ করিলেন।

সুধা বলিল—"এখুনি আবার নীচে নামতে হবে তো ? আছাড় খাওয়া পা'দু'টোকে একটু তাজা করে না নিলে ওরা আজ আর তোমাকে নীচে পৌছে দিতে রাজী হবে না, মনে থাকে যেন।"

সুধীর একটা কেরোসিন কাঠের বাক্সের উপরে বসিয়া দেয়ালে পিঠ দিয়া আরাম করিয়া সিগারেট টানিতেছিল বলিল—"সুধা, আমারও পায়ে একটু তেল দিয়ে দিবি তো ?"

"ঈস্ ! ব'য়ে গেছে ! ছোট বৌদি দিক্ না—"

"আহা ! তোর ছোট বৌদিরই তো পায়ে তুই তেল দিচ্ছিস্ ! সে কি আর আমার পায়ে তেল মালিস্ করবে ? বরং আমাকেই হয় তো হুকুম করে বসবে"—

কমলা তর্জ্জন করিয়া উঠিল—"ছিছি ছিছি আমার সঙ্গে ... না ... দিচ্ছিস।"

সুধা হাসিতে হাসিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"ব্যাটা ছেলে—পায়ে দিব্যি জোর আছে—তোমাদের পায়ে অনর্থক তেল মালিস করতে ব'য়ে গেছে !……নাও ওঠো, ভাল করে এবার মন্দির-টন্দির যা'কিছু দেখবার আছে, দেখে শুনে—বেলাবেলি নামবার উদ্‌যোগ করো,—জ্যেঠামশাই ব্যস্ত হবেন ! জ্যেঠামশাইয়ের জন্য এখানকার কোনও জিনিষ একটা কিনে নিয়ে যাব ভাবছি। কিছুই তো নেবার মত নেই ! অনেক সুগন্ধ চন্দন কাঠ বিক্রী হচ্ছে,—একখণ্ড চন্দনকাঠ নেব, জ্যেঠামশাই গন্ধে খুসী হবেন।"

প্রভাত বিমুগ্ধভাবে লক্ষ্য করিতেছিল—সুধা শুধু সঙ্গীত-নিপুণা বা হাস্তরহস্তনিপুণা নহে, তার সেবানৈপুণ্য ও যত্ন করিবার ক্ষমতা অসাধারণ। অন্তরটি গভীর মমতাশীল। একটিও ভিখারী কিম্বা প্রার্থী সুধার হাতের ক্ষুদ্র রেশমী থলির পয়সা হইতে বঞ্চিত হইতেছিল না। সদাসর্ব্বদা হাস্য-পরিহাসে ব্যাপৃতা থাকিলেও তাহার হাত দুইখানি সর্ব্বদাই প্রত্যেকের সেবাযত্ন ও প্রয়োজন পূর্ণ করিতে নিমগ্ন। মনটি সর্ব্বক্ষণ প্রত্যেকের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রাখিয়াছে।

নিজের স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তার লক্ষ্য খুবই কম। অথচ তাহাকে দেখিলে মোটে বুঝিবার উপায় নাই যে, মানুষটি নিজের প্রতি অত্যধিক উদাসীন ! কারণ, তাহার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুবিন্যস্ত বেশবাস, সদাপ্রসন্ন মুখ ও প্রফুল্ল আচরণের মধ্যে—নিজের সম্বন্ধে ঔদাসীন্য যেন একটুও ধরিতে পারা যায় না।

—তিন—

সীমাচলে বেড়াইতে যাওয়ার দুই সপ্তাহ পরের কথা।

প্রভাত আগামী কল্য ওয়ালটেয়ারে সুধীরদের আতিথ্য সমাপন করিয়া কলিকাতা যাত্রা করিবে, সেই জন্য আজ সকলে মিলিয়া ভাইজাগে 'ভ্যালিগার্ডেন' বা উপত্যকা-উদ্যানে 'পিক্‌নিক্' বা বনভোজন করিতে আসিয়াছিল।

সকলে মিলিয়া মহানন্দে মাটী খুঁড়িয়া পাথর সাজাইয়া উনান প্রস্তুত করা হইল, শুষ্ক কাঠ ডালপালা আহরণ করিয়া রান্না করা হইল। আহারান্তে একটা ঝোপের আড়ালে সুধীর কমলা প্রভাত ও সুহাসিনী চার জনে তাস খেলিতে বসিল। সুধা তাস খেলা'র তত অনুরাগিণী নহে, সে

দূরবীণটা হাতে লইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া চারিদিকের প্রাকৃতিক শোভা দেখিতে লাগিল।

'ভ্যালিগার্ডেনের' ভিতরে যত কিছু দেখিবার না থাকুক, বাহিরের চারিদিকের শোভা অতি রমণীয়। বাগানের ভিতরে শ্রেণীবদ্ধ নারিকেল-তরু ও অন্যান্য নানাবিধ ফল ও ফুলের গাছ। বাহিরে তিন দিকে সবুজ ও কালো পাহাড়, একদিকে 'ব্যাক্‌ওয়াটার্‌ বে'র কৃষ্ণাভ জলরাশি। একটি সুন্দর ঝরণা পাহাড় হইতে চপলনৃত্যে নামিয়া আসিয়া ব্যাকওয়াটার বে'তে মিশিয়াছে।

সবুজ ঘাসে ছাওয়া একটি ক্ষুদ্র কৃত্রিম পাহাড়ের উপরে উঠিয়া নোনা গাছের মত আকৃতি একটা অজানা-গাছের ছায়ায় বসিয়া সুধা দূরবীণ দিয়া 'বস্‌হিল' পাহাড়ের উপরের গির্জাটি লক্ষ্য করিতেছিল; প্রভাত ঘাসের উচু ঢিপিটার নীচে আসিয়া উপরের দিকে তাকাইয়া কহিল—"আপনি এখানে? ওঁরা সকলে আপনাকে খুঁজছেন যে!"

সুধা চোখ হইতে দূরবীণটা নামাইয়া হাসিমুখে বলিল—"উপরে উঠে আসুন না! এখান থেকে দূরের পাহাড়ের মিনারিগুলো আর 'ব্যাক্‌ওয়াটার্‌ বে'র জল চমৎকার দেখাচ্ছে।"

প্রভাত উপরে উঠিয়া আসিল। সুধা বলিল—"বসুন। দূরের পাহাড়গুলো সন্ধ্যার সিঁদুর-মাখা হ'য়ে বাঙ্গায় কালোয় কি চমৎকার দেখ্‌তে হয়েছে দেখুন।"

সুধা প্রভাতের হাতে দূরবীণটা তুলিয়া দিল।

প্রভাত গাছের ছ'য়ায় বসিয়া চোখে দূরবীণ দিয়া দূরের দৃশ্য লক্ষ্য করিতে লাগিল।

—"আচ্ছা প্রভাতবাবু! ঐ পাহাড়টার নাম 'ডল্‌ফিন্‌ নোজ' কেন হ'ল বলতে পারেন? ওটা কি 'ডলফিন্‌' মাছের নাকের মত দেখতে?"

প্রভাত চোখ হইতে দূরবীণ নামাইয়া মৃদু হাসিয়া বলিল—"দেখে তো তা' মনে হয় না। আমি 'ডল্‌ফিন্‌' মাছ দেখিনি।"

"আমিও দেখিনি কখনো।"

'ডল্‌ফিন্‌ নোজ' পাহাড়টি লইয়া সুধা ও প্রভাতের মধ্যে আলোচনা যখন বেশ জমিয়া আসিয়াছে, হঠাৎ প্রভাত অস্ফুট আর্ত্তনাদে চম্‌কাইয়া উঠিল।

সুধা সচকিতে জিজ্ঞাসা করিল—"কি হ'ল?"

"পায়ে কি যেন কামড়াল!"

মুহূর্ত্তমধ্যে দেখা গেল, একটি উজ্জ্বল পীতাভ বর্ণের অর্দ্ধ-চন্দ্র পরিমিত সরু সাপ দ্রুতবেগে সবুজ ঘাসের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে। প্রভাতের হাত হইতে বিদ্যুদ্বেগে ছাতাটা টানিয়া লইয়া তাহারই বাঁটের দ্বারা সাপটার মাথায় উপর্য্যুপরি বারকতক আঘাত করিয়া সুধা তাহার জুতা শুদ্ধ ডান পা'টি সাপের মাথায় সজোরে চাপিয়া ধরিল। সাপটি একটুখানি ছটফট করিয়া নিশ্চল হইয়া পড়িল।

পর মুহূর্ত্তেই সুধা রুমালের কোণে বাঁধা চাবি-রিংয়ে ঝোলানো ক্ষুদ্র ছুরীখানি খুলিয়া প্রভাতকে জিজ্ঞাসা করিল—"কোথায় কামড়েছে?"

প্রভাত তখন যাতনায় না হউক, ভয়ে অর্দ্ধচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিল। হাত দিয়া বাম পায়ের গোড়ালীর খানিকটা উচুতে দেখাইয়া দিল। সুধা মুহূর্ত্তমধ্যে সেই ছুরীখানি দিয়া দৃঢ়হস্তে সেখানটি গভীররূপে চিরিয়া দিল।

প্রভাত যাতনায় চীৎকার করিয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘাসের উপরে এলাইয়া শুইয়া পড়িল। সুধা প্রভাতের দিকে না চাহিয়া সেইখানেই হেঁটমুখে নতজানু হইয়া, ক্ষত-স্থান হইতে রক্ত চুষিয়া ফেলিতে সুরু করিয়া দিল।

প্রভাত অস্ফুটস্বরে বলিল—"সুধা, কি সর্ব্বনাশ করছো, —আমি তো যাবই—তুমিও কেন আমার সঙ্গে মারা যাবে?"

সুধা উত্তর দিল না, ক্রমাগত রক্ত চুষিয়া চুষিয়া কুলকুচা করিয়া ফেলিতে লাগিল। যখন চুষিয়া আর রক্ত পাওয়া গেল না, তখন সে ক্ষিপ্রহস্তে নিজের আসমানী রংয়ের আলপাকা শাড়ীর নিম্নাংশের পাড় সহ কাপড় লম্বা করিয়া ছিঁড়িয়া প্রভাতের হাঁটুর নীচে হইতে বেশ সুদৃঢ় করিয়া বাঁধিতে আরম্ভ করিল।

ইতোমধ্যে বৌদি কমলা প্রভৃতি সকলেই তাহাদের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। সুধার মুখে ঘটনা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ সকলে মিলিয়া আইজাগের বড় হাসপাতালের উদ্দেশে রওনা হওয়ার বন্দোবস্ত করিল। চাকর লোকজন জিনিষপত্র সব পড়িয়া রহিল, তাহারা পরে যাইবে।

'ব্যাক্‌ওয়াটার বে'তে নৌকা প্রস্তুত ছিল, সকলে সত্বর গিয়া উঠিয়া বসিল। নৌকায় শায়িত প্রভাতের মাথার কাছে বসিয়া পাখা দিয়া হাওয়া করিতে করিতে সুধা স্নিগ্ধ-কণ্ঠে কহিল—"ভয় কি প্রভাতবাবু? আপনি অত ভয় পাবেন না, আমি বল্‌ছি, আপনার কোনও ভয় নেই!"

প্রভাত অবশহস্তে সুধার হাতখানি মুঠায় ধরিয়া অশ্রু-ব্যাকুলকণ্ঠে বলিল—"সুধা, এবার যদি বেঁচে উঠি, সে কেবল তোমারই গুণে।"

সুধা সে কথায় কান না দিয়া শান্ত সংযতকণ্ঠে স্নেহপূর্ণ স্বরে প্রভাতের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—"ভয় কি? কালই আপনি উঠে হেঁটে বেড়াবেন! কাল তো আপনার কলকাতা যাওয়ার কথা!"

প্রভাত বালকের মত ব্যাকুল হইয়া কাঁদিয়া বলিল—"সুধা, তুমি আমায় ছেড়ে যেও না,—তুমি না থাকলে আমি বাঁচব না"—

কমলা ও সুহাসিনী প্রভাতের পাশেই বসিয়াছিল, সুধীরও ছিল। সকলেই পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করিয়া সুধার মুখের প্রতি দৃষ্টি স্থির করিল।

সুধা একটুও লজ্জিতা বা সঙ্কুচিতা না হইয়া বরং অত্যন্ত সহজ শান্তমুখে শিশুকে যেমন জননী প্রশান্ত-স্নেহে ভুলাইয়া থাকেন, তেমনইভাবে প্রভাতের অশ্রু মুছাইয়া দিয়া সান্ত্বনার স্বরে বলিল—"না না, আমি আপনাকে ছেড়ে যাব কেন? এই তো আমরা সকলেই আপনার কাছেই র'য়েছি! আপনি চুপ করুন, কথা কইবেন না। আপনার কিচ্ছু ভয় নেই।"

প্রভাত সুধার হাতখানি টানিয়া নিজের বুকের উপর রাখিয়া শিশুরই মত পরম আশ্বস্তচিত্তে ধীরে ধীরে চক্ষু মুদ্রিত করিল।

'ব্যাকওয়াটার বে'র কালো জলে নৌকা বায়ু তাড়নে দুলিতেছে। সন্ধ্যার সিঁদুরের মত আকাশের রক্তিমছায়া কালো জলে ঝলমল্ করিতেছে। হাওয়ায় সুধার মাথার কাপড় খসিয়া পড়িল। *সুধার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই; পাথরের মত নিশ্চল হইয়া প্রভাতের শিয়রের কাছে বসিয়া রহিল।*

কমলা অনেকক্ষণ সুধার পানে অপলকনয়নে চাহিয়া থাকিয়া, সুহাসিনীর কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া মৃদুস্বরে বলিল—"সুধার দিকে তাকিয়ে আজ আমার কেবল 'বেহুলা'র কথা মনে পড়ছে দিদি!"

সুহাসিনী একবার চকিতে প্রভাত ও সুধার পানে তাকাইয়া বলিল—"তা কি আর আমাদের ভাগ্যে ঘ'টবে ভাই?"

"প্রভাতবাবু যদি এ যাত্রায় বেঁচে ওঠেন তো সে সুধারই জন্যে!"

"চুপ, আস্তে! সুধা শুনতে পাবে!"

নৌকা তীরে ভিড়িল। ভাইজাগে মেডিক্যাল কলেজ ও সিভিল হস্পিট্যাল্ আছে। সুধীররা প্রভাতকে লইয়া মেডিক্যাল কলেজে উপস্থিত হইল। মৃত সর্পটিকেও সঙ্গে আনা হইয়াছিল। ডাক্তার সর্পটি দেখিয়া বলিলেন—এ যে 'রিথিয়া' দেখছি! এ দেশী সাপ, ভারী বিষাক্ত। প্রভাতকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—"তখনই গভীর করে' চিরে রক্তটা চুষে বের্ করে ফেলায় ও পা বেঁধে দেওয়ায় শরীরের রক্তে বিষ মোটে মিশতে পায় নি! ওষুধ দিচ্ছি, এইটে ব্যবহার করবেন। আরও খানিকটা রক্ত আমি বে'র্ করে দিচ্ছি, তা'হলে আর কোনও ভয় থাকবে না। তবে হয় তো গায়ে একরকম 'বিষাক্ত গরল' বেরুতে পারে। তার দরুণ গায়ের রং কালো হয়ে যেতে পারে!"

সুধাকে দেখাইয়া সুধীর বলিল—"এঁকে একবার দেখুন তো! ইনিই সে সময়ে এঁর কাছে ছিলেন এবং পা ছুরী দিয়ে কেটে রক্ত চুষে বের্ করে দিয়েছিলেন! এঁর তো কোনও আশঙ্কা নেই?

প্রৌঢ় মাদ্রাজী ডাক্তার সুধাকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—"ইনি সদ্য সদ্য বিষটা মুখে করে টেনে নিয়েছেন, যদি জিভের লালার সঙ্গে সামান্যমাত্রও বিষ রক্তের সঙ্গে মিশে থাকে, খুব সম্ভব অসুখ-বিসুখ করতে পারে। গায়ে যদি গরল হয়, রং একেবারে কালো হয়ে যাবে। এখন থেকে সাবধান হওয়া দরকার! ইনি বোধ হয় এঁর স্ত্রী?"

"না, ইনি আমার বোন, এখনও অবিবাহিতা, আর ইনি আমার বন্ধু।"

ডাক্তারের মুখে একটু সকৌতুক মৃদুহাস্য দেখা গেল। সুধীর ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"প্রাণের আশঙ্কা আছে কি না বলুন? আর যাতে ঐ গরলটা না হয়, তার কি কোনও উপায় করা যায় না?"

"প্রাণের আশঙ্কা আর নেই। গরলের আর কি উপায় হবে? একটা করে ইন্জেক্শান্ দিয়ে দিচ্ছি—যদি আটকাবার হয়, এতেই আটকাবে!"

প্রভাত অশ্রুবিহ্বলনেত্রে ভাবিতেছিল—"সুধা আজ নিজের প্রাণের বিনিময়ে তাহাকে বাঁচাইতে গিয়াছিল।

তো প্রভাতের জীবনের মূল্যস্বরূপ তাহাকে তাহার তরুণ স্বাস্থ্য ও নবোদিত উষার ন্যায় স্নিগ্ধ কান্তি বিসর্জ্জন দিতে হইবে। কিন্তু এই বেদনা, ক্ষোভ ও দুঃখের মধ্যেও আজ তাহার গোপন মর্ম্মতারে কি যেন এক আনন্দ-ঝঙ্কার বাজিয়া উঠিতেছিল—সুধা তাহাকে ভালবাসে। তাহার বাছ সুধার সম্বন্ধে সংশয়ের আর লেশমাত্র অবশিষ্ট রহিল না।

—চার—

সেদিন ভাইজাগ হস্পিটাল হইতে বাড়ী ফিরিয়া রাত্রিতেই সুধার খুব জ্বর আসিয়াছিল। প্রায় দুই সপ্তাহ ভুগিয়া কাল সে অন্নপথ্য করিয়াছে। কিন্তু আশঙ্কার কথা—সুধার সর্ব্বাঙ্গে গরলের মত ক্ষতচিহ্ন দেখা দিয়াছে এবং তাহার কনকচাঁপার মত গৌরবর্ণও দ্রুত মলিন হইয়া আসিতেছে।

এই দুই সপ্তাহ সুধাকে লইয়া জ্যেঠামহাশয় হইতে আরম্ভ করিয়া, সুধীর, প্রভাত, রমলা সুহাসিনী সকলেই সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত ছিলেন। প্রভাত এখনও কলিকাতা ফিরে নাই। সুধা গায়ে একটু বল পাইলে সকলে মিলিয়া একত্র ফিরিবে ঠিক হইয়াছে।

সুধা আজ ঘর হইতে বাহির হইয়া বাহিরের দিকের দালানে ঈজি চেয়ারের উপরে বিছানা পাতিয়া বালিস মাথায় দিয়া শুইয়াছিল। এখনও সে নিজে হাটিতে গেলে টলিয়া পড়িয়া যায়, এত দুর্ব্বল। সুধীর ও প্রভাত তাহাকে ঈজি-চেয়ারে শোয়াইয়া চেয়ার শুদ্ধ বাহিরে লইয়া আসিয়াছে।

রমলা ও সুহাসিনী বাড়ীর ভিতরে ছিল, সুধীর ও প্রভাত সুধার কাছে বসিয়া গল্প করিতেছিল। সুধীর অল্পক্ষণ পূর্ব্বে কি কাযে উঠিয়া গিয়াছে, প্রভাত সুধার পিছন দিকে একখানি ছোট চেয়ারে চুপ করিয়া বসিয়াছিল।

এই কয়দিনেই সুধার চেহারা এত খারাপ হইয়াছে যে, চিনিবার উপায় নাই। শান্ত সমুদ্রের পানে উদাস দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া সুধা চেয়ারে হেলান দিয়া শুইয়াছিল। কি ভাবিতেছিল কে জানে? তাহার রোগশীর্ণ রুক্ষাভ গণ্ড বাহিয়া দুই ফোটা অশ্রুবিন্দু গড়াইয়া পড়িল। প্রভাত সুধার বিষণ্ণ মুখচ্ছবি এবং অশ্রুবিন্দু দেখিয়া বিচলিতচিত্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু ঐ সময়ে সামনে যাইবে কি না ইতস্ততঃ করিয়া পিছনদিকেই চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সুধা ব্লাউসের হাতায় চোখ দুইটি ভাল করিয়া মুছিয়া লইয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া ডাকিল,—"দাই।"

প্রভাত সুধার সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইল—"দাইকে কি ডেকে দেব, সুধা?"

সুধা বলিল—"এই যে, আপনি আছেন? দাইকে ডাকছিলুম আমার এসরাজটা একবার এনে দেবে বলে।"

"আমি এনে দিচ্ছি"—বলিয়া প্রভাত চলিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরে কালো রংয়ের ক্ষুদ্র এস্‌রাজটির রাঙ্গা শালুর আবরণ খুলিতে খুলিতে বাহিরে লইয়া আসিয়া বলিল "কিন্তু তোমার শরীর যে এখনও বড় দুর্ব্বল, সুধা। বাজাতে পারবে কি?" প্রভাত এখন সুধাকে নাম ধরিয়া ডাকে ও 'তুমি' বলে। সুধা ইহাতে আপত্তি করে না।

সুধা হাত বাড়াইয়া এসরাজটা প্রভাতের হাত হইতে টানিয়া লইয়া নিজের বাম কাঁধের উপর শোয়াইয়া ম্লানহাস্যে বলিল—"গানই আমার প্রাণ, প্রভাতবাবু। আমার দৃষ্টি যদি অন্ধ হয়ে যায়, আমার তত দুঃখ হবে না, যদি আমার এই গান গাওয়ার সামান্য শক্তিটুকু নষ্ট হ'য়ে যায়।"

প্রভাত বিস্মিতনেত্রে সুধার পানে তাকাইয়া রহিল। কাঁধের উপরে ফেলা যন্ত্রটির উপরে ক্ষীণ অঙ্গুলিগুলি লীলায়িত করিতে করিতে ডান হাতে ছড়ির টানের সঙ্গে সে বলিল—"কি গান গাইবো বলুন?"

"গান গাইলে বড় বেশী ক্লান্ত হ'য়ে পড়বে না কি সুধা? আজ সবে দু'টি ভাত পেয়েছ।"

"না, কষ্ট হবে না। বরং দিনরাত্রি বিছানায় চুপটি করে থেকে থেকে বুকটার ভেতর যেন গুমরে উঠছে। গান কিছু মনে আসছে না। একটা গান মনে ক'রে দিন না—"

প্রভাত উত্তর দিল না। স্নিগ্ধ গভীর দৃষ্টিতে সুধার পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল। সুধা প্রভাতের এই ভাষাপূর্ণ চাহনিতে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিয়া একটু উসখুস করিয়া নড়িয়া চড়িয়া বলিল—"আপনারও কোনও গান মনে আসছে না বুঝি। আচ্ছা, আমার ঘরে শেল্‌ফের উপর থেকে গীতাঞ্জলিখানা এনে দিন্ তো।"

প্রভাত সুধাকে তাহার সেই মৌন করুণ-ভাষা ভরা চাহনিতে অভিষিক্ত করিয়া মৃদুস্বরে বলিল—"তোমার মনে এখন যে গানের প্রেরণা আসছে, সেই গানখানিই গাও না, সুধা।"

সুধা মৃদু হাসিয়া বলিল—"এখন যে কোনও কিছুরই প্রেরণা আস্‌ছে না! আচ্ছা বসুন, একটা গান মনে পড়েছে—"

সুনিপুণ অথচ শিথিল হস্তে এস্‌রাজে ছড়ি টানিতে টানিতে সুর-ঝঙ্কারের সহিত সুমিষ্ট দুর্ব্বল কণ্ঠ মিশাইয়া সুধা আস্তে আস্তে গাহিতে লাগিল—

"কথা ছিল এক তরীতে কেবল তুমি আমি
যাব— অকারণে ভেসে কেবল ভেসে,
ত্রিভুবনে জানবে না কেউ আমরা তীর্থগামী
কোথায়— যেতেছি কোন্ দেশে সে কোন্ দেশে!—"

প্রভাত অপলকদৃষ্টিতে সুধার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল। গান গাহিবার সময়ে অধিকাংশ সময়ে সুধা যেন মূর্ত্তিমতী বিষাদ হইয়া উঠে! তখন আর মনে হয় না, এই সেই সদা প্রফুল্লচিত্তা তরুণী সুধা! এ যেন কোন্ মূর্ত্তিমতী বেদনা। গানের সুর ও কথার বাতায়ন দিয়া তাহার প্রাণের নিরুদ্ধ গোপন বেদনারাশি প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে! মুগ্ধ প্রভাত শুনিতে লাগিল, সুধার রোগ-দুর্ব্বল ক্ষীণ কণ্ঠস্বরে ব্যাকুল মিনতি লুটাইয়া পড়িতেছে—

"আজো সময় হয়নি কি তার কাজ কি আছে বাকী?
ওগো,— ঐ যে সন্ধ্যা নামে সাগর-তীরে—
মলিন আলোয় পাখা মেলে সিন্ধুপারের পাখী
আপন,— কুলায় মাঝে সবাই এল ফিরে!
কখন তুমি আস্‌বে ঘাটের 'পরে
বাঁধনটুকু কেটে দেবার তরে
অস্ত-রবির শেষ আলোটির মত
তরী— নিশীথমাঝে যাবে নিরুদ্দেশে!"

বাগানের বৃক্ষপত্রের মর্ম্মর শব্দ ও দূরশ্রুত সমুদ্রতরঙ্গের অস্ফুট কলধ্বনির মধ্যে এই বেদনা-করুণ গানখানি পরিপূর্ণ ব্যথারসে সান্ধ্য আকাশ কম্পিত—উদাস করিয়া তুলিল।

প্রভাত সুধার পানে আবেগপূর্ণ ব্যথিত দৃষ্টি মেলিয়া দেখিল, তাহার সুন্দর ঘন কালো আঁখির দৃষ্টি নীল-সাগরের দিক্-চক্রবালে উড়িয়া গিয়াছে, শান্ত মুখখানির উপরে গভীর বিষাদের করুণছায়া স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে!

গান সমাপ্ত করিয়া প্রভাতের দিকে স্মিতহাস্যে চাহিয়া সুধা জিজ্ঞাসা করিল—"কেমন শুনলেন?"

প্রভাত আর থাকিতে পারিল না, ব্যাকুলভাবে উঠিয়া গিয়া নিজের কম্পিত হস্তের মধ্যে সুধার হাত দুইখানি চাপিয়া ধরিয়া আবেগরুদ্ধস্বরে বলিল—"সুধা—সুধা—রাণী আমার,—তোমার কণ্ঠে যে আমি বিশ্বের অমৃত—"

সুধা সচকিতে প্রভাতের হাত হইতে হাত ছাড়াইয়া লইয়া চেয়ারে সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল। তাহার রোগপাণ্ডুর মুখে চোখে ঘন বিস্ময় ও বিরক্তি বিচ্ছুরিত হইতেছিল। তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"প্রভাতবাবু! আপনার কি হয়েছে? আমাকে এ সব কি বল্‌ছেন আপনি?"

বিমূঢ় প্রভাত চকিত সন্ত্রস্ত নিজেকে সম্বরণ করিতে করিতে ব্যথাকরুণস্বরে বলিল—"সুধা—তবে কি—তবে কি আমি ভুল বুঝিছি? তুমি কি আমাকে—"

"আপনাকে ভালবাসি কি না জান্‌তে চান? বাসি প্রভাতবাবু! এই এক মাস দেড় মাসে আপনাকে আমি আমার ছোড়দারই মত আন্তরিক ভালবেসেছি! কিন্তু আর যদি কিছু মনে ক'রে থাকেন, মাফ করবেন—আপনি ভুল করেছেন।"

প্রভাতের মুখে চোখে একটা বিপুল রিক্ততার ছায়া ফুটিয়া উঠিল। সুধীর সেই সময়ে আসিয়া পড়ায় প্রভাত ও সুধা দুই জনেই যেন বাঁচিয়া গেল।

সুধা বলিল—"ছোড়দা, সন্ধ্যা হয়ে গেছে, এইবার তোমরা আমাকে ঘরের ভিতরে তুলে নিয়ে চল।"

—পাঁচ—

প্রভাত সমুদ্রবেলায় বসিয়া ছিল, সুধীর আসিয়া পাশে বসিল।

"প্রভাত, তোকে এত শুখনো দেখাচ্ছে কেন রে?"

"কৈ, না!"

তাহার পর এ কথা সে কথার পর সুধীর বলিল—"আস্‌ছে সোমবারে কলকাতা রওনা হওয়া ঠিক করলুম, প্রভাত! সুধা একটু গায়ে বল পেয়েছে!—ওঃ এমন সর্ব্বনেশে সাপও দেখিনি! কি রকম শীগগির সুধা কালো হয়ে যাচ্ছে দেখেছ তো?"

প্রভাত বিশুষ্কমুখে বলিল—"হ্যাঁ"—

অনেকক্ষণ দুই জনেই চুপ করিয়া থাকিবার পর সুধীর

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"যাক্, তবু সুধার বিয়ের ল্যাঠা আর নেই—তা হ'লে আরও মুস্কিল হ'ত!"

প্রভাত চমকিতভাবে সুধীরের মুখের পানে তাকাইয়া বলিল—"তার মানে?"

সুধীর প্রভাতের প্রতি চাহিয়া বলিল—"ও যে আর বিবাহ করবে না বলেছে! কেন? তুমি কি অজিতের বিষয় জান না?"

"কে অজিত?"

"প্রোফেসর অজিত সেন! অক্সফোর্ডের এম্, এ!"

"হাঁ হাঁ খুব জানি! আমরা একসঙ্গে ফার্ষ্টইয়ার থেকে কলেজে পড়েছি! খুব বন্ধুত্ব ছিল। আহা, সে তো বিলেত থেকে ফিরতে জাহাজে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় মারা গেল!"

সুধীর বিষণ্ণমুখে বলিল—"তার সঙ্গেই সুধার বিয়ের এন্‌গেজমেণ্ট হয়ে গিয়েছিল।"

প্রভাত উৎসুক মুখে বলিল—"তার পর?"

"সে বলেছিল, বিলেত থেকে ফিরে এসে বিয়ে করবে। সুধা বোর্ডিংএ থেকে কলেজে আই-এ পড়তে লাগল। দু'জনে চিঠিপত্র লিখত। তার পর আর কি? সে বিলেত থেকে ষ্টার্ট করতে সুধা বোর্ডিং ছেড়ে বাড়ী এলো, এডেন থেকেও তার টেলিগ্রাম পাওয়া গেছল—ভাল আছে, নির্ব্বিঘ্নে আস্‌ছে—বম্বে'য় নামবার আগেই জাহাজে ঠাণ্ডা লেগে হঠাৎ ইনফ্লুয়েঞ্জা হ'য়ে সব শেষ হয়ে গেল।"

প্রভাত স্তম্ভিত মুখে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

সুধীর খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পরে বলিল—"সুধাকে জ্যেঠামশাই ছোট থেকে মানুষ করেছেন। খুব ছোট অবস্থায় ও মাতৃহীনা হওয়ায় জ্যেঠামশাই ওকে নিজের সন্তানের চেয়ে গভীর স্নেহে মানুষ করেছেন। তার পর বাবাও মারা যাওয়ায় জ্যেঠামশাই সুধাকে আরও নিজের বুক দিয়ে ঘিরে রেখেছেন। ওঁর নিজের তো স্ত্রী পুত্রকন্যা কিছু নেই! জ্যেঠামশাইয়ের ইচ্ছা—সুধা ভাল পাত্রে বিবাহিতা হয়ে সুখী হয়। ওর আশা,—মনের ধাক্কাটা সামলে গেলে সুধা এর পরে বিয়ে করবে!—কিন্তু সুধা যে আর বিয়ে করবে না, আমি জানি। ও শুধু জ্যেঠামশাইকে সুখী রাখবার জন্য ও আর সবাইকে সুখী করবার জন্য নিজে সর্ব্বদা অত প্রফুল্লভাবে থাকে!"

প্রভাত নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া ছিল। একটিও কথা কহিতে পারিল না।

সুধীর আবার বলিল—"সুধা প্রথমটা খুবই ভেঙ্গে পড়েছিল,—তার পরে হঠাৎ একবারেই সামলে সহজ হয়ে গেল! তিন বছর অজিত মারা গেছে—জ্যেঠামশাই কত জায়গায় ওর বিয়ের চেষ্টা করলেন, কিন্তু ও কিছুতেই রাজী হয় না!

"অজিত সুধার হাতের রান্না খেতে বড় ভালবাসতো—বিলেত থেকে লিখতো, দেশে ফিরে সুধার হাতের রান্না খাবে। সেইজন্যে সুধা নিজের হাতের তৈরী কোনও রান্না মুখে তোলে না। অনেক ভালজিনিষ সুধা খেতে পারে না অজিত ভালবাস্‌ত ব'লে!—ওর বাইরের হাসিখুসী সব মিথ্যে।"

প্রভাত যেন স্বপ্নাভিভূতের মত চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সুধীরও আর কোনও কথা বলিতে পারিল না।

সেইদিনই বিকাল বেলা সুধা বাংলো-সংলগ্ন বাগানে আস্তে আস্তে পায়চারী করিতেছিল। এখনও সে দুর্ব্বল, বেশীক্ষণ হাঁটিতে পারে না। অল্পক্ষণ পায়চারী করিয়া ক্লান্তভাবে সে একটি লোহার বেঞ্চের উপরে গিয়া বসিল।

প্রভাত আসিয়া সেখানে দাঁড়াইল। সুধা প্রভাতের দিকে চাহিয়া বেঞ্চের একপাশে কোণ ঘেঁসিয়া সরিয়া বসিয়া ম্লানহাস্যের সহিত বলিল—"বসুন।"

প্রভাত বেঞ্চের অপর প্রান্তে বসিতে বসিতে বলিল—"তোমার সঙ্গে আমার একটু কথা আছে সুধা! সে দিন তুমি আমাকে সুধীরের সঙ্গে সমান আসন দিয়েছো,—সেই ভরসাতেই আজ তোমার সঙ্গে কথা কইবার স্পর্দ্ধা করছি!"

সুধার ম্লান বিষণ্ণ মুখখানি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। প্রভাত বলিতে লাগিল—"সুধীরের কাছে আমি তোমার বিষয় সব শুনেছি। তোমার প্রতি শ্রদ্ধায় আমার অন্তর পূর্ণ হ'য়ে উঠেছে! তোমার এই মূর্খ নির্ব্বোধ ভাইয়ের সেদিনকার মূঢ় আচরণ পারো তো ক্ষমা কোরো, সুধা! আমি আজ তোমার কাছে আর একটা নতুন দাবী নিয়ে এসেছি—আমি অজিতের বন্ধু—অজিতের সঙ্গে আমি অনেকদিন একত্র পড়াশুনা করেছি,—তার চেহারার সঙ্গে আমার চেহারার এত বেশী সাদৃশ্য ছিল যে, কলেজের ছেলেরা

আমাদের যমজ ভাই বলতো ! আমি জানতুম না, অজিতের সঙ্গে তোমার—"

সুধা ব্যথিত-দৃষ্টি অবনত করিয়া বলিল—"হ্যাঁ, সেই অদ্ভুত সাদৃশ্যটি আমি প্রথম দিন থেকেই লক্ষ্য করেছি।

প্রভাত বুঝিতে পারিল, সুধাকে ভুল বুঝা তাহার কোন্খানটায় হইয়াছে ! বুঝিতে পারিল তাহার মুখের পানে নির্নিমেষ তৃষিত-নয়নে তাকাইয়া সে কাহার মুখের সাদৃশ্য অন্বেষণ করিত ! গল্প করিতে করিতে তাহার মুখের পানে চাহিয়া কেন মাঝে মাঝে সে অমন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িত !

প্রভাত প্রকৃতই অন্তরে অন্তরে অনুতপ্ত হইয়া বলিল—"আমার অভদ্র আচরণ ভুলে যেও, সুধা ! আজ থেকে আমিও তোমার 'দাদা' !"

সুধা স্নিগ্ধ হাসিয়া ধীর মৃদুকণ্ঠে বলিল—"শুধু আমার দাদা নয়,—তার চেয়েও বেশী—আপনি তাঁর বন্ধু—"

শ্রী রাধারাণী দত্ত

তাঁতের ফাঁক

জীবন-বসন চল্‌ছে বোনা নূতন পুরাণাতে—
অতীত যুগের জোড় মিলিয়ে উপস্থিতের সাথে ;
সুখের দুখের পাঁচমিশালি মন্দ এবং ভালো,
আর বছরের লালের সাথে এই বছরের কালো,
সরু এবং মোটার মিলে টানা-পোড়েন সূতোয়
রাত্রিদিবা চল্‌ছে বুনোন শক্ত মাকুর গুঁতোয়।

চল্‌ছে মাকু খোস্‌খেয়ালী বিশ্ব-তাঁতীর ঘরে,
বাড়ির পরে পড়ছে বাড়ি লক্ষ তাঁতের 'পরে ;
খস্‌খসানি কাউরি বেশী কাউরি কিছু কম,
কোন'টা বা কেবল হাঁপায়, কোন'টা লয় দম ;
কাউরি আওয়াজ হাসির মতো, কেহ বা কান্নাতে
বসন-জন্ম শেষ করে তার ভাগ্য-তাঁতীর হাতে !

গামছা কেহ, কেউ বা কাপড়, কারো বা নাম শাল,
কেউ বা কিছু ঠাস্ বুনোনী কেউ বা ফিকে জাল ;
সব্‌জে নীলে জরদা লালে রং-বেরঙে ফুটে'
খোস্‌-খেয়ালীর মরজি মাফিক্ বসন বনে' উঠে ;
যেথায় খুসি পাড় বসানো হয়ে গেলেই তার তার,
তাঁতীর হাতের মাকুর ঠেলায় পায় বুঝি নিস্তার !

বিশ্বমাঝে গ্রাহক কোথায়, কিনবে কেবা তায় ?
জগৎজোড়া বসন সে তাই জড়ায় আপন গায় !
তবু যে তার লাজ ঢাকে না বিরাট মোটা দেহে,
নিজের লজ্জা নিজের চোখে শিউরে দেখে চেয়ে ;
যতই জোরে চালায় সে তাঁত খেইএর খেয়াল ধরে',
ততই যে তার ফাঁক বেড়ে' যায় অনন্তকাল ভরে'।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

ফুলী

১

তিন দিন গৃহ হইতে অনুপস্থিতির পর যখন মাথম বাউরি তাহার গ্রাম মাধববাটীর প্রান্তে উপস্থিত হইল, তখন সন্ধ্যা হয় হয় হইয়াছে। তিন দিন পূর্ব্বের প্রাতঃকালে সে ফলমূলের ভার কাঁধে করিয়া, তাহার মনিব নরহরি চট্টরাজের জামাই বাড়ী তত্ত্ব লইতে গিয়াছিল। জামাই বাবুর বাড়ী তাঁহার শ্বশুরের গ্রাম হইতে প্রায় বিশ ক্রোশ দূরে। তবে সমস্ত পথটা মাথমকে হাঁটিয়া যাইতে হয় নাই। অর্দ্ধেক পথ বিষ্ণুপুর পর্য্যন্ত বেঙ্গল নাগপুর কোম্পানীর রেল আছে।

গ্রামপ্রান্ত হইতে তাহার ঘর এখনও প্রায় পোয়াখানেক পথ দূর। চট্টরাজ মহাশয়ের বাটী সে স্থান হইতে অনেক নিকটে। জামাই ও কন্যার সংবাদ লইয়া সর্ব্বাগ্রে মনিবের ঘরেই মাথমের উপস্থিত হওয়া কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু তাহা না করিয়া মাথম একটা ভিন্ন পথ অবলম্বনে প্রথমে আপনার ঘরের দিকেই চলিল। পথিপার্শ্বে প্রকাণ্ড জলাশয় গোকুল বাঁধ। তখনও পর্য্যন্ত গ্রামের দুই চারি জন মেয়ে সেখানে উপস্থিত ছিল। হাঁটু পর্য্যন্ত ধূলা, পা ধোয়াটা বিশেষ প্রয়োজন বুঝিয়া মাথম একবার বাঁধের ঘাটের দিকে চলিল,—আবার কি মনে করিয়া ফিরিল।

ফিরিতে ফিরিতে একটা কথা তাহার কানে গেল, "মাথম বাউরি না?" একটি মেয়ে আর একটি মেয়েকে যেন প্রশ্ন করিল। উত্তরের কথাটা তাহার কানে প্রবেশ করিল না। তবে সেই মেয়েটিরই কথা আবার সে শুনিতে পাইল। "তোমার মামাকে দিয়ে এর একটা বিহিত না করালে কিন্তু চলবে না ভাই।"

এই বারে দ্বিতীয়ার কথাও সে শুনিল, "মামা ত করবে ব'লে তইরী হ'য়ে ব'সে আছে।"

"আহা বেচারি নিরীহ।"

এতক্ষণে মাথম যে স্থানে আসিয়া পড়িল, তাহাতে তাহাদের কথোপকথন শুনিতে পাওয়া যায় না।

একটু ঘোরা পথ অবলম্বনে যখন সে লোকের অলক্ষ্যে তাহার মনিবের বাড়ী অতিক্রম করিল, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে।

তাহার গৃহে ফিরিবার ব্যস্ততার একটা কারণ ঘটিয়াছিল। চট্টরাজ মহাশয়ের জামাতার বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যে সময় সে বিষ্ণুপুর ষ্টেশনে উপস্থিত হইল, তখন কলিকাতাভিমুখী গাড়ীখানা সবে মাত্র ছাড়িয়াছে।

গাড়ীখানার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেই সে যাহা দেখিল, তাহাতে প্রথম তাহার মাথাটা ঘুরিয়া গেল। দেখিল, সেই চলন্ত গাড়ীর জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া একটা মেয়ে ষ্টেশনটা দেখিতেছে। তাহার মুখখানা ঠিক যেন তাহার স্ত্রী ফুলীর মুখের মত। দেখিবার সঙ্গে সঙ্গেই সত্যই তাহার চোখ দু'টা অন্ধের মতই হইয়া গেল। বিস্ময়ে সে যেন জড়ীভূত হইল।

আরও বিস্ময়ের কথা, এ দিক্ ও-দিক্ দেখিতে দেখিতে যেমন মেয়েটার চক্ষু একবার মাথমের উপর পড়িল, অমনই এমন ব্যস্ততার সহিত সে মাথাটা জানালার ভিতরে লইয়া গেল যে, মাথমের বোধ হইল, মেয়েটার মাথা জানালার মাথায় ঠুকিয়া গেল।

গাড়ী তখন অল্পে অল্পে ষ্টেশনের মঞ্চ অতিক্রম করিতে চলিয়াছে। মাথম মনে করিল, গাড়ীর কামরার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া মেয়েটাকে একবার ভাল করিয়া দেখিয়া আসে; কিন্তু ষ্টেশনের ভিতরে প্রবেশমুখে ষ্টেশন মাষ্টারের বাধায় তাহার ইচ্ছা পূর্ণ হইল না।

গাড়ী ষ্টেশন ছাড়িয়া সশব্দে বহুদূর চলিয়া গেল। মাথম দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দৃষ্টিকে তীব্র হইতে তীব্রতর করিয়া সেই দূর হইতে সুদূরগামী গাড়ীখানাকে দেখিতে লাগিল।

আর যখন দেখা গেল না, তখন সে হাতের বাঁক ভূমিতে রাখিয়া, ষ্টেশনের বাহিরের গাছের তলে উপবিষ্ট হইল। দশ ক্রোশ পথ হাঁটিয়া আসায় তাহার শরীরটা ক্লান্ত বটে,

কিন্তু অবসন্ন হয় নাই; অবসন্ন হইয়াছে—গাড়ীতে ফুলীর মত মেয়েটাকে দেখিয়া। ওকি সাদৃশ্য, না সত্য সত্যই ফুলী?

মাথায় হাত দিয়া বসিয়া অনেকক্ষণ চিন্তার পর মাথম ঠিক করিল, সাদৃশ্যটাই বটে। এইরূপ সময়ে বিষ্ণুপুরে গাড়ীর ভিতরে—যেটা মনে করা—পাগলের চিন্তা ভিন্ন আর কিছু হইতেই পারে না—ফুলী কেমন করিয়া প্রবেশ করিবে?

কিন্তু মেয়েটা তাহাকে দেখিয়া ভয়-বিহ্বলার মত অত ব্যস্ততার সহিত মাথাটাই বা গাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করাইল কেন?

তথাপি সে ফুলী নহে। মনে মনে অনেক তর্ক-বিতর্কের পর মাথম সিদ্ধান্ত করিল, "সে কখন ফুলী হইতে পারে না। মেয়েটা ফুলীর একটা সাদৃশ্য। কিন্তু অদ্ভুত সাদৃশ্য!"

সিদ্ধান্ত করিয়াও কিন্তু মাথম মনে শান্তি অনুভব করিতে পারিল না। সে বাড়ী ফিরিবার জন্য ব্যাকুল হইল। ষ্টেশনে জিজ্ঞাসা করিয়া সে জানিল, কলিকাতা হইতে যে গাড়ী বাঁকুড়ার দিকে আইসে, তাহার বিষ্ণুপুরে পৌছিতে তখনও চারি ঘণ্টার উপর বিলম্ব।

মাথম ভাবিল, এই সময়ের মধ্যে বাড়ীর বারো আনা পথ সে অতিক্রম করিতে পারিবে। আর কালবিলম্ব না করিয়া সে মাধববাটী হাঁটিয়া চলিল।

কিন্তু যত শীঘ্র সে আসিবে মনে করিয়াছিল, তত শীঘ্র সে আসিতে পারিল না। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব হইতেই সে চলা আরম্ভ করিয়াছিল, "থাউকি" বেলায় পথে মুড়ি জলযোগ করিয়াছিল মাত্র। বিষ্ণুপুর হইতে প্রথমটা যত বেগে সে চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, শেষটা তাহা আর পারিল না। চলিতে চলিতে সে দেখিতে পাইল, রেল গাড়ী তাহাকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইতেছে।

নিজের মূর্খতা বুঝিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার পথ চলিবার আগ্রহ কমিয়া গেল। গাড়ীতে চড়িয়া গেলে অন্ততঃ এক ঘণ্টা পূর্ব্বে সে বাড়ী পৌছিতে পারিত। বাড়ীতে সে যখন উপস্থিত হইল, তখন সন্ধ্যা ঘনীভূত হইয়া গিয়াছে।

২

বাড়ীর উঠানে পা দিয়াই মাথম ডাকিল, "ফুলি!" উত্তর পাইল না।

সম্বোধনটা বিশেষ উচ্চস্বরের নয়। সুতরাং উত্তর না পাওয়ায় বিস্ময়ের বিষয় কিছুই ছিল না। কিন্তু যখন সে তাহার ঘরের একান্ত নিকটে উপস্থিত হইল, তখন তাহাকে কিঞ্চিৎ বিস্মিতই হইতে হইল, ঘরে এখনও আলো জ্বালা হয় নাই!

তখন সে আর কোনও কথা না কহিয়া একবারে ঘরখানির চালির তলদেশে আসিয়া দাঁড়াইল।

বাহিরে তখনও বিশেষ অন্ধকার না হইলেও চালির ভিতরটা বেশ ঘন অন্ধকারেই ভরিয়া গিয়াছে। তথাপি সে অনুমানে বুঝিল, ঘরের দ্বার বন্ধ।

ফুলী কি তবে ইহারই মধ্যে দ্বার বন্ধ করিয়া আলো নিবাইয়া শুইয়াছে?

ইহার অধিক আর সে অনুমান করিতে সাহস করিল না। বিষ্ণুপুরের সেই দৃশ্যটা এই একান্ত পথশ্রমক্লিষ্ট ক্ষুধার্ত্তের কাছে অস্পষ্ট হইতে হইতে একবারে মুছিয়া যাইবার মত হইয়াছে।

সে এইবারে একটু বিরক্তির ভাবে ডাকিল, "ফুলি!"

এবারও উত্তর না পাইয়া সে বাঁকটা সিঁড়ির গায়ে ঠেসাইয়া দাওয়ার উপরে উঠিল; দোরে হাত দিল, ঠেলিল, তাহার পর কপাটের মাথায় চৌকাটে হাত ঠেকাইল। তখন সে বুঝিতে পারিল, দ্বার বাহিরের দিক্ হইতে বন্ধ।

তখনও তাহার মনে সন্দেহের লেশ মাত্র উদিত হইল না। সে দেখিল, ফুলী নাই বটে, কিন্তু তাহার কুক্কুট ও ছাগগুলা যথাস্থানে রক্ষিত হইয়াছে। ফুলী না থাকিলে আর কে সে গুলাকে অমন করিয়া চালির মধ্যে পূরিয়া রাখিবে?

তবে সে অভাগী সন্ধ্যাবেলা দুয়ার তালা বন্ধ করিয়া কোথায় গেল? মাথম আবার উঠানে নামিয়া তাহার খুড়া অটলের বাড়ীর দিকে মুখ করিয়া উচ্চ কণ্ঠে ডাকিল, "ফুলি!"

তাহার ডাক শুনিয়া যে আসিল, সে ফুলী নহে—অটলের কন্যা ভাবিনী। ভাবিনী নীরবেই তাহার সমীপস্থ হইল। তাহার পা যেন মাথমের দিকে চলিতে চাহিতেছিল না।

"বউ কোথায় রে, ভাবি?"

ভাবি সে কথার উত্তর না দিয়া বলিল, "তুমি কি মনিবের ঘর হ'য়ে আসছ, দাদা?"

"না, বরাবর এইখানেই আস্‌ছি।"

"পাও ধোও নাই দেখছি যে।"

"মনিবের বাড়ী যাবার সময় ধোবো। আগে বল্ সন্ধো-কালে দোরে চাবি দিয়ে সে আবাগী গেল কোথায় ?"

"চাবি কি সে আবাগী দিয়েছে ?"

"দোর খুলে ? এমন সময় কোথায় সে মরতে গেল, ভাবি ?"

"হায়, আবাগীর যদি মরণ হত ?"

"ব্যাপার কি রে ? খুলে বল। আ মর, চুপ ক'রে রইলি কেন ?"

ভাবিনী তথাপি উত্তর দিতে পারিল না। অন্ধকার না হইলে মাখম দেখিতে পাইত, তাহার দুই চক্ষু হইতে টপ টপ করিয়া জল পড়িতেছে।

তাহার নীরবতায় কিন্তু মাখমের চক্ষু প্রস্ফুটিত হইল। সে এইবারে বুঝিল, বিষ্ণুপুরের ষ্টেশনে সে যাহাকে দেখিয়াছে, সে তাহারই ফুলী।

তথাপি বুঝিয়াও বুঝিতে সাহস না করিয়া সে ভাবিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, "সে কি বাপের্ বাড়ী চ'লে গেছে, ভাবি ?"

"বাবা তার বাপের বাড়ীতে খোঁজ করতে গেছে।"

"হুঁ! কেন সে চ'লে গেল, ভাবি ? কারও সঙ্গে কি তার গণ্ডগোল হয়েছিল ?"

"গণ্ডগোল হবার কোনও ত কারণ ছিল না, দাদা, কি লেগে হবে ?"

গম্ভীর ভাবে এইবার মাখম বলিল, "খুড়ো মিছে গেছে। ফুলী তার বাপের বাড়ী যায় নি।"

"তুমি কেমন ক'রে জান্‌লে দাদা ?"

"সে কি একাই চ'লে গেছে ?" উত্তর না দিয়া মাখম প্রশ্ন করিল।

"অজবাকেও আজ কেউ দেখতে পায় নি।"

"কখন থেকে ?"

"সেই সকাল থেকে।"

"নে, ঘরে আলো জাল্।"

তুই কি—কিছু জানতে পেরেছিস্ ?"

"দেখেছি।"

"দেখেছিস্ ?"

"আগে মনে করেছিলুম স্বপন, এখন বুঝছি সত্যি।"

"কোথায় দেখলি ?"

"বিষ্ণুপুরে।"

"দেখলি ত, চুলের মুঠি ধ'রে আবাগীকে ফিরিয়ে আনলি নে কেন ?"

"আনবার উপায় ছিল না রে বোন্। প্রথমটা ত দেখা বিশ্বাসই করতে পারিনি। সে গাড়ীতে—আমি মাটীতে। তার পর দেখতে দেখতে গাড়ী ছেড়ে দিলে। কিছুতেই বোন্, মন আমাকে বলতে পারলে না সে ফুলী।"

"সেই বেদেটা ?"

"তাকে দেখিনি। সে বোধ হয় গাড়ীর ভিতরে ছিল।"

ভাবিনী ক্ষণেক মাথা হেঁট করিয়া মাটীর দিকে চাহিয়া রহিল। ইত্যবসরে মাখমও সেই বিষ্ণুপুরের দৃশ্যটা আর একবার কল্পনার দৃষ্টিতে দেখিয়া লইল, মুখ বাহির করিয়া ফুলীর বাহিরের দিকে চাহিয়া থাকা, তাহাকে দেখা, আর দেখার সঙ্গে সঙ্গেই অতি ব্যস্ততায় মুখখানাকে লুকাইয়া ফেলা। সে একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল।

"এখন বুঝতে পারলি, দাদা! তোকে যে পৈ পৈ মানা করতুম্, অজবার সঙ্গে অতটা ঘনিষ্ঠতা করা ভালো নয়!"

"ঘরে আলো জাল্।'

"হ'লেই বা সে ইয়ার! অতটা বাড়াবাড়ি কেন ?' দাওয়ায় ব'সে এক পহর রাত পর্য্যন্ত তার সঙ্গে গল্প-গুজোব —বউয়ের হাত দিয়ে তাকে পান-তামাক দেওয়া।"

"আলো জাল্!"—বিরক্তির সহিত মাখম ভাবিনীকে আদেশ করিল।

ভাবিনী তথাপি বলিতে লাগিল, "সে বেটা নেশাখোর, তার কি ধর্ম্মজ্ঞান আছে।"

"আ মর্, কথা শুনছিস্ না কেন ?"

ভাবিনী এইবারে কথা বন্ধ করিয়া ঘরে আলো জ্বালাব ব্যবস্থা করিতে চলিল। মাখমও গেল ঘাটে হাত, পা, মুখ ধুইতে। তাহার পায়ে ত ছিল তার আজানু ধূলা। এখন তাহার হাত পা মুখ চোখ—সর্ব্বগাত্রই জ্বালা করিতেছিল।

৩

ঘর হইতে অনতিদূরে "গাঙ্গলি"গোড়ে হইতে হাত পা মুখ ধুইয়া ঘরে ফিরিয়া মাখম দেখিল, ভাবিনী ঘরে আলো জ্বালিয়া চলিয়া গিয়াছে। সে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই

তাহার টাকা পয়সা রাখিবার ছোট বাক্সটির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। দেখিল—বাক্সটি যথাস্থানেই রহিয়াছে। বাক্সের চাবিকাঠি কোথায় থাকিত, তাহার জানা ছিল। সে সেই স্থান হইতে সেটিকে বাহির করিয়া প্রথমেই বাক্সটি খুলিল। যাইবার দিন সে মনিবের নিকট হইতে পাওয়া পঁচিশটি টাকা ফুলীর হাতে দিয়া গিয়াছিল।

বাক্স খুলিয়া মাথম দেখিল, ফুলী টাকার একটিও লইয়া যায় নাই। তদ্ভিন্ন বানীনের কাজ করিয়া ফুলী নিজে যাহা উপার্জ্জন করিয়াছে, তাহাও বাক্সের মধ্যে এক স্থানে সযত্নে রক্ষিত রহিয়াছে। এইবার সে কাপড়-চোপড় প্রভৃতি চলিয়া যাইবার কালে যাহা যাহা ফুলীর সঙ্গে লইয়া যাওয়া সম্ভব, সমস্তই পরীক্ষা করিয়া দেখিল। তাহাদের ভিতর হইতে একটিও সামগ্রী সে লইয়া যায় নাই। এমন কি, সপ্তাহ পূর্ব্বে সে যে একখানি রঙ্গিন কাপড় ফুলীর জন্য বাঁকুড়ার বাজার হইতে কিনিয়া আনিয়াছিল, সেখানিকেও সে ফেলিয়া গিয়াছে।

তখন বাক্স আবার বন্ধ করিয়া মাথম ঘরের বাহিরে দাওয়ায় আসিয়া উপবিষ্ট হইল।

চোখের জল সে আর রোধ করিতে পারিল না। কাঁদিতে কাঁদিতে ফুলীকে উপলক্ষ করিয়া বলিয়া উঠিল, "কি দুঃখে তুই চ'লে গেলি, ফুলি ?"

"মনিবের ঘর থেকে ফিরে এসে ভাত খাবি, দাদা, না খেয়ে মনিবের ঘরে যাবি ?"

"কেন সে চ'লে গেল ভাবি, আমি ত এক দিনের জন্যও তাকে একটা বাখানও পর্য্যন্ত করিনি !"

"কপালে তার দুখ আছে, দাদা, নইলে এ রকম মতিচ্ছন্ন তার কি লেগে হবে ?"

"কবে সে গেছে ?"

"কবে কি, আজই গেছে। দাদা, আজ সকালেও যদি আস্‌তিস্, তা হ'লে বোধ হয়, আবাগী যেতে পারত না।"

"কখন গেলো ?"

"তাও ত বল্‌তে লারবো দাদা ! সকাল বেলায় যেমন রোজ যাই, ধান কলে কায করতে গেছলুম। যাবার সময় তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, 'বউ যাবি ?' সে বল্‌লে, 'আজকে আমি যেতে লারবো, গায়ে আমার সুখ নেই।' আমি একাই চলে গেলুম।"

মাথম মাথা হেঁট করিয়া শুনিতেছিল, উঠানে দাঁড়াইয়া ভাবিনী বলিতেছিল। এমন সময় চট্টরাজ মহাশয়ের আর এক ভৃত্য পান্নু কাপড়ী, তাহার "বাকুলের" বহির্ভাগের পথ হইতে ডাকিল, "মাথম ঘরে রইছিস্ ?"

ভাবিনী শুনিয়া বলিল, "মনিব তোকে ডাকতে পাঠিয়েছে।"

"তা হ'তে পারে।"

মাথম পান্নুর কথার কোনও উত্তর দিল না।

পান্নু আবার ডাকিল, "মাথম !"

ভাবিনী বলিল, "উত্তর দে।"

মাথম বলিল,"তুই ওকে ব'লে আয়, জামাইবাবুর বাড়ীর খবর সব ভাল। জামাইবাবু শুক্কুরবার বাকুড়ায় আস্‌বে। কাছারীতে তার মকদ্দমা আছে। এসে মনিবের সঙ্গে দেখা ক'রে যাবে।"

"মনিবের ঘরকে তুই যাবিনি ?"

"আজ আর যাব না।"

পান্নু আবার ডাকিল, "মাথম বাউরী !"

"যা ভাবি, বলে আয়।"

"তুই নিজেই ব'লে আয় না।"

"আমি যেতে নারবো।"

আরও দুই একবার অনুরোধের পরও যখন মাথম স্থান হইতে উঠিল না, তখন অগত্যা ভাবিনীকেই পান্নুর কাছে যাইতে হইল।

যাইয়াই ভাবিনী বুঝিল, সত্যই মনিব মাথমকে ডাকিতে পাঠাইয়াছে। মাথম তাহাকে যাহা বলিতে বলিয়াছিল, সে তাহাই পান্নুকে বলিল।

শুনিয়া পান্নু তাহাকে বলিল, "তা হবে না রে ভাবি, বাবু একবার তাকে দেখতে চায়। যা বল্‌বার সে নিজেই বাবুকে ব'লে চ'লে আসুক্।"

ভাবিনী ফিরিয়া দেখিল, মাথম ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া কবাট বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

সে জিজ্ঞাসা করিল, "কবাট দিলি কেন, দাদা ?"

"গায়ে সুখ লাই রে বোন্ !"

"ভাত খাবি না ?"

"আজ আর কিছু খেতে নারবো।"

"তা কি হয় ?"

"বকাস্ নি, ভাবি !"

তথাপি ভাবিনী নানা কথায় তাহাকে কবাট খুলিতে অনুরোধ করিল। সে কিছু না আহার করিলে কেমন করিয়া ভাবিনী অন্ন মুখে তুলিবে ? নানা কথায় মমতার সুরে, মাথার দিব্য পর্য্যন্ত দিয়া, সবলে দ্বারে আঘাত পর্য্যন্ত করিয়া ভাবিনী ভাইকে বাহিরে আসিবার জন্য সাধ্য-সাধনা করিল। প্রথম প্রথম ভিতর হইতে দুই একটা কথা কহিয়া শেষে মাখম তাহার কথার উত্তরই দিল না।

এই সময় পানু আসিয়া উঠান হইতে ডাকিল, "মাখম !"

"আজ আর যেতে নারবো, পানু খুড়ো !"

"বাবু তোকে সঙ্গে নিয়ে যেতে আমাকে হুকুম করেছে।"

"আজ যেতে নারবো।"

ভাবিনী বলিল, "একটিবার দেখা ক'রেই চ'লে আয় না, ভাই।"

মাখম উত্তর দিল না।

পানু কাপড়ীও ভাবিনীর কথার পুনরুক্তি করিল। মাখম তাহার কথারও উত্তর দিল না। তখন পানু কিঞ্চিৎ বিরক্তির ভাবেই বলিল, "মনিবের কথা কাটিস্ না। তোরই ভালোর জন্যে—হেই—মাখমা !"

'কাল যাব, পানু খুড়ো।"

"একবার বাইরে আয়।"

"নারবো।"

বিরক্ত হইয়া পানু চলিয়া গেল।

ভাবিনী বিশেষ ব্যাকুলভাবে এইবার জিজ্ঞাসা করিল, "আত্মহত্যা করবি না ত রে, দাদা ?"

"রাধেগোবিন্দ, আত্মহত্যা করব কিসের লেগে রে, বোন্ !"

৪

তথাপি ভাবিনী তাহার কথায় আশ্বস্ত হইল না। অনন্যোপায় হইয়া, ব্যস্ততার সহিত একটা লণ্ঠন হাতে সে চট্টরাজ মহাশয়ের গৃহাভিমুখে ছুটিল।

কিছুদূর না যাইতেই সে দেখিল, বাবু, পানু কাপড়ী, দিনু বাঙ্গাল ও তাহার বাপের মনিব গ্রামের প্রধান ছত্রী ভূম্যধিকারী দোলগোবিন্দ সিং ওরফে দলুবাবুকে সঙ্গে লইয়া তাহাদের বাড়ীর দিকে আসিতেছেন।

নরহরি তাহাকে দেখিয়াই বুঝিলেন, একটা অনর্থের আশঙ্কায় ভাবি তাঁহারই কাছে ছুটিয়াছে—মাখমা এখনও ঘরের কবাট খুলে নাই !

তিনি সেইভাবেই প্রশ্ন করিলেন, "কবাট সে খোলেনি ?"

"না, বাবু।"

"ছুটে যা, তাকে বল্, বাবু আস্‌ছে।"

ভাবিনী ফিরিতেছিল, এমন সময় দলুবাবু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোর বাপ কি এখনও ফেরেনি, ভাবি ?"

"না বাবু !"

নরহরি শুনিয়া বলিলেন, "তা হ'লে বোধ হচ্ছে ফুলী সেখানে যায়নি ?"

ভাবিনী বলিল, "না ত।"

"না কি রে, ভাবি ? তোরা কি কিছু জেনেছিস ?"

"ভাই তাকে দেখেছে।"

তখন সকলেই আগ্রহ সহকারে তাহাকে প্রশ্ন করিল। মাখমের মুখে সে যাহা শুনিয়াছিল, ভাবিনী আনুপূর্ব্বিক সেই কথা তাহাদের শুনাইল। শুনিয়া নরহরি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর অজবা ?"

"ভাই তাকে দেখেনি।"

নরহরি দিনু বাঙ্গালকে আদেশ করিলেন, অজবার ঘরে তাহার তত্ত্ব লইয়া সে যেন যত শীঘ্র পারে তাঁহার কাছে ফিরিয়া আইসে।

দিনু দুই চারি পদ অগ্রসর হইতে না হইতে অপর দিক্ হইতে এক জন তাহাদের উদ্দেশে প্রশ্ন করিল, "তোমরা—আপনারা কে বট গো ?"

দোলগোবিন্দ সিং অটলের স্বর অনুমান করিয়া বলিলেন, "কে রে অটলা ?"

ভ্রাতুষ্পুত্র-বধূর নিষ্ফল অনুসন্ধানে ক্লান্ত হইয়া অটল ঘরে ফিরিতেছিল। প্রভুর কণ্ঠস্বর শুনিয়া সেইদিকে ছুটিয়া আসিতে সে উভয়কেই দেখিল।

"হুজুররা রইছেন ?" বলিয়া অটল একবারে উভয়েরই সম্মুখে ভূমিতে মাথা রাখিয়া ডুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল। ভাবিনীও অমনই বাপের ক্রন্দনের সঙ্গে নিজের অস্ফুট ক্রন্দন যোগ করিয়া দিয়া লণ্ঠন ভূমিতে রাখিয়া বসিয়া পড়িল।

ফুলীর পলায়ন-কাহিনী তখন বিশেষভাবে গ্রামমধ্যে

প্রচারিত হয় নাই। পিতা ও পুত্রীর ক্রন্দনে এইবার তাহা হইবার উপক্রম হইল।

লোকসমাগমের আশঙ্কা করিয়া নরহরি তাঁহাদের উভয়কেই ধমক দিলেন। মাথা না তুলিয়াই অস্পষ্ট ক্রন্দনের সুরে অটল বলিল, "আপনারা দু'জনেই আমার মনিব রইছন, বিহিত কর হুজুর।"

দলুবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিহিত কি? কার সঙ্গে সে চ'লে গেছে শুনেছিস্?"

"জেনেছি হুজুর, অজবা তাকে নিয়ে গেছে। শ্যামা-নগরের রামুমেটে ভেদোশোলের ইষ্টেশনে তাদের গাড়ীতে উঠতে দেখেছে।"

বলিয়া আবার অটল ডুক্‌রাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, আর করযোড়ে কাতরকণ্ঠে উভয়েরই কাছে এই বিষম অপমানের প্রতীকার প্রার্থনা করিল। নহিলে সে গ্রামে আর তাহারা থাকিবে না, বাস উঠাইয়া "ভিন্ গাঁয়ে" চলিয়া যাইবে, চিত্তের আবেগে সে কথাও সে মনিবদের শুনাইয়া দিল।

দলুবাবু, বিশেষতঃ নরহরি তাহাকে যথাসম্ভব আশ্বাস দিয়া উঠিতে আদেশ করিলেন। কেন না, পথের মধ্যে তাহার ওরূপভাবে বসিয়া থাকায় লোকজানাজানি হইবে মাত্র। যদি হয়, সেটা আরও লজ্জার কথা হইবে।

নরহরির আদেশে অটল মাখমকে ডাকিতে গেল। অস্পৃশ্য জাতির গৃহ, তাহাদের উঠানে চট্টরাজ মহাশয় কিম্বা দলুবাবুর উপস্থিত হওয়া একবারেই অসম্ভব। তাঁহারা সদর পথে দাঁড়াইয়া মাখমের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

খুড়ার মুখে যখন সে শুনিল, মনিব পথে দাঁড়াইয়া তাহার অপেক্ষা করিতেছে, তখন মাখম আর ঘরের ভিতরে রহিতে পারিল না। বাহিরে আসিয়া কিন্তু সে খুড়াকে একটি কথাও বলিতে পারিল না।

অটল তাহাকে অনেক আশ্বাস দিল; বলিল, অজবাকে জব্দ করিতে যত টাকা লাগে, মনিব তত টাকাই খরচ করিবে।

মাখম এ কথার কোনও উত্তর না দিয়া কেবল খুড়াকে মনিবের কাছে চলিতে অনুরোধ করিল।

অটল কিন্তু আশ্বাস দিতে ক্ষান্ত হইল না; বলিল, "ভাবনা কি তোর? দুই মনিবেই যখন ভরসা দিয়েছে, তখন একা মধুপরথে বেটাকে রক্ষে করবে, সাধ্য কি!"

মাখম এরূপ আশ্বাস বাক্যেও কোন কথা কহিল না। তাহারা তখন উভয়েই চট্টরাজ মহাশয়ের সম্বোধন শুনিল, "মাখমা!"

নরহরির কাছে উপস্থিত হইয়া মাখম দেখিল, গ্রামের অনেকেই তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, আর, অন্ধকারে যতটা দেখা যায়, সে বুঝিতে পারিল, গ্রামের দুই চারি জন যুবকও কিছু দূরে পথের উপরে দাঁড়াইয়া আছে।

"যদি দেখতেই পেয়েছিলি ত ঘরে না এসে প্রথমেই আমাকে খবর দিলি নে কেন হতভাগা! এতক্ষণে আমি সে দু'টোকেই গ্রেপ্তার করিয়ে বাকুড়ার ইষ্টেশনে উপস্থিত করাতুম!"

মাখমের পরিবর্ত্তে ভাবিনী নরহরিকে উত্তর দিল, "ও বুঝতে পারেনি, বাবু। মনে করেছিল কে, তবে দেখতে আমাদের বউএর মতন।"

অটল শুনিয়া অতি বিস্ময়ের মত মাখমকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুই ওদের দেখেছিস্?"

ভাবিনী বলিল, "অজবাকে দাদা দেখেনি। দেখে ছিল শুধু বউকে, বিষ্ণুপুরে ইষ্টেশনে গাড়ীতে। বউ কি না, বুঝতে না পেরে ঘরে আইছে।"

অটল আবার নরহরির পায়ের সমীপে মাথা রাখিয়া পড়িল। মাখম দাঁড়াইয়া ছিল মাথা হেঁট করিয়া। সে মাথা না তুলিয়াই বলিল, "জামাই বাবুর বাড়ীর খবর সব ভাল রইছেন বাবু।"

"সে খবর কাল শুনবো, এখন আমার সঙ্গে একবার আয় দেখি।" বলিয়াই নরহরি দলু সিংকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমার হাত কামড়াতে ইচ্ছা হচ্ছে, দলু ভাই! হতভাগাটা যদি আর আধ ঘণ্টা আগেও আমাকে বলতো, তা হ'লেও হাওড়া পৌঁছিবার আগে যে কোনও ষ্টেশনে তাদের আমি আটক করাতুম।"

"এখন কি আর হয় না?"

দূর হইতে একটি যুবক নরহরিকে উক্ত প্রশ্ন করিল। সে দোলগোবিন্দেরই ভ্রাতুষ্পুত্র। নাম তার রমানাথ।

দোলগোবিন্দ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কত বেজেছে বল্‌তে পারিস্, রমা?"

তখন পার্শ্বের লোকদিগের মধ্যে কেহ বলিল, আটটা, কেহ বলিল, সাড়ে আট কেহ বা বলিল, সাড়ে আট অনেকক্ষণ

উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, শুকতারা পশ্চিমে চলিয়া পড়িয়াছে ; নটার কাছাকাছি।

রমা কিন্তু ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া একেবারে দীনু বাঙ্গালের লণ্ঠনের সমীপে উপস্থিত হইল এবং বাম হস্তের মণিবন্ধ আলোর সমীপে তুলিয়া বলিল, "আটটা এগারো মিনিট।"

একটি অতি ক্ষুদ্র কব্জী-ঘড়ী অলঙ্কার স্বরূপ তাহার মণিবন্ধে শোভা পাইতেছিল।

নরহরি শুনিয়াই প্রশ্ন করিলেন, "ষ্টাণ্ডার্ড না লোকাল ?"

রমানাথ বলিল, "লোকাল।"

দলু সিং বলিল, "গাড়ী ত তা হ'লে এখনো হাওড়ায় পৌছে নাই হে।"

এইবারে এক এক করিয়া যুবকের দলও সেই স্থানে উপস্থিত হইল।

চট্টরাজ-বংশের আর একটি ছেলে, নাম গতি, বলিয়া উঠিল, "আর গোমা পাসেঞ্জার ত ? পৌছুতে অন্ততঃ আধঘণ্টা লেট না ক'রে ছাড়বে না !"

দলু বলিল, "তা হলে ত এখনো সময় আছে, চট্টরাজ।"

"তুমি কি পাগল হয়েছ, দলু ভাই, গাড়ী হাওড়া ষ্টেশনে পৌছিবে, ষ্টাণ্ডার্ড টাইম আটটা কুড়ীতে।"

রমানাথ বলিল, "ঠিক পৌছুলেও এখনো তেত্রিশ মিনিট।"

"কিন্তু ষ্টেশন এখান থেকে পাকা তিনটি মাইল।"

গতি বলিয়া উঠিল, "গাড়ী ভারি লেট হয়, কাকা !"

এইবারে নরহরি কিঞ্চিৎ উষ্মার সহিতই বলিয়া উঠিলেন, "থাম্ জ্যেঠা ! যদি লেট না হয় ?"

সকলেই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল।

দলু বাবু সেই ক্ষণিক নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া নরহরিকে জিজ্ঞাসা করিল, "কর্ত্তব্য কি তা হ'লে এখন, চট্টরাজ ?"

"কর্ত্তব্য ত দেখছি আজকের রাত্রির মত চুপ। সময় মাত্র আধ ঘণ্টা। যেতে হবে তিন মাইল। ষ্টেশনে উপস্থিত হ'তে না হ'তে গাড়ী হাওড়ায় পৌছে যাবে। যদি অন্ততঃ আর পোনেরো মিনিটও সময় থাকতো—"

নরহরির কথা শেষ না হইতেই রমানাথ আবার বলিল, "আমাদের সঙ্গে সাইকেল আছে কাকা !"

"পোনেরো মিনিটের মধ্যে যেতে পারবি, রমা ?"

"খুব পারবো।"

গতি বলিল, "রমার অত সময়ও লাগবে না।"

ওই কথা শুনিবার সঙ্গে সঙ্গেই নরহরি ট্যাঁক হইতে দশ টাকার একখানা নোট বাহির করিয়া রমানাথের হাতে দিতে দিতে বলিলেন, "এই নে, তবে আর বিলম্ব করিস্ নি। সময় যদি থাকে দেখিস্, টেলিগ্রাম করিস্। দেখিস্, টাকাগুলো যেন জলে না যায়।"

"না কাকা, তা কেন যাবে ?" বলিয়া রমানাথ মালকোঁচা করিয়া কাপড় পরিতে আরম্ভ করিল। তাহাকে সাহায্য করিতে সঙ্গী যুবকগণ ক্ষিপ্রতার সহিত সাইকেল আনিয়া তাহার নিকটে উপস্থিত করিল।

নোটখানা বুকের পকেটে রাখিয়া রমানাথ সাইকেলের প্যাডেলে পা-টি যেমন দিয়াছে, অমনই মাথম বলিয়া উঠিল, "কি করতে যাবে, হুজুর ?"

"কি করতে, কি রে ?" বিস্ময়ের সহিত নরহরি জিজ্ঞাসা করিলেন।

মাথমের কথায় সকলেই অল্পবিস্তর বিস্মিত হইয়াছিল। রমানাথও দাঁড়াইয়া ছিল।

মাথম আর কোনও কথা কহে না দেখিয়া নরহরি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই কি মনে করেছিস্, ফুলীকে ফিরিয়ে আনতে পারব না !"

"তা পারবেক না কেন হুজুর, কিন্তু ফুলীর ভালবাসা ত ঘুবাতে নারবেন।"

এ কথায় সকলেই প্রথমটা স্তম্ভিতের মত হইল। কিন্তু মুহূর্ত্ত পরেই কিঞ্চিৎ উগ্রকণ্ঠে নরহরি বলিয়া উঠিলেন, "বেটা পাগল হয়েছে ! যা রে রমা, যদি টেলিগ্রামই করতে হয়, আর দাঁড়াস্‌নি।"

রমানাথ চলিল। আর মুহূর্ত্তের ভিতরে সকলেই দেখিল, রমানাথের সঙ্গে আরও পাঁচ ছয়টা সাইকেল ছুটিয়াছে।

নরহরি মাথমকে আর কিছু না বলিয়া তাহার ভগিনীকে বলিলেন, "যা ভাবি, তোর বোকা ভাইটেকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে যা।"

চলিতে চলিতে পথে দলু সিং নরহরিকে বলিল, "ছোট লোকের ব্যাপার, তুমি ভাই নরহরি, ওতে মাথা ঘামাতে যাচ্ছ কেন ? সে অজবা বেটা ফিরে এলে দু'দিন পরেই ওদের আপোষে মিল হয়ে যাবে।"

নরহরি বলিলেন, "আমি কি ওই মাথমা বেটার জন্যেই শুধু এতটা করছি! আমি চাই জব্দ করতে অজবাকে। বাগালি থেকে আরম্ভ ক'রে খাইয়ে পরিয়ে বেটাকে 'মানুষ' করেছিলুম, নেমকহারাম বেটা এক কথায় আমার চাকরী ছেড়ে মধু মামার মনিষ্যি করতে চ'লে গেল!"

"তা যা বলেছ, ভাই, মজুর কামীনের এখন বড়ই বাড় হয়েছে। রেলে আর কলে ব্যাটাদের মাথা এমন বিগড়ে দিয়েছে যে, হাজার দিয়েও তাদের মন পাওয়া যায় না। তবে—"

কথা কহিতে কহিতে দলুকে নিরস্ত হইতে দেখিয়া নরহরি জিজ্ঞাসা করিলেন, " 'তবে' বলে চুপ করলে কেন হে ভায়া?"

দলু বলিল, "কর বেটাকে জব্দ।"

গ্রামের যে সকল লোক সেখানে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই ফুলীর এই পলায়নকাহিনীর কেহ অনুকূল, কেহ প্রতিকূল সমালোচনা করিতে করিতে স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেল। থাকিবার মধ্যে ছিল মাত্র তিন চারি জন। তাহারা পানু কাপড়ীর হাত-লণ্ঠনের সাহায্যে নরহরির অনুগমন করিতেছিল। তাহাদের মধ্যে এক জন সুচাঁদ বাগ, দলু বাবুর অসমাপ্ত কথাটা সমাপ্ত করিতেই যেন নরহরিকে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন মিছে পয়সা খরচ ক'রে তাদের আনাতে যাচ্ছেন, ছোট বাবু? গাঁয়ের লোক দিন কতক ঘুমিয়ে বাঁচত।"

দলু বাবু সুচাঁদের কথা শুনিবামাত্র উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিল, "আমিও ওই কথাই বলতে যাচ্ছিলুম, চট্টরাজ!"

সুচাঁদ উৎসাহের উপর উৎসাহ যোগ করিয়া বলিল, "সকাল নেই, সন্ধ্যা নেই,—ছোট বাবু, আপনি ত গাঁয়ের খবর রাখবার বড় একটা সময় পান না।" বলিয়া সুচাঁদ চুপ করিল।

"ব্যাপারটা কি, দলু ভাই? আমি ত সত্যিই কিছুই জানিনে।"

"আর জিজ্ঞাসা ক'র না দাদা, তুমি ত বাড়ীতে সর্ব্বদা থাক না। ছোঁড়াগুলোর গানের জ্বালায় কান ঝালা-পালা হয়ে গেছে।"

[illegible] নরহরির ধান-চালের আড়ত ছিল। এই জন্য সপ্তাহের অধিকাংশ সময় তাঁহাকে সেই স্থানেই থাকিতে হইত। সত্য সত্যই গ্রামের সমস্ত সংবাদ জানিবার অবকাশ তাঁহার থাকিত না। সুতরাং বিস্মিতের মতই তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে হইয়াছে।

সুচাঁদ বলিল, "শুধু গান হ'লেও বাঁচতুম, ছোটবাবু, আ আ ই ঈ তারে নারে—সুর ভাঁজার জ্বালায় গাঁয়ের লোক অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।"

নরহরি জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি ওই বেটীবই জন্যে? হাঁ দলু বাবু?"

সুচাঁদ বাগ আরও কিছু বলিতে যাইতেছিল। দলু বাবু নরহরির কথায় উত্তর না দিয়া তাহাকে বলিল, "ও কথা ছেড়ে দে রে, বাগ।"

নরহরি ঈষৎ হাসির সুরে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওই ছেলেগুলোও সেই তানসেনের দল না কি?"

"আর ওর কথায় কান দিও না দাদা। তুমি যা ভাল বুঝবে—কর।" বলিয়াই দলু বাবু উচ্চহাস্যে বলিল, "তানসান হলেও নিস্তার ছিল দাদা। প্রত্যেকেই এক একটি সোরি মিঞা।"

ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া নরহরি বলিলেন, "সমস্তই বুঝতে পারলুম, সুচাঁদ। কিন্তু আজ আমার কাযে যাওয়াতেই ও বাক্তির এই বিপদ হয়েছে—"

সুচাঁদ বলিল, "তা বটে, ছোট বাবু, কিছু না করলে চিরকালের জন্য একটা কথা থেকে যাবে।"

"কথা থাকবার জন্যও নয় রে, ও ছোট জাত, দলু বাবু যা বললে, ওদের ও সব ব্যাপার ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। তবে আমি যদি কিছু না করি, এর পর মনিষ, মান্দার পাওয়া দুর্ঘট হবে।"

"না ছোট বাবু, বুঝতে পেরেছি।"

দলু বাবু বলিল, "এখন আমি আর চট্টরাজ দু'জনেই মুস্কিলে পড়ব। কর দাদা তুমি বেটাকে জব্দ।"

কিন্তু সে দিনও আর অজবাকে জব্দ করিবা[র] কোন উপায় হইল না। রাত্রি অনুমান দশটার সম[য়] রমানাথ ও তাহার সঙ্গীরা ষ্টেশন হইতে ফিরিয়া নরহরিকে সংবাদ দিল, পলাতকরা হাবড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হ[য়] নাই। তাহারা বোধ হয়, পথিমধ্যে কোন ষ্টেশনে নামি[য়া] গিয়াছে।

৫

ফুলী—ফুলকুমারী! দুই এক দিন নহে, চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বে মাথমের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইয়াছিল। মাথমের পিতা নীলু বাউরী ছিল তাহাদের স্বজাতির মধ্যে মাতব্বর। পুত্রের বিবাহে সে তাহার জাতির হিসাবে যথেষ্ট ব্যয় করিয়াছিল। সত্যই হইয়াছিল বাউরীদের মধ্যে তাহা এক সমারোহের বিবাহ। তিন চারি দিন "নাচনী'র নাচ, পচাই ও ভোজ—নীলু একমাত্র পুত্রের জন্য অনুষ্ঠানের সামান্যমাত্র ত্রুটি করে নাই। ভাল "নাচনী'র নাচ দেখিতে আসিয়া গ্রামের প্রায় সমস্ত ভদ্রলোকই এই বিবাহের সাক্ষী হইয়াছিলেন।

যখন তাহাদের বিবাহ হইয়াছিল, তখন ফুলকুমারীর বয়স ছিল নয় বৎসর, মাথমের পোনেরো।

অবিচ্ছিন্ন ভাবে না হইলেও অনেকদিন ফুলকুমারী শ্বশুরের ঘর করিয়াছে। মাঝে মাঝে ক্রিয়াকলাপে দুই দশদিনের জন্য সে তাহার পিত্রালয় জুনবেদেয় যাইত মাত্র। অতি নিম্নশ্রেণীর বলিয়া হাট-বাজারে গতায়াতে তাহার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিলেও তাহার শ্বশুর-শ্বাশুড়ী তাহাকে বড় একটা গৃহের বাহির হইতে দিত না। তাহার প্রতিবেশিনী অন্যান্য বাউরী-কন্যারা যেরূপ কখন বাঁকুড়ায়, কখন গ্রামের এর ওর তার বাড়ীতে "কামীনের" কাযে স্বতন্ত্রভাবে অর্থোপার্জ্জন করিত, যত দিন শ্বশুর-শ্বাশুড়ী বাঁচিয়া ছিল, তত দিন ফুলকুমারী সেরূপ কায করিবার অধিকার পায় নাই। দুই বৎসর পূর্ব্বে কলেরা রোগে দুই একদিনের ব্যবধান মধ্যে হঠাৎ তাহার শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর মৃত্যু হইল। কন্যারও ওই রোগে জীবন যাইবার আশঙ্কায় ফুলীর পিতা তাহাকে লইয়া স্বগৃহে পলায়ন করিল।

এক বৎসর ফুলকুমারী আর শ্বশুরগৃহে আইসে নাই। পিতামাতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নিষ্পন্ন করিয়া, দুই চারিদিন পরে ঘরে চাবি দিয়া মাথমও জুনবেদেয় চলিয়া গেল। এক বৎসর কাল মাথম শ্বশুরগৃহেই বাস করিল।

পিত্রালয়ে আসিবার অল্পদিন পরেই ফুলকুমারী "কামীনের" কায আরম্ভ করিয়াছিল। বাউরীকন্যা, যখন সে কায করিবার উপযুক্ত হইয়াছে, কেন সে উদরান্নের জন্য বাপ-মার গলগ্রহ হইয়া থাকিবে? তাহার পিতামাতারই বিশেষ আগ্রহে সে মজুরী-বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল।

এইবার সে শ্বশুর-গৃহের পিঞ্জর হইতে বাহির হইয়া পিতৃগৃহের স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল। প্রতিবেশিনী সঙ্গীদের সঙ্গে বাঁকুড়ার ধানকলে, তামাকের আড়তে, ইঁটখোলায় কায করিবার জন্য জুনবেদে হইতে সহরে অনেকবার যাতায়াত করিয়াছিল।

এই যাতায়াতের ফলে তাহার চোখ অনেকটা ফুটিয়াছিল, বাহিরের লোকের সঙ্গে মুখ তুলিয়া কথাবার্ত্তায় কুলবধূর যে লজ্জা-সঙ্কোচ, সেটা গিয়াছিল। তখন সে পথচারী যে কোন পুরুষের সঙ্গে অসঙ্কোচে কথা কহিতে পারিল, এমন কি তাহাদের হাস্য-পরিহাসে উত্তর-প্রত্যুত্তররূপে হাস্য-পরিহাসে যোগ দিতেও সে আর পূর্ব্বের মত লজ্জাবোধ করিত না।

সে মসী-বর্ণা ছিল। কিন্তু তাহার দেহের গঠন, তাহার মুখ, নাক, তাহার গ্রীবার ভঙ্গিমা, বিশেষতঃ, দীঘির কালোজলের উপর ভাসিয়া উঠা প্রস্ফুটিত পদ্মের মত তাহার দুইটা চক্ষু এই অসিতাঙ্গীর রূপকে এমন একটি বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছিল যে, যখন সে প্রাতঃকালে স্নানাহার নিষ্পন্ন করিয়া মুক্তকেশ পৃষ্ঠে ছড়াইয়া তাহারই সমবয়সী মেয়েদের সঙ্গে গান গাহিতে গাহিতে কাযে যাইত, তখন পথে অনেকেরই দৃষ্টি তাহার প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারিত না।

এই সময়ে অজবার সহিত তাহার দেখা হইয়াছিল। অজবা রেলের মাটীকাটা উপলক্ষে তখন মাধববাটী হইতে বাঁকুড়ায় আসিত। প্রায় একই সময়ে অজবার ও মাথমের বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু তাহার স্ত্রী বিবাহের পর অধিক দিন জীবিত ছিল না। স্ত্রীর মৃত্যু হইলে সে একটা সাঙ্গা করে। সেই সাঙ্গার স্ত্রীরও কয় মাস পূর্ব্বে মৃত্যু হইয়াছিল। গ্রামের বধূ—কাযেই স্বামীর এই বন্ধুর কাছে পূর্ব্বেই ফুলী পরিচিতা ছিল। কিন্তু তথায় সে কখনও অজবার সঙ্গে আলাপ করিবার সুযোগ লাভ করে নাই। এখন পিত্রালয়ে তাহার সে ভাব ছিল না। তাহার উপর বাড়ীর বাহিরে কাযে প্রবৃত্ত হইয়া পুরুষদের সঙ্গে আলাপের সঙ্কোচও দূর হইয়া গিয়াছিল। এই অবস্থায় অজবার সঙ্গে তাহার যখন প্রায়ই দেখা হইত, তখন প্রথমে অজবার স্ত্রীবিয়োগ উপলক্ষ করিয়াই উভয়ে আলাপ আরম্ভ হয়। আলাপ ক্রমে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হইয়াছিল। পথিপার্শ্বে উভয়ের হাস্য-পরিহাস যে কোন দিন ফুলকুমারীর সঙ্গিনীদিগের দৃষ্টিপথে পতিত

হয় নাই, এমনও নহে। তথাপি তাহার চরিত্রের বিরুদ্ধে কথা বলিবার মত কায তাহার আত্মীয়গণের মধ্যে কেহ তাহাকে করিতে দেখে নাই। মাখম ত দেখেই নাই, শুনেও নাই। শ্বশুরগৃহে আশ্রয় লইয়া সে তাহার স্ত্রীর তৎপ্রতি অনুরক্তির কিছুমাত্র লাঘব অনুভব করে নাই, বরং স্ত্রীকে মুক্ত করিয়া অর্থসম্বন্ধে সে বিশেষ লাভবানই হইয়াছিল। দুই জনে সমানভাবে খাটিয়া অল্পদিনের মধ্যে তাহারা দু'পয়সার সঞ্চয় করিয়াছিল। জাতিগত স্বাধীনতায় ফুলকুমারীর উক্তরূপ আনন্দের আচরণ তাহাদের সমাজে দোষ বলিয়া গণ্য হইত না।

এইরূপভাবে প্রায় এক বৎসর সে তাহার পিতৃগৃহে বাস করিয়াছিল। এই এক বৎসরের মধ্যে খুড়া অটল ও তাহার একমাত্র কন্যা ভাবিনীর তত্ত্ব লইতে মাখম অনেকবার মাধববাটীতে আসিয়াছিল, ফুলকুমারী আইসে নাই। আসিবার জন্য স্বামীর মুখে ভাবিনীর অনুরোধের কথা অনেকবার সে শুনিয়াছিল, কিন্তু সে অনুরোধ রাখে নাই, অথবা তাহার মা-বাপ রাখিতে দেয় নাই। একান্নবর্ত্তী হইয়া থাকায় তাহাদের অবস্থিতিতে ফুলকুমারীর বাপের সংসারখরচ সম্বন্ধে অনেকটা সুবিধা হইয়াছিল।

শ্বশুর-গৃহে বাস করায় মাখমের বিশেষ কোনও অসুবিধা না থাকিলেও একটা অভাব সে নিত্য অনুভব করিত। তাহার স্বতন্ত্র বাসগৃহ ছিল না। বৎসরের শেষে যখন জুনবেদেয় বাস তাহার সাব্যস্ত হইয়া গেল, তখন তাহার স্বতন্ত্র গৃহেরও প্রয়োজন হইল।

মাধববাটীর ঘর লোকাভাবে অনেকটা জীর্ণ হইলেও তখনও ভাঙ্গিয়া ভূমিসাৎ হয় নাই। গৃহনির্ম্মাণ করিতে যে সকল সাজ-সরঞ্জামের প্রয়োজন, তাহার অনেকাংশ তাহার পুরাতন ঘর হইতে পাইবার সম্ভাবনা জানিয়া মাখম এক দিন মাধববাটীতে চলিয়া গেল।

ইহারই কিছুদিন পূর্ব্বে মধুসূদন পরীক্ষা ওরফে মধুপর্থে নরহরি চট্টরাজের বহুকাল হইতে নিযুক্ত মনিষ অজবাকে ভাঙ্গাইয়া লইয়াছিল। সম্মুখে বর্ষা, চাষের জন্য এক জন কর্ম্মক্ষম মনিষের একান্ত প্রয়োজন। চট্টরাজ মহাশয় কয় দিন ধরিয়া উক্তরূপ মনিষের অনুসন্ধান করিতেছিলেন।

মাখমের আর জুনবেদেয় ঘর করা হইল না। অটলের—বিশেষতঃ ভাবিনীর অনুরোধে মাখম চট্টরাজ মহাশয়ের নিকট হইতে উপযুক্ত দাদন গ্রহণ করিয়া তাঁহার গৃহে চাক্‌রী স্বীকার করিল। তাহার স্ত্রী ফুলীর জন্যও সে চাষের সময়ে যথোপযুক্ত "বেরুণ" পাইবার আশ্বাসে দাদন গ্রহণ করিল। গ্রহণ করা ভিন্ন মাখমের অন্য উপায় ছিল না। চট্টরাজ মহাশয়দের চাকরাণ জমীতে বাস, চাকরী স্বীকার না করিলে ঘর ভাঙ্গিয়া অন্যত্র লইয়া যাইতে তাহার অধিকার ছিল না।

অগত্যা ফুলী স্বামীর সঙ্গে বহুদিনের পর আবার শ্বশুরের ঘরে প্রবেশ করিল।

৬

দলুবাবু নরহরিকে যতটা বলিয়াছিল, ততটা না হইলেও ফুলীর মাধববাটীতে পুনরাগমনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের যুবকদের মধ্যে গানের চর্চ্চাটা হঠাৎ কিছু বেশী হইয়া পড়িয়াছিল। শুধু গান বলা ঠিক হয় না, অধিকাংশ সময় চর্চ্চা হইত সুরের, অর্থাৎ "তানা নানা তেরে নারে। সুর কখন উঠিত ছত্রী বাবুদের "বড়মেলার" রোয়াকে, কখন উঠিত "মনসা-মেলার" প্রাঙ্গণে, কখন পথে, কখন মাঠে, কখন বা গাঙ্গলিগোড়ের পার্শ্বস্থিত পরখদের আম্রকাননে। তাহার সময়ের কোনরূপ স্থিরতা ছিল না—কখনও প্রভাতে, কখনও সন্ধ্যায়, কখন বা গভীর রাত্রিতে।

শ্বশুরগৃহে আসিয়া ফুলী এবার আর ঘরে আবদ্ধ থাকে নাই। সে কায করিতে যাইত। সে কখন স্বামীর সঙ্গে, অধিকাংশ সময় ভাবিনী প্রভৃতি প্রতিবেশিনীদের সঙ্গে এখানে সেখানে যাইতে লাগিল। তাহাকে দেখিয়াই হউক, কিম্বা অন্য যে কারণেই হউক, 'ভদ্র'গৃহের দুই একটি নিষ্কর্ম্মা যুবক এ সময় সত্য সত্যই একটু অস্বাভাবিক ভাবে উল্লসিত হইয়াছিল। সেই উল্লাসের ফলে গ্রামবাসীরা কিছুদিন হইতে কিছু বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল।

তথাপি ফুলীর বিরুদ্ধে কথা কহিবার মত কায কেহ তাহাকে করিতে দেখে নাই।

জাতির অস্পৃশ্যতাই হউক, অথবা উচ্চবর্ণের উপর আন্তরিক বিদ্বেষই হউক, বর্ম্মস্বরূপ হইয়া এই বাউরী-কন্যার বিপদ হইতে আত্মরক্ষার সহায় হইয়াছিল।

সুতরাং অজবার সঙ্গে ঐরূপ অতর্কিতভাবে ফুলীর পলায়ন গ্রামবাসীদের পক্ষে অনেকটা বিস্ময়ের বিষয় হইয়া পড়িয়াছিল।

কখন, কি ভাবে, কেমন করিয়া উভয়ে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল, অন্য লোকের কথা দূরে থাকুক, তাহাদের স্বজাতীয়ের মধ্যেও কেহ তাহা বুঝিতে পারে নাই। এমন কি, ভাবিনী পর্য্যন্ত তাহা বুঝে নাই। অজবা ছিল মাখমের বাল্যবন্ধু। সেই বন্ধুত্বের সূত্র ধরিয়া কার্য্যাবসরে সন্ধ্যার পর অনেক সময় সে মাখমের ঘরে অতিবাহিত করিত।

অনেকক্ষণ ধরিয়া দুই বন্ধুতে কথাবার্ত্তা, গল্পগুজব, হাস্য-পরিহাস চলিত বটে, কিন্তু তাহাতে মাখম অথবা অজবার উপর অসন্তুষ্ট হইবার অনেক কারণ থাকিলেও, ভাবিনী ফুলীকে দোষ দিবার কিছু দেখিতে পাইত না। সুতরাং ফুলীর সেই দুর্ব্বোধ্য আচরণে সে প্রথমটা স্তম্ভিতেরই মত হইয়া গিয়াছিল।

মাখম ঘরে ফিরিতেই ভাবিনী একটু রাগের স্বরে বলিল, "ও তুই গাড়োলের মত মনিবকে কি বল্লি দাদা? বউকে ফিরিয়ে আন্‌লে তুই কি তাকে ঘরে নিবি নে?"

মাখম এই কথার কোনও উত্তর না দিয়া বলিল, "ঘরে ভাত রইছে?"

"বউকে আমি তত দোষ দিই না, যত দোষ দিই তোকে।"—বলিয়াই সে অজবার উদ্দেশে কতকগুলা তীব্র ভাষা প্রয়োগ করিয়া সেই দুষ্টটাকে নানাভাবে প্রশ্রয় দিবার জন্য ভাইকে একটু নির্ম্মম ভাবেই তিরস্কার করিল।

মাখম বলিল, "কিছু খাবার থাকে ত দে, ভাবি, নইলে আমি কবাট দিয়ে শুয়ে পড়ি।"

"ভাত ত রইছে। তোকে যে তখন খাবার লেগে কত সাধলুম।"

"আর সাধতে হবে না, বড় খিদে লেগেছে রে বোন্।"

আর কোনও কথা না বলিয়া ভাবিনী কেবল বলিল, 'তা হ'লে টুক্‌চে অপিক্ষে কর, আমি চ'লে গেলে আবার ঘরে কপাট দিস্‌নে।"

ভাবিনী প্রস্থান করিল। মাখম দুই হাঁটুর ভিতরে মাথা রাখিয়া দাওয়ার উপর উপবেশন করিল।

অল্পক্ষণ মাত্র সে বসিয়াছে, এমন সময় অটল আসিয়া তাহাকে ডাকিল, "মাখমা!" দাওয়ার অন্ধকারে বসা মাখমকে প্রথমটা সে দেখিতে পায় নাই। দ্বিতীয়বার তাহাকে সম্বোধন করিতে গিয়া তাহাকে সে উক্তভাবে উপবিষ্ট দেখিল। দেখিয়াই মাখমকে আশ্বাস দিতে সে একটু উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, "ভয় কি রে! আমি দুই মনিবকেই শুনিয়ে বলেছি, অজবা বেটাকে যদি শাসন না কর, হুজুর, তা হ'লে নিশ্চয় বল্‌ছি, খুড়োভাইপোয় আমরা গাঁ ছেড়ে চ'লে যাব। আমরা আর দেবতার পর্য্যন্ত খাতির রাখবনি—হঃ! মাগন ক'রে খেতে হয়, তাও বি আচ্ছা—হঃ।"

এই সময় ভাতের থালা হাতে পশ্চাৎ দিক্ হইতে ভাবিনী আসিয়া অটলকে বলিল, "যা রে বাবা, তোরও ভাত বেড়ে রেখে এলুম, খেয়ে নিগে যা। রাত ঢের হইচে।"

ক্রোধের সমস্ত লক্ষণ "হঃ হঃ" শব্দের উপর নিক্ষেপ করিতে করিতে অটল নিজের ঘরে চলিয়া গেল। তাহারও পেটে জ্বালা ধরিয়াছিল। মাখমের উত্তর শুনিবার, কিম্বা তাহার কথায় সে সন্তুষ্ট কি অসন্তুষ্ট হইল, বুঝিবার ধৈর্য্য তাহার রহিল না। মাখম কিছুই বলিল না।

সেই দাওয়ারই উপরে ভাতের থালা রাখিয়া ঘরের মধ্য হইতে জল আনিয়া, দাদাকে আহার করিতে অনুরোধ করিয়া ভাবিনী তাহার সম্মুখেই উপবিষ্ট হইল—আর সেই অপ্রিয় প্রসঙ্গের উত্থাপন করিতে সাহস করিল না। মাখম কিন্তু আহার করিতে করিতে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "আর তাকে ফিরিয়ে আনা কি উচিত হয় রে, ভাবি?"

"উচিত হবে না কেন রে? ঘরের বউ, একটা ভুলই না হয় ক'রে ফেলেছে! সেটা কার দোষে এখনও যখন বুঝতে পার্‌ছি না, তখন ও রকম কথা কস্‌নি, দাদা। আমি একবার দেখতে পেলেই চুলের মুঠি ধ'রে হতচ্ছাড়ীকে ঘর্‌কে নিয়ে আস্‌বো।"

"আমি যে তার মুখের দিকে আর চাইতে নারব রে!"

"দেখ, ভাই, অসটা কথা কস্‌নি, আমার ভালো লাগছে না।"

"ভাল, বোন্, পারিস্ ত নিয়ে আয়।"

চট্টরাজ মহাশয়ের মত লোক যখন তাহাদের বউকে ফিরাইয়া আনিবার আশ্বাস দিয়াছেন, তখন সে যে কেন আসিবে না, ভাবিনী বুঝিতে পারিল না। ফুলকুমারীর ফিরিয়া আসার ধ্রুব বিশ্বাসে সে কেবল বলিল, "এলে যেন বউকে মারধর করিস্‌নি, দাদা!"

"কবে আমি তাকে মারধর্ করেছি?"

"করিস্ নি ত জানি। কিন্তু হতভাগীর ওপর এমন

রাগ হচ্ছে দাদা, যে, দেখতে পেলে তাকে আমারই ঝাঁটা মারতে ইচ্ছে হচ্ছে।"

"পারিস্ ত নিয়ে আয়। কিন্তু—" বলিয়া মাখম কিছুক্ষণের জন্য চুপ করিয়া রহিল।

"কিন্তু কি দাদা ?"

"আমি তার মুখের দিকে আর যে চাইতে পারব না, ভাবি !"

এ কথার উপরে ভাবিনীও কিছুক্ষণের জন্য কথা কহিতে পারিল না। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া সে বলিল, "মেয়েলোকের বুদ্ধি, দাদা, তোকে ক্ষমা ঘেন্না করতে হবে।"

"ভালা, তাকে নিয়ে আয়।"

৭

কিন্তু কে তাহাকে লইয়া আসিবে ?

রমানাথ, গতি ও অন্যান্য যুবক স্থির করিয়াছিল, অজবাকে ধরিতে পারিলে, তাহাকে একবারে যমের বাড়ীতে না হউক, অন্ততঃ তাহার একরশী দূরে নিক্ষেপ করিয়া আসিবে।

কিন্তু হায়, অজবার কোনও সন্ধান না পাইয়া ভগ্নোদ্যম হইয়া তাহারা ষ্টেশন হইতে রাত্রি অনুমান দশটার সময় ঘরে ফিরিয়া আসিল। নরহরি বুঝিলেন, তাঁহার কতকগুলি টাকার শ্রাদ্ধ হইল মাত্র। মাখম রমাই বাবুর অকৃতকার্য্যতার কথা পরদিন শুনিল, ভাবিনীও শুনিল।

শুনিয়া মাখম অন্তরের ভাব কিছু মাত্র প্রকাশ না করিলেও ভাবিনী কোনও মতে রোদন সংবরণ করিতে পারিল না। ফুলী যাহাই হউক, সে তাহাকে ভালবাসিত। প্রায় বৎসরেক কাল সে ফুলকুমারী হইতে বিচ্ছিন্ন ছিল। বউকে লইয়া ঘরে ফিরিতে সে দাদাকে কম অনুরোধ করে নাই। তাহার বিশ্বাস, অন্যের কথায় না হউক, শুধু তাহারই অনুরোধ ঠেলিতে না পারিয়া, তাহার দাদা তাহার ভ্রাতৃজায়াকে লইয়া জুনবেদে হইতে মাধববাটীতে আসিয়াছে।

সত্যসত্যই পরদিন প্রায় সমস্ত দিন ধরিয়াই সে কাঁদিল এবং অজবার উদ্দেশে ও তাহার মা ও আত্মীয় স্বজনকে শুনাইয়া যত পারিল গালি দিল।

মাখম ও অজবা উভয়েই ছিল পরীক্ষাদের প্রজা। নরহরি মাতামহের সূত্রে পরীক্ষাদের সম্পত্তিতে অধিকারী হইয়াছিলেন। সুতরাং অজবার উপর প্রভুত্বে মধু পরীক্ষার মত তাঁহারও অধিকার ছিল।

তাঁহার চাকরী ছাড়িয়া যে দিন অজবা মধু পরীক্ষার চাকরী গ্রহণ করিল, সেই দিন হইতেই নরহরি তাহাকে মর্য্যাদার অনুরোধে শাসন করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। মাখমের জন্য তাঁহার ভাবনা যতটা না ছিল, তাহার অনেকগুণ ভাবনা হইয়াছিল, তাহার ভগিনী ভাবিনীর।

গাঙ্গলিগোড়ের দুই দিকে ছিল উচ্চভূমি। একদিকে বাস করিত মাখম ও তাহার খুড়া অটল, অপর দিকে অজবা। গাঙ্গলিগোড়ে একটি অনতিবৃহৎ জলাশয়। গ্রামের অন্যান্য ক্ষুদ্র পুষ্করিণীগুলা যেমন জলশূন্য হইত, এটা সেরূপ না হইলেও ইহার জল এত নীচে নামিয়া যাইত যে, দুই পাড় পরস্পর হইতে দশ বারো হাত ব্যবধান থাকিত মাত্র। এক দিন—দুই দিন—তিন দিন, যখন অজবা ও ফুলকুমারীর কোনও সংবাদ কেহই তাহাদের আনিয়া দিতে পারিল না; তখন বাসন মাজার উপলক্ষে একদিকে বসিয়া ভাবিনী ও অপর দিকে বসিয়া অজবার মা ও ভগিনী—এক জন অজবার নাম লইয়া, অন্য দুই জন ফুলীকে উপলক্ষ করিয়া, সর্ব্বশেষে পরস্পরে গালাগালি আরম্ভ করিল।

মাসখানেক সময় এই ভাবেই কাটিয়া গেল। মাঘের শেষ ফাল্গুনের আরম্ভ। গ্রামের ক্ষেত্রের কার্য্য ধানকাটা এই সময় একরূপ শেষ হইয়া যায়। যাহারা মনিবদের বাঁধা মুনিষ, তাহারা ভিন্ন গ্রামের প্রায় অধিকাংশ বাউরীই এই সময় রোজগার করিতে "নামাল" চলিয়া যায়। "নামাল" অর্থে নিম্নভূমি—হুগলী, চুঁচুড়া, চন্দননগর প্রভৃতি স্থানকে ইহারা নামাল বলিয়া থাকে। সে সব স্থানে মাঘ ফাল্গুন হইতে আষাঢ়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহারা নানা কাযে অর্থোপার্জ্জন করে; বর্ষা আরম্ভ হইবার কিছু পূর্ব্বেই মাঠের কাজে নিযুক্ত হইবার জন্য আবার গ্রামে ফিরিয়া আইসে। যাইবার সময় তাহারা স্ত্রীপুত্রদিগকে সঙ্গে লইয়া যায়। কঠোর পরিশ্রম করিতে যাহারা অশক্ত, পুরুষ অথবা স্ত্রী, অধিকাংশ সময়েই বুড়া ও বুড়ী, তাহারাই কেবল ঘর আগুলিবার জন্য গ্রামে থাকে। সে বৎসর গ্রামে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে শস্য হয় নাই। এই জন্য মাঘ শেষ হইতে না হইতেই বাউরীদের মধ্যে অনেকেরই নামাল যাইবার প্রয়োজন হইল।

মাখম ছিল নরহরির সংবৎসরের বাঁধা মনিষ। তাহার গ্রাম ছাড়িবার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু অটলের না ছাড়িলে চলিবে না। সে দলু বাবুর মনিষ বটে, কিন্তু সারা বছরের জন্য বাঁধা ছিল না।

ভাবিনী ছিল অটলের একমাত্র কন্যা—বিধবা। তাহাদের জাতির প্রথা অনুসারে "সাঙ্গা" করিবার যথেষ্ট বয়স থাকিলেও, সে দ্বিতীয় পতি পরিগ্রহ করে নাই। তাহার মা জীবিত ছিল না; পুত্র-কন্যাও ছিল না। ছিল মাত্র এক পিসী—অটলের অপেক্ষা সে বড়।

সেই পিসীকে ঘরে রাখিয়া ভাবিনী তাহার পিতা ও অন্যান্য বাউরি ও বাউরীণীদের সঙ্গে নামাল চলিয়া গেল। আশ্চর্য্যের কথা, সমস্ত কলহ ধামা-চাপা দিয়া অজবার ভগিনী পস্‌নি (প্রসন্ন) ও তাহার স্বামী কৃত্তিবাস ওরফে কিতে বাউরীও ভাবিনীর সঙ্গে চলিল। অপ্রসন্ন কেহই নহে, যেন কোনও কালে তাহাদের ভিতরে কোনও মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয় নাই।

যাইবার সময় মাখমকে সে বুঝাইয়া গেল, ফুলী যদি একান্তই না ফিরে, তাহা হইলে ছাতার কানালী গ্রামে শ্বশুরঘরে তাহার যে এক অল্পবয়সী বিধবা ননদ আছে, নামাল হইতে ফিরিয়া সে তাহার সহিত মাখমের সাঙ্গা করাইয়া দিবে।

৮

তিন মাস দেখিতে দেখিতে অতিবাহিত হইয়া গেল। বর্ষা আসিতে আর বড় বিলম্ব নাই। আর দশ বারো দিনের ভিতরেই বাউরীর দল, স্ত্রী-পুরুষ সকলেই গ্রামে ফিরিয়া আসিবে। ফুলকুমারীকে উপলক্ষ করিয়া গ্রামের মধ্যে দুই দশ দিন যে একটু উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা নিবিয়া গেল। সমাজের অতি নিম্ন স্তরের এই হীন কথা লইয়া উচ্চশ্রেণীর জনগণের মধ্যে যতটা আন্দোলন হওয়া সম্ভব, সমস্ত শেষ হইয়া গিয়াছে। পাড়ায় পাড়ায় সময়ে অসময়ে যে সুরের উচ্ছ্বাস উঠিত, তাহাও যেন ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া, ভবিষ্যতের গল্পের বিষয়ে পরিণত হইবার উপক্রম করিয়াছে। ফুলীকে ফিরাইবার মত্ত মাখমের বিশেষ আগ্রহ দেখিতে না পাইয়া, আর ফুলীর অভাবে তাহার কার্য্যে বিশেষ অনাস্থা না দেখিয়া, নরহরিও অজবাকে যথোপযুক্ত শাস্তি দিবার সঙ্কল্প হইতে নিরস্ত হইয়াছেন। সমস্ত গ্রামটার ভিতরে মর্ম্মবেদনা লইয়া পড়িয়া আছে, এক দিকে মাখম, অন্যদিকে অজবার মা। অবিশ্বাসিনী স্ত্রীর জন্য মাখম যতটা মনোব্যথাই ভোগ করুক না কেন, সেই অভাগীর অপরাধের জন্য অজবার মা এই দীর্ঘ তিন মাস এক মাত্র পুত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বড় অল্প মানসিক যন্ত্রণা অনুভব করিতেছে না।

এই তিন মাসের মধ্যে অজবার মা বহুবার তাহার পুত্রের প্রভু মধু পরীক্ষার কাছে কাঁদিয়া আসিয়াছে। মধু আশ্বাস দিয়াছে, তাহার পুত্র যেখানেই থাকুক না, সন্ধান পাইলেই সেই স্থান হইতে তাহাকে ধরিয়া আনিবে। শুধু তাহাই নহে, মধু ঠাকুর বলিয়াছে, অজবা ফিরিলে চট্টরাজরা যদি তাহার উপর অত্যাচার করিতে যায়, সে হাইকোর্ট পর্য্যন্ত দেখিয়া লইবে।

কিন্তু এই তিন মাসের মধ্যে কেহ জানিতে পারিল না, অজবা ও ফুলী কোথায়? যাহারা নামাল গিয়াছিল, তাহারা উভয়কে খুঁজিয়াছে। সন্ধান পাইলে নিশ্চয়ই গ্রামে খবর আসিত।

অজবার মা, বিশেষতঃ মধু পরীক্ষা নিজে বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল। ইহার মধ্যে একটা বেশ বড় রকমের বৃষ্টি হইয়া চাষের "বতর" হইয়া গেল। চট্টরাজের জমীর প্রায় বার আনা জমীতে লাঙ্গল দেওয়া হইল। তাহার একবিঘা জমীতেও এখন লাঙ্গল পড়িল না! অথচ এখন নূতন মনিষ পাওয়া বড়ই দুর্ঘট। গ্রামের লোক পূর্ব্ব হইতেই কোথাও না কোথাও "কাঁকড়া" লইয়া আবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং অজবার সন্ধান গ্রামের সকলের অপেক্ষা মধু পরীক্ষারই বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

মধ্যে বেশ আর একটা বৃষ্টি হইয়া হলকর্ষণের আর একটা সুযোগ হইল। এবারও "বতর" যদি উত্তীর্ণ হইয়া যায়, তাহা হইলে মধু পরীক্ষার জমীর পক্ষে বিলক্ষণই ক্ষতি হইবে। ব্রাহ্মণ, মনিষের জন্য বিশেষ ব্যাকুল হইয়া পড়িল।

বৃষ্টির পর দুই চারিদিনের রৌদ্রে ক্ষেত্র যখন ঈষৎ শুষ্ক হয়, তখনই তাহা হলচালনের উপযোগী থাকে। ইহাকেই পশ্চিমবঙ্গে বলে "বতর" এবং পূর্ব্ববঙ্গে বলে "যো"।

চট্টরাজের অবশিষ্ট ক্ষেত্র কর্ষণের জন্য মাখমও সেই

শুষ্কতার প্রতীক্ষা করিতেছিল। দুই দিন সে একরূপ নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রামসুখ ভোগ করিল। তৃতীয় দিবসে আবার তাহাকে লাঙ্গল ধরিতে হইবে।

দ্বিতীয় দিবসের সন্ধ্যার পর কাজ করিবার কিছু না থাকায় ঘরের দাওয়াটিতে বসিয়া মাখম গান গাহিতেছিল। তাহার প্রতিবেশীদের মধ্যে সকলে তখনও ফিরে নাই। তাহার নিজের 'বাকুলে'র মধ্যে এক দিকে ছিল অটলের ঘর আগুলিয়া তাহার পিসী; অপর দিকে ছিল একমাত্র সে। আর কেহ থাকিলে বলিতে বাধ্য হইত, গত তিন মাসের মধ্যে একটি দিনের জন্যও মাখম এরূপ প্রফুল্লতা লইয়া উপবিষ্ট হয় নাই।

তাহার প্রফুল্লতার বিশেষ কারণ ঘটিয়াছিল। ফুলীর চলিয়া যাওয়ার পর একটি দিনের জন্যও সে নেশা করে নাই! আজ সে করিয়াছে। মনিবের ঘর হইতে সকাল সকাল বিদায় লইয়া পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের শুঁড়িখানা হইতে এক পেট "পচাই" পান করিয়া সে ঘরে ফিরিয়াছে।

বাউরী জাতের মধ্যে ওই একটা প্রচণ্ড অস্বস্তি—পানদোষ, যাহার জন্য মজুরীতে যথেষ্ট পয়সা পাইয়াও তাহাদের দারিদ্র্য ঘুচে না, সেটা পূর্ব্বে মাখমের ছিল না; তাহার বাপ মা জীবিত থাকিতে একবারেই ছিল না। শ্বশুরগৃহে অবস্থান কালে বিবাহাদি দুই একটা উৎসবে সেই স্থানের সমবয়স্কদের অনুরোধে দুই একবার সে পচাই পান করিয়াছিল বটে, কিন্তু সে "কালে-ভদ্রে"।

তাহার স্বগৃহে ফিরিয়া আসার পর তাহার সাঙ্গাৎ ওই অজবা তাহাকে মদ্যপানে প্রবৃত্ত করিয়াছিল। মাঝে মাঝে সে মাখমকে কদ্‌মাহাটির পচাইখানায় ধরিয়া লইয়া যাইত। এইরূপে অল্পে অল্পে সে তাহার বন্ধুকে মদ্যপানে অনেকটা অভ্যস্ত করিয়াছিল।

তথাপি মাখম তাহার সাঙ্গাতের মত বদ্ধ-মাতাল ছিল না, মদ্যপান অজবার নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্য ছিল, মাখম কোনও দিন সেরূপভাবে মদ্যপান করে নাই। বিশেষতঃ ফুলকুমারীর চলিয়া যাওয়ার পর হইতে আজিকার পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত সে মদ্য স্পর্শও করে নাই। আজ করিয়াছে। শুধু স্পর্শ করা নহে—আজ সে পচাই পূর্ণমাত্রায় পান করিয়াছে, অর্থাৎ যতক্ষণ তাহার পেটে ধরিয়াছে। কেন সে এরূপ করিল, তাহার কারণ নির্ণয়ের লোকও সে সময় পাড়ায় বড় একটা কেহ ছিল না। নেশায় বিভোর হইয়া টলিতে টলিতে মনে মু[খে] যাহা আসিয়াছে, গাহিতে গাহিতে সে আজ ঘরে ফিরিয়াছে।

পথে আসিবার সময় দোকানী সুচাঁদ বাগ তাহ[ার] এই বিশেষ স্ফুর্ত্তি দেখিয়া তাহার দোকান হইতেই জিজ্ঞা[সা] করিয়াছিল, স্ফুর্ত্তির একটা কারণ অনুমান করিয়া—"বউএ[র] সন্ধান পেয়েছিস্ নাকি রে মাখম?"

"হঃ, বাগ খুড়া—নমস্কার।"

"কোথায় রে?"

"সেইটি বল্‌তে লারব, খুড়া!"

"কেন লার্‌বি, বল্, মধু পর্‌খে তার মনিষের লে[গে] পাগলের মত ঘুরে বুল্‌ছে।"

"বুল্‌চেক বইকি খুড়া, দু'টা দু'টা বতর গেল—জমী[তে] হাল পড়লো না। মন থির রইবেক লাতো!"

"জেনে থাকিস্ ত বল্। পর্‌খে ঠাকুরকে আ[মি] খবর দি।"

ইহার উত্তরে মাখম গান ধরিল,—

"সুপপুলখা পিসী রে মরতে যদি রামের কাছেই গেলি।
লাক্‌টা কেনে থুয়ে ঘরে চাবি না দিলি॥
তোর লাকের লেগে লঙ্কা ছারে খার,
বাবার বংশে বাতি দিতে রইল না কেউ আর।
মরি হায় রে, পিসী রে—তোর লাকের লেগে এএএ—

গাহিতে গাহিতে টলিতে টলিতে বামগণ্ডে হাত দিয়া তানে[র] উপর তান যোগ করিতে করিতে মাখম ঘরে চলিয়া আসিল।

৯

ঘরের দাওয়াটিতে একাকী বসিয়া ঐরূপ 'পিসী পিসী' বলিয়া সুর ভাঁজিতে লাগিল।

শুনিয়া সত্যই তাহার পিসী অটলের ভগিনী, তাহা[র] কাছে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল এবং আহারের জন্য অনুরোধ করিয়াছিল। মাখম উঠে নাই; যেহেতু সে আহারের প্রয়োজনীয়তা একবারেই অনুভব করে নাই।

তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া পিসী যখন চলিয়া গেল, তখন সে কিয়ৎক্ষণের জন্য নীরবে বসিয়া রহিল; এমন নীরব যে, যদি কেহ সেখানে উপস্থিত হইত, তীক্ষ্ণদৃষ্টির সাহায্যে অন্ধকার ভেদ করিয়া তাহাকে দেখিতে না পাইত, তাহা হইলে কিছুতেই তাহার অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারিত না।

অনেকক্ষণ বসিয়া মাথম দীর্ঘশ্বাস সহযোগে একটি হুঙ্কার দিল। দিয়াই কি যেন একটা অপরাধ করিয়াছে, এই-রূপ ভাবে আপনাকেই গোটা দুই গালি দিয়া সে আবার গান ধরিল :—

"হরি হে তোমায় ভালবাসি কই ?
তোমায় যদি বাস্‌তুম ভালো, জানতুম নাকো তোমা বই।"

গান শেষ হইতে না হইতে তাহার কানে শব্দ গেল, "মাথমা !"

মাথম শুনিয়াও শুনিল না। সে তখন আবার গণ্ডে করতল দিয়া বেশ উচ্চকণ্ঠেই তান ধরিল,—

"হরি হে, ওহে হরি, হরি-ই-ই।"

আবার শব্দ আসিল, "মাথম বাউরি !" কে সে ডাক শুনে ! সম্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার সুর উচ্চ হইতে আরও উচ্চে উঠিল, "হরি-হে-এ-এ-এ !"

মাথমের নামে ডাক অটলের ভগিনীও শুনিয়াছিল ! সে ছুটিয়া আসিয়াই তাহাকে বলিল,"শুনতে পাইছুস না মাথমা ?"

"কি পিসী ?"

"মনিব ডাকছে, শুনতে পাইছুস না ?"

"ও মনিব নয় রে, পিসী !"

"কে তবে ?"

উত্তরে মাথম কিঞ্চিৎ নিম্ন কণ্ঠে গাহিল,—

"হরি-হে-এ-এ।"

পিসী তথাপি সম্বোধনকারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে তাহাকে অনুরোধ করিল। যখন সে দেখিল, মাথম তাহার অনুরোধ রক্ষা করিল না, তখন তাহার মাথা ঠিক নাই বুঝিয়া পিসী চলিয়া গেল।

আবার সে হরি শব্দের উপর সুর সংযোগের উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় তীব্র কণ্ঠে তাহার অতি নিকটেই তাহার নাম উচ্চারিত হইল, "মাথমা !"

মাথম মাথা তুলিল ; দেখিল, তাহার অপবিত্র গৃহ-প্রাঙ্গণে চালির সম্মুখে দাঁড়াইয়া মধু পরীক্ষা।

তাহাকে দেখিয়াই অতি সঙ্কুচিতভাবে করযোড়ে মাথম প্রণাম করিল।

প্রণামের উত্তরে পরীক্ষা মহাশয় একান্ত শ্লীলতাবর্জ্জিত ভাষায় তাহাকে গালি দিয়া বলিলেন, "রা কাড়ছিস্ না, হয়েছে কি রে ?"

"কিছুই হয় নি হুজুর।"

"তবে ?"

"বলুন হুজুর !"

"এত যে ডাক্‌লুম, শুন্‌তে পাস্ নি ?"

"পেয়েছি হুজুর—বাবা ঠাউর !"

শুনিয়াই মধু পরীক্ষার ক্রোধটা বিশেষ ভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। একটা নীচ বাউরীর স্পর্দ্ধা এতদূর বাড়িয়াছে যে, সে তাঁহার ডাক কানে না তুলিতে সাহস করিল ! কিন্তু নিজের একটা বিশেষ স্বার্থের জন্য তাঁহাকে ক্রোধ সংযত করিতে হইল। কথা কহিতে কহিতেই পরীক্ষা বুঝিলেন, মাথমা মাতাল হইয়াছে। তাহার পর তাঁহার কথার উত্তর দিয়াই মাথম যখন নাসিকার সাহায্যে আবার সুর ধরিল, তখন তাঁহার সমস্ত ক্রোধ দূর হইয়া গেল। তিনি হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্যি, আজ তোর হ'ল কি রে, মাথমা ?"

"নোতুন কিছু হয় নাই হুজুর, যা হবা'র তা হয়ে গেছে।"

"আমি তোর কাছে বড় দরকারে এসেছি। একটা বতর চ'লে গেছে, আর একটা যায় যায় হয়েছে, অথচ আমার এক বিঘে জমীতেও লাঙ্গল পড়ল না।"

"তা তো দেখতেই পাইছি, হুজুর।"

"অথচ তোর মনিবের প্রায় সমস্ত জমীতেই লাঙ্গল দেওয়া হয়ে গেল।"

"তা হলেন বই কি, হুজুর। ঘোষালের সোলের সেই পাঁচ বিঘে বাকুড়া শুধু বাকী রইছেন।"

"তা হ'লে আমার কি হবে, মাথম ?"

"মনিষ পেলে না, হুজুর ?"

"কোথা থেকে পাবো ? অজবা বেটার লেগে আর কাউকেও ত কাঁকড়া দিতে পারলুম না !"

বলিয়াই পরীক্ষা মশাই মাথমকে সন্তুষ্ট করিবার জন্যই যেন অজবাকে উদ্দেশ করিয়া যৎপরোনাস্তি গালি দিলেন।

মাথম সে সমস্ত গালি নীরবে শুনিল মাত্র।

"এখনও ত আর ভালো মনিষ পাবার কোনও উপায় দেখছি না, মাথম।"

মাথম একটি মৃদু হুঙ্কার দিয়া বলিল, "তা বটে।"

"বটে না ?"

"বটেই ত হুজুর, ভালো মনিষ আর কুথাকে মিল্‌বেক! বিশেষ ক'রে অজবার মতন মনিষ। তার মতন কাষ করতে আমিও লারি হুজুর।"

পরীক্ষা আসিয়াছিলেন মাথমের নিকট হইতে অজবার সন্ধান লইতে। সুচাঁদের দোকানে "হাট" করিতে আসিয়া তিনি তাহারই নিকটে শুনিয়াছেন, মাথম ফুলীর সন্ধান কোথা হইতে কেমন করিয়া জানিয়াছে। যেখানে ফুলী সেইখানেই অজবা। তাহাদের গোপন স্থানটা কোনও রকমে মাথমের নিকট হইতে জানিতে হইবে। একবারে সেই প্রশ্ন করিলে পাছে মাথম কথা প্রকাশ না করে,—তাই ভয়, মৈত্র, কথার কৌশল প্রভৃতি নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিবার জন্য পরীক্ষা মহাশয় প্রস্তুতই হইয়া আসিয়াছেন। তিনি জানিতেন, একটু চতুরতার সহিত প্রশ্ন করিতে পারিলেই বর্ব্বর বাউরী পেটে কথা রাখিতে পারিবে না। এতক্ষণের কথা-বার্ত্তায় অজবা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবার সুবিধা হয় নাই, এইবারে হইল। অজবার উদ্দেশে আবার তিনি কতকগুলা গালি দিলেন। মাথমের ন্যায় নিরীহ ধার্ম্মিক বন্ধুর উপর অজবার সেই নিদারুণ বিশ্বাসঘাতকতা যে কত বড় পাপ, নিষ্ঠাবান্ 'বাবাঠাকুর' হইয়াও তিনি তাহা অনুমান করিতে পারিলেন না। মৃত্যুর পরে অজবাকে কোন্ নরকে যে যাইতে হইবে, তাহাও তিনি কল্পনার অনুসন্ধানে খুঁজিয়া পাইলেন না।

অজবা সম্বন্ধে অনেক কথা কহিয়া মধুঠাকুর মাথমের মুখ হইতে দুই একটা কথা শুনিবার প্রত্যাশা করিয়াছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, কিছু বলা দূরে থাকুক, সমস্ত সময়টা সে নিশ্চল পাতরের মত বসিয়া রহিল। ব্রাহ্মণ একটা দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ পর্য্যন্ত তাহার নিকট হইতে শুনিতে পাইলেন না। সে এখন মাতাল, তাঁহার কথা শুনিতে পাইল না মনে করিয়া, অগত্যা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে হইল, "ঘুমুচ্ছিস্ নাকি রে?"

মাথম এখনও নিরুত্তর। অনিচ্ছাতেই হউক, অথবা ফুলীসম্বন্ধীয় আলোচনায় নূতন ভাবে জাগিয়া উঠা মর্ম্মবেদনার জন্যই হউক, তাহার মুখ হইতে কোন উত্তর বাহির হইল না।

ঈষৎ উত্তেজিত কণ্ঠে পরীক্ষা ঠাকুর ডাকিলেন, "মাথম!"

"ঘুমুই নাই, হুজুর।"

"তবে? একটা কথাও কইছিস্ না কেন? হাঁ কি না ব'লে একটা কথা সায়ও ত দিতে পারতিস্! এক পেট মদ খেয়েছিস্ বুঝি?"

"টুক্‌খ্যা খেইয়েছি বটে।"

"সে বেটার মত তোকে ত বড় একটা মদ খেতে দেখি নি! যাক্, একটা কথা তোর কাছে আমি জান্‌তে এসেছি। তোর মেইয়ার কি তুই কোন খবর পেয়েছিস্?" এ দেশে সাধারণতঃ স্ত্রীকে "মেয়ে" বলিয়া থাকে।

মাথম বলিল, "এখন সে আর আমার 'মেয়্যা' কই বাবাঠাকুর!"

"তোর নয় ত কার?"

"লা হুজুর, সে আর আমার কেমন ক'রে হবে?"

"কেন হবে না? তোদের জাতের বিয়ে ত! কত জনের পরিজন, ঘর কর্‌তে কর্‌তে মানুষই নিয়ে পালিয়ে গেল, ফিরে এসে আবার ঘর কর্‌লে। জেনেছিস্ ত বল্, আমি তাকে আনা করাই।"

"তিন মাস—"

কথা শেষ করিতে না দিয়া মধু ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন, "তাকে কি হয়েছে? তুই বল্, আমি তাকে নগদী পাঠিয়ে ধরে আনা করাই। এর পর তোকে ফেলে আর যাতে সে না পালিয়ে যেতে পারে, আমি তারও ব্যবস্থা করব। চুপ ক'রে রইলি কেন বল্।"

একটা গভীর শ্বাস ত্যাগ করিয়া মাথম বলিল, "লাঃ।"

"'লা' কি? কোথায় তারা বল্‌বি না?"

"সে আর আসবেক নি, বাবাঠাকুর।"

"আসে না আসে সে আমি বুঝব। তুই কেবল বল্ কোথায় রইছে তারা।"

আবার ক্ষণেকের জন্য নীরব রহিয়া মাথম বলিল, "দরকার লাই। সে যখন আমার এত ভালবাসা ছেড়ে যেতে পেরেছে, তখন দরকার লাই।"

ক্রোধকর্কশস্বরে এইবারে মধু ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন, "তোর নেই, আমার আছে।"

বলিয়াই তিনি ফুলকুমারীকে উদ্দেশ করিয়া কতকগুলা গালি দিলেন। মাথম অবনত মস্তকে মাথা নাড়িতে নাড়িতে নীরবে সেই গালিগুলা শুনিল—"সেই বেউশ্চেটার জন্য আমার এমন কাষের মনিষ চ'লে যাবে?"

পরীক্ষা ঠাকুরের এ কথাও মাখম নীরবে কর্ণগত করিল; কথার প্রতিবাদও করিল না, ফুলীর সম্বন্ধে অত বড় হীন বিশেষণটা স্বীকারও করিল না।

মধুসূদন মাখমের নীরবতায় আর নিরস্ত রহিলেন না। ক্রোধের উপর ক্রোধ যোগ করিয়া তিনি বলিলেন, "বল মাখমা! কোথায় অজবা?"

"আমি জানিনে হুজুর।"

"জানিস্ না?"

"কোথা অজবা রইছে—আমি জানি না।"

"ফুলী? বল্, কতক্ষণ আমি তোর এই নরককুণ্ডে দাঁড়িয়ে থাক্‌বো?"

মাখম তাঁহাকে কেবল ঘরে ফিরিতে অনুরোধ করিল।

"বল্‌বি নে? তবে রে—" উদ্দীপ্ত ক্রোধে ব্রাহ্মণ তাহাকে প্রহার করিতে হাত উঠাইলেন। নিতান্ত অস্পৃশ্য জাতি না হইলে মধুসূদনের হস্তে নিশ্চয়ই সে দিন মাখমের লাঞ্ছনা হইত। একান্ত "নীচ বাউরী" বলিয়া মধুসূদন তাহাকে রাত্রিকালে স্পর্শ করিতে পারিলেন না। প্রহারোদ্যত হস্ত তাঁহাকে নামাইয়া লইতে হইল।

কয় দিন ধরিয়া মনিষের নিষ্ফল অনুসন্ধানে মধুসূদনের মনটা বিশেষরূপই উত্যক্ত হইয়া ছিল। তাহার উপর তাঁহার স্থির ধারণা ছিল, তাঁহার এই নিষ্ফলতায় নরহরি বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেছে। সুতরাং মাখমের ওইরূপ নীরবতায় তাঁহার ক্রোধ অনেকটা ন্যায্যের মতই হইয়াছিল।

ক্রোধের বশে মাখমকে আরও কতকগুলা গালি দিয়া, এমন কি চাল কাটিয়া তাহার উচ্ছেদের ভয় পর্য্যন্ত দেখাইয়াও যখন তাহার পেট হইতে কথা বাহির করিতে পারিলেন না, তখন মধুসূদন আবার শান্তভাব ধরিয়া অজবার সন্ধান জানিবার অন্য উপায় অবলম্বন করিলেন। বাউরী জাতির চরিত্র তাঁহার বিশেষরূপই জানা ছিল। জাতিটা অত্যন্ত নিরীহ ও বিশ্বাসী। কড়া কথা কহিলে যেমন ভয় পায়, মিষ্ট কথা কহিলে তেমনই গলিয়া যায়। এই হতভাগা মাখমটা কেবল আজ তাহার ব্যতিক্রম দেখাইতেছে। এ ব্যতিক্রমের কারণটাও তিনি একরূপ অনুমান করিয়া লইলেন। সেটা আর কিছু নহে, নরহরির আস্কারা।

গ্রামের মধ্যে নরহরিই ছিল তাঁহার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী। ব্রাহ্মণদের ভিতরে পূর্ব্বে 'পরখে'রাই ছিলেন সর্ব্বাপেক্ষা সম্পত্তিবান্। চট্টরাজরা তাঁহাদের বংশের দৌহিত্র। মায়ের দিক্ হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে তাহারা পরখেদের প্রায় অর্দ্ধেক সম্পত্তির মালিক হইয়াছে। কোথাকার কে কোথা হইতে আসিয়া তাহাদেরই 'বাপুতি' সম্পত্তি দখল করিল। এই জন্য চট্টরাজদের উপরে পরীক্ষাদের স্বাভাবিক একটা বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল। দুই বংশে বহুকাল ধরিয়া মামলা মোকর্দ্দমা হইয়াছে। পরস্পরের ভিতরে বহুদিন পর্য্যন্ত মুখ দেখাদেখি ছিল না। নরহরি নিজে যদিও অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন, তথাপি মাতুলবংশের সহিত মিলিত হইবার বিশেষ ইচ্ছা থাকিলেও 'দায়াদ'দের বাধায় তিনি ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। নরহরির পরীক্ষাদের প্রতি ততটা বিদ্বেষ না থাকিলেও পরীক্ষাদের তৎপ্রতি বিদ্বেষের অন্ত ছিল না। বিদ্বেষের আর একটা কারণ হইয়াছিল। ইদানীং নরহরি বাঁকুড়া সহরে চাল-ধানের আড়ত করিয়া বেশ দু'পয়সা অর্জ্জন করিয়া অনেক ভূসম্পত্তি তাঁহার পূর্ব্ব সম্পত্তিতে যোগ দিয়াছেন। কিন্তু 'দায়াদ'দের মধ্যে বিভক্ত হইয়া পরীক্ষাদের অনেকের সম্পত্তি অল্প হইয়া গিয়াছে।

অল্প হইলেও চট্টরাজদিগের অপেক্ষা পরীক্ষাদের প্রতিপত্তি এখন অনেক বেশী। পায়ের উপর পা দিয়া আরও একপুরুষ খাইবার সম্পত্তি এখন অনেকেরই আছে, বিশেষতঃ মধু পরীক্ষার। নরহরির অপেক্ষা আয় অল্প হইলেও তাঁহারও সম্পত্তি নিতান্ত নগণ্য নহে, বিশেষতঃ আজকাল আদালতে উকীলের মুহুরিগিরি করিয়া, তাঁহারও বেশ দু'পয়সা উপরি রোজকার হইতেছে।

সুতরাং মাখমের নীরবতায় নরহরির প্ররোচনা অনুমান করিয়া অজবাকে ফিরাইতে তাঁহার আগ্রহ অধিক হইয়া পড়িল।

শান্তভাবে এইবার তিনি মাখমকে বলিলেন, "মনে কিছু করিস্ না, জমীতে চাষ হচ্ছে না দেখে মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে। তাই তোর চুপ থাকায় হঠাৎ আমার রাগ হয়ে গেল, কিছু মনে করিস্ না।"

মাখম বলিল, "না হুজুর, তা করব কেন।"

"সত্যিই কি তুই সে বেটার খবর জানিস্ না?

মাখম আবার নীরব হইয়া গেল দেখিয়া মধুসূদন তাহার জানাটা ঠিক বুঝিয়া লইলেন। তখন আরও বিনম্রস্বরে

তিনি বলিলেন, "তাই ত রে, বললে তোর কোন ক্ষতি দেখতে পাচ্ছি না, তবু বলতে নারলি।"

মাখম এইবারে উত্তরে মধুসূদনকে পরিতৃপ্ত করিল, "সত্যিই আমি জানিনি, হুজুর। ভাবি জেনেছে। জেনে আমাকে খবর দিয়েছে।"

"ভাবি কোথায় মজুরী করছে ?"

"ফরাসডাঙ্গায় শেট বাবুদের দীঘিতে মাটী তুলছে।"

"অজবাও তা হ'লে সেখানে আছে ?"

"না। সে কোথায় আছে, আমি গেলে জানতে পারব। আমাকে যেতে লিখেছে।"

"তবে তুই যা।"

মাখম আবার মাথা হেঁট করিয়া বসিল।

"কি বলিস্, শীগ্‌গির বল্। আমি এখানে আর অধিকক্ষণ দাঁড়াতে পারি না। আমার গা বিড়-বিড় করছে।"

মাথা না তুলিয়াই মাখম উত্তর দিল, "ঘরকে যাও, হুজুর।"

"সে ত যাবই রে বেটা! তোর হুকুমে যাব? তুই যাবি না ?"

মাখমের মাথা তাহার দুই হাঁটুর ভিতর প্রবিষ্ট হইল।

"ফুলীকে আবার আমরা তোর কাছে পাঠিয়ে দেব। অজবাকে শাসন করবার দরকার হয়, তাও আমি করব, মাখমা!"

এরূপ কথাতেও যখন মাখম উত্তর দিল না, তখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত ক্ষণেক সেখানে নীরবে দাঁড়াইয়া মধুঠাকুর প্রস্থানোদ্যত হইলেন।

কিছুদুর গিয়া ব্রাহ্মণ আবার ফিরিলেন। এইবার সত্যসত্যই করুণকণ্ঠে মাখমকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোর যা হবার তা ত হয়েই গেছে। বিনা অপরাধে আমার ছেলেগুলো না খেয়ে মরবে!"

মাখম এ কথা শুনিয়া আর চুপ রহিতে পারিল না। বলিল, "ঘরকে যাও হুজুর, আমি আজ ভোরেই নামাল চ'লে যাব।"

বিশেষ আশ্বস্তভাবে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া মধু পরীক্ষা বলিয়া উঠিলেন, "তাই বল, শুনে আশ্বস্ত হই। শুধু নামাল যাব বললে চলবে না; তাদের আনতে হবে। অত বেশী দেরী করলে চলবে না—আনতে হবে। দু পাঁচ দিনের মধ্যেই —বতর থাকতে থাকতে।

"তুমি ঘরকে যাও, রাত হইছে।"

"আমি নিশ্চিত হ'তে পারি ?"

মাখম যাইতে প্রতিশ্রুত হইল—সে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে গ্রাম ত্যাগ করিবে। মধু ঠাকুর কিছু খরচা দিতে চাহিলেন। উত্তরে সে গান ধরিল—

"হরি হে, তোমায় ভালবাসি কই ?"

১০

রমানাথ টেলিগ্রাফ করিবার বহুপূর্ব্বে বিষ্ণুপুরের পরের ষ্টেশন পিয়ারডোবাতে অজবা ও ফুলকুমারী নামিয়া গিয়াছিল —এই জন্য রমানাথ তাহাদের কোনও সন্ধান পায় নাই।

ষ্টেশন হইতে বনপথ ধরিয়া, এ গ্রাম হইতে সে গ্রামে আশ্রয় লইয়া, কিছুদিন তাহারা জাহানাবাদে অবস্থিতি করিয়াছিল। সে স্থান হইতে তারকেশ্বরের পথ অবলম্বনে তাহারা ভাগীরথী তীরে উপস্থিত হইয়াছিল।

এখন, প্রায় দুই মাসের উপর, তাহারা চাঁপদানীর কলে মজুরী করিতেছে। করিতেছে তাহারা ওই মাটীরই কায। তবে বেতন, বাকুড়ায় তাহারা যেরূপ পাইত, এখানে প্রত্যেকেই তার দ্বিগুণ পাইতেছে।

কলে তাহারা কায করে, কিন্তু বাস করে তাহারা সে স্থান হইতে প্রায় এক মাইল দূরে, ঠিকাদারের বাগানে। ধরা পড়িবার আশঙ্কায় অন্যান্য কুলীদের সঙ্গে তাহারা কুলীলাইনে থাকিতে সাহস করে নাই।

সেই বাগানের একটা কুঁড়ে ঘরে দুই মাসের উপর তাহারা দম্পতির মতই বাস করিতেছিল। অন্যান্য কুলী তাহাদের উপর সন্দেহ করিবার কোনও কারণ দেখে নাই। অবস্থাও তাহাদের গ্রামের অপেক্ষা অনেকটা স্বচ্ছল হইত, যদি না অজবা অতিরিক্ত মাত্রায় মদ্যপান করিত। ফুলীও আজকাল সময়ে সময়ে একটু আধটু নেশা করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

সে দিন শনিবার অপরাহ্ন। সন্ধ্যা হইতে মাত্র ঘণ্টাখানেক বিলম্ব ছিল। তিনটি যোগ সে দিন একত্র হইয়াছিল। সপ্তাহের শেষ—কুলীরা সে দিন একবারে ছয় দিনের বেতন পাইবে। মাসের শেষ—কুলীদের মাটীকাটা কার্য্যও মাসের সঙ্গে সঙ্গে শেষ হইয়াছে। পরদিন হইতে আর কাহারও সেখানে থাকিবার প্রয়োজন রহিবে না। সকলেই এইবারে মাঠের কায করিতে যে যাহার গ্রামে ফিরিবে।

ফিরিতে পারিবে না কেবল অজবা ও ফুলকুমারী। সঙ্গীরা চলিয়া গেলে কোথায় যাইবে তাহারা? এ প্রশ্ন দুই জনেরই মনে উঠিয়াছে। কায খুঁজিয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তর ভ্রমণ ভিন্ন তাহাদের অন্য উপায় রহিল না। অস্পৃশ্য জাতি, তাহাদের হাতের জলে ভদ্র গৃহস্থদের কোনও কায হইবে না, ওই এক মাটীকাটার মত কায ভিন্ন অন্য কোনও কায তাহাদের পক্ষে অসম্ভব। সেই দিন কার্য্যশেষে উভয়েরই চিত্ত অল্পবিস্তর বিষণ্ণ হইয়া উঠিল। তাহার উপর মদ্যপানাদি ব্যাপারে যথেচ্ছ অপব্যয় করিয়া দুই দিন যে বসিয়া খাইবে, তাহারও উপায় তাহারা রাখে নাই।

বিশেষ চিন্তিত হইল ফুলী। আজিকার পাওনা বেতনের ঋণশোধ, খাই খরচ প্রভৃতি বাদে, অতি অল্পই অবশিষ্ট থাকিবে বুঝিয়া সে একটু শঙ্কিতা হইয়াছে। অজবার সঙ্গে এই তিন মাস ধরিয়া তাহার অবস্থিতির নেশা আজ যেন ছাড়িবার মত হইয়াছে।

কুলীদের কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া ঠিকাদার মনিব আনন্দ করিবার জন্য প্রত্যেককে আজ এক দিনের বেতন পুরস্কার দিয়াছে। পুরস্কার পাইয়াই অজবা তাহার সমস্ত চিন্তা এক পেট তাড়ির তলে ডুবাইতে গিয়াছে। ফুলীও হঠাৎ জাগিয়া উঠা দুশ্চিন্তার আক্রমণ হইতে নিস্তার পাইবার জন্য, অন্যান্য কুলী কামিনীর সঙ্গে মনিবের দেওয়া পুরস্কারের মর্য্যাদা রাখিয়াছে।

সমস্ত চিন্তার বিলোপে বেশ একটু উৎফুল্ল ভাবেই সে তাহার সেই বাগানের ঘরটিতেই ফিরিতেছিল। বেলা যায় দেখিয়া সে আর অজবার ফিরিবার অপেক্ষা করিতে পারিল না। তাহাকে ইহার পর রাঁধিয়া খাইতে হইবে।

মাথায় তাহার ছিল গামছায় বাঁধা হাট—চাল, ডাল, লবণ প্রভৃতি; এক হাতে ছিল বোতলে পোরা তৈল, অঞ্চলে বাঁধা ছিল খরচ-পত্র বাদে তাহার সপ্তাহের বেতনের যৎসামান্য অবশেষ।

তথাপি ফুলকুমারী আজ বিশেষভাবে উৎফুল্ল। মদিরার আনন্দ তাহার ভবিষ্যতের চিন্তা একবার মুছিয়া লইয়াছে। পাছে টলা মাথা হইতে মাটীতে পড়িয়া যায়, এইজন্য সে মুক্ত হস্ত দিয়া মাথার পুঁটুলিটি ধরিয়া রাখিয়াছিল। সহর ছাড়িয়া সামান্য দূরে আসিয়াই সে গান ধরিল। অন্যান্য সঙ্গিনীরা যে যাহার নিজের স্থানে চলিয়া গিয়াছে। এখন সে একাকিনী। পথ নির্জ্জন।

যেখানে আসিয়াছে, তাহার নিকটে কতকগুলা গাছ জড়াজড়ি করিয়া এক প্রকার জঙ্গলের ভাব ধরিয়াছে।

স্থানটা গানের অনুকূল মনে করিয়াই যেন সে গান ধরিল:—

"শ্যামের নাগাল পেলেম না লো সই!
আমি কেমন ক'রে ঘরে রই?"

"আজও শ্যামের নাগাল পেলিনি!"

বৃক্ষকুঞ্জের ভিতর হইতে কথা উঠিল। কথাটা ফুলকুমারীর কানে স্বপ্নের মত লাগিল। তাহার ঘোরা মাথা আরও ঘুরিয়া গেল। কোনও প্রকারে মাথার পুঁটুলি মাথায় রাখিয়া সে স্থির হইয়া দাঁড়াইল অথবা দাঁড়াইতে চেষ্টা করিল—মুখ ফিরাইতে পারিল না।

তাহার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য ভাবিনীকে সঙ্গে লইয়া মাখম সেই বৃক্ষগুলার অন্তরালে অবস্থিতি করিতেছিল। কথা কহিয়াই সে বাহিরে আসিল। ভাবিনী আসিল না।

নিকটে আসিয়াই সে প্রশ্নের পুনরুক্তি করিল, "আজও পেলিনি? কুল ছেড়ে এত দূরে এলি, তিন মাস সঙ্গে সঙ্গে রইচুস্, তবু শ্যামচাঁদের নাগাল ধরতে নারলি ফুলি!"

বলিতে বলিতে যে দিকে ফুলকুমারী মুখ করিয়া ছিল, মাখম সে দিকে আসিয়া দাঁড়াইল।

ফুলকুমারীর আর কথা না কহিলে চলিল না। মাখমের চোখের উপর তাহার মদির-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সে বলিল, "হেথাকে মরতে কেন আইচুস্?"

তাহার সে বিলোল দৃষ্টির প্রহারে মাখম ক্ষণেকের জন্য স্তব্ধ হইয়া গেল। তাহার মুখ হইতে উত্তর বাহির হইল না। তাহার মনে হইল, এই স্বামি-ত্যাগিনীর অন্তরে তাহার জন্য এখনও অনেক মমতা লুকানো আছে। মনে হইল, তাহার হঠাৎ চলিয়া আসার জন্য মর্ম্মবেদনা তাহার দৃষ্টির বিলোলতার ভিতর দিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। দেখিয়া সে মুগ্ধ, স্তব্ধ—কোনও কথা কহিতে পারিল না।

তাহাদের আলাপের ভাষা সকলের বোধগম্য না হইবার সম্ভাবনা বুঝিয়া আমরা তাহার ঈষৎ পরিবর্ত্তন করিয়া বলিব।

স্বামীকে উত্তর দিতে অশক্ত বুঝিয়া ফুলকুমারী আবার বলিল, "কেন আর এখানে এসেছিস্ ?"

"ভয় নেই রে তোকে নিতে আসিনি, দেখতে এসেছি। অনেক দিনের মায়া, ছাড়তে পারলুম না। তুই যে আমার যথাসর্ব্বস্ব ছিলি রে! তাই দেখতে এলুম আমাকে ছেড়ে তুই কেমন আছিস্। তা দেখলুম, ভালই আছিস্ তুই।"

"পথ ছেড়ে দে, আমি চ'লে যাই।"

"এখনি ছেড়ে দেবো রে! আমি তোর সুখে বাধা দিতে আসি নি। তবে একটিবার বল্, তুই যে চ'লে এলি, সে কি আমার কোন অপরাধে ?"

"না।"

"তবে ?"

"তোকে আমার ভালো লাগতো না।"

"ভালো লাগতো না !"

"না।"

"কত দিন থেকে লাগতো না, ফুলি !"

"যে দিন থেকে তোর সঙ্গে আমার বিয়ে।"

শুনিয়া মাখম প্রথমটা অপ্রতিভের মত হইল। ভালো লাগতো না, এ কথার উপর কথা কহিবার তাহার কি আছে!

উভয়েই ক্ষণেকের জন্য নীরব। ফুলকুমারীই প্রথমে এই নীরবতা ভঙ্গ করিল। দৃষ্টি ভূমির দিকে করিয়া বলিল, "এই ত শুন্‌লি, এইবারে চ'লে যা।"

মাখমও এতক্ষণে উত্তর দিবার কথা পাইল। সে বলিল, "ভালোই যদি লাগে নি ফুলি, তা হ'লে আগেই আমাকে ত্যাগ করিস্ নি কেন? এতকাল আমার ঘর ক'রে মায়া বাড়িয়ে কেন ত্যাগ কর্‌লি ?"

ফুলী এ অতি ন্যায্য কথার উত্তর দিতে পারিল না। কেবল বলিল, "সন্ধ্যা হয়ে এলো, বিদেশ বিভুম, কোথায় রয়েছিস্, চ'লে যা।"

"না, আর দাঁড়াবো না ফুলি! তবে, ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে তোর ভাত-কাপড়ের ভার নিয়েছিলুম, তাই একবার তোকে শুনিয়ে যাই, আমার সঙ্গে এখনো কি তোর যাবার ইচ্ছা আছে ?"

"যাবার উপায় নেই !"

"উপায় নেই !"

"তুই একা এসেছিস্, না সঙ্গে কেউ আছে ?"

"আছে, ভাবি।"

"তুই যা, ঠাকুরঝিকে একবার পাঠিয়ে দে।"

কথার অর্থ বুঝিতে পারুক, আর নাই পারুক, মাখম সেখানে থাকার আর প্রয়োজনীয়তা বুঝিল না। সে তাহার জামার ভিতর লুকান একখানি সুন্দর পাড়ওয়ালা রঙ্গীন কাপড় বাহির করিল।

দেখিয়াই সবিস্ময়ে ফুলী বলিয়া উঠিল, "ও কি ?"

কোনও উত্তর না দিয়া, কাপড়খানি ফুলীর সম্মুখে পথের উপর রাখিয়া, পাকড়ীর প্রান্ত খুলিতে খুলিতে বলিল, "ওই নে, তোর সেই সখের কাপড়, আর এই নে তোর রোজগারের পয়সা। গুণে নে, তেরো টাকা চারি আনা।" বলিয়া কাপড়ের উপর সে টাকা কয়টি রাখিয়া দিল।

তাহার পর কোঁচার খুঁট হইতে একটি ক্ষুদ্র নাকছাবি বাহির করিয়া বলিল, "আর এই নে, যা তুই পালিয়ে আস্‌বার পাঁচ দিন আগে চেয়েছিলি।"

ফুলকুমারী অতি কাতরভাবে বলিয়া উঠিল, "না, না।"

"না কেন রে, হাঁ। আমি তোকে সুস্থ মনে দিচ্ছি; তুই আমাকে ত্যাগ করেছিলি; আমি যে তোকে এখনো মন থেকে ত্যাগ কর্‌তে পারি নি রে!"

এই বলিয়া ফুলকুমারীর অঞ্চল ধরিয়া তাহার প্রান্তে মাখম সেই ক্ষুদ্র অলঙ্কারটি বাঁধিয়া দিল। কেন না, ফুলকুমারীর দুই হাতই বদ্ধ ছিল। তাহার সে বস্তুটি লইবার উপায় ছিল না।

দিয়াই মাখম চলিয়া গেল। মুহূর্ত্তের জন্যও আর সে পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিল না।

১১

চক্ষু দুটি নিম্ন করিয়া ফুলকুমারী কিছুক্ষণ সেই কাপড়খানি ও তাহার উপরে রক্ষিত টাকা কয়টির উপর চাহিয়া রহিল। তাহার পর একবার মুখ ফিরাইল। দেখিল, তাহার স্বামী চলিয়াছে। মাথার পুঁটুলি ও হাতের বোতল ভূমিতে রাখিতে রাখিতে আর একবার সে মাখমের দিকে চাহিল। মাখম সেইরূপই চলিয়াছে। ক্ষণেক সে সেইদিকেই চাহিয়া রহিল। মাখম একটিবারের জন্যও মুখ ফিরাইল না।

আর সে যেন চাহিয়া থাকিতে সাহস করিল না। কি

যেন একটা শঙ্কার ভাবে সে কাপড় ও টাকা শীঘ্র শীঘ্র উঠাইয়া লইল। টাকা নাকছাবির পার্শ্বে অঞ্চলে বাঁধিল। কাপড় বস্ত্রাভ্যন্তরে লুকাইল।

সমস্ত গুছাইয়া আবার যেমন সে উঠিতে যাইতেছে, অমনি সে শুনিল, "ভালো কথা ফুলি, অজবাকে বলিস্, সে যেন দু' এক দিনের ভিতরে দেশে ফিরে যায়। পরথে ঠাকুরের চাষ একেবারেই বন্ধ। ঠাকুর ছটফট করছে। পরথে ঠাকুরের লেগেই আমি এসেছি। তার কোনো ভয় নেই। কেউ কিছু বলবে না তাকে।"

ফুলকুমারীর মুখ ফিরাইতে বিলম্ব দেখিয়া সে একটু জোর গলায় বলিল, "শুন্‌তে পেলি ?"

ফুলকুমারী ফিরিয়া ঘাড় নাড়িয়া বুঝাইল, পাইয়াছে।

"বল্‌তে পারবি ?"

ফুলকুমারী সেইরূপ ভাবেই বুঝাইল, "পারবো।"

তাহার কথা না শুনিয়া বুঝি মাধমের তৃপ্তি হইতেছিল না ! সে আবার বলিল, "না, আমাকেই বল্‌তে হবে ?"

তিন বারের প্রশ্নেও ফুলকুমারী একটি বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিল না। সে সেইরূপই মাথা নাড়িয়া উত্তর দিল, "তোমাকে বলতে হবে না।" বলিয়াই ফুলকুমারী চলিল। পথের বাঁকের মুখে উপস্থিত হইয়া একবার সে মুখ ফিরাইল। ফিরাইতেই দেখিল, তাহার স্বামী ঠিক সেইখানেই দাঁড়াইয়া তাহাকে দেখিতেছে। ঈষৎ দ্রুতপদে সে তাহার দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া গেল।

"কি হ'ল, দাদা ?"

চমক লাগার মত মাধম মুখ ফিরাইল।

ভাইয়ের মুখের অবস্থাটা ভাবিনী যেন কেমন এক রকম দেখিল। সে ব্যাকুলভাবে আবার জিজ্ঞাসা করিল, "আবাগী বল্‌লে কি ?"

"বল্‌লে ? সে ? আমাকে ?—অনেক কথা বলেছে।"

"আস্‌তে চাইলে না ?"

"বল্‌লে আস্‌বার উপায় নেই।"

"উপায় নেই মানে কি ?"

"সে তোকে একবার দেখা করতে বল্‌লে।"

"কোথায় সে ?"

"পথেই এখনো আছে। বোধ হয় তোর অপেক্ষা করছে।"

কালবিলম্ব না করিয়া ভাবিনী দ্রুতপদে ফুলকুমারীর উদ্দেশে চলিয়া গেল।

বাঁকের মুখ হইতে কিছু দূরে ছিল পথের একটা সাঁকো। চলিতে চলিতে টলিতে টলিতে আর অধিক চলা অসম্ভব বুঝিয়া ফুলী সেই সাঁকোর আলিশার উপর বসিল। পানের মত্ততাতেও সে মাথা অনেকটা ঠিক রাখিতে পারিয়াছিল। কিন্তু পারিল না যখন তাহার স্বামী তাহার সমস্ত বিশ্বাসঘাতকতাটাকে উপেক্ষা করিয়া, তিরস্কারের পরিবর্ত্তে, তাহাকে কতকগুলা উপহার দিয়া চলিয়া গেল। শুধু তাহাই নহে, এক নাকছাবিটি বাদে, অবশিষ্ট সমস্ত বস্তুরই প্রবল অভাব সে অনুভব করিতেছিল। একটু সাজিবার মত বস্ত্র ত তাহার ছিলই না, সেদিনকার কাষ শেষ হইবার পর দুইটা দিন যদি তাহাদের নূতন কাষ না জুটিত, তা হইলে তৃতীয় দিনে তাহাদের উভয়কেই উপবাসী থাকিতে হইত। তাহাদের গৃহত্যাগের প্রথম মাসটা অতিকষ্টেই অতিবাহিত হইয়াছিল। পথে এক দিন কাষ জুটিত ত দুই দিন জুটিত না। কোনো কোনো দিন পেটভাতায় তাহাদিগকে সারাদিন পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। দুইটি মাস মাত্র তাহাদের অবস্থা স্বচ্ছল হইয়াছিল। আবার দারিদ্র্য ফুলকুমারীকে বিভীষিকা দেখাইতেছিল। এমন সময় এক অভাবনীয় দিক্ হইতে আসিল ওই দান। দেবতাও বুঝি কাহারও কাতর প্রার্থনায় অমন করিয়া দান করিতে পারে না।

নেশা ছাড়িবার মুখে বাস্তবিকই ফুলী যেন দ্বিগুণ মাতাল হইয়া পড়িল। চলিতে গিয়া দুই তিনবার সে পড়িতে পড়িতে রহিয়া গেল। অগত্যা তাহাকে বসিতেই হইল।

সাঁকোর আলিশাটা বিশেষ চওড়া ছিল না। তার তিন চার হাত নিম্নে নালা। বর্ষাকালে সেই স্থান দিয়া পথের এক দিক্ হইতে অন্য দিকে জল নিকাশ হইয়া যায়।

ভাবিনী দূর হইতে দেখিল, বউ সমস্ত জিনিষপত্র নীচে রাখিয়া আলিশার উপর হেঁট মাথায় বসিয়া আছে। কিন্তু মাথাটা তার টলিতেছে। যদি ওই অবস্থায় পিছন দিকে পড়িয়া যায়, তাহা হইলেই ত সে মরিবে ! দেখিয়াই সে তাহার দিকে ছুটিয়া গেল।

যা ভয় করিয়াছিল তাই, ভাবিনী নিকটে উপস্থিত হইয়াছে মাত্র, এমন সময় ফুলী টাল খাইল। ভাবিনী দুই হাতে তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। সম্রস্তার মত ফুলকুমারী

তাহার মুখের পানে চাহিতেই ভাবিনী বলিল, "যা সর্ব্বনাশ করবার তা ত ক'রেই এসেছিস্, ভাইটিকে আবার খুনের দায়ে ফেল্‌ছিলি!"

আবার মাথাটা নামাইয়া ফুলকুমারী বলিল, "এইগুলো সব নিয়ে আমাকে ঘরে দিয়ে আস্‌তে পার্‌বি, ঠাকুরঝি?"

"সব রকমে মরেছিস্ দেখছি যে!"

"আমাকে ঘরে দিয়ে আয়। আমি আর দাঁড়াতে পারছি না।" তাহার অবস্থা দেখিয়া ভাবিনীর কেমন একটু করুণা জাগিয়া উঠিল। সে জিনিষপত্রগুলা উঠাইয়া এক হাতে লইয়া অন্য হাতে ফুলকুমারীর বাহু ধরিল। ধরিয়াই বলিল, "আর এ ঘর ওঘর কেন, তোর নিজের ঘরেই চল।"

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ফুলকুমারী বলিল, "আর যাবার উপায় নেই।"

"এ কথা বেশ বলছিস্। দাদাকেও ওই কথা বলেছিস্?"

ফুলী মাথা হেঁট করিয়া মুহূর্ত্তের জন্য দাঁড়াইল। তাহার পর ঘূর্ণিত মদির-চক্ষু ভাবিনীর চোখের উপর স্থাপিত করিয়া গ্রীবা ঈষৎ বঙ্কিম করিয়া বলিয়া উঠিল, "নিয়ে যেতে যদি না যেতে চাস্, দে আমার সব জিনিষ ফিরিয়ে।"

ইত্যবসরে ভাবিনী কথাটার অর্থ বুঝিয়া লইল। বুঝিবার সঙ্গে সঙ্গে এক অব্যক্ত বেদনায় তাহার সারা অন্তরটা ভরিয়া গেল। সে একটা হুঙ্কার ত্যাগ করিল।

ফুলকুমারীর মত্ততা এইবারে পূর্ণ ভাবেই যেন ফুটিয়া উঠিল। অতি আবেগভরে সে বলিয়া উঠিল, "বুঝতে পারলিনি অভাগী? বিধাতা আমার ঘরে ফেরবার পথে কাঁটা দিয়েছে রে!"

ভাবিনীও তেমনই আবেগভরে বলিয়া উঠিল, "আ অভাগী, ঘরে ছেলে ছেলে ক'রে কত দেব্‌তার মানত করলি, কত অষুধ খেলি, এই নরককুণ্ডে এসে কি না তার ফল পেলি!"

"আমি আর দাঁড়াতে নারবো", বলিয়াই সে তখনও ভাবিনীর মুষ্টিতে ধরা বাহু আকর্ষণ করিল।

ভাবিনী মুষ্টি ছাড়িল না। দৃঢ়তর মুষ্টিতে বাহু ধরিয়া অপর হস্তে, প্রবলবেগে বহির্গত অশ্রু অঞ্চলে মুছিতে মুছিতে সে সংক্ষুব্ধা ভ্রাতৃজায়াকে ধরিয়া লইয়া চলিল। আর তাহাকে তিরস্কার করিবার কথা সে খুঁজিয়া পাইল না।

দীর্ঘ প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিতে থাকিতে মাখমের চোখে তন্দ্রা আসিতেছিল। একটা বকুলবৃক্ষের স্কন্ধে পৃষ্ঠ দিয়া সে অবসন্ন দেহকে সেই তন্দ্রার কোলে ফেলিয়া দিল। তন্দ্রাটি ঘনীভূত হইয়া তাহাকে চিন্তার জ্বালা হইতে নিষ্কৃতি দিবার উপক্রম করিয়াছে, এমন সময় তাহার কানে শব্দ গেল, "দাদা ওঠ!" চোখ মেলিয়াই সে দেখিল ভাবিনী ফিরিয়াছে।

ভাবিনী বলিল, "আর এখানে প'ড়ে থাকতে হবে না, উঠে পড়।"

"কি জন্য সে তোকে দেখতে চেয়েছিল, ভাবি?"

"তার মরণের কথা শোনাতে। ওঠ দাদা, তার প্রত্যাশা ত্যাগ কর।"

"আমি ত অনেক কালই করেছি ভাবি, তুই করলি কি না বল্।"

"করতেই হ'ল রে ভাই, বিধাতা তার ফেরবার উপায় মেরে দিয়েছে।"

নিশ্চিন্তের মত সে মাখমকে উঠিতে অনুরোধ করিল। নিশ্চিন্তের মত মাখম উঠিল।

৬২

বাড়ী হইতে বাহির হইবার সময় মাখম তাহার পিসীকে বলিয়া গিয়াছিল, আমি একবার নামাল যাচ্ছি, মনিবকে বলবি পিসি, ফিরতে আমার দিন সাত আট বিলম্ব হবে। জগু রায়কে আমি ব'লে গেছি, যে ক'গুঁড়ো জমী বাকি আছে, সে হাল দিয়ে দেবে।

পিসী মাখমের সে কথা নরহরিকে বলিয়াছিল। তাহাতে নরহরি বুঝিয়াছিলেন, মাখম ফুলীর সন্ধান পাইয়াছে এবং তাহাকে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টায় চলিয়া গিয়াছে।

লাঙ্গল দিবার যে সামান্যমাত্র জমী অবশিষ্ট আছে, তাহারও ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছে জানিয়া নরহরি মাখমের এই চলিয়া যাওয়ায় অসন্তুষ্ট হইবার কোনও কারণ দেখিলেন না। তবে সে বোকাটা সে কথা তাঁহাকে বলিয়া যাইতে পারিত। তিনি তাহা হইলে তাহাকে শুধু অনুমতি দিতেন না, সঙ্গে সঙ্গে তাহার যাতায়াতের ব্যয়টাও দিতেন। যাহাই হউক, তাঁহার ধারণার ভ্রম হইবার বিশেষ কোনও কারণ ছিল না, সুতরাং মাখমের যাওয়া যে ফুলীকে ফিরাইতে, ইহাতে তাঁহার আর সন্দেহ রহিল না।

কিন্তু ফুলী ফিরিলে অজবা কি করিবে? সে কি তাহার ঘর বাড়ী, মা, বোন্‌কে ফেলিয়া একেলা বিদেশে ঘুরিতে পারিবে? গ্রামে তাহাকে ফিরিতেই হইবে। এই ফিরিবার কথাটা নরহরির ভাবিবার বিষয় হইল। কেন না, অজবা ফিরিলে তাহাকে যদি শাসন করা না হয়, তাহা হইলে তাহার ভৃত্য সম্বন্ধে কর্ত্তব্যের একটা বিশেষ ত্রুটি হইবে। অজবাকে শাসন করা কঠিন কথা নয়, তবে সে কায করিতে গেলে মধু মামার সঙ্গে একটা যে গণ্ডগোল বাধিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সে গণ্ডগোলের জন্যও তাঁহাকে প্রস্তুত হইতে হইবে।

আপাততঃ অনুমান মাত্র। হয় ত অজবার স্বগ্রামে ফিরিয়া আসা নাও ঘটিতে পারে। তথাপি নরহরি তাহার আসাটা সাব্যস্ত করিয়া মধু পরীক্ষার মনের ভাব বুঝিবার জন্য প্রিয় বন্ধু দোলগোবিন্দ সিংহকে তাহার সঙ্গে কথা কহিবার অনুরোধ করিতে তাঁহার বাড়ী চলিয়া গেলেন।

দলুবাবু নরহরির বন্ধু হইলেও মধুর সহিত তাঁহার কোনও বিবাদ ছিল না। মধু, নরহরি, দোলগোবিন্দ তিন জনেই ছিলেন প্রায় সমবয়সী। বিষয়সূত্রে মাতুলের সঙ্গে ভাগিনেয়ের বিবাদ হইবার পূর্ব্বে উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট সদ্ভাব ছিল। মধু ও দলুবাবুর মধ্যে সে সদ্ভাবটা এখনও আছে।

নরহরি দলুবাবুর কাছে মাখমের হঠাৎ নামাল চলিয়া যাওয়া হইতে অজবার গ্রামে ফিরিবার সম্ভাবনা পর্য্যন্ত সব কথা বলিয়া তাহার শাসন সম্বন্ধে মত জিজ্ঞাসা করিলেন। দলুবাবুরও মতে তাহার শাসন অবশ্য কর্ত্তব্য। তবে মাখমের ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে কোনও কথা মধুর কাছে উত্থাপন করা তিনি যুক্তিযুক্ত বোধ করিলেন না। দলুবাবুর মতে অবস্থা জানিয়া ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। সুতরাং মামার মনোভাব বুঝিবার ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া নরহরি আড়তের কাযে বাঁকুড়া চলিয়া গেলেন।

মাখমের নামাল যাওয়ার পর পূর্ণ এক সপ্তাহ চলিয়া গেল। অজবার ফিরিয়া আসা পরের কথা—নরহরি এখন মাখমেরই ফিরিয়া না আসায় শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন। মাঠের কায অনেকটা সে আগাইয়া দিয়া গেছে বটে, তথাপি তাহার করিবার মত কায এখনও যথেষ্ট বাকি আছে। জগু রায় এত দিন তাহার হইয়া কায করিতেছিল, অন্য স্থানে আবদ্ধ থাকায় সপ্তাহ শেষে সেও চলিয়া গেল।

আশার মধ্যে মাখমের খুড়া অটল ও তাহার কন্যা ভাবিও আজও পর্য্যন্ত ফিরে নাই।

মাখমের ফেরার আশ্বাসটা তিনি দলুবাবুর কাছেই পাইলেন। অটল তাঁহাকে পত্র দিয়াছে, মাসের চব্বিশ দিনে তাহারা মাধনবাটীতে ফিরিয়া আসিবে। মাখম তাহাদেরই সঙ্গে আছে। সেও উক্ত দিবসে তাহাদের সঙ্গে ফিরিবে।

পত্রটাতে একটা চিন্তা করিবার বিষয় ছিল। অটল ফুলী সম্বন্ধে একটা কথাও লিখে নাই। ইহাতে বুঝিবার এই ছিল, মাখম হয় চিত্তের অস্থিরতায় শান্তিলাভের জন্য দুই চারি দিন কাযে কামাই করিয়া তাহার আত্মীয়গণের কাছে গিয়াছে, নয় ফুলীকে খুঁজিতে গিয়া বিফলমনোরথ হইয়াছে। হয় তাহার সন্ধান পায় নাই, নয় পাইয়াও তাহাকে ফিরাইতে পারে নাই।

সে দিন জ্যৈষ্ঠের বিশ তারিখ, তথ্য জানিতে হইলে আরও চারি দিন তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে হইবে বুঝিয়া নরহরি মাখমের পুনরাগমন প্রতীক্ষায় রহিলেন।

মধু পরীক্ষার মনোভাব জানিবার জন্য দলুবাবু যে বাউরীদের গ্রামে ফিরিবার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তাহা আর তাঁহাকে করিতে হইল না। সপ্তম দিনে মধুসূদন নিজেই তাঁহার ঘরে আসিয়া তাঁহার মনোভাব প্রকাশ করিয়া গেলেন।

তখন রাত্রির প্রথম প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। বাটীর বাহিরে একটি সুরচিত বৃহৎ চণ্ডীমণ্ডপ। এ দেশে তাহাকে দুর্গামেলা বলে। পৈতৃক ব্যবস্থায় বৎসর বৎসর ইহাতে দুর্গা পূজা হইয়া থাকে। পূজার ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য দলুবাবুর পূর্ব্বপুরুষ কর্ত্তৃক অনেক ভূমি-সম্পত্তি নির্দ্দিষ্ট আছে। মেলাটি তাঁহার ও জ্ঞাতিবর্গের সাধারণ সম্পত্তি।

সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অনেক লোকেরই এখানে সমাগম হয়। দুর্গা পূজার কয়টা দিন বাদে সারা বৎসর, কখন গান, কখন বাজনা, কখন তাস, কখন পাশা, নানাবিধ গল্প-গুজব, পরচর্চ্চা, মামলা-মোকদ্দমা ইত্যাদি নানা বিষয়ক কথায় মণ্ডপটি সর্ব্বদাই মুখরিত থাকে। এই সমস্ত নিত্য প্রতিপাল্য কর্ম্ম শেষ হইলে, কেহ কেহ হরিসঙ্কীর্ত্তনে যোগ দিতে, কেহ তুলসীদাসী রামায়ণ পড়িতে অথবা শুনিতে অন্য অন্য স্থানে চলিয়া যায়। রাত্রি নয়টার পর অনেক

সময় একমাত্র দলুবাবুই মালাটি ঘুরাইবার জন্য সেখানে বসিয়া থাকেন। সঙ্গের প্রভাব সময়ে সময়ে তাঁহারও উপরে ক্রিয়া করিত। তাঁহাকেও তাস-পাশা গল্প-গুজবে মধ্যে মধ্যে যোগ দিতে হইত। তবে তাঁহার নাম-জপে অনেকটা অনুরাগ ছিল। খেলার ভিতরে, গল্পের ভিতরেও মধ্যে মধ্যে তাঁহার মুখ হইতে সীতারামের নাম উচ্চারিত হইত।

সে দিন গল্পটা একটু বিশেষ রকমই জমিয়াছিল। বছর সতেরো পূর্ব্বে গ্রামের পচা মুচি একটা ঝিঙ্গেপুলি বাঘ মারিয়াছিল। বাঘটা কোথাকার কোন জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া কেমন করিয়া মাধববাটীর প্রান্তস্থ মাঠে আসিয়াছিল। আসিয়া পড়িয়াছিল সেটা দিনের বেলায়। চারিদিকে গ্রাম। বাঘটা সেই সব গ্রাম ভেদ করিয়া জঙ্গলে পলাইবার পথ পাইতেছিল না। সুতরাং যতক্ষণ না তাহার পলাইবার উপায় হয়, ততক্ষণ জীবনটা রক্ষা করিবার জন্য অজুমালে একটি হৃষ্টপুষ্ট ছাগকে সে মুখে পুরিয়াছিল। তাহার এই অপরাধে গ্রামের সমস্ত লোক তাহাকে বধ করিতে উদ্যত হয়। জনতার মধ্যে ছিলেন ভোজনানন্দ ভজু পরখে, দেশের মধ্যে তাঁহার ভোজন-শক্তির একটা বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল। আট দশ সের ওজনের একটি পাঁঠা অবলীলাক্রমে তিনি উদরস্থ করিতে পারিতেন। যখন যেখানে যে ভোজের কথা তাঁহার কর্ণগোচর হইত, অনিমন্ত্রিত অবস্থাতেও তিনি সেখানে উপস্থিত হইতেন। পূর্ব্বরাত্রিতে ওইরূপ একটি ভোজে তিনি একটি ছাগের আপুচ্ছমস্তক উদরস্থ করিয়া সেই স্থান দিয়া ঘরে ফিরিতেছিলেন। আসিবার সময় মাঠের মধ্যে একটি বেশ ধড়-গোছের জনতা দেখিয়া, আবার একটি বিরাট ভোজের আয়োজন হইতেছে এই বিশ্বাসে কৌতূহলপরবশ হইয়া সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে ওই ঝিঙ্গাপুলি ব্যাঘ্রদর্শন। দর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই একটি পিতৃনাম সংযুক্ত বিকট চীৎকারে সেই আপুচ্ছমস্তক ছাগটাকে উদর হইতে মাঠে নিক্ষেপ করিয়া তিনি মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন।

এই সমস্ত কথা লইয়া সেখানে সকলে বেশ আনন্দ উপভোগ করিতেছিল। বাস্তবিকই পচা মুচি অসমসাহসিকতায় শুদ্ধ মাত্র লাঠির প্রহারে সেই বাঘটাকে হত্যা করে। এই ব্যাঘ্রহত্যায় তাহাকে সাহায্য করিয়াছিল ভৈরবা বাউরী। সে ছিল অজবার পিতা। সুতরাং বাঘ ও ভজু পরখে হই ওই গল্পকথা অজবায় আসিয়া পড়িল। এক জন ব "মধু পরখে অজবাকে আনতে লোক পাঠাইছে।"

কথাটা শুনিবামাত্র নরহরির ভ্রাতুষ্পুত্র গতি বলি উঠিল, "সে আসিলে তার হাড় চূর্ণ না করিয়া জলগ্র করিব না।" সেই কথায় তাহার সহচরবৃন্দ একবাক্যে সায় দিল।

দলুবাবু সমস্ত জানিয়াও না জানার মত প্রশ্ন করিলে "অজবাকে আনতে মধু খুড়ো কাকে পাঠিয়েছেন রে?"

কড়ু রাণা বলিল, "মাখম নিজে গিয়েছে, জ্যেঠাবাবু।"

দলুবাবু বলিলেন, "তাই বটে, মাখমাকে ক'দিন দেখতে পাচ্ছি না!" বলিয়াই গতিকে তিনি হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ রে গতি, তা হ'লে কেমন ক'রে তোর অজবার শাসন করবি?

রমানাথ গতির হইয়া উত্তর দিল, "তাতে কি, সে বেটা ত অপরাধী।"

দলুবাবু বলিলেন, "যদি তাদের আপনা-আপনির ভিতর মিল হয়ে যায়?"

এটা একটা ভাবিবার কথা বটে! নীচজাতীয়ের সমাজ— যদি সকল বাউরী অজবাকে ক্ষমা করে, আর ফুলী তাহার স্বামীর কাছে ফিরিয়া আইসে, তাহা হইলে ভদ্রলোকদিগের পক্ষে সে সম্বন্ধে মাথা ঘামাইবার বিশেষ যে প্রয়োজন আছে, অনেকেই সেটা মনে করিল না।

গোঁ ধরিয়া রহিল কেবল কয় জন যুবক। তাহারা অজবার এই গুরু অপরাধ উপেক্ষার চোখে দেখিতে চাহিল না।

কিন্তু মধু পরীক্ষা যখন সমস্ত জানিয়া অজবাকে আনিতে পাঠাইয়াছে, সে কি তাহার রক্ষার জন্য প্রস্তুত না হইয়াছে? তবে গ্রামের ষোল আনা লোক যদি অজবাকে শাসন করিতে যায়, একা মধু পরীক্ষা কি করিতে পারে?

অনেক বিচার-বিতর্কের পর কোনও একটা বিশেষ কিছু মীমাংসা যখন হইল না, তখন ওই বাউরীকুলের নামাল হইতে ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত কেহ উক্ত প্রশ্নের মীমাংসা করিবার প্রয়োজন বুঝিল না।

এই পরচর্চ্চা নিষ্পন্ন করিয়া সকলে নিজ নিজ কার্য্যে স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ মালা ঘুরাইয়া দলু

বাবুও বাড়ীর ভিতরে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময় সদরের দ্বার হইতে শব্দ উঠিল, "দলু বাবাজী ঘরে আছ ?"

কণ্ঠস্বর শুনিয়াই দলু বাবু বুঝিলেন, মধু খুড়া।

মালার থলিটি গলায় ঝুলাইয়া চণ্ডীমণ্ডপের সোপানের নিকটে আসিয়া তিনি বলিলেন, "আছি খুড়া, এসো।" মধুসূদন নিকটে আসিতেই তিনি তাহাকে মণ্ডপের উপরে উঠিয়া আসনে বসিতে অনুরোধ করিলেন।

মধুসূদন মণ্ডপে উঠিলেন না। উঠানে দাঁড়াইয়াই বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ হে দলু বাবু, গতে ছোঁড়া নাকি বলেছে, অজবা এখানে এলে সে তার হাড় গুঁড়ো ক'রে দেবে ?"

দলু বুঝিলেন, মেলায় বসিয়া ক্ষণপূর্ব্বে অজবার শাসন কথা লইয়া যাহারা তর্ক করিতেছিল, তাহাদেরই মধ্যে কেহ না কেহ মধু খুড়াকে লাগাইয়া চলিয়া গিয়াছে। গতির ও সেই সঙ্গে নিজেরও একটা কৈফিয়ৎ দিতে তিনি বলিলেন, "সেটা কথার কথা খুড়া, সে কথার কোনও মূল্য নাই। তবে তার শাসন যে প্রয়োজন, এতে খুড়ো সকলেরই প্রায় একমত।"

"কেন ? কিসের শাসন ? কি সে করেছে ? আর ওর জন্য অজবাকে যদি শাসন করতেই হয়, তা হ'লে সর্ব্বাগ্রে করতে হয় অনেক ভদ্রলোকের ছেলেদের। শুধু কি দেখছ তুমি একা অজবারই দোষ ? ছি ছি, নীচ ছোট লোকের কথা, তাই নিয়ে তুমিও কি না মাথা ঘামাচ্ছো ! কতকগুলা অসৎ সঙ্গে প'ড়ে, তোমারও মাথাটা কি খারাপ হয়ে গেল, বাবাজি ! শাসন করতে হ'লে, দলু বাবু, আগে নিজের নিজের ঘর শাসন করতে হয়।"

"ঘর শাসন করতে হয়, মানে কি খুড়া ?"

"আমার হাতে প্রমাণ আছে, দেখিয়ে দেবো।"

রমানাথ আহার করিতে ভিতরে গিয়াছিল। সেখান হইতেই মধুসূদনের তীব্র স্বর তাহার কানে প্রবেশ করিতেছিল। আহারে আর তাহার বসা হইল না। সে আসিয়া মণ্ডপের ভিতর দিকের দ্বারের কবাটের অন্তরালে কথা শুনিবার জন্য দাঁড়াইল।

মধুর শেষ কথা শুনিতেই তাহার অন্তর জ্বলিয়া উঠিল। সে অন্তরাল হইতে বাহির হইয়াই বলিয়া উঠিল, "যা মুখে আসে বল না, ঠাকুরদা।"

"কেন বল্‌বো না ? প্রমাণ হাতে আছে, দেখিয়ে দেবো—দেখিয়ে দেবো।"

"একটু মুখ সামলে কথা কয়ো ঠাকুরদা !"

"কেন ? সত্য কথা কইব, মুখ সামলাবো কি ! মারবি না কি ?"

"চল, কি প্রমাণ দেবে, দিতেই হবে। নইলে—"

বলিতে বলিতে রমানাথ মধুসূদনের দিকে চলিয়া আসিল। দলু বাবু তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। 'নইলে' বলিয়া সে কোনও একটা অসম্মানের কথা মুখ হইতে বাহির করিতেছিল। মুখে তাহার হাত দিয়া দলু বাবু তাহা রুদ্ধ করিয়া দিলেন এবং তিরস্কারের সঙ্গে ভ্রাতুষ্পুত্রকে বাড়ীর ভিতরে যাইতে আদেশ করিলেন।

মধুসূদন রমানাথকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "গতেকে বলিস্, অজবার হাড় ভাঙ্গা সে ত অনেক পরের কথা, মধু পরখের গায়ে একবিন্দু রক্ত থাকতে তার গায়ে সে যেন নখের আঁচড় পর্য্যন্ত দিতে না আসে।"

"দিলে কি হবে ?"

কথাটা বাহিরের দিক্ হইতে উঠিল। সকলেই বুঝিল, গতিও মধুসূদনের অনুসরণে আসিয়া দূর অন্তরাল হইতে তাহাদের কথা শুনিতেছে।

মধুসূদন মুখ ফিরাইয়াই বলিলেন, "কি হবে, দিয়ে দেখিস না !"

"আলবৎ দেবো। একবার তাকে পেলে হয়,—"

দেখিতে দেখিতে উভয়ে বিষম কলহ বাধিয়া গেল। যে যাহার প্রতি অপভাষার প্রয়োগ আরম্ভ করিল। এ দেশের পল্লীগ্রামে কলহে ভাষার প্রয়োগে অনেক সময় ইতর-ভদ্রের ভাষার বড় একটা প্রভেদ থাকে না। দলু বাবু উভয়কে শান্ত করিতে অকৃতকার্য্য হইলেন।

সর্ব্বশেষে মধুসূদন গতিকে বলিয়া উঠিলেন, "অজবাকে আমি এখনি এখানে নিয়ে আসছি। যদি বাপের বেটা হ'স, তবে গায়ে তার হাত ঠেকাতেই হবে।"

গতি বলিল, "নিয়ে এসো। তার হাড় এক ঠাঁই মাস এক ঠাঁই করতে না পারি, তা হ'লে আমি গোবিন্দ চট্টরাজের বেটাই নই। আর আমিও দেখবো—তুমি কত বড় বাপের বেটা, কেমন ক'রে তাকে রক্ষা কর।

এইখানেই উভয়ের কলহের সেই সময়ের মত অন্ত হইল।

একদিকে দলু বাবু প্রস্থানপর মধুসূদনের হাত ধরিয়া ফেলিলেন; অপর দিকে গতির মা পুত্রকে টানিয়া গৃহে লইয়া গেলেন। গণ্ডগোল শুনিয়া তিনি ঘর হইতে সেখানে ছুটিয়া আসিয়াছিলেন।

এ কলহের শেষ কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে, বুঝিতে না পারিলেও দলু বাবু এইটা বুঝিলেন, অজবা গ্রামে ফিরিয়া আসিয়াছে। তিনি রমানাথকে শুধু তিরস্কার করিয়া সে রাত্রির মত বিশ্রাম লইতে তাহাকে সঙ্গে লইয়া বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেলেন।

সে দিন অনেক রাত্রিতে বাঁকুড়া হইতে নরহরি গৃহে ফিরিলেন। আসিয়া সমস্ত কথাই শুনিলেন। তিনিও বুঝিলেন, অজবা ফিরিয়াছে। কলহের জন্য তিনিও ভ্রাতুষ্পুত্রকে যথেষ্ট তিরস্কার করিলেন। একটা নীচের জন্য মধু পরীক্ষার সঙ্গে অনর্থক ফৌজদারী বাঁধানো তিনি পছন্দ করিলেন না। তিনি গতিকে বলিলেন, "ওরূপ ভাবে অজবাকে শাসন করিতে গেলে আমাদিগকেই ফৌজদারীতে পড়িতে হইবে। কেন না, মধু পরীক্ষা তাহার মনিষকে রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টার কিছু মাত্র ত্রুটি করিবে না। তা না করিয়া, মাখমা ফিরিলে তাকে দিয়া অজবার নামে ফৌজদারী আদালতে নালিশ করাইব। কেন না, অজবা মাখমার বিবাহিতা স্ত্রীকে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। তাতে অজবার মেয়াদ যে হইবে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।"

এরূপ শাসন অজবাকে প্রহার করা অপেক্ষা অনেক গুণে কঠোর, ইহা বুঝিয়া গতিকৃষ্ণ তাহাকে প্রহারের সঙ্কল্প ত্যাগ করিল।

১৩

পরদিন প্রাতঃকালে নরহরি নিজেই দেখিতে পাইলেন, অজবা মধু মামার মাঠে লাঙ্গল দিতেছে। তিনি তখন গতি ও রমানাথ উভয়কেই ডাকাইয়া তাহার প্রতি কোনওরূপ অত্যাচার করিতে নিষেধ করিলেন। বলিলেন, মাখমা ফিরিলে যাহা কর্ত্তব্য, তিনিই করিবেন। উভয়কে উপদেশ দিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইলেন না, তাহাদের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে দলু বাবুকে উপদেশ দিয়া বাঁকুড়ায় চলিয়া গেলেন। গ্রামবাসীরাও ক্রমে জানিল, অজবা ফিরিয়াছে। কিন্তু ফিরিয়াছে সে একা। ফুলী তাহার সঙ্গে আসে নাই। লোকের কাছে লাঞ্ছিত হইবার ভয়ে সে নিজের ঘরে আসে নাই, মধু পরখের বাড়ীতেই আশ্রয় লইয়াছে।

ফুলী সম্বন্ধে জানিবার কৌতূহল সকলেরই মনে জাগিয়াছিল। কিন্তু মধু ঠাকুর তাহাকে সারাদিন এমন করিয়া আগুলিয়া রহিলেন যে,কাহারও কৌতূহলনিবৃত্তির সুযোগ ঘটিল না।

গ্রামের প্রায় সকলেই বুঝিল, ফুলী আবার তাহার স্বামীর কাছে ফিরিয়া গিয়াছে। এই বুঝাটুকু সম্বল করিয়া তাহারা মাখমের আগমনের প্রতীক্ষায় রহিল।

চতুর্থ দিবসে গ্রামের সমস্ত বাউরী নামাল হইতে ফিরিয়া আসিল। মাখমও তাহাদের সঙ্গে আসিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা, ফুলী তাহাদেরও সঙ্গে আসিল না। শুধু তাহাই নহে, প্রশ্ন করিয়া তাহারা জানিল, মাখম অথবা তাহার সঙ্গীরা কেহই বলিতে পারিল না, কোথায় সে।

এই সংবাদ শুনিয়া নরহরিও বিস্মিত হইলেন। গতি, রমানাথ ও তাহাদের সঙ্গীরা ত অবাক্ হইয়া গেল। তবে কি ফুলী অজবার সঙ্গে পলাইয়া যায় নাই?

ফুলীর সঙ্গে সাক্ষাতের কথা মাখম কাহাকেও জানায় নাই। ভাবিনীকেও সে নিষেধ করিয়া দিয়াছিল। তাহাদের সঙ্গী বাউরীরা পর্য্যন্ত ফুলী-তত্ত্ব অবগত হয় নাই। তাহারা এই টুকুমাত্র বুঝিয়াছিল, মাখম ফুলকুমারীর অন্বেষণে আসিয়াছিল, কিন্তু তাহার সন্ধান পায় নাই।

নরহরিও মাখমকে ফুলীর কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। প্রথমে মাখম বলে নাই, অসঙ্কোচে সমস্ত সত্য গোপন করিয়াছিল। কিন্তু তাহার মুখের ভাব মাঝে মাঝে তাহার অন্যমনস্কতা, কাযে অনাস্থা ইত্যাদি দেখিয়া এক দিন তাহাকে নির্জ্জনে ডাকাইয়া অসঙ্কোচে সমস্ত কথা তাঁহার কাছে প্রকাশ করিতে বলিলেন।

প্রশ্নে মাখম বিপুল উচ্ছ্বাসে কাঁদিয়া ফেলিল এবং আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা তাহাকে শুনাইয়া দিল।

ঘটনার বর্ণনায় ফুলীর উপর মাখমের প্রেমের গভীরতা উপলব্ধি করিয়া নরহরি মাখমের দুরবস্থায় বিশেষ কাতর হইলেন। তাহাকে আশ্বস্ত করিতে বলিলেন, "তুই যদি তাকে ঘরে নিতে চাস্, বল্। আমি তাকে আনা করাবার ব্যবস্থা করি।"

ক্ষণিকের জন্য নিস্তব্ধ থাকিয়া মাখম বলিল, "কোথায় আছে সে, কি ক'রে জানবে হুজুর?"

"সে যেমন ক'রে জানি না কেন, তোর ভাবনা কি? আমি বুঝতে পারছি, অজবা কোথাও তাকে লুকিয়ে রেখে এসেছে। চাষের কাযটা তুলে দিয়েই বেটা সেখানে চ'লে যাবে।"

"কথাটা মনে নিচ্ছে, হুজুর!"

"যেখানে তাকে লুকিয়ে রাখুক না কেন, আমি তার সন্ধান পাব।"

মাখম চুপ করিয়া রহিল।

নরহরি তাহার নীরবতার অর্থ না বুঝিয়া বলিলেন, "আর যদি অজবাকে জব্দ করতে চাস্ ত বল্, তোকে দিয়ে তার নামে ফৌজদারী করিয়ে দিই।"

"তাতে কি হবে, হুজুর?"

"তোর বিয়ে করা স্ত্রীকে সে চুরি ক'রে নিয়ে গেছে। প্রমাণ হ'লেই তোর ফুলীও ফিরে আসবে, তারও মেয়াদ হবে।"

"অজবার মেয়াদ হবে?"

"নিশ্চয়। তোর বিয়ে করা স্ত্রী নয়, এ কথা ত গ্রামের কেউ হলফ ক'রে বলতে পারবে না। গাঁয়ের পোনের আনা লোক তোর বিয়েতে নাচনীর নাচ দেখেছে। কি বলিস্? মোকদ্দমা করবি?"

মাখম একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া মাথা নাড়িল।

"আমার কথায় অবিশ্বাস করছিস্?"

"না হুজুর। তবে অজবাকে মেয়াদ দিলে ফুলী যে কষ্টে পড়বে!"

ফুলী তোর কাছে ফিরে আসবে, কষ্টে পড়বে কেন? নিজের ইচ্ছায় সে আস্তে না চায়, হাকিম পেয়াদা সঙ্গে দিয়ে তাকে তোর ঘরে পাঠিয়ে দেবে। কি করবি বল্— আ ম'ল, চুপ ক'রে রইলি কেন?"

"হাকিম ফুলীকে ডিক্রি দিতে পারে, তার ভালবাসা ত ডিক্রি দিতে লারবেক্!"

"পাগলের মত যা তা বলিস্ নি মাখমা, তুই তাকে ঘরে নিতে চাস্?"

"আমি ত নিতে চাই হুজুর—"

"তাই বল্, আমি তাকে আনা করাই।"

আবার একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া মাখম বলিল, "দেখে মনে হ'ল, সেও যেন ফিরে আসতে চায়।"

"তবে তাকে ফিরিয়ে আনতে তোর আপত্তি কি? তোর সমাজে তাকে নেবে না? সমাজে তাকে তোলবার জন্য যা কিছু খরচ লাগবে, আমি দেবো।"

"হুজুর, তার ফিরে আসবার আর উপায় নেই।"

"উপায় নেই?" অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত নরহরি মাখমকে প্রশ্ন করিলেন। "উপায় নেই—মানে কি মাখমা?"

হাঁটুর ভিতরে মাথা লুকাইয়া মাখম ডুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল, প্রভুর প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না।

বুদ্ধিমান্ নরহরি মাখমের এই ক্রন্দনে ও উত্তর দেওয়ার সঙ্কোচে একবারেই বুঝিয়া ফেলিলেন, অভাগিনী অবৈধ সংসর্গে গর্ভবতী হইয়াছে। তাহা হইলে সত্যই তাহার স্বামীর কাছে ফিরিবার উপায় নাই। অজবাকে জেলে প্রবেশ করাইলে ফুলী যে কেন কষ্ট পাইবে, সেটাও বুঝিতে বাকি রহিল না। কিছুক্ষণ তাঁহাকে দাঁড়াইয়া ভাবিতে হইল; ভাবিতে হইল, এই নীচজাতীয়ের সঙ্গে সেই নীচজাতীয়ার স্নেহের সম্বন্ধ। মাখম ফুলীকে পাইতে এখনও ব্যাকুল! হঠকারিতায় একটা কায করিয়া ফুলীও এখন অনুতপ্ত! সেও স্বামীর কাছে ফিরিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে। তাঁহার অনুমান নিশ্চিত করিবার জন্য মাখমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই তোর স্ত্রীর মুখে শুনেছিস্, না আর কারও মুখে?"

"সে নিজেই বলেছে।"

"ও রকম অবস্থাতে কি তাকে ঘরে আনতে পারিস্ না?"

"না ত!"

"তবে আর তার জন্য হা-হুতাশ ক'রে শুকিয়ে মরছিস কেন? যখন জানছিস্ তোদের দু'জনের ইচ্ছা থাকলেও তার সঙ্গে ঘর করবার তোর উপায় নেই, তুই একটা সাঙা কর।"

"করব হুজুর।"

"করব কি, যত শীগগির পারিস্। এমনই ক'রে উদাসী হ'য়ে কত দিন থাকবি?"

"ভাবিও ওই কথা বলেছে।"

"যে তোকে স্নেহ করে, সেই ওই কথা বলবে।"

মাখম আশ্বস্তের ভাব দেখাইল।

অজবার শাসন আর কোনও মতেই চলিতে পারে না বুঝিয়া নরহরি মাখমকে আবার সংসারী হইতে উপদেশ

দিলেন এবং ওই বিধবা-বিবাহের সমস্ত ব্যয়নির্ব্বাহে প্রতিশ্রুত হইলেন।

১৪

অজবার সঙ্গে যখন ফুলী আসিল না, আর সেই জন্য মাখমাতেও সামান্যমাত্রও উত্তেজনা দেখা গেল না, তখন গ্রামে অতি অল্পদিনের মধ্যেই ফুলীর কথা নিবিয়া গেল। বাউরীদের মধ্যে সে সম্বন্ধে বিশেষ একটা তর্ক-বিতর্ক উপস্থিত হইল না। জ্যৈষ্ঠের শেষ হইতেই সে বৎসর বর্ষার আরম্ভ হইয়াছিল। বাউরী স্ত্রী-পুরুষ সকলেই তখন বিশেষ রূপেই মাঠের কাযে লিপ্ত। দিনের কঠোর পরিশ্রমের পর ওই সব কথা লইয়া আলোচনায় কাহারও আর সাধ্য থাকিত না।

অজবা মাধববাটীতে আসিয়া অবধি মনিবের গৃহেই অবস্থিতি করিতেছিল, তাহার নিজের গৃহে বাস করিতে আসে নাই।

গ্রামের অনেকেই, বিশেষতঃ গতি রমানাথ প্রভৃতি যুবক-বৃন্দ মনে করিয়াছিল, চিরকাল যাহা হইয়া থাকে, স্বামি-ত্যাগিনী তাহার পলায়নের সহচরকে ত্যাগ করিয়া গণিকাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে, অথবা এমন এক জনকে আশ্রয় করিয়াছে, যাহার বিশ হাত দূরে দাঁড়াইতে বাউরী অজবার সাহস নাই।

ফুলীর কথা লোকের মুখ হইতে শুধু মিলাইল না, মাস দুইয়ের মধ্যে তাহাদের মন হইতেও মুছিয়া গেল।

মুছিল না কেবল মাখমের মন হইতে। অজবাকে দেখিলে সে মুখ ফিরাইয়া লইত। অজবাও তাহাকে দেখিতে ভয় পাইত। দেখিলে দূর হইতেই সরিয়া পড়িত।

তিন মাস অতিবাহিত হইয়া গেল, চাষের কায শেষ হইল। মাখম যাহা মনে করিয়াছিল, তাহা হইল না—ফুলীর কাছে যাইবার জন্য অজবার কোনও আগ্রহ সে দেখিতে পাইল না। বরং, চাষের সময়টা উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই, মনিবের ঘর ছাড়িয়া সে গাঙ্গলিগোড়ের পাড়ে নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিল।

ইহার পূর্ব্বে মাখম অন্তরাল হইতে অনেক বার অজবার গতিবিধি লক্ষ্য করিয়াছিল। আকাশের অবস্থায় কখন কখন মাঠে লাঙ্গল দিবার সুবিধা হয় না। মাখম সেই সেই দিন আগ্রহের সহিত লক্ষ্য রাখিত, অজবা গ্রাম ছাড়িয়া ফুলীর লুকান স্থানে যায় কি না। লক্ষ্য করিয়া সে বিশেষ কিছু বুঝিতে পারে নাই। পূর্ব্বে প্রায় প্রতিদিন অজবা কদমাহাটিতে গিয়া পচাই পান করিত। এ কয় মাস সে তাহাকে তাহাও করিতে দেখে নাই।

এই সমস্ত কারণে মাখমের মনে স্বতঃই একটু সন্দেহ জাগিয়াছিল। অজবা ঘরে ফিরিতেই তাহার সন্দেহ বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইল।

মাখম অজবাকে শুধু ঘরে ফিরিতে দেখিল না। সে দুই এক দিন তাহার ধাম্‌সা বাজানো শুনিতে পাইল। এক দিন অজবার বাঁশীর সুর তাহার কানে গেল। আর এক দিন সে শুনিল, অজবা মাতাল হইয়া অতি উল্লাসে গান গাহিতেছে।

শুনিয়া মাখমের সন্দেহ দৃঢ় হইল। তবে কি ওই পাপিষ্ঠটা ফুলীকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছে?

তথাপি সে মনকে বুঝাইল। অজবা নির্লজ্জ, গ্রামে ফিরিয়াছে। ফুলী লজ্জায় তাহার সঙ্গে আসিতে পারে নাই। চাষের কায শেষ করিয়া, ধান কাটিয়া, মনিবের খামারে তুলিয়া তাহার পর কাযে ইস্তফা দিয়া সে ফুলীর সঙ্গে পুন-র্মিলিত হইবে। তাহা করিলে মাঘ মাস পর্য্যন্ত তাহাকে মাধববাটীতে থাকিতে হইবে।

মাখম ওইরূপ বুঝিয়া মনকে কতকটা নিশ্চিন্ত করিল।

ভাবিনীও নিজের দিক্ হইতে অজবার আচরণ লক্ষ্য করিতেছিল, কিন্তু নিজের মনোভাব একটি দিনের জন্যও তাহার ভাইকে জানায় নাই। বউ ত জন্মের মত তাহাদের ছাড়িয়া গিয়াছে। আসিবার একান্ত ইচ্ছা থাকিলেও আর ত তাহার দাদার সংসারে ফিরিয়া আসিবার উপায় নাই! সুতরাং তাহার সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া লাভ কি?

অজবার একাকী ফিরিয়া আসায় তাহারও মনে প্রথমটা সন্দেহ জন্মিয়াছিল। অজবা কি বউকে ফেলিয়া আসি-য়াছে? অথবা বউ তাহাকে ত্যাগ করিয়া অন্য কাহারও আশ্রয় লইয়াছে?

সেও এই কয় মাস মনটাকে একরূপ বুঝাইতেছিল। কিন্তু অজবার ফুলকুমারী সম্বন্ধে নিশ্চিন্তভায় তাহারও মনে একটা ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হইল।

সে কয় দিন ধরিয়া অজবার ধাম্‌সা বাজানো, বাঁশীর

নাগিনক নৃত্য ছন্দ

আলাপ, স্ফূর্তির গান—সমস্ত শুনিল। আর সে মনকে বুঝাইতে পারিল না। তবে কি দানবটা তাহার ভ্রাতৃ-জায়াকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছে?

অজবার ওইরূপ গান শুনিতে শুনিতে নিজের ঘরের দাওয়ায় বসিয়া এক দিন সন্ধ্যার পর মাখম মাথাটি হেঁট করিয়া কাঁদিতেছিল। এমন সময় দূর হইতে সে ভাবিনীর স্বর শুনিল, "দাদা, ঘরে রইছিস্?"

তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া, মাথা তুলিয়া মাখম দেখিল, ভাবিনী তাহার কাছে আসিতেছে। সে উত্তর দিল, "রইছি রে!"

ভাবিনী একবারে ভাইয়ের সমীপস্থ হইয়া বলিল, "ব্যাপারটা কি বল্ দেখি।"

"কিসের ব্যাপার?"

"শুনতে পাচ্ছিস্ না?"

"অজবার গানের কথা বল্‌ছিস্?"

"বেহায়া বেটা কেমন ক'রে অত স্ফূর্ত্তি করছে?"

"তা আমি কেমন ক'রে বলব!"

"বউএর খবর কিছু পেয়েছিস্?"

"না। আর পেয়ে লাভ?"

"তা তো বুঝি! তবু যে মন বুঝে না রে! ও বেটা যে একা এলো—"

ভাবিনীর কথা শেষ না হইতেই মাখম বলিল, "যদিই আসে, তা তুই আমি কি করব?"

"আমার মনে নিচ্ছে, দুষ্টুটা তাকে ফেলে চ'লে এসেছে।"

"আবার!" ঈষৎ ক্রোধের বশে মাখম বলিল, "আবার! যদি ফেলেই আসে, তুই আমি কি করতে পারি!"

একটা দীর্ঘশ্বাসে ভাবিনী বুঝাইল, কিছুই সে করিতে পারে না। আর সে সম্বন্ধে কোনও কথা না কহিয়া ভাবিনী কেবল বলিল, "তোর খাওয়া হয়ে গেছে?"

"অনেকক্ষণ।"

ভাবিনী ফিরিল। কিছুদূর যাইতেই মাখম বলিল, "আমারও তাই মনে নিচ্ছে। কিন্তু ওকি তাকে ত্যাগ ক'রে আসতে পারে, ভাবি?"

ভাবিনী মুখ না ফিরাইয়াই বলিল, "ও নীচটা সব পারে।"

"ফুলীর সেই অবস্থায়?"

"ওর অসাধ্যি কিছু নেই রে ভাই!"

"মাঘ মাস না গেলে কিছু বলতে নারবো রে বোন্।"

চলিতে চলিতে ভাবিনী একবার মুখ ফিরাইল। তখন সে অনেকটা দূরে গিয়াছে। সেই স্থান হইতে ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে সে বলিল, "মনিব যখন সব খরচ দেবে বলেছে, তখন সাঙ্গা করতে আর দেরি করছিস্ কেন?"

"এর ভিতর সময় পেলুম কখন যে, সাঙ্গা করব।"

"বেশ ত, এখন ত সময় হয়েছে, এখন বিয়ে করতে ত দোষ নেই।"

অন্যমনস্কের ভাবে মাখম উত্তর দিল, "দোষ কি?"

"তা হ'লে কথা আবার পাড়ি? এ ভাদ্র মাসের ক'টা দিন বাদে, আশ্বিনের গোড়ায় গোড়ায় একটা ভালো দিন দেখে—কি বলিস্?"

"ও আর বলাবলি কি রে?"

"দেখিস, সেবারে কথা দিয়ে রাখতে নারলি, এবারেও যেন তাই না হয়!"

"কিসের লেগে আর হবে রে?"

ভাবিনীর উচ্চ স্বর তাহার পিতা অটলের কর্ণগোচর হইল। ভাবিনী ফিরিতেই সে জিজ্ঞাসা করিল, "মাখমার সঙ্গে তোর কি কথা হচ্ছিল রে?"

ভাবিনী বলিল, "সাঙ্গার কথা।"

"ও সাঙ্গা করবে?"

"এই ত আমাকে বললে।"

অটলের এ কথাটায় কেমন বিশ্বাস হইল না। সে তখন নিজে গিয়া মাখমকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ রে, মাখমা!"

ভাবিনীর প্রস্থানের পরেই আবার মাখম সেইরূপই মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া ছিল। খুড়ার কথা শুনিতেই সে মাথা তুলিয়া উত্তর দিল, "কি খুড়া?"

"তুই সাঙ্গা করবি?"

"না তো!"

ভাবিনী বাপের পিছন পিছন আসিয়াছিল, এই কথা শুনিয়াই সে বিস্মিত ভাবে বলিয়া উঠিল, "তবে তুই আমাকে কি বললি?"

মাখম বলিল, "কি বললুম?"

অটল বলিল, "আর শুন্‌তে হবে না ভাবি, চল। ও যা বলেছে, আমি তা না শুনেও শুনেছি।"

১৫

তথাপি ভাবিনীর অবিরাম অনুরোধের উৎপাতে, মাখমকে স্বীকার করিতে হইল, সে ভাবিনীর বিধবা ননদীকে বিবাহ করিবে। সত্যই ত সংসারে যখন তাহাকে থাকিতেই হইবে, তখন তাহার ভব-ঘুরের অবস্থায় চিরটা কাল থাকিলে চলিবে কেন ? এক রকমে ত আর দিন যাইবে না, শরীরের অসুখ বিসুখ আছে ত ! তখন কে তাহার সেবা করিবে ? ভাবিনী ত সকল সময়ে তাহার কাছটিতে বসিয়া থাকিতে পারিবে না। পেটের চিন্তায় তাহাকে ত এদিক্ ওদিক্ কায খুঁজিয়া ঘুরিতে হইবে !

ভাবিনীর নির্ব্বন্ধে পড়িয়া মাখম বিবাহে সম্মত হইল। তবে ভাবিনী ভাইয়ের বিবাহ যতটা শীঘ্র দিবে মনে করিয়াছিল, তত শীঘ্র হইল না। মাখম আশ্বিনে বিবাহ করিতে চাহিল না। ভগিনীকে আশ্বাস দিল, হয় অগ্রহায়ণ, নয় মাঘ এই দুই মাসের মধ্যে যেটায় সুবিধা বুঝিবে, সেই মাসে বিবাহ করিবে।

ভাদ্র ত গেলই, আশ্বিন, কার্ত্তিকও চলিয়া গেল, অজবার গ্রামত্যাগের কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। বরং পূর্ব্বে পূর্ব্বে, এর ওর তার সঙ্গে কথায়, তাহার একটুকু আধটুকু যা সঙ্কোচ ছিল, ক্রমে ক্রমে সে সঙ্কোচও তাহার চলিয়া গেল। এখন তাহার পূর্ব্বের স্ফূর্ত্তি একরূপ পূর্ণ মাত্রায় ফিরিয়া আসিয়াছে।

-ইহার মধ্যে গ্রামের কেহই কি তাহাকে ফুলকুমারী সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন করে নাই ? করিয়া থাকিতে পারে। সত্য হউক, মিথ্যা হউক, অজবা সেই প্রশ্নের যে কোনও একটা উত্তর দিলেও আজিও পর্য্যন্ত তাহা মাখমের কর্ণগোচর হয় নাই। এখনও পর্য্যন্ত মাখমের বিশ্বাস, এই সমস্ত স্ফূর্ত্তির মধ্যেও অজবা ফুলকুমারীর সঙ্গে পুনর্ম্মিলিত হইবার দিন গণিতেছে।

ইতোমধ্যে ভাবিনী ছাতার কানালি গ্রামে যাইয়া সাঙ্গার কথাটা একরূপ ঠিক করিয়া আসিয়াছে। কথাটা পাকা হইতে সামান্য মাত্র বাকি আছে। অলঙ্কারপত্র মাখমকে যাহা দিতে হইবে, তাহার জন্য বাধিবে না। প্রভু নরহরি সর্ব্ববিষয়ে তাহাকে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। একবার মাত্র কন্যাটিকে মাখমের নিজের চোখে দেখা এবং তাহার সঙ্গে দুই একটা কথা কওয়া। ফুলকুমারীর সেই কথা, 'তোকে আমার ভালো লাগতো না' শেলের মত মাখমের হৃদয়টা বিদ্ধ করিয়া দিয়াছিল। মনের দুঃখ মনেই রাখিয়া বালিকা অবস্থা হইতেই সে তাহার চির-অপ্রিয়ের সঙ্গ করিয়া আসিতেছিল। বাহির হইবার সুযোগ সে পায় নাই, তাই সে বাহির হয় নাই। এ মেয়েটার বেলায়ও যদি তাহাই হয় ! এখন ত আর সে বালিকা নয়। তার চোখ ফুটিয়াছে। অনেকটা ভালমন্দ বুঝিবার শক্তিও তাহার জন্মিয়াছে। তাই মেয়েটির সঙ্গে দেখা ও কথাবার্ত্তা করিয়া মাখমের জানার প্রয়োজন, ভাবিনীর ননদীর তাহাকে ভাল লাগিল কি না। ভাল তাহার লাগে—তাহাকে সে বিবাহ করিবে ; না লাগে, তাহার সংসারে কলঙ্কের পুনরভিনয় সে দেখিতে চায় না। অগ্রহায়ণ মাসে মাখমের ছাতার কানালি যাইবার সুবিধা হইল না। তখন মাঠে ধান কাটার কার্য্য আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। পৌষের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত তাহার আর অবকাশ থাকিবে না।

ভাবিনীও সেটা বিলক্ষণ জানিত। তাই দাদাকে তাহার শ্বশুর-গৃহে যাইবার জন্য পীড়ন না করিয়া সে একদিন নিজে সেখানে যাইয়া তাহার ননদীকে মাধববাটীতে ধরিয়া আনিল। এইরূপে সে উভয়ের মধ্যে সাক্ষাতের সুযোগ করিয়া দিল।

তাহার সঙ্গে কিয়ৎক্ষণের কথায় মাখম তাহার নিকট হইতে ভালবাসাপ্রাপ্তি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইল।

এইবারে ভাবিনী তাহার শ্বশুরের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া স্থির করিল, মাঘমাসের প্রথমে যে কোনও শুভদিনে তাহার ননদীকে দাদার বধূ করিয়া দিবে।

কিন্তু অগ্রহায়ণ শেষ হইতে না হইতে এক দিন সন্ধ্যায় ভাবিনী ও মাখম উভয়েই অজবার বাড়ীতে হঠাৎ লোকসমাগম দেখিতে পাইল।

পর দিন প্রাতঃকালে তাহার কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া ভাবিনী যাহা শুনিল, তাহাতে সে একবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। সে শুনিল, অজবা অতি সঙ্গোপনে ছাতার কানালিতে গিয়া তাহাকে সম্পূর্ণরূপে লুকাইয়া তাহার ননদীকেই সাঙ্গা করিয়া আসিয়াছে।

বাউরী যুবতীদিগের চিত্তাকর্ষণ করিবার অনেকগুলা গুণ অজবার ছিল। যে 'বাউরি-কাটা' চুল এখন ভদ্র যুবকগণের মধ্যে বিশেষভাবে প্রচলিত হইয়াছে, সেটা বিশেষরূপেই অজবার মাথার শোভা সম্পাদন করিত। তাহার উপর বাউরীদের মধ্যে গায়ক বলিয়া তাহার একটা প্রসিদ্ধি ছিল। সে সুন্দর বাঁশী বাজাইতে পারিত। সবার উপর এমন অদ্ভুত সে ধাম্‌সা বাজাইতে পারিত যে, 'নাচনীর' নাচের সঙ্গে তালে তালে নৃত্য করিতে করিতে যখন দুই হাতে দুইটা কাঠির সাহায্যে সে তাহার বাদ্যযন্ত্রের চর্ম্মকে মুখরিত করিয়া তুলিত, তখন শুধু বাউরি-অঙ্গনা কেন, পুরুষরা পর্য্যন্ত মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারিত না।

একটা বিবাহ উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া অজবা ছাতার কানালি গিয়াছিল। সেখানে নাচনীর নাচে সে ধাম্‌সা বাজাইয়াছিল। সেই বাদ্য শুনিয়া ও অজবার চিত্তাকর্ষক মূর্ত্তি দেখিয়া ভাবিনীর ননদী তাহাতে আকৃষ্ট হয়। তাহার ফলে উভয়ের বিবাহ।

শুধু রূপ-গুণের আকর্ষণেই যে এ বিবাহ হইয়াছিল, তাহা নহে; কেন না, ভাবিনীর শ্বশুর ত শুধু উক্ত কারণে মুগ্ধ হইবে না। অজবা এই সাঙ্গা করিতে তাহার কন্যাকে যে অলঙ্কার দিয়াছিল, তাহা তাহার পুত্রবধূর ভাইয়ের দেয় অপেক্ষা মূল্যে অধিক, তথাপি বিশেষ গোপনে সে কন্যার বিবাহ নিষ্পন্ন করিয়াছিল। করিয়াছিল, যাহাতে ভাবিনী অথবা তাহার ভাই না জানিতে পারে।

মাথমও এ সাঙ্গার কথা শুনিল। শুনিতেই তাহার মর্ম্ম-জ্বালা অগ্নিশিখারূপে তাহার দেহের প্রতি লোমকূপ দিয়া যেন বাহির হইয়া গেল।

এ জ্বালা ভাবিনীর ননদীকে অজবার বিবাহের জন্য নহে। তাহার আর বিবাহ করিবার ইচ্ছা ছিল না। শুধু স্নেহময়ী ভগিনীর একান্ত অনুরোধে সে বিবাহে স্বীকৃত হইয়াছিল। ভাবিনী যে প্রতি সন্ধ্যায় দাওয়াটিতে তাহার ভাইয়ের সেই মাথায় হাত দিয়া একাকী বসিয়া থাকা দেখিতে পারিত না।

তাহার ননদীর অন্যকে বরণ করায় প্রকৃতই সে হাঁফ ছাড়িয়া যেন বাঁচিল। বিশেষতঃ তাহার সঙ্গে কথাবার্ত্তার পর সেই মেয়েটাকে অপরের হাতে হাত দিতে দেখিয়া নারীকে জীবনের সঙ্গিনী করিতে আর তাহার প্রবৃত্তি রহিল না।

মর্ম্ম তাহার জ্বলিয়া উঠিয়াছে—ফুলীর জন্য। এ পাষণ্ড তবে কি তাহাকে বিদেশে বিভূমে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে? আসিয়াছে—তাহার সেই গর্ভবতী অবস্থায়?

ফুলকুমারীর কথা মনে উঠিতেই মাথমের মাথাটা ঘুরিয়া গেল। বিশেষতঃ সেই অসহায়া অভাগীর কি হইয়াছে—কোথায় সে, কিরূপ অবস্থায় সে, বাঁচিয়া আছে কি মরিয়াছে, এই সব জানিবার জন্য সে যেন ক্ষিপ্তের মত হইয়া গেল।

ভাবিনী পূর্ব্বাহ্ণে এই সংবাদ পাইয়াছিল। মাথম শুনিল, অপরাহ্ণে—মনিবের গৃহ হইতে নিজের ঘরে ফিরিবার সময়ে —পথে।

ঘরে আসিয়াই সে উত্তেজিত কণ্ঠে ডাকিল, "ভাবি!"

উক্ত সংবাদ শুনিবার পর অবধি ভাবিনী ননদী ও শ্বশুরের আচরণ স্মরণ করিয়া মরমে মরিয়া গিয়াছিল। ভাইয়ের সঙ্গে আর সে দেখা করিতে সাহস করে নাই।

ভাইয়ের উত্তেজিত কণ্ঠের আহ্বান যখন তাহার কানে ঠেকিল, তখন সে সত্য সত্যই একবারে মরার মত হইয়া গেল। তাহার উত্তর দিবার কথা জোগাইল না। সমস্ত দিনটা ধরিয়া হরির কাছে সে মানত করিতেছিল, দাদা যেন ঐ বিবাহের কথাটা শুনিতে না পায়। এ কথা দাদার অবিদিত থাকিবে না জানিয়াও স্ত্রী-স্বভাববশে সে ঐরূপ করিয়াছিল। কি জানি, কেন তাহার মনে হইয়াছিল, মাথমের ঐ কথা শোনায় একটা বিষম অনর্থের সৃষ্টি হইবে। মাথমের ডাকার ভাবেই ভাবিনী বুঝিতে পারিল, সংবাদ তাহার ভাইয়ের কর্ণগোচর হইয়াছে। শুধু তাহাই নয়, সে যাহা ভয় করিয়াছিল, ভাই সংবাদ শুনিয়া বিশেষভাবেই উত্তেজিত হইয়াছে।

"ভাবি, ভাবি, ভাবি—"

ভাবিনী আর স্থির থাকিতে পারিল না। সে মাথমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চলিল। ঘর ছাড়িয়া মাথমের ঘরের দিকে কিছু দূর আসিতেই সে দেখিল, ভাই তাহার লম্বভাবে উপর দিকে মুখ করিয়া দাওয়ার উপর শুইয়াছে।

"আরে মর, তুইও ম'রে গেছিস্ নাকি—ভাবি?"

"অমন ক'রে শুয়ে থাকিস্‌নে দাদা, ওঠ।"

মাথম উঠিয়া বসিতেই তাহার মুখের পানে একবার মাত্র চাহিয়াই ভাবিনী ডুকারিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

"কাঁদছিস্ কেন, একটা কথা তোকে বলবার জন্য

ডেকেছি,—আরে মর্, কাঁদতে লাগলি কেন? কাঁদবার ব্যাপার কি হয়েছে?"

"এমন বিশ্বাসঘাতকি করবে, কেমন ক'রে জানবো?"

"কে করলে রে বিশ্বাসঘাতকি? তোর ননদ? না রে, সে ঠিক করেছে।"

"আমাকে এত কথা ব'লে শেষকালে আবাগী—"

"আবার! ঠিক করেছে রে, ঠিক করেছে। বিয়ে কর্‌তে আমার একেবারেই ইচ্ছা ছিল না। কর্‌লে আমি সুখী হতুম না। শুধু তোর জেদে রাজি হয়েছিলুম। হরি আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে রে!"

কোনও উত্তর না দিয়া ভাবিনী অঞ্চল দিয়া চোখের জল মুছিতে লাগিল। মুছা শেষ হইলে ননদীর উদ্দেশে, তাহার শ্বশুরের উদ্দেশে সে কতকগুলা গালিপাড়িতে লাগিল। হতভাগা শ্বশুর অন্য কোনও স্থানে কন্যার বিবাহ দিলে ভাবিনীর তত আক্ষেপ থাকিত না। অজবা সম্বন্ধে জানিয়া শুনিয়া তাহাকে কন্যা দিয়া সে তাহার ও তাহার ভাইয়ের মাথাটা মাটীতে লুটাইয়া দিয়াছে।

"বড় অপমানটা করলে, দাদা!"

"তা করেছে বটে, ভাবি! তবে তাতেও আমার কোনো দুঃখু নেই রে!" বলিয়া মাখম কিছুক্ষণের জন্য নীরব হইল।

অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়াও যখন ভাবিনী দেখিল, ভাই তাহার আর কোনও কথা কহিল না, তখন জিজ্ঞাসা করিল, "কি জন্য আমাকে ডাকলি, দাদা?"

উত্তরে মাখম বলিল, "নাঃ, তোকে দিয়ে হবে না। আমাকে নিজেই দেখতে হবে। যা ভাবি, ঘরে যা।" বলিয়াই মাখম উঠিয়া বসিল।

ভাবিনী বলিল, "কিছু যদি আমার কর্‌বার থাকে বল্।"

মাখম কোনও কিছু বলিল না দেখিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "কি দেখতে হবে তোকে? এমন কি কায যে, আমি পার্‌ব না?"

এ কথার কোনও উত্তর না দিয়া মাখম ভাবিনীকে প্রতিপ্রশ্ন করিল, "হাঁ রে ভাবি, তোর কি মনে হয়? ফুলীকে অজবা কি পরিত্যাগ ক'রেছে?"

"তার কথা আর তুলছিস্ কেন, দাদা? যদি তাকে ত্যাগই ক'রে থাকে, তা হ'লে তার ঠিক শাস্তিই হয়েছে।"

"ঠিক বলেছিস্ ভাবি, ঠিক বলেছিস্" বলিয়াই মাখম উঠিয়া দাঁড়াইল।

ভাবিনী তাহার উঠার ভাব বুঝিতে না পারিয়া বলিল, "উঠে দাঁড়ালি কেন?"

"ঠিক বলেছিস্ ভাবি, তার শাস্তি ঠিক হয়েছে।"

"বোস্ তুই, ভাত এনে দি, খা।"

"কিন্তু ও শালা তার সর্ব্বনাশ ক'রে কেমন ক'রে পরিত্যাগ ক'রে এলো, ভাবি?"

ভাবিনী ভাইয়ের ভাবটা কেমন কেমন দেখিয়া নিজের মনোভাব চাপিয়া অতি সাবধানে কথা কহিতেছিল। মাখমের এই কথা শুনিয়া সেও আর স্থির থাকিতে পারিল না। ব্যাকুলভাবে বলিয়া উঠিল, "শুধু ত্যাগ কর্‌লেও দুঃখ হ'ত না, দাদা। তাকে সেই অবস্থায় সেই বিদেশে ফেলে এসে বেটা কি না, এমন ক'রে আমোদ কর্‌ছে! তোর বুকে ছুরির ওপর ছুরি মার্‌ছে। এমন পাপিষ্ঠটাকেও তুই সাঙ্গাৎ করেছিলি!"

"ভাবি, তুই একটু থাক্, আমি একবার ঘুরে আসি", বলিয়াই মাখম এক লম্ফে দাওয়ার উপর হইতে উঠানে নামিয়া পড়িল।

"কোথায় যাবি?" ভাবি প্রশ্ন করিল।

উত্তর না দিয়া মাখম চলিল।

"না, না, এখন তোকে কোথাও যেতে হবে না।"

চলিতে চলিতে মাখম মুখ ফিরাইয়া বলিল, "তোর কি মনে হয়, ও শালা ফুলীকে মেরে ফেলেছে?"

"তা কি পারে! সেটা পারা কি সহজ কথা! কর্‌লে কি সে দেশে একটা হৈ চৈ প'ড়ে যেত না! কর্‌লে ওর এ রকম ক'রে আমোদ কর্‌বার সাহস হ'ত!"

"ঠিক, ঠিক।'

"যাচ্ছিস্ কেন? খাওয়া-দাওয়া কর্।"

"ফুলী ক'মাস চলে গেছে রে?"

"কেন আর তার কথা তুলছিস্ দাদা? ফিরে আয়।"

তথাপি মাখম চলিতে লাগিল দেখিয়া ভাবিনী ছুটিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "নাঃ! এখন কোথাও তুই যেতে পাবি না।"

"একবার সেই শালাকে জিজ্ঞাসা করব রে ভাবি?"

"নাঃ! তাকে কি জিজ্ঞাসা করবি? সে বেটা কি তোকে সত্যি কথা কইবে?"

ঠিক এই সময়ে অজবার বাড়ীর দিক হইতে একটা হাস্যকোলাহল উঠিল। মাখম ভাবিনীর হাত হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিল।

ভাবিনী দুই হাতে তাহার সমস্ত শক্তি দিয়া মাখমের হাত বাঁধিয়া বলিল, "আমাকে মেরে না ফেলে তুই যেতে পার-বিনি। দেখছি তোর মাথায় খুন চেপেছে। বেশী টানাটানি করলে বাপকে ডাকবো।"

এতক্ষণের পর মাখম যেন কতকটা প্রকৃতিস্থ হইল, বলিল, "যাব না ভাবি, হাত ছাড়্।"

"মিছে কইছিস্ না?"

"না।"

ভাবিনী ভাইয়ের হাত ছাড়িয়া দিল এবং তাহাকে আহার করিতে অনুরোধ করিল।

মাখম বলিল,"খেতে কিন্তু একেবারেই ইচ্ছা নেই, বোন।"

ভাবিনী বলিল, "যা পারিস্, ভাই!"

মাখমের মতি যে চঞ্চল হইয়াছে, এটা ভাবিনী তাহাকে দেখার একটু পরেই বুঝিয়াছিল, কিন্তু কতটা যে তাহার চাঞ্চল্য, ইহা সে বুঝিতে পারে নাই।

অনুনয়-বিনয়ে ভাইকে যখন সে আহার করাইতে বসাইল, তখন মাখম বিশেষ একটু উচ্ছ্বাসের সঙ্গেই বলিয়া উঠিল, "তাই ত রে ভাবি, তোর মত আপনার জন আমার এ পৃথিবীতে আর কেউ নেই রে!"

"সত্যই কি দাদা, তোর মাথায় আজ খুন চেপেছিল?"

মাখম কটিদেশ হইতে এক তীক্ষ্ণধার ছুরিকা বাহির করিল।

মোরগের লড়াই বাউরিদের মধ্যে একটা প্রধান কৌতুক। লড়াইয়ের সময় তাহারা মোরগের পায়ে ওইরূপ ছুরি বাঁধিয়া দেয়।

ভাবিনী মাখমের হাত হইতে ছুরি কাড়িয়া লইল।

১৬

ভাবিনীর কথায় মাখমের চিত্ত অনেকটা শান্ত হইল। ফুলকুমারীর চিন্তায় তাহার ত সত্যই কোনও লাভ নাই! মাখম মনে মনে বলিল, কেন তবে সেই অবিশ্বাসিনীর চিন্তায় আমার ইহকাল পরকাল নষ্ট করি? ভগিনীকে সে আশ্বাস দিল, আর সে কখন ওরূপ উত্তেজিত হইবে না।

অগ্রহায়ণ উত্তীর্ণ হইয়া গেল। যেন কোথাও কিছু হয় নাই, এইরূপ ভাবে মাখম তাহার দৈনন্দিন কার্য্য করিতে লাগিল।

ইতোমধ্যে ভাবিনী ভাইয়ের জন্য আর একটি মেয়ের সম্বন্ধ লইয়া আসিল। সেটিও বাল-বিধবা। দেখিতে সে তাহার ননদী হইতে অনেক ভাল। শুধু তাহাই নহে, তাহার বাপ বাউরী সমাজের মধ্যে একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিল। মৃত্যুকালে সেই ব্যক্তি তাহার কন্যাকে এক মরাই ধান ও কিছু নগদ টাকা দিয়া গিয়াছে। তাহার সঙ্গে সাঙ্গা হইলে মাখমকে হয় ত আর মনিষগিরি করিতে হইবে না। গ্রামের যে-সমস্ত ভদ্রলোকের দু'দশ বিঘা জমি আছে, অনেকেই তাহার সমস্ত অংশ নিজেরা চাষ করিয়া উঠিতে পারেন না। কতক জমি তাঁহারা সাজায় বিলি করেন। অর্থাৎ খাজনা, টাকার পরিবর্ত্তে ধান্যে আদায় করেন। কতক বিলি করেন ভাগে। জমি হইতে উৎপন্ন শস্যের একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ প্রজার নিকট হইতে তাঁহারা লইয়া থাকেন। মাখম যদি চাপাতোড়া গ্রামের ওই কন্যাটিকে গ্রহণ করে, তাহা হইলে ওইরূপ ভাগ চাষের জমি লইয়া কৃষিকার্য্যে নিজের অবস্থার অনেক উন্নতি করিতে পারিবে। বাউরিদের মধ্যে স্বাধীনভাবে কৃষিকার্য্য করিবার ভাগ্য কদাচ কাহারও ঘটিয়া থাকে।

এরূপ প্রলোভনের বিবাহ, মাখম অস্বীকার করিতে পারিল না। খুড়া অটলও তাহাকে অনুরোধ করিল এবং মাখমের ইচ্ছামত কন্যাটিকে দেখিতে ও তাহার আত্মীয়দের সঙ্গে কথার মীমাংসা করিতে চাপাতোড়া গ্রামে চলিয়া গেল।

আড়তের কাযের উপলক্ষে কিছুদিনের জন্য নরহরিকে পুরুলিয়ায় থাকিতে হইয়াছিল। সুতরাং মাখমের এই দ্বিতীয় লাঞ্ছনা সম্বন্ধে কিছুই তিনি জানিতে পারেন নাই। মাখমের বিবাহের ব্যয়-নির্ব্বাহ করিতে তিনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, বিবাহের বিলম্ব আছে জানিয়া তিনি তাহার কোনও ব্যবস্থা করিয়া যান নাই।

ঘরে ফিরিয়া সব কথা যখন তাঁহার কর্ণগোচর হইল, তখন তিনি মর্ম্মান্তিক দুঃখিত হইলেন। এ পরাভব মাখমের নহে, তাহা তিনি বেশ বুঝিলেন। অজবার এই বিবাহে মধু পরখের

চাল আছে। তাঁহাকে অপ্রতিভ করিবার জন্য মধু অর্থ অলঙ্কার সমস্ত দিয়া অজবাকে সাহায্য করিয়াছে। তিনি থাকিলে কিছুতেই এই বিবাহ হইতে দিতেন না।

তিনি বুঝিলেন, মাখমের নির্ব্বুদ্ধিতায় অজবাকে শাসন না করিয়া বিষম ভুল করিয়াছেন।

কিন্তু এখন আর তাহাকে শাসন করিবার কোনও উপায় নাই। ফুলকুমারীকে লইয়া অজবার পলায়নের পর বহুদিন অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। তার উপর যাহাকে উপলক্ষ করিয়া অজবার নামে ফৌজদারী করা হইবে, কোথায় সেই ফুলী?

তথাপি তিনি, মাখম কিম্বা অন্য কাহাকেও না বলিয়া, বাঁকুড়ায় গিয়া উকীলদের কাছে পরামর্শ গ্রহণ করিলেন। জানিলেন, অজবার অপরাধের বিচারে ফুলীর থাকার একান্ত প্রয়োজন।

আর কাহারও কাছে সন্ধান জানিবার সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া তিনি এক দিন মাখমকেই ফুলীর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি জানিতে পারিয়াছে কোথায় ফুলী?"

মনিবের মুখ হইতে ওইরূপ অভাবনীয় প্রশ্ন শুনিয়া মাখম প্রথমটা স্তব্ধের মত হইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ সে তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল মাত্র।

তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া নরহরি পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিলেন, "মুখের দিকে চাইছিস্ কি? তোর স্ত্রী কোথায় আছে জানিস্?"

সবিস্ময়ে মাখম বলিল, "তাকে দরকার কি হুজুর?"

নরহরি বলিলেন, "দরকার আছে।"

মাখম অবনত মস্তকে কেবল মাথা নাড়িয়া বুঝাইল, "কোনও দরকার নেই।"

"তোর নেই, আমার আছে। হতভাগা তখন যদি আমার কথা শুনতিস, ওই বদমায়েসটার নামে ফৌজদারী করতিস্, তা হ'লে এত দিন বেটা জেলে পচে মরতো। আমাকে এই অপমানটা ভোগ করতে হ'ত না।"

"আপনার অপমান? কে করলে হুজুর? অজবা?"

"অজবা আমার অপমান করবে কি রে মাখমা! করেছে মধু পরথে—মামা, ভাবির ননদের সঙ্গে সেই উদ্যোগ ক'রে অজবার বিয়ে দিয়েছে। নইলে অজবার বাবারও সাধ্য কি, তোকে অত গঞ্জনা দেবে। মামা বার বার আমার অপমান করছে। নির্ব্বোধ বেটা, শুধু তোর জন্যই আমি সে অপমানের শোধ নিতে পারছি না। জানিস্ ত বল্, কোথায় ফুলী। তুই না করতে চাস্, আমি তাকে দিয়ে সেই বেটার নামে ফৌজদারী করাবো। ওর আবার সাঙ্গা করার মজাটা টের পাইয়ে দেবো। কি ভাবতে লাগলি? জানিস্ ত বল্।"

মাখম উত্তর করিল, "জানি না হুজুর।"

"না জানিস্, জান্তে হবে। তাও বেশী দিন নয়, দু'চার দিনের মধ্যে। না পারিস্, আমার মনিষী আর তোকে করতে হবে না। তোর মত হতভাগা চাকরের জন্য আমি যে বার বার 'দায়াদে'র কাছে অপমান ভোগ করব, তা পারবো না। কি বলিস্, তার খোঁজ করতে পারবি? সে বেশী দূরে নেই। অজবা আশেপাশের কোন্ গাঁয়ে তাকে লুকিয়ে রেখেছে।"

নরহরির এটা বুঝা উচিত ছিল, নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামেই যদি অজবা ফুলীকে লুকাইয়া রাখিবে, ফুলীর প্রতি তাহার যদি ঐরূপই টান থাকিবে, তা হইলে সে আবার সাঙ্গা করিবে কেন? অভিমানের দিক দিয়া হিসাব করিতে তাঁহার ভুল হইয়া গেল। ফুলকুমারীর অনুসন্ধানে তিনি জিদের সহিত আবার মাখমকে আদেশ করিলেন। মাখম স্বীকার করিল না।

অতি কঠোর বাক্যপ্রয়োগে নরহরি এবার মাখমকে স্থান ও কার্য্যত্যাগে আদেশ করিলেন।

মাখম চলিয়া গেল।

গতি অন্তরাল হইতে তাহার খুল্লতাতের সঙ্গে মাখমের কথোপকথন শুনিতেছিল। মাখমের জড়তায় সেও ভিতরে ভিতরে বিশেষ ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। মাখম বাটীর সম্মুখদ্বারের বাহিরে আসিতেই তাহাকে প্রহার ও কটূক্তি প্রয়োগ করিয়া দূর হইয়া যাইতে আদেশ করিল।

নরহরি নিজে অতি শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন। অনেকটা কর্ত্তব্যের দিক দিয়া, কতকটা মধু পরীক্ষার সঙ্গে 'দায়াদ'সম্পর্কের অভিমানের মধ্য দিয়া অজবার শাসন তাঁহার একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। অথচ একমাত্র মাখমের জড়তার জন্য তিনি কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। সেই জন্য তাঁহার উত্তেজনা নিতান্ত অন্যায় হয় নাই। জাতি ও শিক্ষার অভিমানে আমরা অনেক

সময় নীচ, অস্পৃশ্য অশিক্ষিতের মনস্তত্ব উপেক্ষার চোখে দেখিয়া থাকি। কদাচ মনে করি, উচ্চ শিক্ষিতের ঘরে মাখমের মত ঐরূপ একটি দুর্ঘটনা যেরূপ মানসিক ঘাত-প্রতিঘাতের সৃষ্টি করে, স্বল্পবুদ্ধি অশিক্ষিতদের ভিতরে কখন সেই ঘাত-প্রতিঘাতের সৃষ্টি করিতে পারে না। অন্য ভদ্রলোকদিগের মত নরহরিও ফুলকুমারীর পরিত্যাগ নীচের ঘরের নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনার একটা উদাহরণ মনে করিতেন। তাই এতদিনের মধ্যে এক দিনও বাক্-সম্পদহীন ভৃত্যের হৃদয়ের দিকটা তিনি লক্ষ্য করেন নাই। কখনই মনে করেন নাই, স্ত্রীর পলায়ন মাখমের হৃদয়ে কঠোরভাবে আঘাত করিয়াছে। তাহার স্ত্রী হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার বিষাদ ক্ষণিক, ভাবিনীর ননদকে বিবাহ করিতে মাখমের অনিচ্ছার কথা শুনিয়া, তাঁহার এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল। তবে মাখমের মুখ হইতে উচ্চারিত দুই একটা কথা তাঁহার কানে ঠেকিয়াছিল। 'অজবাকে জেলে দিলে ফুলী যে কষ্ট পাবে!' 'হাকিম ফুলীকে ডিক্রী দিতে পারে, কিন্তু তাহার ভালবাসা ত ডিক্রী দিতে পারে না।' কথাগুলা তাঁহার কানে ঠেকিয়াছিল মাত্র। মাখমের অন্তরের গভীর অর্থ লইয়া তাহা যে তাহার মুখ হইতে উচ্চারিত হইয়াছে, সেটা তাঁহার মনে হয় নাই।

যাহাই হউক, নিতান্ত তিরস্কৃত হইয়া, মাখমের চলিয়া যাওয়ার পরেই নরহরির মন বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইল। ভৃত্যদিগের প্রতি তিনি কদাচ কঠোর ব্যবহার করিতেন।

বিশেষতঃ উদ্ধত ভ্রাতুষ্পুত্রের সেই নিরপরাধ ভৃত্যের প্রতি দুর্ব্ব্যবহার, তাঁহার চিত্তকে আরও ক্ষুণ্ণ করিয়া তুলিল। কিন্তু ভ্রাতুষ্পুত্র যে অপরাধ করিয়াছে, তিনি নিজেও সেই অপরাধে অপরাধী বলিয়া, তাহাকে কিছু বলিতে পারিলেন না। তিনি মাখমকে আবার ডাকিয়া আনিতে গতিকে আদেশ করিলেন। বলিতে বলিলেন, 'মাখমের নিজেরই যখন অজবার উপর প্রতিশোধ লইতে ইচ্ছা নাই, তখন তিনিও তাহাকে শাস্তি দিবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন।'

গতি গেল, কিন্তু মাখমকে দেখিতে পাইল না। তৎপরিবর্ত্তে সে ভাবিনীকে সঙ্গে করিয়া খুড়ার কাছে আনিল।

তাহারই মুখে ফুলকুমারীর দুর্দ্দশার কথা সমস্তই নরহরি অবগত হইলেন। এতদিন পরে মাখমের কথা তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল। ফুলীর আর মাখমের গৃহে ফিরিবার উপায় নাই।

সেই সঙ্গে নরহরি ভাবিনীর মুখে মাখমের নূতন সম্বন্ধের কথা শুনিলেন। শুনিয়া তিনি পরমানন্দিত হইলেন। বলিলেন, এ বিবাহে যাহা ব্যয় হইবে, সমস্তই তিনি বহন করিবেন। ভাবিনীর ভাইকে ঘর হইতে একটি পয়সাও বাহির করিতে হইবে না। মেয়ের পক্ষ মাখমের নিকট হইতে যে সকল অলঙ্কার চাহিবে—হউক তাহা যত মূল্যের—তাহাও তিনি দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

ভাবিনী ভাইকে মনিবের কাছে লইয়া আসিতে চলিয়া গেল। বিবাহের পাকা কথা কহিতে অটল চলিয়া গেল চাপাতোড়ায়। নরহরি জানিলেন, এ বিবাহ ভাবিনীর ননদীর সঙ্গে বিবাহ অপেক্ষা অনেকাংশে ভাল এবং এ বিবাহে মাখমের সম্পূর্ণ মত আছে।

ননদীর সঙ্গে দেখা হইলে তৎপ্রতি কোনও কটূক্তি প্রয়োগ করিতে ভাবিনীকে তিনি নিষেধ করিয়া দিলেন।

১৭

কিন্তু কোথায় মাখম? ভাবিনী ঘরে আসিয়া মাখমকে দেখিতে পাইল না। কিন্তু দেখিল, তাহার ঘরের কবাট একবারে হাট-করা খোলা রহিয়াছে। মাখম যে তাহার প্রভু-কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়াছে, তাহা সে জানিত না। মনে করিল, ঘরের নিকটে কোথাও না কোথাও সে রহিয়াছে। ঘর ওই-রূপ অবস্থায় রাখিয়া সে দূরের কোথাও যাইতে পারে না।

সে ভাইকে ডাকিল। উত্তর পাইল না। কিয়ৎক্ষণ তাহার ফিরিবার অপেক্ষায় তাহারই দাওয়ার উপরে বসিল। গৃহ লোকশূন্য দেখিয়া কুঁকড়াগুলা তাহার ঘরের ভিতরেই প্রবেশ করিয়াছিল। সেগুলাকে সে তাড়াইল।

অনেকক্ষণ বসিয়াও ভাবিনী যখন দেখিল, মাখম ফিরিল না, তখন সে দ্বারে শিকল দিয়া ভাইয়ের অন্বেষণে বাহির হইল। মনিব মাখমকে শীঘ্র তাঁহার কাছে পাঠাইতে বলিয়াছেন।

যেখানে যেখানে মাখমের অবস্থিতির সম্ভাবনা, সেই সেই স্থানে ভাবিনী তাহার অন্বেষণ করিল। তাহার দেখা পাওয়া দূরে থাক্, কেহ তাহাকে প্রাতঃকাল হইতে দেখিয়াছে—এ কথাও বলিতে পারিল না।

তখন বেলা প্রায় দশটা। হয় ত মাখম গৃহে না ফিরিয়া পথ হইতেই মনিবের গৃহে চলিয়া গিয়াছে, এই মনে করিয়া ভাবিনী সেই স্থানেই তাহার তত্ত্ব লইতে চলিল। যাইয়া জানিল, মাখম সেখানে আসে নাই।

আবার সে ঘরে ফিরিল। দেখিল, ঘর তাহার তদবস্থই রহিয়াছে। এইবারে মনে তাহার কেমন একটা সন্দেহ জাগিল। ওই সমস্ত বিবাহের কথার ভিতরেও অভাগী বউয়ের উপরে মাখমের একটা প্রবল স্নেহ সে অনুভব করিত। সে বিলক্ষণ বুঝিত, বিবাহ করিতে আর মাখমের ইচ্ছা নাই; শুধু তাহারই একান্ত অনুরোধে সে বিবাহে সম্মতি দিয়াছে। দেওয়া মাত্রই তাহার সার হইয়াছে। যে পাষণ্ড একবার তাহার ভাইকে মর্ম্মান্তিক লাঞ্ছনা দিয়াছে, আবার সে তাহাকে লাঞ্ছনার উপর লাঞ্ছনা দিল। অথচ সেই প্রচণ্ড অপরাধীর শাস্তি হইল না। মনের দুঃখে তবে কি ভাই কাহাকেও না বলিয়া ঘর ফেলিয়া কোথাও চলিয়া গেল!

আবার সে তাহার প্রভুর গৃহে চলিয়া গেল এবং তাঁহাকে সমস্ত অবস্থা বলিল। এইবারে সে প্রভুর মুখে মাখমের তিরস্কৃত হইবার কথা শুনিল এবং কেন যে চট্টরাজ মহাশয়ের মত দয়ালু প্রভুর কাছে তিরস্কৃত হইয়াছে, তাহাও ভাবিনী জানিতে পারিল। জানিয়া ভাবিনীর চিত্ত অনেকটা শান্ত হইল। গতি ঠাকুরের কাছে মার খাইয়া অভিমানে দুঃখে মাখম ঘরে ফিরে নাই। বাঁকুড়া অথবা অন্য কোনও নিকটবর্ত্তী গ্রামে চলিয়া গিয়াছে। একটু মনটা তাহার শান্ত হইলেই সে ফিরিয়া আসিবে। বউকে আনিতে যখন তাহার ইচ্ছা নাই, তখন সাঙ্গা করিয়া নূতন সংসার করিতেই তাহার ইচ্ছা হইয়াছে। অপমানের ক্ষোভটা দূর হইলেই, যেখানে থাকুক, সেই স্থান হইতে সে চলিয়া আসিবে।

দশটা, এগারোটা, দুপুর—ক্রমে অপরাহ্ন, মাখম ফিরিল না। তথাপি ভাবিনী তাহার ঘরে ফিরিয়া না আসা সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ করিল না। তখন তাহার মনে হইল, পথের মধ্যে দেখা পাইয়া হয় ত দাদা তাহার বাপের সঙ্গে, চাপাতোড়ায় চলিয়া গিয়াছে। এবারেও সে নিজের চোখে মেয়েটাকে দেখিবে, তাহার সঙ্গে কথা কহিবে। তাহাকে তাহার ভাল লাগিল কি না জানিবে। তাহার ভাইকে নিশ্চয় মেয়েটার ভাল লাগিয়াছে, তাই তাহার আত্মীয়রা দুই জনকে খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিয়াছে, মধ্যাহ্নে অমনই অমনই ছাড়িয়া দেয় নাই।

ভাবিনীর বাপও তখনও পর্য্যন্ত ফিরে নাই। সুতরাং সে বাপের সঙ্গেই ভাইয়ের ফিরিয়া আসার প্রত্যাশা করিল।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে মেয়ের মামা ও এক জন বিজ্ঞ আত্মীয়কে সঙ্গে লইয়া অটল ফিরিয়া আসিল। আসিয়াই ভাবিনীর কাছে মাখমের তত্ত্ব লইল।

বাপের সঙ্গে ভাইকে না দেখিয়া ভাবিনী চমকিয়া গেল, কিন্তু বুদ্ধিমতী আসল কথাটা প্রকাশ না করিয়া তাহাদিগকে শুনাইল, মনিবের বিশেষ একটা প্রয়োজনে তাহাকে ভিন্ন গ্রামে যাইতে হইয়াছে। সে দিন সে আসিতেও পারে, না-ও আসিতে পারে। ইহার পর গোপনে সে তাহার পিতাকে লইয়া সমস্ত ব্যাপার প্রকাশ করিল।

ব্যাপারটা শুনিয়া অটলের বিশেষ চিন্তার বিষয় বলিয়া বোধ হইল না। ওরূপ অভিমানে সেও পূর্ব্বে অনেকবার গৃহত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু সে অভিমান দুই দিনের বেশী তাহাকে বাড়ীর বাহিরে রাখিতে পারে নাই।

অটল বাড়ীতে আর অধিকক্ষণ অপেক্ষা না করিয়া, সঙ্গীদিগকে চট্টরাজ মহাশয়ের কাছে লইয়া গেল।

সেই স্থানে মাখমের অনুপস্থিতিতেই বিবাহের পাওনার সব কথা স্থির হইয়া গেল। চাপাতোড়া গ্রাম মাধববাটীর নিকটে, একখানা মাত্র গ্রাম পরে। মেয়ের মামা মাখমকে পূর্ব্বে অনেক বারই দেখিয়াছে। সুতরাং বরকে দেখিবার বিশেষ প্রয়োজন তাহাদের হইল না।

পাঁজি দেখিয়া নরহরি ৪ঠা বিবাহের শুভদিন স্থির করিয়া দিলেন। মাঘ মাসের ৪ঠা। হউক এ সাঙ্গা, পৌষ মাসটা যখন হিন্দুর বিবাহের পক্ষে একবারেই নিষিদ্ধ, তখন সে মাসটায় বিবাহ হওয়া তিনি যুক্তিযুক্ত বোধ করিলেন না।

১৮

এক দিন দুই দিন—তৃতীয় দিনেও যখন মাখম আসিল না, তখন নরহরি পর্য্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। মাখম সম্বন্ধে ব্যাপারটা তিনি দলু বাবুকে বলেন নাই। এইবারে সেটা তাঁহার কাছে প্রকাশ করিতে হইল। শুনিয়া তাঁহাকেও চিন্তিত হইতে হইল বটে, কিন্তু তিনি নরহরিকে আশ্বাস

স্বপ্ন

শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ দেববর্ম্মা বড়ঠাকুর, ত্রিপুরা

দিলেন। বলিলেন, এক যদি সে চা বাগানের কুলী হইয়া চলিয়া না যায়, তা হইলে যেখানেই সে থাকুক না কেন, সন্ধান তাহার মিলিবেই। কেন না, সে নিঃসম্বল অবস্থায়, কেবলমাত্র অভিমানের ঝোঁকে ঘর হইতে চলিয়া গিয়াছে। শুধু হাতে শুধু দৈহিক শ্রমের উপর নির্ভর করিয়া বাহিরে বাহিরে অধিক দিন থাকা তাহার পক্ষে অসম্ভব। বিশেষতঃ বাউরী জাতিটা স্বভাবতঃই ভীরু। গ্রাম ছাড়িয়া অন্যত্র যখন তাহারা কায করিতে যায়, যায় তাহারা দলবদ্ধ হইয়া; যখন গ্রামে ফিরিয়া আসে, তখন ওইরূপ দলবদ্ধ হইয়াই আসে। চারগুণ বেতন দিলেও কোন বাউরী একাকী বিদেশে চাকরী করিতে চাহে না।

নরহরিকে শুধু আশ্বাস দিয়াই দলুবাবু ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি মাখমের অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করিলেন। যেখানে যেখানে তাহার যাওয়া সম্ভব, সেই সেই স্থানে লোক পাঠাইলেন।

সন্ধান মাখমের মিলিল না, কিন্তু তাহার সন্ধানের আভাস মিলিল। এক জন তাহার শ্বশুরগৃহ জুনবেদে গিয়া জানিল, যে দিন মাখম নরহরির কাছে তিরস্কৃত হইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছে, সেই দিনই সে ফুলকুমারীর বাপ-মা তাহাদের কন্যার কোনও সন্ধান জানে কি না জানিতে সেখানে উপস্থিত হইয়াছিল। তাহারা তাহাদের কন্যার কোনও সংবাদ তাহাকে দিতে পারে নাই।

আর এক জন ভাতুল গ্রামে মাখমের মাতুলালয়ে গিয়া জানিয়া আসিল, সে তাহার মামাতো ভাইয়ের নিকট হইতে পাঁচ টাকা ধার লইয়া গিয়াছে। বলিয়াছে, আমি ফুলীকে খুঁজিতে চলিয়াছি। যদি তাহাকে পাইতে একমাসের অধিক সময় অতিবাহিত হইয়া যায়, তা হইলে তাহার মনিব চট্টরাজ মহাশয়ের নিকট হইতে সে ওই টাকা চাহিয়া লইবে।

এইটুকু জানিয়া নরহরি অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন। মাখম তাহা হইলে অভিমানে গৃহত্যাগ করে নাই। তাঁহারই মর্য্যাদা রাখিতে তাঁহার আদেশ পালন করিতে চলিয়া গিয়াছে।

ভাবিনী ও অটল মাখমের ওইরূপ ভাবে চলিয়া যাওয়াটা পছন্দ না করিলেও তাহার শীঘ্র ফিরিয়া আসার সন্দেহ করিল না। তবে মাখম ফুলীকে সঙ্গে লইয়া ঘরে ফিরিলে, নূতন বিবাহ সম্বন্ধটার কি হইবে? পূর্ব্ব-স্ত্রীকে ফিরাইয়া আনিয়াছে শুনিলে মেয়েটির আত্মীয়স্বজন আর ত মাখমকে তাহার সহিত সাঙ্গা দিতে চাহিবে না।

আর ফুলীর গর্ভের অবস্থা জানিয়া অটলই বা কেমন করিয়া তাহাকে তাহাদের ঘরে স্থান দিবে। দিলে বাউরী সমাজ তাহাদিগের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়ার সম্পর্ক রাখিবে কেন?

যাহাই হউক, ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া সকলেই মাখমের পুনরাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

কিন্তু মাখম যে কেন চলিয়া গিয়াছে, তাহার প্রকৃত কারণ মাধববাটীর এক জন ব্যতীত আর কেহ জানিতে পারে নাই। সেই এক জন অজবা। প্রভুর কাছে তিরস্কার আর পতির কাছ হইতে প্রহার খাইয়া মাখম কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত চট্টরাজদিগের বাগানপথ ধরিয়া তাহার ঘরে ফিরিতেছিল। ঘটনাক্রমে অজবাও সেই পথ ধরিয়া তাহার মনিবের গৃহের দিকে আসিতেছিল। আসিতে আসিতে পথের মাঝে উভয়ের সাক্ষাৎ হইল। ইহার পূর্ব্বে আরও অনেকবার অজবা'র সঙ্গে মাখমের পথের মাঝে দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছে। কিন্তু অজবাকে দেখিলেই মাখম মুখ ফিরাইয়া পথের এক দিক দিয়া চলিয়া যাইত। অজবাও চলিয়া যাইত সঙ্কুচিতভাবে পথের অন্য দিক দিয়া।

আজ হঠাৎ যে যাহার মুখোমুখী হইয়া পড়িল। কিন্তু মাখম এবার মুখ ফিরাইল না। অজবা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের মত সঙ্কুচিতভাবে একটু পাশ কাটাইয়া যাইতেছিল। মাখম তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ রে শালা, একটা মেয়ের সর্ব্বনাশ ক'রে, আর একটাকে যে সাঙ্গা করলি, তাকে কোথায় ফেলে এলি?"

প্রথমে অজবা কোনও উত্তর দিল না। সে পাশ কাটিয়া সরিয়া পড়িবার চেষ্টা করিল।

মাখম পথরোধ করিয়া বলিল,—"চ'লে যাচ্ছিস কি রে শালা, বল্।"

"কি বল্‌ব?"

"কি বল্‌ব!"

"সে কোথায় আমি কি জানি?"

"তুই তাকে কুলের বার ক'রে নিয়ে গেলি, কোথায় সে তুই জানিস্ না? জানবো আমি? অজবা, তোর সমস্ত

বিশ্বাসঘাতকি আমি মাপ ক'রে এসেছি। সাবধান হয়ে কথা ক'। সত্য ক'রে বল্।"

তথাপি অজবা সত্য কহিল না। বলিল, "আমার সঙ্গে সে যায় নাই।"

শুনিবামাত্র প্রচণ্ড ক্রোধে বাঘের মত মাখম অজবার দেহের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং তাহাকে ভূমিতে পাতিত করিল। অজবা মাখম অপেক্ষা বলিষ্ঠ ছিল। কিন্তু অপরাধীর অন্তর্দুর্ব্বলতায় সে মাখমের শক্তিকে রোধ করিতে পারিল না।

ভূমিতে ফেলিয়াই উন্মত্তের মত অজবাকে প্রহার করিতে করিতে ও কুৎসিত ভাষায় গালি দিতে দিতে মাখম বলিল, "আমি নিজের চোখে দেখে এলুম, তাকে টাকা কাপড় দিয়ে এলুম—এখনো মিথ্যা কইবি।"

শেষ কয়টা কথা শুনিতেই তড়িতাহতের মত অজবা চমকিয়া উঠিল। বলিল, "আমাকে ছেড়ে দে, আমি বল্‌ছি।"

মাখম কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া সে দাঁড়াইল ও হেঁটমুণ্ডে গায়ের ধূলা ঝাড়িতে লাগিল।

ইত্যবসরে মাখম ফুলকুমারীর সঙ্গে কিরূপে, কোথায়, তাহার কিরূপ অবস্থায় দেখা হইয়াছিল, কোথায় সে থাকিত, সমস্ত কথা তাহাকে শুনাইল।

অজবা দাঁড়াইয়া সমস্তই শুনিল। সে সকল কথায় উত্তর দিবার তাহার কিছুই ছিল না।

মাখম এইবারে ফুলকুমারীর শেষ দুর্দ্দশার কথা, যে দুর্দ্দশা তাহাকে স্বামীর ঘরে ফিরিয়া আসিতে নিরস্ত করিয়াছে, অজবাকে যখন জিজ্ঞাসা করিল, তাহার যে অবস্থায় পিশাচেরও তাহার উপর দয়া হয়, ফুলীর সেই অবস্থায় কেমন করিয়া সেই পাষণ্ড তাহাকে অজানা বিদেশে ফেলিয়া আসিল। তখন অজবা বলিল, "আমি তাকে ফেলে আসি নাই। সেই আমাকে ত্যাগ ক'রে চ'লে গেছে।"

"সত্যি ?"

"যে দিন তুমি গিছলে, তার পরদিন সকালে ঘুম ভেঙে উঠে আর তাকে দেখতে পাইনি।"

"সত্যি বলছিস্ অজবা ?"

"তাকে সঙ্গে ক'রে এনে আমার বোনের শ্বশুর ঘরে রাখবো কথা ছিল ; কিন্তু আর তাকে দেখতে না পেয়ে একা চ'লে এসেছি। সমস্ত দিন ধরে খুঁজেছি, কেউ বলতে পর্য্যন্ত পারলে না, তাকে দেখেছে কি না।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া মাখম বলিল, "কোথায় সে যেতে পারে, তোর মনে হয় ?"

"তা ত বলতে নারছি।"

"তিন মাস তোরা কি বস্তিবাটীতেই ছিলি ?"

অজবা বলিল, "না। ছিলুম সেখানে এক মাস।"

এই বলিয়া পলাইবার সময় পথে যে যে স্থানে তাহারা অবস্থিতি করিয়াছিল, অজবা মাখমকে বলিল।

শুনিতে শুনিতে অতি উত্তেজনায় মাখম অজবাকে প্রবলভাবে এক পদাঘাত করিল। সে আঘাতের ভার অজবা সহ্য করিতে না পারিয়া পড়িয়া গেল।

আর পিছন দিকে না চাহিয়া, আবার একটা কটূক্তি প্রয়োগ করিতে করিতে বলিল, "যা, বেঁচে গেলি। তোকে খুন ক'রে আমার বুকের জ্বালা নিবারণ করব মনে করেছিলুম, বেঁচে গেলি।"

বলিতে বলিতে মাখম দূর হইতে দূরে চলিয়া গেল। নিজের বাড়ী যাইবার পথ ধরিয়াছিল। সে পথে আর না যাইয়া শ্বশুরের গ্রাম জুনবেদে অভিমুখে চলিল। ফুলীকে খুঁজিতেই হইবে। কোথায় আছে, কেমন আছে না জানিতে পারিলে ইহজীবনে আর প্রাণে শান্তি আসিবে না।

১৯

অজবা মাখমকে মিথ্যা কথা কহে নাই। সত্যই সে ফুলকুমারীকে ত্যাগ করে নাই, ফুলকুমারীই তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে।

বাজার হইতে এক পেট তাড়ি খাইয়া পুরা দমে মাতাল হইয়া যখন অজবা তাহার সেই বাগানের কুটীরটিতে ফিরিল, তখন রাত্রি প্রায় আটটা হইয়াছিল।

টলিতে টলিতে আঙ্গিনায় উপস্থিত হইয়া দেখিল, ঘরে অন্ধকার। মত্ততার ভিতর দিয়া যতটুকু বিস্ময় তাহার আসিতে পারে, সমস্তই আসিল।

অনেকটা সন্দিগ্ধের ভাবে সেই স্থানে দাঁড়াইয়া সে তীব্র দৃষ্টি দিয়া অন্ধকার ভেদ করিবার চেষ্টা করিল। সে ঘরে যে কোনও প্রাণী আছে, তাহা তাহার বোধে আসিল না।

পাপের মন—ফুলীর যে ফুল্লচক্ষু দেখিয়া সে মুগ্ধ হইয়াছে,

কায করিতে করিতে অনেকবার সে দেখিয়াছে, সেই চক্ষু দুইটির উপর অনেকেরই তীব্রদৃষ্টি পতিত হইয়াছে—এমন কি ঠিকাদার বাবুটিরও পর্য্যন্ত। অবশ্য ইহাতে ফুলকুমারীর কোনও দোষ না থাকিলেও অজবা অনেক সময় তাহার গতিবিধি সন্দেহের চোখে নিরীক্ষণ করিত।

আলোকশূন্য ঘর দেখিয়া এই মত্তের সন্দিগ্ধ হৃদয়টা তীব্র স্পন্দনে কাঁপিয়া উঠিল। সে তখন পা টিপিয়া টিপিয়া, আঙ্গিনার পার্শ্বস্থ একটা আমগাছের অন্তরালে যাইয়া গাছের গুঁড়িতে ভর দিয়া দাঁড়াইল। সে স্থান হইতে ঘরে লোকের যাতায়াত সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রায় আধ ঘণ্টা দাঁড়াইয়াও যখন কোনও মানুষের যাতায়াত তাহার দৃষ্টিগোচর হইল না, তখন আবার সে পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আসিল। আসিয়াই ডাকিল, "মতি!" সে ঐ নামেই ফুলকুমারীকে এ দেশে পরিচিত করিয়াছিল।

ঘর হইতে কোনও উত্তর আসিল না। আবার ডাকিল, "মতি!" এবারেও উত্তর না পাইয়া সংশয় তাহার শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল।

সে যথাসম্ভব দ্রুতপদে কুটীরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াই তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিল, "ফুলী!"

ঘরটা অতি ক্ষুদ্র হইলেও তাহার তিন দিকে খালি ছিল। তাহার এক দিকে হইত তাহাদের রন্ধনকার্য্য, অপর দিকে কাঠ-কুটা রাখা হইত।

ফুলকুমারী এইবারে উত্তর দিল। উত্তর দিল সে ঘরের ভিতর হইতেই। কিন্তু অজবার মত্ত মস্তিষ্কে বোধ হইল, সে যেন কাঠ-কুটা রাখার চালির দিক্ হইতে উত্তর দিতেছে।

"এত রাত্রে ওখানে কি করছিস্?"

ফুলকুমারী উত্তর দিল না।

"ফুলী!"

"কি বলছিস?"

অজবা এবারে বুঝিল, ফুলী ঘরের ভিতর হইতে উত্তর দিল। সে গৃহদ্বারে উপস্থিত হইল এবং চৌকাটে হাত রাখিয়া মাথাটা ঘরের ভিতরে প্রবেশ করাইয়া ফুলকুমারীকে দেখিবার চেষ্টা করিল—দেখিতে পাইল না। দ্বারদেশে দাঁড়াইয়াই বলিল, "ঘর অন্ধকার কেন?"

"চেরাক জালি নাই।"

"জালিস্ নাই, জাল্।"

"তুই ধরিয়ে নে।"

"কেন, তুই?"

"আমার গায়ে সুখ নাই।"

"তা কেমন ক'রে থাকবে!"

অজবার এ রহস্যের অর্থ ফুলকুমারী ভাল বুঝিতে পারিল না। সে মনে করিল, হয় ত মাতালটা তাহার স্বামীর আগমন জানিতে পারিয়াছে।

তাই মনে করিয়া আবার তাহাকে সে আলো জালিতে বলিল। অজবা তথাপি ঘরের দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিল। এখনও সে ফুলকুমারীকে দেখিতে পায় নাই। সে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় রইচিস্?"

"শ্মশানে রইচি রে! কেন, আসতে কি তোর ডর লাগছে?"

"কোথায় গিয়েছিলি?"

"যমের ঘর। আ মর্, ঘরকে আয়।"

অজবা ঘরে প্রবেশ করিল এবং ফুলকুমারীর নির্দ্দেশমত স্থান হইতে দীপ ও দেয়াশেলাই সংগ্রহ করিয়া আলো জালিল। জালিতেই দেখিল, দুই হাতের উপর ভর দিয়া ফুলকুমারী হেঁট মাথায় মাটীর উপর বসিয়া রহিয়াছে।

প্রথমটা সে ওইরূপ বসার মর্ম্ম ভাল বুঝিতে পারিল না। সত্যই কি তবে ফুলীর অসুখ হইয়াছে? সে তখন জিজ্ঞাসা করিল, "তা হ'লে রসুই করিস্ নাই?"

ফুলকুমারী বলিল, "না।"

"হুঁ, কি খাব?"

"নিজে রসুই ক'রে নে।"

"তুই নারবি?"

"না তো।"

কথা কহিতে কহিতে মাধমের দেওয়া ফুলকুমারীর সেই নূতন সুন্দর পাড়যুক্ত কাপড় অজবার চোখে পড়িল। সে তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, "ওটা কি রে, ফুলী?"

"আঁখ ত রইছে, দেখ না।"

"ও কাপড় কোথায় পেলি?"

উত্তর দিতে ফুলকুমারীর কণ্ঠ হঠাৎ কেমন রুদ্ধ হইয়া আসিল। সে মুখ ফিরাইয়া বাম হস্ত কাপড়ের উপর রাখিয়া অন্যমনস্কার ভাবে অঙ্গুলি দিয়া তাহার পাড় পরীক্ষা করিতে লাগিল।

"কোথায় পেলি ?"

অতি রুক্ষস্বরে অজবা প্রশ্ন করিল।

ফুলকুমারী মুখ ফিরাইয়া অজবার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "যেখানেই পাই না কেন, তোকে যে সব কথাই বল্‌তে হবে, তার মানে কি ?"

"না বল্‌লে খুন করব" বলিয়াই অকথ্য ভাষায় সে গালি দিয়া উঠিল।"

ফুলকুমারী বলিল, "আমার ভালবাসা দিয়েছে রে !"

এই কথা শুনিবামাত্র প্রচণ্ড ক্রোধে দুরাত্মা ফুলকুমারীর কেশাকর্ষণ করিয়া গালি দিতে দিতে তাহাকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার আরম্ভ করিল। কিছুক্ষণ ফুলকুমারী প্রহার নীরবে সহ্য করিল। যখন আর পারিল না, তখন কোনও উপায়ে সেই মত্তের হস্ত হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া দৌড়িয়া কুটীর হইতে বাহির হইয়া গেল।

অজবা তাহার অনুসরণ করিল বটে, কিন্তু মত্ততার জন্য অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিল না। তখন টলিতে টলিতে ফিরিয়া ঘরের দাওয়ার উপর বসিল। বসিয়া যতক্ষণ পারিল তাহাকে নানা অপভাষায় গালি দিল। অপর কোনও পুরুষে আসক্তির জন্যই সে নারী যে ওই নূতন সুন্দর বস্ত্র উপহার পাইয়াছে, ইহাতে তাহার কোনও সন্দেহ ছিল না।

গালি দিতে দিতে ক্লান্ত হইয়া সে সেই দাওয়ার উপরেই শুইয়া পড়িল। কিন্তু এ পর্য্যন্ত সে ফুলকুমারীর দিক্ হইতে কোনও উত্তর পায় নাই। শুইয়া শুইয়া এইবারে তাহার ফুলীর উত্তরের প্রয়োজন হইল। তাহার অনুমান সত্য কি না, ফুলীর কথা হইতেই তাহাকে বুঝিয়া লইতে হইবে। তাহার বিশ্বাস, ফুলকুমারী অন্ধকারে আঙ্গিনার কোন না কোন স্থানে লুকাইয়া আছে।

শুইয়া একটা হাতে ভর দিয়া মাটীর দিকে মুখ করিয়া নিমীলিতনেত্রে সে ডাকিল, "ফুলি—মতি ! আমার ডাকে আর উত্তর দিবি না ? মতি ! কেন তুই এ বিশ্বাসঘাতকি করলি ? জানিস্, আমি তোকে কত ভালবাসি। তোর জন্যে আমি কি না করেছি ? ওঃ ! আমার বন্ধু ঘর-বাড়ী দেশ—শুধু তোর জন্যে আর, আর আমি তোকে মারব না। ফুলি—মতি !"

বার বার ওই দুই নামে ফুলকুমারীকে সম্বোধন করিতে করিতে এবং অস্পষ্ট ভাষায় তাহার সেই অজানা নবানুরাগের পাত্রকে হত্যা করিবার প্রতিজ্ঞা করিতে করিতে অজবা গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

পর দিন সূর্য্যোদয়ের অনেক পরে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। উঠিয়া দেখিল, ঘরে ফুলী নাই, কেবল তাহার ছেঁড়া কাপড়-খানা ঘরের একপাশে পড়িয়া রহিয়াছে। সমস্ত দিন ধরিয়া সে ফুলকুমারীকে অন্বেষণ করিল। সন্ধান ত সে পাইলই না, এমন এক জনকেও সে দেখিতে পাইল না, যে একটি মুহূর্ত্তের জন্যও তাহাকে দেখিয়াছে।

অগত্যা পর দিন প্রভাতে মাধববাটীতে রওনা হইবার জন্য অজবা বৈদ্যবাটী পরিত্যাগ করিল। মাখম মধু পরীক্ষার যে কথা অজবাকে বলিবার জন্য ফুলকুমারীকে অনুরোধ করিয়াছিল, সেটা আর তাহার বলিবার অবসর হয় নাই। আর কোথাও যাইবার স্থান না দেখিয়া সাহসে বুক বাঁধিয়া নিজের ইচ্ছামতই অজবা মাধববাটীতে ফিরিবার মন করিল। এ পর্য্যন্ত সে যাহা উপার্জ্জন করিয়াছে, সমস্তই তাহার নেশাতেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। পথে দুই চারি দিনের বিলম্ব ঘটিলেও তাহাকে অনাহারে মরিতে হইত।

তৃতীয় দিবসে অজবা মাধববাটীতে উপস্থিত হইল। গ্রামের সন্নিকটে যখন সে উপস্থিত হইল, তখন সূর্য্যাস্ত হয় নাই। সে সময়ে সে গ্রামে প্রবেশ করিতে সাহস করিল না। একটু রাত্রি পর্য্যন্ত বাহিরে বাহিরে অপেক্ষা করিয়া নির্জ্জন পথ অবলম্বনে সে একবারে মনিবের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিল। মনিব তাহাকে আশ্বাস দিলেন। বলি-লেন, "আমার ঘরেই তুই রহিয়া যা। কেউ কিছু তোকে বলে, তার নাকে মুখে জল না ঢেলে ছাড়বো না। সে জন্য বাঁকুড়ার সব কটা আদালত ত দেখবোই, তাতেও না হয়, হাইকোর্ট অবধি না দেখে ছাড়বো না।"

কিন্তু একমাত্র মাখম ভিন্ন আর কেহ তাহার প্রতি কুবাক্য পর্য্যন্ত প্রয়োগ করে নাই। সুতরাং মধুসূদনেরও আর হাইকোর্ট দেখিবার প্রয়োজন হয় নাই।

মাখমের মুখ হইতে শুনিবার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত অজবা ফুলকুমারীর বস্ত্র-প্রাপ্তি-রহস্য বুঝিতে পারে নাই। বরাবরই তাহার ধারণা ছিল, সে বস্ত্র ফুলী কোনও না কোন অবৈধ উপায়ে অর্জ্জন করিয়াছে। সেই বদ্ধমূল বিশ্বাসে ফুলকুমারীকে নির্ম্মমভাবে প্রহার করিয়া তাহার মনে সামান্য মাত্রও অনুতাপ জাগে নাই। প্রাতঃকালে তাহাকে কুটীরে না দেখাতে

সে অনুমান করিয়াছিল, ফুলী তাহার সেই বস্ত্রদাতা "ভাল-বাসার" অনুসরণ করিয়াছে। সেই বিশ্বাসে সে তাহার অন্বেষণে ক্ষান্ত দিয়া দেশে চলিয়া আসিয়াছে। আসিয়া আবার একটা সাঙ্গা করিয়াছে। মাথমের মুখ হইতে যখন সে সমস্ত তথ্য জানিতে পারিল, তখনই সে একবারে যেন জীবন্মৃত হইয়া পড়িল। তাহার সমস্ত দৈহিক শক্তি ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেল। নহিলে কখনই সে ঐরূপভাবে মাথমের কাছে লাঞ্ছিত হইতে চাহিত না।

মাথমের তীব্র পদাঘাতে যখন সে মাটীতে পড়িয়া গেল, তখন তাহার অনুতপ্ত মনে ফুলকুমারীর প্রতি তাহার সেই পাষণ্ডের আচরণটাই জাগিয়া উঠিল মাত্র।

মনিবের ঘরে সে দিন আর অজবার যাওয়া হইল না। ঘরে ফিরিয়া দারুণ শিরঃপীড়ার অছিলা লইয়া নববিবাহিতা স্ত্রীর সম্মুখে মাথায় হাত দিয়া সমস্ত দিনটাই একরূপ সে বসিয়া কাটাইয়া দিল।

২০

কুটীর হইতে বাহির হইয়াই ফুলকুমারী একটা দিক্ ধরিয়া ছুটিল। মদের নেশা তাহার অনেকক্ষণ আগেই ছুটিয়াছিল। মদ হইতে হাজার গুণে তীব্র মনের নেশা এখন তাহাকে আক্রমণ করিয়াছে। অজবার পৈশাচিক আচরণ—তাহার সেই নিষ্ঠুর প্রহার, সেই নেশার মাত্রা আরও যেন অধিক করিয়া তুলিয়াছে!

তাই ত যাহার উপর সে চরম অত্যাচার করিয়াছে, সে তাহার উপর অত্যাচারেরও কিরূপ প্রতিশোধ লইল! ফুলকুমারী ত মনকে শতভাবে বুঝাইয়াও স্বামীর ঐরূপ প্রতিশোধ লওয়া মস্তিষ্কে আনিতে পারিতেছে না। অথচ তাহা জলন্ত সত্যের মত তাহার দৃষ্টির সমস্ত মত্ততাকে পুড়াইয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। আর এই পাষণ্ড অজবা?—দৃষ্টির মোহে মনটাকে আবিষ্ট করিয়া যে তাহার ইহকাল পরকাল নষ্ট করিয়া দিয়াছে?

ভাবিনীর রাখিয়া যাইবার পর হইতে অজবার আসিবার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত ফুলকুমারী কেবল তাহার স্বামীর আচরণের বিষয় চিন্তা করিতেছিল। চিন্তায় সে এতদূর তন্ময় হইয়া গিয়াছিল যে, কুটীরে ফিরিয়া আহারাদির উদ্যোগের অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্যগুলা এক মুহূর্ত্তের জন্য তাহার মনে উদিত হয় নাই।

স্বামীর স্নেহ, তাহার ননদীর স্নেহ, সমস্ত অপমান ভুলিয়া অতি যত্নে তাহার পদস্খলিত ভ্রাতৃজায়াকে ধরিয়া তাহার সেই বাগানের ঘরটিতে লইয়া আসা, ঘুম-পাড়ানো গানের মত তাহার উত্তপ্ত হৃদয়টাকে প্লাবিত করিতেছিল।

অজবার মূর্ত্তি মাঝে মাঝে তাহার মনের উপর আঘাত করিতেছিল। মনের চোখ দিয়া এক একবার স্বামীর মূর্ত্তি ও অজবার মূর্ত্তি পাশাপাশি দাঁড় করাইয়া সে দেখিতে-ছিল, আর দুইটা মূর্ত্তিকে তুলনায় সমালোচনা করিতেছিল। দেখিতে দেখিতে তাহার মনে হইল, এত কাল মরা-চক্ষু দিয়া সে তাহার স্বামীকে দেখিয়া আসিয়াছে।

অজবার সেই পাষণ্ডের আচরণের পর তাহার স্বামীর প্রকৃত মূর্ত্তি উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠিল।

সে পাগলের মত দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া সেই অন্ধকারেই ছুটিল।

কোন্ পথ সে অবলম্বন করিয়াছে, কোথা হইতে কোথায় যাইতেছে, এই রাত্রিকালে একাকিনী কোথায় কত দূর সে যাইতে পারে, সে সব চিন্তা এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাহার মনে উদিত হইল না।

কিছুক্ষণ চলিয়া তাহার মনে হইল, যেখানে স্বামীর সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সেইখানে সে উপস্থিত হইয়াছে। যে বাগানের ভিতর দিয়া মাথম আসিয়াছিল, তাহা সে একবার দূর হইতে দেখিয়াছিল।

আরও কিছু দূর অগ্রসর হইয়া সে সেই পথ অবলম্বন করিল। বুঝি তাহার মনে স্বামীর পুনর্দ্দর্শনের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছিল। সে আকাঙ্ক্ষার মূল্য কি, তাহার বুঝিবার সামর্থ্য ছিল না। আর ত সে তাহার বর্ত্তমান অবস্থায় তাহার স্বামীর ঘরে প্রবেশ করিতে পারিবে না! মুষ্টিপ্রহার, পদাঘাত—সর্ব্বপ্রকারে যখন অজবা তাহাকে জর্জ্জরিত করিতেছিল, তখন সে উপুড় হইয়া পড়িয়াছিল। এখন সে মনে মনে বলিল, হায়, সে সময় তাহার পদাঘাতটা কুক্ষিতে গ্রহণ করিলাম না কেন? তাহা হইলে গর্ভস্থ পাপটা বিনষ্ট হইয়া যাইত—তাহা হইলে স্বামীর গৃহে ফিরিবার কোনও বাধা তাহার থাকিত না।

সত্য সত্যই মদ্য হইতে শতগুণ মাদকতা লইয়া ফুল-কুমারী অন্ধকারে পথ চলিতেছিল।

কতক্ষণ চলিয়াছে, কত দূর চলিয়াছে, কোথায়

আসিয়াছে, কিছুই তাহার বোধ ছিল না। হউক সে নীচজাতীয়া, তথাপি সে নারী, পথের মাঝে কোনও দুর্ব্বৃত্তের সম্মুখে পড়িলে সর্ব্বপ্রকারে তাহার লাঞ্ছিত হইবার সম্ভাবনা, এ সকল চিন্তা, চলিবার মুখে একটিবারের জন্যও তাহার মনে উঠে নাই। সে চলিতে-ছিল ত চলিতেই ছিল। সে চলার বিরাম হইবে কি না, তাহার বুঝিবার সামর্থ্য ছিল না।

সহসা লোকের উল্লাস-কোলাহল শুনিয়া সে চমকিয়া উঠিল। মাথা তুলিয়া দেখিল, সে সেওড়াফুলির বাজারের অতি নিকটে উপস্থিত হইয়াছে। আর যেখানে সে দাঁড়াইয়াছে, তাহার একরূপ সম্মুখেই মদের দোকান। দোকান বন্ধ হইয়াছে, কিন্তু তখনও কতকগুলা মাতাল দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া নানা রঙ্গ-কথায় মদ্যের প্রভাব প্রকাশ করিতেছে। দেখিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার গতি রুদ্ধ হইল। সে পিছাইল, সদর পথ ছাড়িয়া একটা গ্রাম্যপথে প্রবেশ করিল।

তাহার বোধ হইল, সেই সকল মাতাল তাহাকে দেখিয়া তাহার অনুসরণ করিতেছে।

আত্মরক্ষার অন্য কোনও উপায় না দেখিয়া সে পথি-পার্শ্বের একটা বাড়ীর দিকে ছুটিয়া গেল।

২১

"কে রে, কে রে? বিন্দি, আলো—চোর চোর—বিন্দি, আলো।"

তখন রাত্রি প্রায় দশটা। অন্ধকারময় রাত্রিতে পল্লী-গ্রামে সে সময় লোকের বাড়ীতে চোরের প্রবেশের অসম্ভাবনা ছিল না। একটা কোঠাঘরের বারান্দা হইতে সহসা ওরূপ ভীতিব্যঞ্জক শব্দ উঠা, সুতরাং নিতান্ত অস্বাভাবিক হয় নাই। চোরের নাম শুনিয়া বিন্ধ্যবাসিনী অথবা বৃন্দারাণী ঘরের ভিতরে মূর্চ্ছিত হইয়াছিল কি না, সেটা তখন জানিবার সম্ভাবনা না থাকিলেও, বারান্দা হইতে তাহার নাম ও চোর চোর শব্দ সত্য সত্যই দুই চারিবার অতি উচ্চকণ্ঠেই উচ্চারিত হইল।

ধীর অচঞ্চল পদক্ষেপে ফুলকুমারী সেই বারান্দার সম্মুখে উপস্থিত হইল। হইয়া দেখিল, এক বৃদ্ধের মত লোক একটি হুঁকা হাতে সেই বারান্দায় বসিয়া আছে। উপস্থিত হইয়াই সে বলিল, "বাবা, আমি চোর নই।"

বৃদ্ধ দেখিল এক নারী। বুঝিল চোর না হইতে পারে। জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুই?"

ফুলকুমারী বলিল, "এক অনাথা। আজ রাত্রির মত তোমার এখানে আশ্রয় মাগন করি।"

ভিতরের যে কোনও স্থান হইতে বিন্দু এ কথা শুনিতে পাইল। সে তখন আলো লইয়া সেখানে আসায় ভয় করিবার কিছুই দেখিল না, তথাপি ভিতর হইতে উচ্চকণ্ঠে সে প্রশ্ন করিল,—"কোথায় চোর?"

সে কথার কোনও উত্তর না দিয়া বৃদ্ধ ফুলকুমারীকে বলিল, "না, এখানে থাকৃতে পাবি না।"

"আজ রাত্রির মতনটি বাবা, ভোরেই আমি চ'লে যাব।"

ফুলকুমারীর মুখ হইতে তখনও মদ্যগন্ধ বিলুপ্ত হয় নাই। সে গন্ধ বৃদ্ধের নাকে প্রবেশ করিল। সে বলিল, "না, এখানে তুই থাকৃতে পাবি না।"

"একটা রাত্রির মত, বাবা!"

"না, না—এখনই তুই চ'লে যা। নইলে চৌকিদার ডেকে ধরিয়ে দেব। বেটী বেউশ্যে, মাতলামি করবার আর জায়গা পাও নি!"

এ কথার উপর আর কোনও কথা চলে না বুঝিয়া ফুলকুমারী আবার পথের দিকে মুখ ফিরাইল। বৃদ্ধের বাড়ী হইতে বহির্গত হইবার পূর্ব্বে ক্ষণেক দাঁড়াইল, পথে পড়িলে এবারে তাহাকে সর্ব্ববিধ অবস্থার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে! হউক না কেন সে নীচজাতীয়া, তথাপি তাহার নারীত্বের মর্য্যাদা আছে। বাজারের পথ, তাহার কোথায় কত দুষ্ট লোক আছে—কে জানে? তাহাদের মধ্যে কাহারও চোখে পড়িলে কি লাঞ্ছনা তাহার না হইতে পারে, তাহা সে কেমন করিয়া বলিবে?

"দাঁড়িয়ে কি ভাবতে লাগলি, চ'লে যা।"

"যাচ্ছি বাবা!"

"যাচ্ছি না, এখনি! এ গেরস্তর বাড়ী। মাতলামি করবার জায়গা নয়।"

ফুলকুমারী চলিল। মনে করিল, রাত্রিটার মত আবার অজবার কাছে ফিরিয়া যাই। কিন্তু সে দুই পদ না চলিতেই

বিন্দু ঘরের ভিতর হইতে একটা আলো লইয়া বাহিরে আসিল। বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে ?"

বৃদ্ধ বিন্দুকে অন্য কোনও উত্তর না দিয়া, রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত বাহিরের দ্বার রুদ্ধ না করিবার জন্য তিরস্কার করিল।

ইতোমধ্যে ফুলকুমারী দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াছে। বাহির হইতে গিয়া আবার সে লোকগুলার হাস্য-পরিহাস শুনিতে পাইল। আবার সে দাঁড়াইল।

"আ মর্, আবার দাঁড়ালি কেন ? যা বিন্দি, মাতাল বেটীকে বার ক'রে কবাট বন্ধ ক'রে দিয়ে আয়।"

বিন্দু তখন আলোটা হাতে লইয়া বাহিরের দ্বারের দিকে চলিল। ফুলকুমারী তখনও বাহিরে যায় নাই। বিন্দু নিকটে আসিতেই সে অনুচ্চকণ্ঠে বলিল, "মা আজকার রাতটা রইতে না দাও, ওই পুরুষগুলা চলে না যাওয়া পর্য্যন্ত আমাকে এইখানে একটু দাঁড়াতে দাও। থাকব না মা, ওরা চলে গেলেই চলে যাচ্ছি।"

তাহার পরিধেয় বস্ত্র মলিন ছিল। মজুরী কার্য্য সে শেষ করিয়া ঘরে ফিরিতেছিল মাত্র, বস্ত্র পরিবর্ত্তনের অবকাশ পায় নাই। মাথার চুলগুলাতেও পারিপাট্য ছিল না। আলোকের সাহায্যে বিন্দু তাহার সেই অবস্থা দেখিয়া ঈষৎ অবজ্ঞার ভাবেই প্রশ্ন করিল, "তোর ঘর কোথা ?"

ফুলকুমারী উত্তর দিল, "বাঁকুড়া।"

"এ দেশে মজুরী করতে এসেছিস্ বুঝি ?"

ফুলকুমারী বলিল, "হাঁ মা, কলে মাটীর কায করতে আইচি।"

বিন্দু বুঝিল, মেয়েটা আর যাই হ'ক, স্বামী তাহার যে অভিধান দিয়া তাহাকে দূর দূর করিয়া তাড়াইতেছিল, তা সে নয়। তখন তাহার অনুমানটা স্থির করিবার জন্য সে আবার জিজ্ঞাসা করিল, "তোরা কি জাত ?"

ফুলকুমারী বলিল, "বাউরী।"

এই সময় বৃদ্ধ বারান্দা হইতে বলিয়া উঠিল, "আরে মর্ মাগী, মাতাল বেউশ্যেটার সঙ্গে দাঁড়িয়ে কি কথা কইতে লাগল ? ওকে বিদেয় ক'রে কবাটে খিল দিয়ে চলে আয়।"

"যাচ্ছি রে ! বেউশ্যে তার কি হয়েছে, খেয়ে ফেল্‌বে না কি !"

"রাত্তির কত হয়েছে তা জানিস্ ?"

"হ'ক। ব'সে থাকতে না পারিস্, শু'গে যা।"

বিন্দুর এই এক দৃঢ় আদেশেই বৃদ্ধের বাক্য বন্ধ হইয়া গেল।

ফুলকুমারী এতক্ষণ মুখ ফিরাইয়াই কথা কহিতেছিল। সে বুঝিয়াছে, তাহার মুখের গন্ধ পাইয়াই বৃদ্ধ তাহার প্রতি অত কঠোর ব্যবহার করিতেছে।

বিন্দুকে অবস্থা জানাইতে তাহার বড়ই সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল।

বিন্দু কিন্তু ফুলকুমারীর মুখ দেখিতে বড়ই ইচ্ছুক হইয়া পড়িল। তাহার মুখ ফিরাইয়া কথা বিন্দুর ভালো লাগিতেছিল না। সে বলিল, "মুখ ফিরিয়ে কথা ক'।"

"নারবো মা !"

"মদ খেয়ে মরেছিস্ বুঝি ?"

"আজ আমাদের কাম শেষ হয়ে গেছে। ঠিকেদার বাবু তাই আমাদের খেতে দিতেছিল।"

"তোদের বাউরী জাতের বুঝি ও রকম খাওয়ায় দোষ হয় না ?"

"না তো।"

"তবে আর লজ্জা কেন, মুখ ফেরা।"

ফুলকুমারী মুখ ফিরাইল। লণ্ঠনটা তাহার মুখের কাছে ধরিতেই বিন্দু চমকিয়া উঠিল। তাহার এক কন্যা হইয়াছিল। দশ বৎসর বয়সে সেই কন্যা মরিয়া যায়। তাহার পর পঁচিশ বৎসর অতীত হইয়াছে। বিন্দুর বয়স এখন পঞ্চান্ন। আর তাহার পুত্র অথবা কন্যা কিছুই হয় নাই। এ বয়সেও সময়ে সময়ে তাহার সেই মৃত কন্যার স্মৃতি জাগিয়া উঠে। ফুলীর সেই মুখ দেখার সঙ্গে সঙ্গেই বিন্দুর কন্যার স্মৃতি তীব্র বেগে জাগিয়া উঠিল। অনাথনাথের ইচ্ছা, সে যেন দেখিল, তাহার কন্যা পূর্ণ যুবতীর রূপ ধরিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে।

"তোর নাম কি, মা ?"

"দেশে আমার নাম ফুলী, এখানে নাম করেছি মতি।"

"আমার শত্রুটার নাম রেখেছিলুম লক্ষ্মী।"

ফুলকুমারী কথাটা ভালো বুঝিতে পারিল না। সে জিজ্ঞাসা করিল, "সে তোমার কে, মা ?"

বিন্দু এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না। অর্দ্ধরুদ্ধ

কণ্ঠে সে প্রতিপ্রশ্ন করিল, "এখানে এ অবস্থায় তুই কেমন ক'রে এসে পড়লি? তুই কার সঙ্গে এ দেশে এসেছিস্?"

"দেশের লোক আইছে।"

"তোর কি সোয়ামী নেই?"

"রইছে ত।"

"সে কোথায়?"

"বৈকালে তার সঙ্গে দেখা হয়েছে।"

"তবে অনাথা বল্লি যে?"

ঠিক এমনি সময়ে সদর রাস্তা হইতে কে বলিয়া উঠিল, "পলা খুড়ো জেগে আছ?"

বৃদ্ধ উত্তর দিল, "আছি রে বাবা!"

"তামাক খাচ্ছ না কি?"

বৃদ্ধ একটি কলিকা শেষ করিয়া, আর একটি সাজিয়া অগ্নিসংযোগে সবে মাত্র দুই একটি টান দিয়াছে, এমন সময় বাহির হইতে ওই প্রশ্ন।

বৃদ্ধ বলিল, "খাচ্ছি।"

পথের লোক বলিল, "প্রসাদটা পাবো না কি?"

বিন্দু বৃদ্ধের উত্তরে বাধা দিয়া বলিল, "না, আর প্রসাদ পেতে হবে না, ঘরে যা কেষ্টা!"

অতি তীব্র স্বরে স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া বিন্দু বলিয়া উঠিল, "আমার শরীর ভালো নয়, মিন্‌সে এখনো বাইরে ব'সে আছিস্! ঘরে যা।"

"যাচ্ছি" বলিয়া প্রহ্লাদ ওরফে পলা খুড়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।'

"কেও, খুড়ি?"

"হাঁ রে বাবা."

"সঙ্গে ওটি কে গা?"

"আমার—আমার—বোন্-ঝি।" বলিয়াই বিন্দু কবাট বন্ধ করিয়া দিল।

বিন্দুর অলঙ্ঘনীয় আদেশে প্রহ্লাদ ঘরে গিয়া শুইয়াছিল, কিন্তু ঘুমায় নাই। বাহিরে বারান্দায় পদশব্দ শুনিয়া শুইয়া শুইয়াই সে জিজ্ঞাসা করিল, "বেটাকে বিদায় ক'রে দরজা বন্ধ ক'রে এলি?"

"বন্ধ করা হয়েছে, তুই ঘুমো। কি তোর নশো পঞ্চাশ টাকা আছে যে, সে চুরি করবে!"

"বেটার মুখে মদের গন্ধ!"

"গন্ধ তোর নাকে ঢুকেছে। আমি গন্ধ পেলুম না, উনি পেলেন! নিজে বড় সাধু কি না।"

"মেয়েটা কে জেনেছিস্?"

"জানবো আবার কি? অনাথা—অবলা, বিদেশে ঘর। এসেছিল এ দেশে কায করতে। বাসা খুজে পাইনি, ভয়ে অস্থির হয়ে ঘুরছে, পড়েছে—ক' বেটা মাতালের সুমুখে—ছুটে আশ্রয় নিতে এসেছে। না জেনে না শুনে তাকে যা মুখে এলো তাই ব'লে—ছেলে পুলে নেই বলে প্রাণে কি একটু মমতাও থাকতে নেই!"

"তাকে যেতে দিস্‌নি ত?"

বিন্দু ডাকিল, "লক্ষ্মী—মতি! উপরে উঠে বোস।"

এই ডাকেই প্রহ্লাদের প্রশ্নের উত্তর হইয়া গেল। সে কেবল বলিল, "যদি সে না খেয়ে থাকে, তাকে মুড়ি টুড়ি যা থাকে খেতে দে।"

প্রহ্লাদ নিশ্চিন্ত ভাবে নিদ্রা যাইবার জন্য চক্ষু মুদিল।

২২

হাত, পা, মুখ, চোখে জল দেওয়াইয়া, বিন্দু ফুলকুমারীকে প্রথমে একখানা পরিষ্কৃত বস্ত্র আনিয়া দিল। তাহার পর দুধ, মুড়ি, গুড় সে রাত্রিতে ঘরে আহার্য্যের মধ্যে যা যা ছিল, সমস্ত দিয়া সে তাহাকে পরিতোষের সহিত আহার করাইল। তাহার পর প্রহ্লাদের গভীর নাসিকাধ্বনি যখন তাহার গভীর নিদ্রা সাব্যস্ত করাইয়া দিল, তখন বিন্দু ফুলকুমারীকে বারান্দার মেঝের উপর নিজের নিকটে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ভগবান্ই আমার মুখ দিয়ে তোর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ঠিক ক'রে দিয়েছে। মনে কর্ আমি তোর মাসী।"

ফুলকুমারী আবেগভরে বিন্দুর চরণতলে বার বার প্রণাম করিতে করিতে বলিল, "মা হও, মাসী হও—এখন থেকে সবই আমার তুমি।"

"তা ত হলুম রে, কিন্তু সকাল হলেই ত তুই চ'লে যাবি! কোন্ বিদেশে তোর ঘর, আর হয় ত এ জন্মে তোকে দেখতে পাব না।"

"তা কেন, আমি রইবো।"

"রইবি!"

"তুমি যদি রাখো,—"

藝自慢子寶合
七福之内

"আমরা কি জাত জানিস্ ?"

"মা হও—তুমি মা, মাসী হও—তুমি মাসী—জাতের কথা কইছিস্ কেন মা ! আমরা বাউরী, এক ডোম আর বেদে ছাড়া সবার ঘরেই থাকতে পারি। তুমি যদি রাখো, তা হ'লে ত অকূলে আমি কূল পাই।"

কথাটা বিন্দুর কানে কেমন একটা হেঁয়ালীর মত ঠেকিল। অত্যন্ত বিস্মিতার মত সে জিজ্ঞাসা করিল, "অকূলে কূল মানে কি রে, মতি ?"

ফুলকুমারী চেষ্টা করিয়াও উত্তর দিতে পারিল না। তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইবার মত হইল।

"তুই ত বল্লি তোর সোয়ামী আছে !"

"রইছে ত !"

"তবে আপনাকে অনাথা বল্লি কেন ? এই ত বল্লি বিকালে তার সঙ্গে তোর দেখা হয়েছে।"

"হইছে ত !"

"তবে ?"

ফুলকুমারী উত্তর দিতে পারিল না।

বিন্দুও চিন্তান্বিতার মত ক্ষণেক বসিল। তথাপি ফুলকুমারীর মুখ হইতে কোনও উত্তর না শুনিয়া ঈষৎ গম্ভীর ভাবে বলিল, "মা বলিস্, মা ; মাসী বলিস্, মাসী—মতি, কোনও কথা আমার কাছে গোপন করিস্ নি। সত্য ক'রে বল্ দেখি, ব্যাপারখানা কি !"

"বললে আমাকে খেদাড়ে দিবে না ?"

"তুই কি বেরিয়ে এসেছিস্ ? আ মর, চুপ ক'রে রইলি কেন ? বল্। তাড়িয়ে দেওয়ার মত বুঝি, আজ দেবো না।"

ফুলকুমারী বলিতে আরম্ভ করিল। আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথা—স্বামীর গৃহত্যাগ হইতে বৈষ্ণবাটীর সেই বাগান ছাড়িয়া চলিয়া আসার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত।

শুনিতে শুনিতে বিন্দুর কখন ফুলকুমারীর উপর ক্রোধ, কখন বা তাহার জন্য দুঃখ হইতে লাগিল। কিন্তু অজবার নির্দ্দয় ভাবে প্রহার ও স্বামি-দত্ত তাহার সেই কাপড়খানা টুকরা-টুকরা করিয়া ছিঁড়িবার কথা বলিতে বলিতে যখন ফুলকুমারী তাহার পৃষ্ঠে গণ্ডে আঘাত-চিহ্ন বিন্দুকে দেখাইতে লাগিল, তখন বিন্দু আর রোদন সংবরণ করিতে পারিল না ; কাঁদিতে কাঁদিতে তখন সে বলিয়া উঠিল, "তোর সোয়ামী, ননদ যখন তোকে ঘরে নিতে চাইলে, তখন তাদের সঙ্গে চ'লে গেলি না কেন আবাগী ?"

অগত্যা ফুলকুমারীকে স্বামীর সঙ্গে না যাইবার কারণ বলিতে হইল।

শুনিয়া একটি দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বিন্দুকে বলিতে হইল, "তাই ত রে মতি, অনাথাই ত তুই বটে ! ভালো আজকের মত ঘুমো, কাল মিন্‌সেকে জিজ্ঞাসা ক'রে যা করবার করা যাবে।"

গ্রীষ্মকাল, সুতরাং বিন্দু বারান্দাতেই ফুলকুমারীর শয়নের ব্যবস্থা করিবার জন্য একখানা মাদুর আনিতে ঘরের ভিতর চলিয়া গেল।

ইত্যবসরে ফুলকুমারী তাহার পরিত্যক্ত বস্ত্রাঞ্চল হইতে টাকা কয়টি ও নাকছাবি বাহির করিল। গৃহাভ্যন্তর হইতে বাহিরে আসিয়া মাদুর বিছাইয়া বিন্দু জিজ্ঞাসা করিল, "একলা বাইরে থাক্‌তে পারবি ?"

সে কথার কোনও উত্তর না দিয়া ফুলকুমারী সেই টাকা ও অলঙ্কার বিন্দুর পদপ্রান্তে রক্ষা করিয়া বিপুল উচ্ছ্বাসের সহিত কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "মাসী, এই তোমার চরণে লাগছি, আমাকে আর ফেলে দিস্ না।"

"এ কি" বলিয়াই বিন্দু টাকা কয়টা ও নাকছাবি উঠাইয়া লইল। টাকা গণিল, নাকছাবিটাকে আলোর সম্মুখে লইয়া পরীক্ষা করিল।

"আমাকে ঘুস দিচ্ছিস্ না কি ?"

"তুমি খেদাড়ে দিলেও আমি যাব না ত।"

"বালাই, ভগবান্ তোকে এখানে পাঠিয়েছে—এই বাড়ীটার ভিতরে আছি মাত্র দু'টো বুড়োবুড়ী—একটা মেয়ে ছিল, তাও ভগবান্ অনেককাল কেড়ে নিয়েছে।"

অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত স্বরে এই সকল কথা বলিতে বলিতে বিন্দু টাকাগুলা রাখিতে ঘরের ভিতর চলিয়া গেল।

অল্পক্ষণ পরেই আর একটা মাদুর লইয়া সে ফুলকুমারীর পার্শ্বেই সেটাকে পাতিয়া শয়ন করিল।

শুইতে না শুইতেই ফুলকুমারী ঘুমাইয়া পড়িল। কিন্তু বিন্দুর ঘুম আসিল না। কিছুক্ষণ মাদুরে এ-পাশ ও-পাশ করিয়া সে উঠিল। ঘরে প্রবেশ করিল এবং স্বামীকে উঠাইয়া তাহাকে সমস্ত কথা প্রকাশ করিল।

প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া প্রহ্লাদ

দেখিল, মেয়েটা তখনও ঘুমাইতেছে। সেই অবস্থায় প্রহ্লাদ ফুলকুমারীকে ভালো করিয়া দেখিবার সুবিধা পাইল। বৃদ্ধ দেখিল, কৃষ্ণাঙ্গী হইলেও এমন সৌষ্ঠব-সম্পন্না নারী সে কমই দেখিয়াছে।

প্রহ্লাদ ডাকিল, "মতি!"

ধড়মড়িয়া ফুলকুমারী উঠিয়া বসিল এবং সম্মুখে বৃদ্ধকে দেখিল, অতি ব্যস্ততার সহিত সে আপনার নারী-দেহ আবৃত করিতে লাগিল।

প্রহ্লাদ বলিল, "তোর মেসোকে অত লজ্জা দেখাবার দরকার নেই রে, বেটি!"

ফুলকুমারী প্রহ্লাদের পায়ের কাছে প্রণাম করিতেই বৃদ্ধ বলিল, "তোর মাসী-মেসোর কাছে থাক্‌বি?"

"রইতেই ত এসেছি, বাবা!"

"দু' দিন থেকে মায়া বাড়িয়ে আবার পালিয়ে যাবি না ত?"

"না তো!"

"দেখিস্!"

"তুমি খেদাড়ে দিলেও যাবো না, বাবা!"

"তবে থাক্। আমাদের ছেলে-মেয়ে নেই, আজ থেকে মনে কর, এ তোর বাপের ঘর।"

কৃতজ্ঞতা দেখাইতে ফুলকুমারী বৃদ্ধের পায়ের কাছে মাথাটা লুটাইয়া দিল।

২৩

মাখম ফুলকুমারীর কোনও সন্ধান পাইল না। প্রথমে বৈদ্যবাটী ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থান—একদিকে চন্দননগর, অন্যদিকে শ্রীরামপুর—সর্ব্বত্র বিশেষভাবে অন্বেষণ করিয়াও যখন তাহাকে পাইল না, তখন যে পথ দিয়া তাহাদের বৈদ্যবাটী আসার কথা সে অজবার মুখে শুনিয়াছিল, সেই পথ অবলম্বন করিয়া তারকেশ্বর, জাহানাবাদ প্রভৃতি স্থানের মধ্য দিয়া ফুলীকে অন্বেষণ করিতে করিতে, নিজের অন্না-ভাবের উপক্রম দেখিয়া সে ঘরে ফিরিয়া আসিল। জানিবার মধ্যে কেবল সে জানিল, সে দেশে অজবার নাম হইয়াছে—অতুল, আর ফুলির নাম হইয়াছে—মতি।

ফুলীকে ত সে পাইল না, লাভের মধ্যে চাপাতোড়ার সেই মেয়েটার সঙ্গেও তাহার সাঙ্গা হইল না, যখন সে আসিল, তখন মাঘের চৌঠা পার হইয়া গিয়াছে। স্ত্রীর প্রতি মাখমের একান্ত নিষ্ঠা জানিতে পারিয়া, মেয়েটির আত্মীয়গণ তাহাকে কন্যা দিতে সাহস করিল না।

মাখমের দুর্ভাগ্য দূর করা মানুষের অসাধ্য বুঝিয়া ভাবিনী, অটল, নরহরি, দলুবাবু—সকলেই তাহার সাঙ্গার চিন্তা হইতে ক্ষান্ত দিলেন।

মাঘ মাস শেষ হইয়া গেল। ফাল্গুনের আরম্ভ। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের মত বাউরীরা নামাল যাইতে আরম্ভ করিল।

অটল, ভাবিনীও চলিল। যাইবার সময় সে ভাইকে অনুরোধ করিয়া গেল, আর যেন সে সেই বিশ্বাসঘাতিনীর জন্য ঘর ছাড়িয়া না যায়। নিশ্চয় সে গঙ্গাতীরের কোনও সহরে গণিকাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে।

মাখম স্বীকার করিল, ফুলীর মোহ এইবারে তাহার ঘুচিয়াছে। তবে সে যদি জানিতে পারিত, ফুলী বাঁচিয়া আছে, আর যে কোনও হীনবৃত্তিই অবলম্বন করুক্, সুখে আছে, মাখম তা হইলে ইহজীবনের মত তাহার নামটি পর্য্যন্ত মুখে আনিত না।

অটল গেল, ভাবিনী গেল, অজবাও তাহার ভগিনী ভগিনীপতি, এমন কি নববিবাহিতা স্ত্রীটিকে পর্য্যন্ত লইয়া চলিল। এবারে বাউরীর দল একবারে শূন্য। সেখানে রেলে তাহারা মাটী কাটার এক বড় রকমের কায পাইয়াছে। এখানে রোজ বড় জোর আট আনা, সেখানে পুরুষ চৌদ্দ আনা, স্ত্রীলোক দশ আনা, কাযও পূর্ণ তিন মাস হইবার সম্ভাবনা। বাউরীরা সে লোভ সংবরণ করিতে পারিল না। গ্রামের মধ্যে যে যেখানে কর্ম্মক্ষম ছিল, প্রায় সকলেই প্রস্থান করিল। রহিয়া গেল শুধু মাখম।

এবারকার নির্জ্জনতা সে যেন মধুময় অনুভব করিতে লাগিল। সে পূর্ব্বে অন্যান্য বাউরীদের সঙ্গে মিশিত, কিন্তু নিজের দুর্ভাগ্যটা স্মরণ করিয়া মিলনে সুখ পাইত না।

সে এবারে প্রায়ই কদমাহাটিতে যাইত, একটু একটু নেশা করিত এবং গ্রামের কাহারও সঙ্গে মেশামিশি না করিয়া একবারে নিজের ঘরে চলিয়া আসিত। সেখানে দাওয়াটির উপরে একাকী বসিয়া যতক্ষণ না ঘুম আসিত, নানা প্রকার সুরের আলাপ করিত।

এইরূপ করিয়া কুড়ি পঁচিশ দিন সে অতিবাহিত করিল, ফাল্গুন শেষ হইতে বড় বিলম্ব নাই। এক দিন মাখম

কদমাহাটি না গিয়া বাঁকুড়া হইতে খাঁটি মদ কিনিয়া আনিল। তৎপূর্ব্বদিনে নরহরির গৃহে তাঁহার দৌহিত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে উৎসব হইয়াছিল। এ সেই দৌহিত্র, যাহার মায়ের তত্ত্ব লইতে গিয়া সে ফুলীকে হারাইয়াছে।

ঐ উৎসবটার সঙ্গে সঙ্গেই মাখমের ফুলীর শোক জাগিয়া উঠিয়াছিল। নরহরির জামাতা মাখমকে দুই টাকা পুরস্কার দিয়াছে। সেই পুরস্কারের টাকায় ফুলীর শোক জন্মের মত ভুলিবার জন্য আজ সে বাঁকুড়া হইতে খাঁটি মদ আনিয়াছে।

সে দিন শুক্লা চতুর্দ্দশী, ফাল্গুনের মেঘমুক্ত পরিপূর্ণপ্রায় চাঁদ। বিমল জ্যোৎস্না তাহার বাড়ীর উঠান হইতে দূরস্থ গোকুলবাঁধের ধার পর্য্যন্ত সমস্ত প্রান্তরটায় ফাল্গুন-হাওয়ায় যেন উড়িয়া বেড়াইতেছে!

সন্ধ্যা হইতে না হইতেই মাখম সেই তীব্র সুরার এক পাত্র পান করিয়াছে। পানের সঙ্গে সঙ্গেই গান—নানা জাতীয় শব্দ-বিন্যাসে সুরের আলাপ।

তাহার পর কিছুক্ষণ আলাপ বন্ধ করিয়া, সে মাথা হেঁট করিয়া বসিল। কিছুক্ষণ ওইরূপ নিস্তব্ধ ভাবেই কাটিল। গাছে বাতাস-লাগার শব্দ ভিন্ন কোনও দিক্ হইতে কোনও শব্দ সেখানে পৌঁছিতেছিল না।

নিঃশব্দে সে আর এক পাত্র গ্রহণ করিল।

দুই দুইবার সে পান করিল বটে, কিন্তু মাখমের বোধ হইল, তাহার যেন আশানুরূপ নেশা হইতেছে না। পচাই পান করিয়া অন্য দিন সে যে আনন্দ উপভোগ করে, সে আনন্দও তাহার আসিতেছে না। সে মনে করিল, মদের বদলে শুঁড়ী বেটা তাহাকে এক বোতল জল দিয়াছে।

কিয়ৎক্ষণ বসিয়া, গা-মাথা দুলাইয়া সে নেশা আনিবার চেষ্টা করিল।

নেশা আসিয়াছে, কিন্তু মনোমত আসিতেছে না। মাখম তৃতীয় পাত্র পূর্ণ করিল।

"যা ফুলী, এইবারে আমি তোকে জন্মের মত ভুলতে চললুম" বলিয়া মাখম সেই তৃতীয় পাত্র মুখে তুলিতে যাইতেছে, এমন সময় তাহার ঘরের পার্শ্বের দিক্ হইতে শব্দ উঠিল, "দাদা, ঘরে রইছিস্?"

অতি বিস্ময়ে মাখমের হাত হইতে পাত্রটি পড়ে নাই এই মাত্র। পাত্র ভূমিতে রাখিয়াই সে বলিয়া উঠিল, "কে রে তুই? ভাবি?"

ভাবিনী সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

"ব্যাপার কি রে? তুই কি একাই চ'লে এলি?"

"এখন একাই বটে!"

"খুড়া?"

"সে সে দেশেই রইছে।"

"ব্যাপার কি ভাবি?"

"তুই ও কি করছিস্ দাদা?"

"ফুলীকে জন্মের মতন ভুলছি।"

"বেশ করছিস্! দাদা, আর একটা বউ নিবি?"

"আর লাঃ! ঢের হইছে রে ভাবি!"

"দেখ না, এমন বউ আর পাবি না। ভাল না লাগে, না লিবি।"

মত্ত মাখম ব্যাপারটা কি বুঝিতে পারিল না। সে অসহিষ্ণুভাবে বার দুই লাঃ, লাঃ বলিয়া ভূমি হইতে পাত্র গ্রহণ করিতে গেল।

ভাবিনী তাড়াতাড়ি দাওয়ার উপরে উঠিয়া মাখমের হাত ধরিয়া ফেলিল।

"একবার তাকে দেখ। ভাল না লাগে, দেখে চ'লে আয়। তার পর যত পারিস্, নেশা কর। আমি রইতে নারবো।"

"রইতে নারবি!"

"ফির্‌তি গাড়ী ক'রে কোলকাতায় চ'লে যাব। কেবল তোর জন্যই ত আইচি রে! তোর দুঃখু আর দেখতে নারলাম।"

এমনই সময়ে বাহির দিক্ হইতে শব্দ উঠিল, "কৈ রে ভাবি, কোথায় তোর ভাই?"

বলিতে বলিতে এক দীর্ঘদেহ বলিষ্ঠকায় বৃদ্ধ, হাতে লাঠী, মাথায় পাগড়ী মাখমের গৃহ-প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইল।

"ইনি কে হইছেন রে, ভাবি?"

ভাবিনী ভাইকে কোনও উত্তর না দিয়া আগন্তুককে বলিল, "এই গো মেসো, এই আমার ভাই।"

আগন্তুক অন্য কেহ নহে, প্রহ্লাদ। বৃদ্ধ গম্ভীর স্বরে মাখমকে সম্বোধন করিল, "তোর স্ত্রীকে সঙ্গে ক'রে এনেছি। সে আমার বাড়ীতে আট মাস আশ্রয় নিয়ে আছে। এই আট মাস আমার স্ত্রী তাকে সন্তানের মত কাছে রেখেছিল। বড় গুণবতী মেয়ে, বড় লক্ষ্মী,

গেরোর ফেরে একটা ভুল করেছিল। দেখ, তাকে ঘরে নিবি? না নিস্, তাতেও আমার দুঃখু নেই। যত দিন আমরা বুড়োবুড়ী বেঁচে থাকবো, তত দিন তাকে মেয়ের মতনই যত্ন-আদর করব। আমাদের ছেলেমেয়ে ছিল না—দেখ বুঝে মাখম।"

"কোথায় সে রইছেন মেসো?"

"আগে বল,—আমাকে এই রাত্রেই ফিরে যেতে হবে। তোর বোনকেও আমি তার অনেক ক্ষতি ক'রে সঙ্গে এনেছি। সেখানে সে রোজ দশ আনা ক'রে মজুরী পাচ্ছিল। তোর স্ত্রীর জন্যই ধ'রে এনেছি। আগে বল্।"

ভাবিনী ছুটিয়া প্রহ্লাদের পা জড়াইয়া বলিল, "আর কেন মেসো, মিছে দেরী করিস্। দে, তোর বেটিকে ভাইয়ের হাতে ধ'রে দে।"

"দে মেসো, মেসো রে, আমার জীবনটা ফিরিয়ে দে।"

"আয় রে বেটা, সঙ্গে আয়।"

২৪

গোকুলবাঁধের পাড়ে একটা আম্রবৃক্ষের তলদেশে নির্জ্জনে ফুলকুমারী বসিয়া ছিল। বসিয়াছিল সে স্বামীকে দেখিবার ব্যাকুল প্রতীক্ষায়। সম্মুখে জ্যোৎস্না, পশ্চাতে জ্যোৎস্না, শুধু সেই আম্রতলে তাহার অন্তরের প্রতিচ্ছবি লইয়া অন্ধকার।

বসিয়া বসিয়া সে দেখিল, কে এক জন পাড়ের অপর দিক্ ধরিয়া তাহার দিকে আসিতেছে। কে সে, দূর হইতে ফুলকুমারী ভাল বুঝিতে পারিল না। পাছে স্বামী না হইয়া সে গ্রামের আর কেহ হয়, তাহাকে দেখিলে এবং চিনিলে লজ্জায় সে মরিয়া যাইবে বুঝিয়া ফুলকুমারী গাছের গুঁড়ির অন্তরালে আত্মগোপন করিল।

মাখমকে না চিনিবার অনেকটা কারণ ঘটিয়াছিল। ফুলীর অন্বেষণে বাহির হইয়া পথে সে একবারেই ক্ষৌর-কার্য্য করিবার সুবিধা পায় নাই। বাড়ীতে আসিয়াও দেহের উপর অনাস্থাবশে সে একবারেই ক্ষৌরকার্য্য উঠাইয়া দিয়াছিল। তাহার শ্মশ্রু, কেশ বর্দ্ধিত হইয়া ফুলকুমারীর দৃষ্টিতে তাহাকে না চিনিবার মতই করিয়াছিল। বিশেষতঃ, সেই রাত্রিকালে। আসিতে আসিতে মাখম আম্রবৃক্ষের সমীপস্থ হইলেও ফুলকুমারী তাহাকে চিনিতে পারিল না। সে বিশেষ সঙ্কুচিতভাবে নিশ্বাস পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

মাখম নিজে বুঝিতে না পারিলেও, তাহার নেশা কম হয় নাই। আমগাছের নিকটে আসিয়া নেশার ঝোঁকে সে দেখিল, সেখানে কেহই নাই। সে একবারে চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওরে মেসো, কৈ আমার ফুলী?"

"চিঁচাস্ না, রইছি রে" বলিয়াই ফুলকুমারী একটু অগ্রসর হইল।

"রইছিস—আয়, আয় ফুলি, একটা বছর আমার ঘর আঁধার রইছে রে!"

মত্ততায় অতি আনন্দের বেগে ফুলকুমারীকে বাহুপাশে বাঁধিতে আসিয়া তাহার সম্মুখে মাখম আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেল।

ফুলকুমারী ক্ষিপ্রতার সহিত তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। উঠাইয়া বসাইতে বসাইতে বলিল, "এ কি ভূতের মত হইছিস্ রে, আমি তোকে চিন্‌তে পারি নাই।"

"আমাকে যে তোর ভাল লাগে নাই রে ফুলি, তাই ভূত হয়েছি", বলিয়া মাখম উপবিষ্ট হইয়াই ফুলকুমারীর কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিল।

পরস্পরের কণ্ঠ জড়াইয়া বিপুল আবেগে উভয়েই উভয়ের পৃষ্ঠে কিছুক্ষণ অশ্রুবর্ষণ করিল।

"হাঁ রে, আমাকে ঘরকে লিবি?"

"লিবে—উঠে পড়, মেসো চ'লে যেতে চাচ্ছে" বলিয়া ভাবিনী তাহাদের কথোপকথন উপক্রমেই বন্ধ করিয়া দিল।

"এখানে আর লোক-জানাজানি করতে হবেক না, উঠে পড় বউ, আমার পাগল ভাইকে ধ'রে ঘরকে লিয়ে যা।"

"মতি!"

প্রহ্লাদের কথা শুনিবামাত্র সকলেই সসম্ভ্রমে দাঁড়াইল।

দূর হইতে সম্বোধন করিয়া প্রহ্লাদ তাহাদের নিকটে আসিল। আসিয়াই বলিল, "এইবারে আমি যেতে পারি মা?"

"আজকে তোকে ছেড়ে দিতে পারব না বাবা!" বলিয়াই মাখমের কানে কানে ফুলকুমারী বলিল, "মদ খেয়েছিস্?"

মাখম বলিল, "টুকচ্যা খায়েছি।"

"আর রইছে?"

"সবই রইছে, পূরা বোতল।"

"মেসোকে ধর, ছাড়িস্ না, তাকে একটু খেতে দে। বড় কষ্ট ক'রে আইচে।"

প্রহ্লাদ বলিল, "থাকবার যে উপায় নেই মা ! দেখে ত এসেছিস, তোর মাসী একা।"

ভাবিনী বলিল, "কেন মেসো, বাপকে ত তোমার বাকুল আল্‌গুতে রেখে আইচি।"

সকলে মিলিয়া প্রহ্লাদকে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিল—মাথম তাহার পা দুইটা জড়াইয়া ধরিল আর মদ্যের অস্তিত্বের আভাস দিয়া মেসোকে তাহার গায়ের ব্যথা দূর করিতে অনুরোধ করিল।

প্রহ্লাদের মাঝে মাঝে মদ্য সেবনটা চলিত। সত্য সত্যই পথের কষ্টে তাহার শরীরটা বড়ই ক্লান্ত হইয়াছিল। সে ক্লান্তি দূর করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিল না। বলিল, "যেতে পারলেই ভাল হ'ত। তবে তোর মায়া কাটাতে পারছি না রে মতি !"

"যেখানে থাকি, আমি তোমারই ত রইচি বাবা ! তোমার আর আমার সেই দয়াময়ী মা'র।"

ফুলকুমারী হাতে ধরিয়া তাহার বহুদিনের পরিত্যক্ত ঘরে তাহার মেসোকে ধরিয়া লইয়া আসিল।

ভাবিনী নরহরিকে সেই রাত্রিতেই সংবাদ দিল। কেন না,মেসোকে খাওয়াইতে হইলে তাহাদের ঘরে ত চলিবে না।

নরহরি শুনিয়া পরমানন্দিত হইলেন, বলিলেন, সমাজে ফুল্লীকে তুলিয়া লইবার জন্য তাহাদের যত ব্যয় হইবে, তাহার ভার তিনি গ্রহণ করিবেন।

সমস্ত রাত্রিটাই নবপরিচিত জামাতার সঙ্গে আনন্দ করিয়া প্রহ্লাদ সূর্য্যোদয়ের কিছু পূর্ব্বে ভাবিনীকে লইয়া মাধববাটী হইতে প্রস্থান করিল। লোক-জানাজানি করাটা তখন কাহারও ইচ্ছা ছিল না।

যাইবার সময় প্রহ্লাদ মতির গচ্ছিত টাকা কয়টি এবং বিন্দুর দত্ত দুইখানি বস্ত্রোপহার মাথমের হস্তে তুলিয়া দিল। আর বলিল, সে এক জন সে দেশের খ্যাতনামা রাজমিস্ত্রী, মাসে তাহার ত্রিশ চল্লিশ টাকা আয়, বিন্দুও দুগ্ধ বিক্রয় করিয়া দিন প্রায় বার তেরো আনা উপার্জ্জন করে, সংসারে খাইবার মধ্যে মাত্র তাহারাই দুই জন—যদি জামাতা তাহার কন্যা মতিকে লইয়া তাহার ঘরে থাকিতে ইচ্ছা করে, কোনও কায কর্ম্ম না করিলেও সে অক্লেশে তাহাদের ভরণপোষণের ভার লইতে পারে।

* * * * *

মাথমের সংসারে আবার আনন্দ ফিরিয়াছে। ফুলকুমারীর পুনরাগমন লইয়া গ্রামের কেহই আর বিশেষ কোনও তর্ক-বিতর্ক করিল না। বাউরীরা ফিরিয়া আসিয়া মাথমের বাড়ীতে একটা ভোজে তাহাকে সমাজে নির্দ্দোষ করিয়া লইল।

* * * * *

দুই বৎসর অতীত হইয়াছে। একান্ত ইচ্ছা থাকিলেও মাথম মতিকে লইয়া তাহার মেসোর বাড়ীতে উপস্থিত হইবার সুযোগ পায় নাই।

ফুলকুমারীর গর্ভস্থ সন্তানের কি হইল, প্রথম প্রথম দুই এক বার মাথমের জানিতে ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু সাহস হয় নাই। এখন তাহারই একটি পুত্র হইয়াছে। সেই সঙ্গে মাথম ফুলকুমারীর পূর্ব্বাবস্থা একরূপ বিস্মৃতই হইয়াছে।

* * * * *

দীর্ঘ দুই বৎসর পরে। বিন্দু তাহার বাড়ীর ভিতরে গো-সেবা কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। একটি আড়াই বৎসরের কন্যা তাহার পিঠের উপর পড়িয়া মাথার চুল টানিয়া তাহাকে উত্ত্যক্ত করিতেছিল। বৃদ্ধ হুঁকা হাতে সেই বারান্দার উপর হইতে তাহার দুর্দ্দশা দেখিতেছিল। ব্যতি-ব্যস্ত হইয়া বিন্দু বলিয়া উঠিল, "দেখছিস্ কি মিন্‌সে, মেয়েটাকে ধর্। জ্বালাতন ক'রে মারলে যে আমাকে।"

এমন সময়ে বাহিরের কবাটে ঘা পড়িল,—"মাসী !"

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ
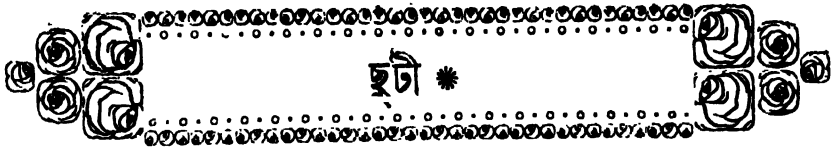
ছুটী *

"ছুটী! ছুটী! ছুটী! গ্রীষ্মের লম্বা ছুটী! চৈত্রে চড়কের ঢাকে কাঠী পড়িতে আরম্ভ, আর 'আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে' নহে, আষাঢ়স্য অষ্টাদশদিবসে শেষ, পুরা ২॥০ মাস, ৩২ দিনে পাকি ওজনের মাসের হিসাবেও এক দিন বাড়তী থাকিয়া যায়। ছুটী পাইলে ছাত্রদিগের মুক্তির আনন্দ, শিক্ষক-দিগেরও মুক্তির আনন্দ। ছুটী হইলেই প্রাণ বলে কোথাও ছুটি। ইচ্ছা করে কোথাও গিয়া শ্রান্ত-ক্লান্ত মনটা জুড়াই, রাজধানীর কর্ম্মকোলাহল হইতে দূরে গিয়া একটু আরাম খাই।" ইত্যাদি কথা বারো বৎসর আগে মনের স্ফূর্ত্তিতে লিখিয়াছিলাম। (১) আবার বারো বৎসর পরে সেই মামুলি কথারই পুনরাবৃত্তি করিতেছি। তবে এখন বলিতেছি, প্রাণের স্ফূর্ত্তিতে নহে—প্রাণের দায়ে; তখন অবসর পাই-লেই ছুটিয়া বাহির হইতাম—সখের বশে, সুখের লোভে, আনন্দের আশায়; আর এখন ছুটিয়া বাহির হই—শান্তি-লাভের বৃথা চেষ্টায়। এ যেন সেই কথামালার গল্পের আহারের চেষ্টায় দৌড়ান (২) ও প্রাণভয়ে দৌড়ানর মধ্যে বিষম প্রভেদ। বারো বৎসরে না কি এক যুগ! আমার জীবনে এই বারো বৎসরে সত্য সত্যই যুগান্তর ঘটিয়াছে। ছুটী-সম্বন্ধে উদ্ধৃত উচ্ছ্বাসপূর্ণ বাক্যগুলি খসড়া অবস্থায় থাকিতেই শোকসিন্ধুর একটি প্রবল ধাক্কা খাইয়া আমার জীবনের প্রবাহ ফিরিয়াছে এবং তাহার পর ধাক্কার উপর ধাক্কায় আমাকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিয়া সকল শক্তি ও সুখ-স্বস্তি-শান্তি হরণ করিয়াছে। যাক্ সে বেদনার প্রসঙ্গ।

১

এই যে ছুটী হইলেই প্রাণ বলে—কোথাও ছুটি, ইহার কারণ কি? (শব্দদ্বয়ের মধ্যে কি ব্যুৎপত্তিগত সম্পর্ক আছে, সেই জন্যই মনের এই প্রকার ঝোঁক আসে? বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের এই সমস্যা-সমাধানের ভার প্রবীণ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি ও শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার ও নবীন শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই সুপণ্ডিত-ত্রয়ীর উপর দিয়া মূল প্রশ্নটির বিচারে প্রবৃত্ত হই।) অবশ্য ইহার সহজ উত্তর তো পড়িয়াই রহিয়াছে। উল্লিখিত পুরাতন প্রবন্ধে সে উত্তর দিয়াছি। গুরুশ্রমের পর বিশ্রাম, ইহাই প্রকৃতির আদেশ।' (জানি না, এ ক্ষেত্রেও উপসর্গ-ঘটিত ব্যাকরণ-রহস্য আছে কি না—শ্রম ও বিশ্রাম!) শ্রান্ত-ক্লান্ত দেহমন জুড়াইতে, জিরাইতে, মানবের স্বাভাবিক প্রবণতা আছে। প্রকৃতি-দেবীই সন্তানের মঙ্গলার্থ, তাহার স্বাস্থ্য ও সামর্থ্য বজায় রাখিবার জন্য, এই ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। (অবোধ অবাধ্য সন্তান সকল সময়ে এই ব্যবস্থা বুঝে না বা মানে না, ফলও অবিলম্বে বা বিলম্বে পাইয়া থাকে।) ইহাতে আরাম তো আছেই, তাহার উপর একটা বড় লাভ আছে। রাত্রিতে সুনিদ্রার পর দিবারম্ভে কার্য্যে প্রবৃত্তির ন্যায়, বিশ্রামের পরে অবসন্ন দেহে নূতন বলাধান হয়, অবসন্ন মনে নূতন শক্তিসঞ্চার হয়, ফলে নূতন উদ্যমে নবীভূত তেজে কার্য্যভার পুনরায় গ্রহণ করা যায়। প্রাণটা তাজা (fresh) হয়, নবীনতা আসে। সুতরাং ইহা জীবনের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য-সম্পাদনের জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এই বিশ্রামের সময়টা বৃথা নষ্ট হয় না, ইহা অদূর ভবিষ্যতে সুফল-প্রসূ। পতিত জমি আবাদ করিলে সোনা ফলে। (তবে দীর্ঘকাল ধরিয়া আরাম খাইলে শেষে জড়তা আসে, তাহাতে কর্ম্মে অপ্রবৃত্তি জন্মিবার সম্ভাবনা, যেমন অধিক ঘুমাইলে হয়। লম্বা ছুটীর পর অনেকে এইরূপ জড়তা অনুভব করিয়াছেন।) (৩)

---

* বঙ্গবাসী কলেজের ছাত্র-সমিতির বর্ত্তমান বর্ষের প্রারম্ভিক (inaugural) অধিবেশনে লেখক-কর্ত্তৃক পঠিত। (১১ই শ্রাবণ ১৩৩৪)

(১) 'কাশীবাস'-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। পাগলা ঝোরা', দ্বিতীয় সং, ২৪২-৫৩ পৃঃ।

(২) লেখকের পক্ষে এ বয়সে আহারের চেষ্টায় দৌড়ান বিড়ম্বনা, কেন না, পেটে আর গুরুভার সহে না। এখন রসনা ও উদরের মধ্যে রফার প্রয়োজন হইয়াছে। নতুবা একেবারেই দফারফা হইবার সম্ভাবনা।

(৩) The peculiar mentality that characterises most of us on our return to work after the annual holiday is an interesting psychological fact. . . . . For a few days we are strangely dull and depressed. We work because we have got to do so, but the salt of work has lost its savour and we are apt to feel bored. The main feature of the mental make-up

এক জায়গায় চুপ্‌টি করিয়া বসিয়া থাকিলে বা আড় হইয়া শুইয়া পড়িলে (এবং তোফা নিদ্রা দিতে পারিলে) শ্রান্তি-শান্তি হয়, আরাম হয়, ভিতরে ভিতরে শরীরের নষ্ট বস্তুর ও শক্তির পুনরুদ্ধার হয়। অধিকাংশ লোক এই উপায়েই শ্রান্তি দূর করিয়া নববল লাভ করেন। কিন্তু ইহার একটি দোষ, ইহা বড় একঘেঁয়ে, বৈচিত্র্যবর্জ্জিত, সুতরাং সত্বর সজীবতা-সঞ্চারের বাধা হয়। পক্ষান্তরে নানা স্থানে ভ্রমণে ইহা অপেক্ষা শীঘ্র উপকার পাওয়া যায়, নব নব দৃশ্য-দর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই মনের স্ফূর্ত্তি হয়, শীঘ্র শীঘ্র অবসাদ কাটিয়া যায়, কর্ম্মে প্রবৃত্তি ফিরিয়া আসে। অবশ্য দেহ-যন্ত্রটা দুর্ব্বল থাকিলে পদব্রজে বা সাইকেল্ চালাইয়া দেশ-ভ্রমণ করা সম্ভব নহে, করিতে গেলেও উপকার না হইয়া অপকারই হইবে। সে সব ক্ষেত্রে মোটরে, রেল্‌গাড়ীতে, ষ্টীমারে জাহাজে দেশভ্রমণ করিলে, আয়াস হয় না, কিন্তু 'আয়েস' হয়, শরীরের উপর জুলুম করা হয় না, কিন্তু মনের সজীবতা-স্ফূর্ত্তি হয় ; ফলে বিশ্রামের উদ্দেশ্য সুচারুরূপে সিদ্ধ হয়। এই জন্যই মানুষ ছুটী পাইলেই কোথাও ছুটিতে চাহে, শুইয়া বা বসিয়া আরাম করিতে চাহে না।

এ সম্বন্ধে হালের এক জন ইংরাজ লেখক বেশ একটা মজার কথা বলিয়াছেন। অবশ্য কথাটা তিনি সম্পূর্ণ গম্ভীর-ভাবে বলেন নাই, বেশ একটু কৌতুকের ছিটা আছে ; কিন্তু এই 'পরিহাসে'র ভিতর যে 'পরমার্থ' একেবারে নাই, তাহা বলা যায় না। তিনি বলিয়াছেন, এরূপ বিশ্রাম হইতে সুফল আদায় করিতে হইলে, শুধু অভ্যস্ত কার্য্য বন্ধ করিলে চলিবে না, তখনকার মত নিজস্ব প্রকৃতিও ত্যাগ করিতে হইবে। যিনি সাধু, তিনি যেন দিন কতকের জন্য অসাধু-বৃত্তি অবলম্বন করেন—চুরি, জাল, জুয়াচুরি, বাটপাড়ি ধরেন! তাহাতে যদি কাহারও আর্থিক বা অন্য প্রকার ক্ষতি হয়, সে ক্ষতি পরে 'ধাতে' ফিরিয়া আসিলে পূরণ করিলেই চলিবে ! তাঁহার সুন্দর কথাগুলির এইভাবে 'চুম্বক' করিয়া দিলে মূলের সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়া যায়। অতএব পাদটীকায় অবিকল উক্তিটি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। (৪) পাঠকবর্গ লেখাটুকুর তারিফ করিবেন।

যে সব দেশে নিসর্গের অনুপম শোভা, আধুনিক বিলাত ও মার্কিন দেশের লোক অনেকে সেই সব দেশে বিশ্রাম ও স্বাস্থ্যলাভ এবং তৎসঙ্গে সৌন্দর্য্য-উপভোগে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তি-লাভ এই উভয় উদ্দেশ্যেই গিয়া থাকে। (৫) শুধু বিলাসী ধনিসম্প্রদায় নহে, সামান্য দোকানী পসারী বা চাকুরিয়া পর্য্যন্ত ছোট ছোট ছুটী-ছাটাতে, এমন কি (week-end) সপ্তাহান্তে নিকটবর্ত্তী মনোরম স্থানে ট্রেণে বা মোটরে, নৌকায় বা ষ্টীমারে, অল্প সময়ের জন্যও গিয়া স্বাস্থ্য ও সজীবতা লইয়া ফিরে। ইহার অনুকরণে ও অনুসরণে বাঙ্গালীও আজ কাল এই পথ ধরিয়াছে। মধুপুর, দেওঘর, শিমুলতলা,

---

for the time being is a curious inability to concentrate . . . . the disinclination for work, both mental and physical—that accompanies the first week of return. [AFTER THE HOLIDAY: *The Indian Daily News*: 23rd Oct., 1923]

(৪) The secret is that our holidays should rest not only our minds and bodies but characters too. Take, for example, a good man. His goodness wants a holiday as much as his poor weary head or his exhausted body. I wonder if he should not rest it by becoming for three weeks a bad man. Instead of sitting quietly on the pier, as he now does, he might pick a pocket or two. On returning from a sail in a boat he could furtively bore a hole in it. In his hotel he could mix up the boots, turn out the electric light and decamp without paying his bill. Such expenditure as his holiday involved might be met with a forged cheque. On returning to town all the errors of three weeks could be rectified: the handkerchiefs and purses returned to his victims on the pier; provision made for the survivors of those who had been drowned when the boat filled and sank; and so forth. But that is not the point. The point is that he would have had a complete holiday. Similarly a wicked man should rest his wickedness and devote his month in Brighton to good works.

I do not, I must confess, see in England, any period of prosperity for my plan; but it is sound, none the less. Perhaps the nearest practicable advice to it that one dares to give is that on a holiday we should endeavour to change the conditions of our life in every way as completely as possible. Only thus can a holiday be, for those of us who are active and restless in mind, a genuine rest. For it is not idleness that such require, but a change of employment. E. V. LUCAS: *Listener's Lure*.

(৫) "What we want is rest," said Harris. "Rest and complete change," said George, "the overstrain of our brains has produced a

গিরিডি প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী স্থানে, দার্জ্জিলিং, শিলং, সিমলা, মুসুরী প্রভৃতি দূরবর্ত্তী স্থানে, এমন কি সুদূর কাশ্মীর পর্য্যন্ত যাইতেছে। চাকুরীর এস্তাজারীর বা ব্যবসায়ের ঝঞ্ঝাটের ভিতর একটু ফুরসদ পাইলেই চাকুরী-স্থান বা ব্যবসার স্থান হইতে পৈতৃক ভদ্রাসনে না যাইয়া, প্রবাস-ভূমি হইতে জন্মভূমি পল্লীভবনে না ফিরিয়া, অবকাশ-কালের সুযোগে জ্ঞাতি-কুটুম্ব আত্মীয়-প্রতিবেশীদিগের সহিত মিলনসুখ ভোগ না করিয়া, বাঙ্গালীও সাহেবদিগের দেখাদেখি আজ-কাল এই ভাবে বিদেশে অবসর যাপন করিতেছে, কষ্টার্জ্জিত অর্থ জলের মত ব্যয় করিয়া ভিন্নপ্রদেশবাসীর পেট ভরাইতেছে, এ জন্য অনেকে অর্থনীতি ও সমাজনীতির দিক্ হইতে নিন্দা করেন। কিন্তু কালের প্রভাব, যুগধর্ম্ম (zeitgeist) কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। এখনকার আবহাওয়াই এইরূপ। তবে হিন্দুর সাত্ত্বিক প্রকৃতি অধিকাংশ স্থানেই বাঙ্গালীর এই দেশ-ভ্রমণকে একটি বিশেষত্ব দিয়াছে। অধিকাংশ বাঙ্গালী এইরূপ সুযোগ পাইলে তীর্থভ্রমণ করিয়া ঐহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও পারত্রিক মঙ্গল একত্র উভয় আনন্দই উপভোগ করেন। (যদিও বিজ্ঞ ব্যক্তিরা ইহাকে 'সৌখীন তীর্থযাত্রা' বলিয়া টিপ্পনী কাটেন।)

২

এই ভাবে প্রশ্নটির যে মীমাংসা করা হইল, তাহা অবান্তর না হইলেও নিতান্ত মোটা কথা। 'এহো বাহ্য'। একটু সূক্ষ্মভাবে দেখিলে ইহার গভীরতর উত্তর মিলিতে পারে।

জড়বিজ্ঞানে দুইটা শক্তির কথা শুনি, একটা কেন্দ্রানুগ (Centripetal), আর একটা কেন্দ্রাতিগ (Centrifugal), একটা সম্প্রকর্ষণ আর একটা বিপ্রকর্ষণ। আমার ধারণা— শুধু জড়জগতে কেন, মনোজগতেও এই উভয় শক্তিই কার্য্যকরী। একটি শক্তি আমাদিগকে মায়ার বন্ধনে নাগপাশে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, 'not নড়ন চড়ন, not কিচ্ছু,' আমরা দেশভুঁই, ভিটামাটী, বাগান-বাগিচা, জমি-জায়গা, 'বিত্ত-পসার,' স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি, স্ত্রী-পুত্র-পরিজন, জ্ঞাতি-কুটুম্ব, আত্মীয়স্বজন, পাড়া-পড়শী, আঁকড়াইয়া আছি, গণ্ডীর বাহির হইতে চাহি না, তাহাদিগকে ছাড়িতে হইলেই জগৎ শূন্য, চক্ষুঃ অন্ধকার দেখি। (আমাদের শাস্ত্রে, ইহার নাম 'বিষ্ণুমায়া') ; এই শক্তির বলেই সংসার চলিতেছে, ইহারই প্রভাবে সমাজের স্থিতি ; নতুবা সব এলোমেলো, ছন্নছাড়া, ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইত। ইহারই গুণে লক্ষ্মীশ্রীসম্পন্ন সুসংহত সমাজ গ্রাম নগর রাষ্ট্রের উৎপত্তি, স্থিতি ও উন্নতি। (রাষ্ট্রনীতিতে Conservatism স্থিতিশীলতার উদ্ভবও এই শক্তির বিকাশ।)

আবার বিপরীত শক্তির প্রভাবে মানুষ নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকে না, ভিটামাটী কামড়াইয়া পড়িয়া থাকে না। তাহাদিগের মনোভাব, 'তাতস্য কূপোঽয়মিতি ব্রুবন্তঃ ক্ষারং জলং কাপুরুষাঃ পিবন্তি।" 'উদ্‌যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ।' এই অসন্তোষের তাড়নায়, এই লক্ষ্মীলাভের কামনায়, উদ্যমশীল পাশ্চাত্য জাতিগণ কত দূরদেশে, কত দুর্গম বিপৎসঙ্কুল অপরিচিত স্থানে প্রয়াণ করিতেছে, উপনিবেশ স্থাপন করিতেছে, রাজ্যবিস্তার বা বাণিজ্যবিস্তার করিতেছে, প্রকৃতির সহিত সমরে বিজয়লাভ করিতেছে।

"দক্ষিণে চাই উত্তরে চাই
ফেণায় ফেণা, আর কিছু নাই,
যদি কোথাও কূল নাহি পাই
তল পাব ত তবু।
ভিটার কোণে হতাশ মনে
রৈব না আর কভু।
যাবই আমি যাবই, ওগো,
বাণিজ্যেতে যাবই ॥"

রবীন্দ্রনাথ—বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ। ক্ষণিকা ॥

ইহাতে তাহাদের ব্যক্তিগত উন্নতি হইতেছে, রাষ্ট্রেরও ধনবৃদ্ধি হইতেছে। ফলতঃ এই শক্তির গুণে জগতের সমূহ উপকার হইতেছে। অথচ স্বদেশপ্রেমে, মাতৃভূমির প্রতি ভক্তিতে তাহারা কম নহে। (রাষ্ট্রনীতিতে Liberalism

---

general depression throughout the system. Change of scene, and absence of the necessity for thought, will restore the mental equilibrium."

I agreed with George, and suggested that we should seek out some retired and old-world spot, far from the madding crowd, and dream away a sunny week among its drowsy lanes—some half-forgotten nook, hidden away by fairies, out of the reach of the noisy world —some quaint perched eyrie on the cliffs of time, from whence the surging waves of the nineteenth century would sound far-off and faint.—JEROME K. JEROME:

ভারতীয় আর্য্যগণের এই উদ্যম, এই উল্লাস, এই উন্নতির আশা ছিল। এখনও যে একেবারে লোপ পাইয়াছে, তাহা নহে। মাড়োয়ারী প্রভৃতি ব্যবসায়ি-সম্প্রদায়, তথা 'শ্যামা জন্মদা' বঙ্গমাতার আঁচল-ধরা বাঙ্গালী জাতি ভারতের, এমন কি জগতের বহু স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তবে মনস্বী শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় বলিবেন, প্রভেদ এই যে, মাড়োয়ারী যায় বোঝা ঘাড়ে করিয়া ও তুলাদণ্ড বা গজকাঠি হাতে লইয়া; আর বাঙ্গালী যায় অস্ত্র-আইনের কল্যাণে অবশিষ্ট একমাত্র আইনসঙ্গত অস্ত্র—লেখনীহস্তে।

আবার এক শ্রেণীর মানব, আর্থিক উন্নতির জন্য নহে, জ্ঞানের উন্নতির জন্য, রাষ্ট্রের নহে, জ্ঞানের সীমানা বাড়াইবার জন্য, সিন্ধুনীরে, ভূধরশিখরে, কাননে কান্তারে, মরুভূমে তুষারক্ষেত্রে, এমন কি গগনে পর্য্যন্ত বিচরণ করিতেছে। কোন্ দিন বা ভূগর্ভে বা অতল সাগর-তলে (যন্ত্রের সাহায্যে) অবতরণ করিয়া নব নব তত্ত্বের অবিষ্কার করিবে। এই উচ্চভাবভাবিত মানবের জীবনের মূলমন্ত্র,—'জ্ঞানাৎ পরতরং ন হি।' (৬)

ভারতীয় আর্য্যগণও এক দিন এই পবিত্র মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। তবে তাঁহাদিগের উদার উদ্দেশ্য ছিল—জ্ঞান-বিতরণ। এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহারা তিব্বত-চীনে, ব্রহ্মতাতারে, 'অসভ্য জাপানে', শ্যাম-সুমাত্রায়, বলিদ্বীপে, যবদ্বীপে, চম্পায় কাম্বোডিয়ায়, আধ্যাত্মিক জ্ঞান বিস্তার করিয়া 'বৃহত্তর ভারতে'র সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

অতটা উচ্চভাবভাবিত না হইলেও এই শক্তির স্ফুরণেই অনেকের বাতিক দেশ-পর্য্যটন—য়ুরোপ-আমেরিকায় তো ইহা সংক্রামক হইয়া পড়িয়াছে। জানি না, ইহা আদিম মানবের (nomadic habit) যাযাবর-বৃত্তির জের কি না। পঙ্গপালের মত tourist বা globe-trotterএর দল পৃথিবীর আনাচ-কানাচ পর্য্যন্ত ছাইয়া ফেলিয়াছে। 'ঘর-বোলা', 'ঘরকুণো', 'ঘরমুখো', 'ঘর হইতে আঙ্গিনা বিদেশ' ইত্যাদি অপবাদগ্রস্ত বাঙ্গালীও আজ এই শক্তির প্রভাবমুক্ত নহে। তাই ইদানীং সে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। ঘরে আর মন টেকে না। এ যেন বদ্ধ ঘরে থাকিয়া দম বন্ধ হইয়া আসিতেছে—তাই বাহির হইবার জন্য প্রাণ আঁকু-পাঁকু করিতেছে। (তাই বলিয়া ইহারা vagabond, ভবঘুরে, হাভাতে, লক্ষ্মীছাড়া নহে। বরং ইহারাই জাতির ভবিষ্যতের আশাস্থল।) বাঙ্গালী যুবকদিগের পদব্রজে, সাইকেলে, মোটরে, দেশভ্রমণের কথা আজকাল প্রায়ই সংবাদপত্রে পাঠ করা যায়। যাহারা অতটা উদ্যমশীল, কর্ম্মঠ, কষ্টসহিষ্ণু নহে, তাহারাও সুযোগ পাইলেই রেলগাড়ীতে চড়িয়া দেশ-বিদেশ, হিল্লী-দিল্লী বেড়াইতেছে। এই সবই সেই জীবনের একঘেঁয়েত্ব-নিবারণের চেষ্টায়, (freshness) সজীবতালাভের আকাঙ্ক্ষায় হইলেও ইহার ভিতর উল্লিখিত সূক্ষ্মতর শক্তি কার্য্য করিতেছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুলেখক ষ্টীভনসনের কথাগুলি এক্ষেত্রে স্মর্ত্তব্য।—(৭)

'That divine unrest, that old stinging trouble of humanity that makes all high achievements and all miserable failure, the same that spread wings with Icarus, the same that sent Columbus into the desolate Atlantic.

R. L. STEVENSON: *Will of the Mill.*

এই কারণেই ভ্রমণকাহিনী পাঠ করিতে এত ভাল লাগে। (আমার নিজের তো গল্প ও জীবনবৃত্তান্তের পরেই ভ্রমণ-কাহিনী প্রিয় পাঠ্য।) যে বেচারা অর্থ ও অবসরের অভাবে দেশভ্রমণে অসমর্থ, সে ভ্রমণকাহিনী পাঠ করিয়া দুধের তৃষ্ণা ঘোলে মিটায়। এরূপ 'পরের মুখে' (ঝাল খাওয়ায় নহে)

---

(৬) For always roaming with a hungry heart
Much have I seen and known;
To follow knowledge like a sinking star,
Beyond the utmost bounds of human thought.
. . . .
To strive, to seek, to find and not to yeild.'

—TENNYSON: *Ulysses.*

Men my brothers, men the workers, ever reaping something new;
That which they have done but earnest of the things that they shall do.
. . . .
Not in vain the distance beacons. Forward, forward let us range!

TENNYSON—*Locksley Hall.*

(৭) এই সব লম্বা লম্বা ইংরেজী 'কোটেশান্' কেবল লেখকের ইংরেজী বিদ্যা জাহির করা, অনেকে এই তীব্র মন্তব্য করিবেন। আমার এই মাত্র কৈফিয়ৎ—নিজের রচনার সরসতার অভাব বৈদেশিক সুলেখকদিগের সুন্দর রচনা উদ্ধৃত করিয়া পূরণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। জানি না, ইহাতে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি। তবে যাঁহারা রাজভাষায় অভিজ্ঞ নহেন, তাঁহাদিগের যথেষ্ট বিরক্তির কারণ বটে। সেজন্য তাঁহাদিগের নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করি।

মিষ্ট খাওয়ার তৃপ্তি আছে। তাই ইংরেজ কবি কুপার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত-পাঠে আনন্দ পাইয়া ভ্রমণকারীর উদ্দেশে বলিয়াছেন,

He travels and I too . . . .
. . . . with kindred heart
Suffer his woes and share in his escapes.
—THE TASK, *Bk. IV.*

(তবে উদ্যমশীল ব্যক্তিগণ এইরূপ প্রতিনিধিতে কায সারিয়া সুখ পান না। ভ্রমণবৃত্তান্ত-পাঠে তাঁহাদিগের ভ্রমণ-প্রবৃত্তি আরও উত্তেজিত হয়।)

বনের পাখী বলে—"আপনা ছাড়ি দাও
মেঘের সঙ্গে—একেবারে।"
খাঁচার পাখী বলে—"নিরালা সুখ-কোণে
বাঁধিয়া রাখ আপনারে।"
বনের পাখী বলে—"না, সেথা কোথায়
উড়িবারে পাই।"
খাঁচার পাখী বলে—"হায়,
মেঘে কোথায় বসিবার ঠাঁই।"

রবীন্দ্রনাথ—(দুই পাখী—ক্ষণিকা ॥)

কিন্তু ইহা অপেক্ষাও সূক্ষ্মভাবে, গভীরভাবে প্রশ্নটির মীমাংসা করা যায় না কি? দ্বিতীয় কারণটি প্রথমটি অপেক্ষা সূক্ষ্মতর গভীরতর হইলেও, খুব বেশী দূর যায় না। আমার যেন মনে হয়, 'এহো বাহ্য।' ইহারও উপর কিছু আছে। অর্থাৎ এই 'কেন'রও আবার 'কেন' আছে। এইবার সেই কথা বলি।

দেহ ও আত্মা লইয়া মানুষ; বাইবেলের সৃষ্টিপ্রকরণে বর্ণিত আছে, জীহোভা (বিধাতা পুরুষ) মাটী দিয়া মানব-দেহ গড়িয়া পরে সেই জড়-পিণ্ডের নাসারন্ধ্রে প্রাণবায়ু সঞ্চারিত করিয়াছিলেন। দেহটা স্থূল উপাদানে, পঞ্চভূতে গঠিত মৃন্ময়; আত্মা সূক্ষ্ম উপাদানে, ঐশ্বরিক তেজে অনুপ্রাণিত—চিন্ময়। এ যেন খড়মাটীতে নির্ম্মিত প্রতিমায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা। দেহ—সান্ত, দেশকালের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ; আত্মা অনন্তকাল ও দেশব্যাপী; দেহ সসীম, আত্মা অসীম; দেহ বদ্ধ, আত্মা মুক্ত; দেহ ধনুঃ, আত্মা শর; দেহ finite, limited, আত্মা infinite, unconfined; মানবের মাটীর দেহ, তাই তাহার চরণ মাটীতে সংলগ্ন, মানব অমৃতের সন্তান, তাই তাহার মাথার উপর অনন্ত আকাশ। এই সৃষ্টি-তত্ত্ব হইতে প্রশ্নটির রহস্যভেদ হয় না কি?

বনের পাখী বলে—"আকাশ ঘননীল
কোথাও বাধা নাহি তার।"
খাঁচার পাখী বলে—"খাঁচাটি পরিপাটি
কেমন ঢাকা চারিধার।"

মানবের সান্ত দেহ (সার্দ্ধত্রিহস্ত-পরিমিত) পরম আরামে মাটী কামড়াইয়া থাকে, বন্ধনে আনন্দ ও শান্তি পায়, পরিচ্ছিন্ন স্থান-কালে ঘর-গৃহস্থালী গুছাইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে। (মানব-বুড়ী মাটীতে লুটায়) আর অনন্ত আত্মা মুক্ত আকাশে, বিপুল বিশ্বে বিচরণ করিতে ব্যগ্র, অস্থিপঞ্জরে, দেহ-পিঞ্জরে, সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ (Cribb'd, cabin'd, confined') থাকিতে চাহে না। তাই মানবাত্মার স্বাধীনভাবে বিচরণ করিবার এই আকুলতা। (এ যেন ঘুড়ির সূতা ছাড়া।) ইহাই কি ভাবুক কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতায় ফুটিয়া উঠে নাই?

" 'It would be a wildish destiny. . . . .
Of something without space or bound,
And seemed to give me spiritual right
To travel through that region bright.
. . . .
Of travelling through the world that lay
Before me in my endless way."
—STEPPING WESTWARD.

এই 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'য় কি 'কেন'র উত্তর মিলে না?
"সীমার মাঝে অসীম তুমি, বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর॥"

—রবীন্দ্রনাথ—(সীমার গান।)

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

আতিথ্য-ধৰ্ম্ম
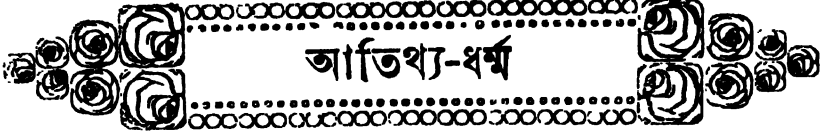
অতিথিদের বলির যূপে হে দেশ, আছ বাঁধা,
আতিথ্যটা ধর্ম্ম কি পাপ লাগিয়ে দিলে ধাঁধা।
অতিথি যে 'গুরুর গুরু' কয় তব পুরাণ,
মুখের অন্ন বুকের রক্ত তাহারে প্রদান,—
রাজকন্যা,—রাজ্য দিয়ে শ্মশানে আশ্রয়,—
পুত্র-বলি ইত্যাদি সব, মিথ্যে কিছুই নয়।
শত্রু-সখা-ধর্ম্ম-জাতি-নির্ব্বিশেষে তাই
দরাজ তোমার দরদালানে অতিথিদের ঠাঁই।

যুগে যুগে আস্‌ল যত লুণ্ঠক-মণ্ডল
মঠদেউলে কর্‌লে বরণ, অতিথি-বৎসল!
কোষাগারের হদিশ দিলে, রসুই ঘরের চাবি
পরলোকের মোক্ষ-দুয়ার খুল্‌বে তাতেই ভাবি'।
এলো কুশান শক হুন গ্রীক ঐ আতিথ্য-লোভে,
ঘর ছেড়ে তায়, ভাবলে না হায়, আপনি কোথায় শোবে।
মরুতৃষায় কাতর হয়ে পরে এলেন যাঁরা
তৃষ্ণা-নিবারণে তাঁদের দিলে শোণিতধারা।
বিশেষতঃ 'গোঘ্ন', তাঁরা, গোয়াল ছিল ভরা
শাস্ত্রে মধুপর্কে পশুবধের আছে ছড়া।
কামাখ্যা-মা'র মন্ত্র তোমার সিদ্ধ ছিল বেশ,
কিন্তু বৃক বৃকই র'লেন, হলেন নাক মেষ।

এঁরা ছিলেন মানুষ তবু, নিত্য সেবার ফলে,
কালক্রমে ঠাঁইও পেলে এঁদের চরণ-তলে।
বন্যা এলো মড়ক এলো কাল আকালের সনে,
নয়ন-জলের পাদ্য দিয়ে বর্‌লে পরাণ-পণে।
বস্‌তে তাদের দিলে সবুজ গাল্‌চেখানা পেতে,
বসা শোওয়ায় লম্বা হলো, চায় না কেহই যেতে।
নতুন নতুন ব্যাধি এলেন যমের সুপারিশে,
সগৌরবে সবার সাথে দিব্যি গেলেন মিশে।
তামাক এলেন, সুরা এলেন, নেশায় হ'য়ে বুঁদ,
নতুন নতুন বিলাস এসে চাহেন বাঘের দুধ।
কেউ বা ঘরে আগুন-লাগান, কেউ বা কাসান কেসে,
কেউ বা কেবল বমন করেন ভোজন ক'রে ঠেসে।
সইলে সবি, নইলে পরে ধর্ম্ম পাবে লোপ,
বেড়ে যাবে ওলাইচণ্ডী শীতলা মা'র কোপ।

অনেক পীড়াই দেখা দিলেন রীতি-প্রথার বেশে
অসদাচার লোকাচারের রূপে এলেন শেষে,
কেউ বা রাজার পঞ্জা নিয়ে, পঞ্জী নিয়ে কেহ,
কেউ বা ঢেকে গেরুয়াতে কুষ্ঠভরা দেহ।
সংস্কারের ভূত-প্রেতেরা এলো শ্মশান থেকে,
গয়ায় পিণ্ড না দিয়ে তা' ঘরেই দিলে ডেকে।

পাপেরা সব আস্‌ল ক্রমে বন্ধুগণের ডাকে,
কারো মাথায় লম্বা টিকি, তিলক কারো নাকে,
জালকরা কেউ পুঁথি আনে তৈলবটের লোভে
স্বার্থপরের হাড়ের পাশা কারুর হাতে শোভে।
কারো আসার নেইক বাধা, নেই ফেরানর রীতি,
অ-তিথি ঠিক কেহই নহেন সবাই চির-তিথি।

সত্য কেবল উঁকি দিয়েই পলায়ে যান দূরে,
মুক্তি এসে ঠাঁই না পেয়ে বারবারই যায় ঘুরে।
শক্তি এলে সবাই মেলে তাড়ায় পরিহাসে,
লক্ষ্মী এসে পক্ষীবেশে উড়ে পালায় ত্রাসে।
দেবতারা সব আসেন বটে ভিড়ের ঠেলা দেখে,
যা'ন চলে হায় অশ্রুধারায় রোষ অভিশাপ রেখে।

এম্‌নি ক'রে পালছ তুমি আতিথেয় ব্রত,
দেখুক জগৎ মহাব্রতের মাহাত্ম্যটা কত।
গৃহে তোমার ঠাঁই জোটে নি আছ গোয়াল-ঘরে,
গো-দেবতার চরণতলে কুণ্ঠিত অন্তরে।
এঁটো পাতার নেইক অভাব গোয়াল ঘরেই জড়ো
লেহন এবং চর্ব্বণে তার ভাগ বখারা করো।
দেবতা তোমার চিবায় পাতা, তুমি তাহাই চাটো,
দুগ্ধ তোমার ভোগ্য নহে যতই গোবর ঘাঁটো।
অঙ্গে তোমার বস্ত্র না থা'ক শাস্ত্র আছে শিরে,
সঙ্গে তোমার গোবর আছে গণ্ডী দিয়ে ঘিরে।
অতিথ-সেবার ধর্ম্ম তোমার ঠিকই থেকে গেছে,
মৃত্যু যদি হয়ও তোমার, চক্ষু যাবে বেঁচে।

[signature]

বিজয়-তোরণ

বঙ্গের বিজয়-কীর্ত্তি ভাবিতে ভাবিতে,
কত কথা একে একে জাগিল স্মরণে,
বিদ্যুৎকৃপাণ-প্রভা চমকিল মনে
বিজয় সিংহের স্মৃতি উদ্ভাসিত চিতে।

কোথা বঙ্গ! কত দূরে কোথা সে সিংহল!
লবণাম্বুরাজিবুকে মরকতমণি!
নীলোৎপল-স্নিগ্ধকান্তি যে দেশে রমণী—
সিন্ধুমণি যোনি যথা ইন্দু সমুজ্জ্বল।

কামরূপ শিশুমূর্ত্তি মৈনাক-মৈনাকী—
সিন্ধুমাঝে স্বর্গগৃহে প্রবাল আসনে
স্বর্ণধনুকরে বসি সহাস-আননে
মঞ্জু শোভা প্রেমরণে বিলসিত আঁখি।

মসৃণ করভ কৃষ্ণ শিলারাজি মাঝে,
হেমাম্বরা মনোহরা বেলাভূমি 'পরে
তরঙ্গ ভাঙ্গিয়া পড়ে অট্টকলস্বরে—
দীর্ঘ দীপ্তফেন যেথা ফণিসম নীচে।

শঙ্খশুভ্র গঙ্গশ্যেন প্রসারিয়া পাখা
দলে দলে উঠে পড়ে সাগরের বুকে—
চলে ধীবরের ডিঙ্গা পরম কৌতুকে—
ডিঙ্গামুখে রক্তবর্ণ হস্তচিহ্ন আঁকা।

নীলাম্বুবিস্তার হ'তে ভেসে আসে ধীরে
গম্ভীর মধুর মৃদু সারঙ্গের স্বর!—
মুক্ত সিক্ত কেশদাম ঘন সুপ্রচুর
নাগবালা গায় গান সিন্ধুতরী ঘিরে।

সে কোন বিজয় বাহু লিখিল লঙ্কায়
বীরসিংহ জয়গাথা বীরের রুধিরে,
ধরিল বিজয়-মাল্যকীর্ত্তি দীপ্ত শিরে
পরাজিত শত্রু নত, কুন্ঠিত শঙ্কায়।

সে দিন কি এ বঙ্গের মনসা-মন্দিরে
জেগেছিল কোন বুকে নব উদ্দীপনা?
মন্দাকিনী বীণাতন্ত্রে নূতন বাসনা
বেজেছিল নবরাগে মধুর গম্ভীরে?

শুনি কুহকিনী ছিল সে সিন্ধু-আলয়ে
কুহবিদ্যা-বিনোদিনী যৌবন-দর্পিতা,
কটাক্ষে গায়িল তার যেই কামগীতা—
মুগ্ধ হ'ল তাহে বীরসিংহের হৃদয়।

বীরভোগ্যা বসুন্ধরা, বীর বরনারী—
জয়গর্ব্বে প্রেমস্বপ্ন জাগিল মধুর
দুটি প্রাণ এক করি মিলন চতুর
ফুটাল প্রেমের চিত্র চিরচিত্তহারী।

বীরসিংহে পালি গর্ব্বে সে সুন্দরী পুরী-
ধরিলা সিংহলা নাম বঙ্গের গৌরব।
স্মৃতি তার আজো যেন চন্দন-সৌরভ
ফুটায় অতীত স্বপ্ন-বিস্মৃত মাধুরী।

শ্রান্ত মন, চিন্তা যেন স্বপ্ন হয়ে আসে,
ভাবিলাম বঙ্গের সে বীরতীর্থতীরে
কি আছে স্মরণচিহ্ন? অবনত শিরে
কাহার বন্দনা করি মনের উল্লাসে?

ডুবিল চেতনা মোর নিদ্রাচ্ছায়া মাঝে,
অসতর্ক করভ্রষ্ট রত্ন যেন জলে!
তার পর? প্রবেশিয়া প্রশান্ত অতলে
প্রবেশিয়া দেখিলাম সে বিজয়রাজ্যে!

সিংহলার সিংহকুম্ভ "বিজয়" তোরণ—
পুরমুখ অর্দ্ধবৃত্ত শোভার আধার
করিছে এ বাঙ্গালার গৌরব প্রচার—
মুকুটে ত্রিসিংহকুম্ভ চিত্ত-বিমোহন।

তাম্রের যুগের ভারতবর্ষ

ধাতুর অস্ত্র তৈয়ারী করিতে শিখিয়া মানুষ সর্ব্বপ্রথমে তাম্রের অস্ত্র তৈয়ারী করিল এবং পরে তাম্রের অস্ত্র কঠিন করিবার জন্য তাহাতে কষ্টীর বা টিন মিশাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। পাথরের অস্ত্রের যুগের পরে পৃথিবীর সকল দেশেই তাম্র ও টিন-মিশ্রিত তাম্র বা ব্রঞ্জের যুগের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগকে সেই জন্য পৃথিবীর সকল দেশে ঐতিহাসিকরা তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন ;--পুরাতন পাথরের যুগ (Paleolithic age), নূতন পাথরের যুগ (Neolithic age), এবং তাম্র ও ব্রঞ্জের যুগ (Copper and Bronze age)। ভারতবর্ষে এত দিন তাম্র ও ব্রঞ্জের যুগের নিদর্শন বিশেষ পাওয়া যায় নাই ; হিন্দুস্থান বা উত্তর-ভারতবর্ষে স্থানে স্থানে তাম্রের অস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু কেবল তাহা হইতে তাম্রের যুগের উৎকর্ষের অবস্থা স্থির করিতে পারা যায় নাই। Civilasion শব্দটা আধুনিক বাঙ্গালায় "সভ্যতা" হইয়া দাঁড়াইয়াছে

তাম্রের যুগের সমাধি, নাল, বেলুচিস্তান
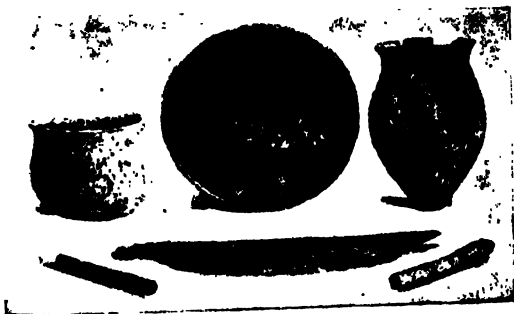
তাম্রের পাত্র ও ব্রোঞ্জের অস্ত্র, মুহেন-জো-দড়োতে আবিষ্কৃত

বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে "সভ্যতা" বলিলে ইংরাজী শব্দটির শক্তির সমস্তটা প্রকাশ হয় না। "সভ্যতা" বোধ হয় নূতন পাথরের যুগেও ছিল। কারণ, তাহারাও কাপড় বুনিতে জানিত, ভাল ভাল মাটীর বাসন তৈয়ারী করিত এবং সুন্দর ছবি আঁকিতে পারিত। উৎকর্ষ শব্দে তাৎকালীন মানব-সমাজের আপেক্ষিক উন্নতির পরিচয় বুঝিতে পারা যায়। নূতন পাথর এবং তাম্র বা ব্রঞ্জের যুগের প্রভেদ আপেক্ষিক, সুতরাং উৎকর্ষ শব্দই ব্যবহার করা উচিত।

মুহেন্-জো-দড়ো আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে ভারতবর্ষের তাম্রের যুগের উৎকর্ষ বুঝিবার কোনই উপায় ছিল না। কেবল ইহাই নহে, অতি প্রাচীন ভারতবাসীর সহিত প্রাচীন পারস্য বা ব্যাবিলোনিয়ার কোনও সম্বন্ধ ছিল কি

ব্রোঞ্জের কুঠার, তীরের ফলা, বাটালি, বল্লম, ছুরী
মুহেন-জো-দড়োতে আবিষ্কৃত

না, তাহাও বুঝিতে পারা যায় নাই। এখন বুঝিতে পারা গিয়াছে যে, তাম্রের যুগের পরে আমাদের দেশেও ব্রঞ্জের যুগ আসিয়াছিল এবং তাম্রের যুগের উৎকর্ষ সুদূর ভূমধ্যসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্বপ্রান্তে ক্রীট দ্বীপে যে প্রাচীন জাতি বাস করিত, তাহাদের উৎকর্ষের সহিত তাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস নদীতীরবর্ত্তী দেশের এবং আমাদের ভারতবর্ষের সিন্ধু ও বেলুচিস্থান প্রদেশের উৎকর্ষের

যে সাদৃশ্য ও জাতিগত সম্বন্ধ ছিল, তাহা গত চারি বৎসরের মধ্যে কতক পরিমাণে নির্ণীত হইয়াছে। এই জাতীয় এবং এই যুগের উৎকর্ষ ভারতবর্ষে মাত্র দুই স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে ;—পঞ্জাবের মণ্টগোমেরী জিলায় হরপ্পানামক গ্রামে এবং সিন্ধুপ্রদেশের লাড়কানা জিলায় মুহেন-জো-দড়ো নামক বিস্তৃত ধ্বংস-স্তূপমধ্যে। হরপ্পা গ্রাম রেলের লাইনের নিকট এবং তাম্রের যুগের পরেও দীর্ঘকাল এই স্থানে

শ্বেতপাথরের মূর্ত্তি, পার্শ্বের দৃশ্য, মুহেন-জো-দড়ো

মানুষের বসতি ছিল ; প্রাচীন ইরাবতী বা রাবী নদীর গর্ভে এই প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ অনতিদূরে এখনও বিদ্যমান আছে এবং নূতন ইরাবতী নদী হইতে খাল কাটিয়া জল আনিয়া ইহার চারিদিকে অনেক দিন ধরিয়া আবাদ চলিতেছে। মুহেন-জো-দড়ো অপেক্ষাকৃত জনশূন্য এবং পুরাতন নদীর খাদের উপরে অবস্থিত বলিয়া ইহার চারিদিকে এত দিন জলবেষ্টিত ছিল। পঞ্জাবের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অনুর্ব্বর বলিয়া সিন্ধু-প্রদেশের উত্তরদিকে অবস্থিত এই ধ্বংসস্তূপটি তাম্রের যুগের পরে মানুষের সংসর্গে অধিক আসে নাই। তাম্রের যুগে সিন্ধুনদ বর্ত্তমান গর্ভের অনেক পশ্চিমে বহিত, এই সিন্ধুর পুরাতন গর্ভ অনেকগুলি। মুহেন-জো-দড়োর নিকটে সিন্ধুনদের একটি পুরাতন গর্ভ এখন "নরা" নামে পরিচিত এবং ইহা এখন খাল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মুহেন-জো-দড়োর মধ্য দিয়া সিন্ধুনদ যে খাদে এককালে প্রবাহিত ছিল, তাহা জলাভাবে মরুভূমি হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের দেশে নদ বা নদী পুরা

শ্বেতপাথরের মূর্ত্তি, সম্মুখের দৃশ্য, মুহেন-জো-দড়ো।

তন গর্ভ পরিত্যাগ করিলে তাহা বিলে পরিণত হয়, কিন্তু বৃষ্টিহীন এবং প্রায় জলশূন্য সিন্ধুপ্রদেশে পুরাতন নদীর গর্ভ-বালুকা ক্রমশঃ মরুভূমিতে পরিণত করে। সিন্ধুপ্রদেশের সমস্ত নগর এখনও প্রায়শঃ সিন্ধুনদের উপরে অবস্থিত এবং এই দেশের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সিন্ধুনদ পুরাতন খাদ পরিত্যাগ করিলে নগরগুলিও পরিত্যক্ত হইত। এইরূপে আলোর, ব্রাহ্মণাবাদ বা মনসুরা এবং দেবল পরিত্যক্ত হইয়াছিল। এখন হইতে অনুমান ৫ হাজার বৎসর পূর্ব্বে সিন্ধুনদ মুহেন-জো-দড়ো নগরের পাদমূল পরিত্যাগ

করিয়া প্রায় ১ শত ক্রোশ পূর্ব্বে প্রাচীন সরস্বতী নদীর পুরাতন খাদ দিয়া বহিতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং সেই সময় হইতে মুহেন-জো-দড়ো ক্রমশঃ জনশূন্য হইয়া উঠিয়াছিল, অনেক দিন পরে সরস্বতী নদীর পুরাতন খাদ পরিত্যাগ করিয়া সিন্ধু যখন তাহার বর্ত্তমান খাদ খনন করিয়া লইল, তখন মুহেন-জো-দড়োর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্তূপের ধ্বংসের উপরে সিন্ধুপ্রদেশের বৌদ্ধরা একটি স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই স্তূপটি খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয় শতকে নির্ম্মিত হইয়াছিল। দীর্ঘকাল পরিত্যক্ত ও জনশূন্য ছিল বলিয়া মুহেন-জো-দড়োতে কণামাত্রও লৌহ আবিষ্কৃত

অলঙ্কার রাখিবার তাম্রপাত্র, মুহেন-জো-দড়োতে আবিষ্কৃত

হয় নাই; কিন্তু তাম ও ব্রঞ্জের যুগের পরেও মনুষ্যের বসতি ছিল বলিয়া হরপ্পায় অনেক লৌহ এবং পরবর্ত্তী যুগের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। সেই জন্যই মুহেন-জো-দড়োতে তাম্রের ও ব্রঞ্জের যুগের উৎকর্ষের নিদর্শন আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে হরপ্পায় আবিষ্কৃত নিদর্শনগুলি তাম্রের বা ব্রঞ্জের যুগের বলিয়া পরিচিত হইতে পারে নাই।

তাম্রের যুগে ভারতবর্ষের লোকের অবস্থা কিরূপ ছিল, এক মুহেন-জো-দড়োতে আবিষ্কৃত নিদর্শন হইতে তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। তখন অর্থাৎ যীশুখৃষ্টের জন্মের পাঁচ হাজার হইতে সাত হাজার বৎসর পূর্ব্বে এ দেশের লোক লিখিতে জানিত না। আমরা যেমন "ক" শব্দটি জ্ঞাপন করিবার জন্য একটি চিহ্ন ব্যবহার করিয়া থাকি, পুরাতন ভারতবাসীরা তাহা করিত না। তাহারা একটি ভাব প্রকাশ করিবার জন্য এক বা ততোধিক চিহ্ন ব্যবহার করিত। মানুষ চলিতেছে, ইহা বুঝাইবার জন্য তাহারা মানুষের দুইটা পা আঁকিত; মানুষ সিঁড়ি দিয়া ঢিবি বা বাড়ীর উপরে উঠিবে, ইহা বুঝাইবার জন্য তাহারা মানুষের দুইটি পা, একটি সিঁড়ি বা মই এবং একটি স্তূপ বা গৃহ পাশাপাশি আঁকিত। এইরূপ লিখনপ্রণালীর নাম চিত্র-লিপি (Pictogram); একটি ধারণা বুঝায় বলিয়া কেহ
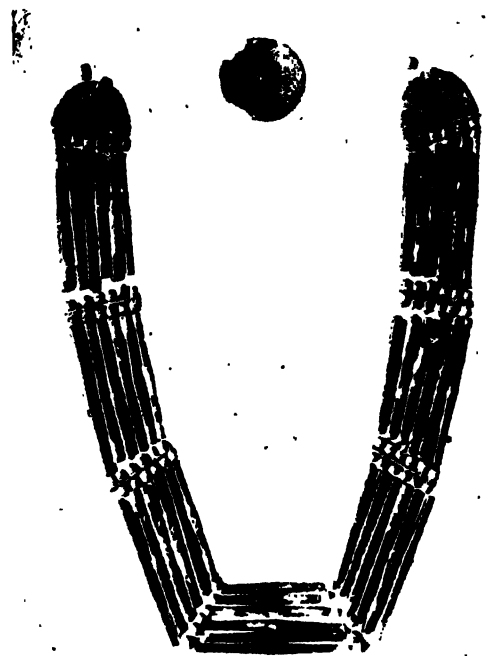
মুহেন-জো-দড়োতে আবিষ্কৃত কর্ণেলিয়ানের মালা

কেহ এই জাতীয় লিখন-প্রণালীকে ধারকলিপি (Ideogram) বলিয়া থাকেন। প্রাচীন ব্যাবিলোন, মিশর ও আমেরিকার মানুষ চিত্রলিপি ব্যবহার করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে বর্ণমালা আবিষ্কার করিয়াছিল। কোনও কোনও প্রত্নতত্ত্ববিদ্ মনে করেন যে, ভারতবর্ষে তাম্রের যুগের এই চিত্রলিপি ব্যাবিলোনের সুমেরীয় যুগের চিত্রলিপি হইতে অভিন্ন। কিন্তু ব্যাবিলোনে সুমেরীয় চিত্রলিপির প্রতিশব্দ, কোষ ও টীকা প্রচুর পরিমাণে আবিষ্কৃত হইয়াছে, ভারতীয় এবং সুমেরীয় চিত্রলিপি যদি অভিন্ন হইত, তাহা হইলে এত দিনে সুমেরীয় চিত্রলিপির অনুবাদ-প্রণালী অবলম্বন করিয়া ভারতীয় চিত্রলিপির অর্থ বুঝিতে পারা যাইত। অদ্যাবধি কোনও ভারতীয় চিত্রলিপির অনুবাদ হয় নাই বা

অর্থ বুঝিতে পারা যায় নাই ; সুতরাং ভারতীয় ও সুমেরীয় চিত্রলিপি যে এক নহে, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে। তবে অনেক বিষয়ে ব্যাবিলোনের সুমেরীয় উৎকর্ষের সহিত ভারতের তাম্র ও ব্রঞ্জের যুগের উৎকর্ষের সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম সাদৃশ্য শঙ্খের ব্যবহার, তাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস নদীর উভয় তীরের দেশে প্রাচীনতম যুগের ধ্বংসাবশেষগুলিতে প্রচুর পরিমাণে শঙ্খনির্ম্মিত দ্রব্যাদি প্রতি বৎসর আবিষ্কৃত হইয়া থাকে। আমাদের দেশে বর্ত্তমান সময়ে যেমন কেবল শঙ্খ হইতে বলয় প্রস্তুত হইয়া থাকে, সেইরূপ মেসোপোটেমিয়ার স্ত্রীব্যবহার্য্য নানারূপ অলঙ্কার কেবল শঙ্খ হইতেই নির্ম্মিত হইত। কেবল তাহাই নহে, শঙ্খের পুঁতি, চমস বা কোশা, ছোট কৌটা, নল প্রভৃতিও তৈয়ারী হইত। মুহেন-জো-দড়ো নামক স্থানে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে আমি যে সমস্ত ধ্বংসাবশেষ খনন করিয়াছিলাম, তাহাতেও এইরূপ নানাবিধ শঙ্খ-নির্ম্মিত দ্রব্য পাওয়া গিয়াছিল। সহস্র সহস্র শঙ্খনির্ম্মিত বলয়ের সহিত শঙ্খনির্ম্মিত কৌটা, বোতাম, কর্ণের অলঙ্কার, নল আবিষ্কৃত হইয়াছিল এবং তাহা এখনও কলিকাতার মিউজিয়ামে দেখিতে পাওয়া যায়।

মুহেন-জো-দড়োর কাচের গুঁড়ার রঙ্গীন পাথরের ও প্রবালের মালার দানা বা পুঁতি

তাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস নদীতীরে প্রাচীনতম যুগে সুমেরীয় অধিবাসিগণ কাচের ব্যবহার জানিতেন না। আমরা এখন পাশ্চাত্য শিক্ষকদিগের নিকট শুনিয়া শিখিয়াছি যে, কাচ মিশরদেশে গ্রীকজাতি কর্ত্তৃক যীশুখৃষ্টের জন্মের দুই এক শতাব্দী পূর্ব্বে আশ্চর্য্যরূপে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। মরুভূমির বালুকার উপরে রন্ধনকালে বালুকা গলিয়া কাচের আকার ধারণ করিয়াছিল ; কিন্তু এখন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, কাচের ব্যবহার ক্রীট দ্বীপে যীশুখৃষ্ট জন্মিবার অন্ততঃ ৩ হাজার বৎসর এবং বেলুচিস্থান ও সিন্ধুদেশে অন্ততঃ ৫ হাজার বৎসর পূর্ব্বে ছিল। বেলুচিস্থানের যে সমস্ত কাচপাত্র কলিকাতা মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে, তাহা ভিনিসদেশীয় মধ্যযুগের বহুবর্ণ কাচ-পাত্রের ন্যায় বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত। এই সকল রঞ্জিত কাচ-পাত্র আধুনিক যুগের কাচ-পাত্রের ন্যায় চিত্রিত নহে ; গলিত কাচ পাত্রের আকারে পরিণত হইবার সময়ে ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ প্রদত্ত হইয়াছিল। এই জাতীয় বহুবর্ণে রঞ্জিত একটি কাচ-পাত্র শ্রীযুক্ত কজেন্ দ্বারা (H. Cousens) ব্রাহ্মণাবাদ বা মনসুরার ধ্বংসাবশেষমধ্যে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হইয়াছিল, কিন্তু তখনও মুহেন্-জো-দড়ো আবিষ্কার হয় নাই বলিয়া এই কাচ-পাত্রটি তাম্রের যুগের নিদর্শন বলিয়া পরিচিত হইতে পারে নাই।

হাতীর দাঁত হইতে মালার দানা বা পুঁতি মুহেন-জো-দড়োয় আবিষ্কৃত

ক্রীটদ্বীপের কাচের নিদর্শনের সহিত ভারতবর্ষের তাম্রের যুগের নিদর্শন-সমূহের একটা আশ্চর্য্য সাদৃশ্য আছে। এই সাদৃশ্য সর্ব্বপ্রথমে মুহেন্-জো-দড়োতে আবিষ্কৃত নিদর্শন-সমূহে বুঝিতে পারা গিয়াছে। কাচের গুঁড়া মাটীর সঙ্গে মিশাইয়া নানাবিধ অলঙ্কার, পাত্র ও খেল্না নির্ম্মিত হইত। অনেক সময়ে এই সমস্ত অলঙ্কার বা খেল্নায় এক প্রকার নীলবর্ণের উজ্জ্বল প্রলেপ দেখিতে পাওয়া যায়। ক্রীটদ্বীপে এই জাতীয় যে সমস্ত পুঁতি বা অলঙ্কার পাওয়া গিয়াছে, তাহা রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিতে পারা গিয়াছে যে, ইহা কাচের গুঁড়া বা বালি একত্র মিশাইয়া ছাঁচে ঢালিয়া পরে পোড়াইয়া লওয়া হইত ;—
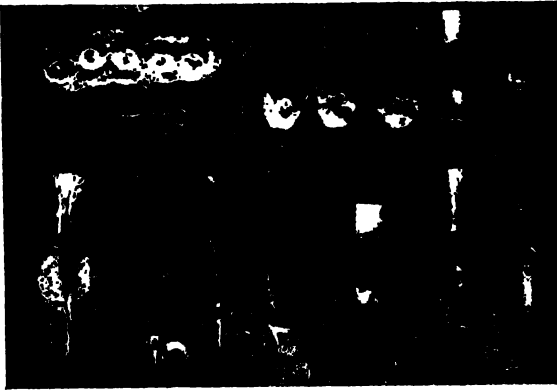
সুবর্ণ ও প্রবালের পুঁতি ও সোনার কলম

The very careful examination and analysis of various specimens of this glazed ware by Professor A. H. Church and Mr. Noel Heaton show that they represent a true faience technique. The material is almost pure sand and clay, and was moulded into shape. The true character of the manufacture appears from the fact that at times not only the surface but the whole composition of the objects consisted of vitreous paste. In that case they were intermediate between mere glazed ware and the moulded glass beads and plaques that came into vogue in Late Minoan & Mycenaean times

ভারতবর্ষে রায় বাহাদুর পণ্ডিত দয়ারাম স্বামী কর্ত্তৃক হরপ্পা নামক স্থানে এইরূপ কাচনির্ম্মিত বলয় আবিষ্কৃত হইয়াছিল, কিন্তু তখন তিনি ইহা তাম্রের যুগের নিদর্শন

নালে আবিষ্কৃত বৃষমূর্ত্তিযুক্ত চিত্রিত ভাণ্ড

অথবা কাচের গুঁড়া-নির্ম্মিত অলঙ্কার বলিয়া চিনিতে পারেন নাই। মুহেন-জো-দড়োতে এই জাতীয় পুঁতি, দাবা খেলিবার গুটী, ছোট ছোট পাত্র বা পেয়ালা, মানুষের মূর্ত্তি প্রভৃতি প্রভূত পরিমাণে আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং পুঁতিগুলিতে উজ্জ্বল নীল-বর্ণের প্রলেপ দেখিতে পাওয়া যায়। এই কাচের গুঁড়ার টুক্রা ভাঙ্গিয়া ছুরি দিয়া চাঁচিলে ইহা যে মাটী অথবা বিশুদ্ধ কাচ নহে, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। এই জাতীয় কাচের গুঁড়া-নির্ম্মিত পদার্থ মুহেন্-জো-দড়ো এবং হরপ্পা ব্যতীত ভারত-বর্ষের আর কোনও স্থানে পাওয়া যায় নাই। তক্ষশিলা, রাজগৃহ, মথুরা, কৌশাম্বী, পাটলিপুত্র, এমন কি,

ক্রীটদ্বীপের বক্রকণ্ঠ চিত্রিত পাত্র

সিন্ধুদেশের মীরপুরখাস বা থুল মীররু কন্ প্রমুখ অপেক্ষাকৃত
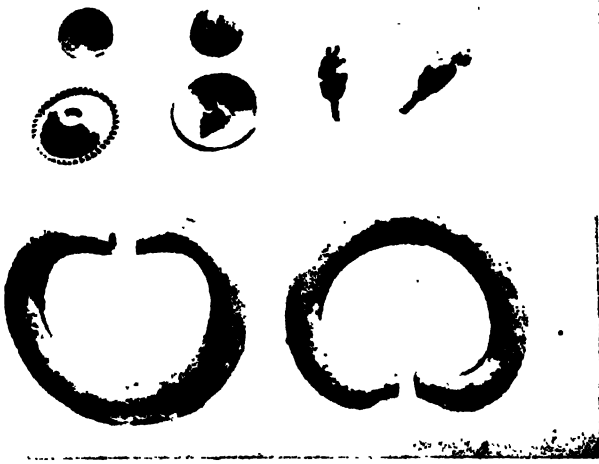
সুবর্ণের অলঙ্কার মুহেন-জো-দড়োতে আবিষ্কৃত

আধুনিক ধ্বংসাবশেষমধ্যেও পাওয়া যায় নাই। পাটলিপুত্র-খননকালে যীশুখৃষ্ট জন্মিবার ৩ শত বৎসর পূর্ব্বের কাচের শীলমোহর পাওয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু মিশ্র কাচের অর্থাৎ কাচের গুঁড়া ও মাটী মিশান পাত্র হরপ্পা এবং মুহেন্-জো-দড়ো ব্যতীত আর কোথাও পাওয়া যায় নাই। এই সকল কারণে বুঝিতে পারা যায় যে, কাচের গুঁড়া—ও—মাটী—মিশ্র নির্ম্মিত দ্রব্যাদি ভারতবর্ষের তাম্রের যুগে উৎকর্ষের নিদর্শন।

তাম্রের যুগে আমাদের দেশে উৎকর্ষের আর একটি প্রধান নিদর্শন চিত্রিত পাত্র। মাটীর ভাঁড়ে চিত্র কিছু নূতন কথা নহে,ইতুপূজার ঘট, নব পত্রিকার ঘট, বিহার ও যুক্তপ্রদেশের ছষ্টিপালনার ঘট প্রভৃতি নানাপ্রকারে চিত্রিত ভাণ্ড ভারতবর্ষে ব্যবহৃত হয়। এই সকল চিত্র ভাঁড় পোড়াইবার পরে আঁকা হয়, কিন্তু তাম্রের যুগে চিত্রিত ভাণ্ড সে রকম নহে। তাম্রের যুগে ভাণ্ড দগ্ধ হইবার পূর্ব্বে এক, দুই বা বহু বর্ণের চিত্র আঁকিয়া তাহার পরে অগ্নিতে দেওয়া হইত।

এই জাতীয় চিত্রিত মৃৎভাণ্ড হরপ্পা গ্রামে রায় বাহাদুর পণ্ডিত দয়ারাম সাহনী কর্তৃক সর্ব্বপ্রথমে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। কিন্তু তখন তিনি তাঁহার আবিষ্কারের গুরুত্ব বুঝিতে পারেন নাই। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে মুহেন-জো-দড়োতে বহু চিত্রিত মৃৎভাণ্ডের খণ্ড আবিষ্কৃত হওয়ায় এই জাতীয় পাত্র যে তাম্রযুগের সভ্যতার একটি প্রধান নিদর্শন, তাহা বুঝিতে পারা গিয়াছিল এবং তখন হইতে হরপ্পার চিত্রিত মৃৎভাণ্ডের কদর বাড়িয়া গিয়াছে। ২২ বৎসর পূর্ব্বে বেলুচিস্তানের ঝালাওয়ান জিলায় নাল নামক গ্রামে সোহর-ডাম্ব নামক প্রাচীন সমাধির মধ্যে অনেকগুলি চিত্রিত মৃৎভাণ্ড আবিষ্কৃত হইয়াছিল; কিন্তু তখনও আমাদের দেশের পণ্ডিতরা তাম্রের যুগের উৎকর্ষ সম্বন্ধে কিছুই জানিতেন না বলিয়া এই সমস্ত চিত্রিত মৃৎভাণ্ডের বিশেষ আদর হয় নাই। দুই বৎসর পূর্ব্বে নালে খননকালে বহু চিত্রিত মৃৎভাণ্ড তাম্রের যুগের সমাধির মধ্যে আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং দুই বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত কাশীনাথ নারায়ণ-দীক্ষিত কতকগুলি অতি সুন্দর বহুবর্ণে রঞ্জিত চিত্রিত মৃৎভাণ্ড আবিষ্কার করিয়াছেন। এই সমস্ত চিত্রিত মৃৎভাণ্ডের বিশেষত্ব এই যে, পরবর্ত্তী যুগে ভারতবর্ষের কোনও স্থানে এই জাতীয় মৃৎভাণ্ড আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহা সুন্দর ও সুগঠিত এবং কখনও মৃৎভাণ্ডের গাত্রের প্রলেপের উপর চিত্রিত এবং কখনও বা প্রলেপ ব্যতীত চিত্রযুক্ত। কতক-

মুহেন-জো দড়োর চিত্রিত ভাঁড়

কাচের গুঁড়ার বালা, হরপ্পায় আবিষ্কৃত

প্রস্তর ব্যবহৃত হইত বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে হীরা, চুণি, পান্না বা মুক্তা পাওয়া যায় নাই। প্রবাল ও কর্ণেলিয়ান প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইত।

তাম্রের যুগে ভারতবাসী পাথর কাটিয়া মূর্ত্তি বা প্রতিমা তৈয়ারী করিতে জানিত। মুহেন-জো-দড়োতে যে দুই চারিটি প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে, তাহা দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় যে, তাম্রের যুগের ভারতবাসীর সহিত এখনকার ভারতবাসীর আকার-গত কোনই সাদৃশ্য নাই। দুই একটি মূর্ত্তিতে যে গাত্রবস্ত্র আছে, তাহা এখনকার "জামেওয়ারের" মত; ইহা হইতে অনুমান হয় যে, বয়ন-শিল্প প্রচুর উন্নতিলাভ করিয়াছিল। একটি বড় পাথরের মূর্ত্তিতে যে গাত্রবস্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হয় জামেওয়ারের মত বোনা অথবা "বৃন্দাবনীর" মত ছাপা। মুহেন-জো-দড়ো বা হরপ্পাতে যে দুই এক টুকরা কাপড় আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা মাটী হইতে তুলিতে পারা যায় নাই। কারণ, টানা ও পোড়েন

গুলি চিত্রিত মৃৎভাণ্ড অণ্ডের আবরণের ন্যায় পাতলা এবং তাহার ভিতরে বাতি জ্বালিয়া দিলে বাহির হইতে আলো দেখা যায়।

ভারতবর্ষের যে যুগে চিত্রলিপি, কাচের ও কাচের গুঁড়ার বাসন, অলঙ্কার ও চিত্রিত মৃৎভাণ্ড ব্যবহৃত হইত, সে যুগের মানুষ বহুমূল্য মণিরত্ন এবং সুবর্ণের অলঙ্কার প্রস্তুত করিতে জানিত। পলা বা প্রবাল, গজদন্ত, রক্তপ্রস্তর প্রভৃতি নানাবিধ কঠিন দ্রব্য কাটিয়া মালা গাঁথিবার জন্য কেমন করিয়া পুঁতি তৈয়ারী করিতে হয়, তাহা তাহারা বুঝিত। নব্য প্রস্তরের যুগে গজদন্ত লম্বা করিয়া কাটিয়া পরে গোল করিয়া তাহার পরে ঘষিয়া যে প্রকারে মালার দানা বা পুঁতি তৈয়ারী করা হইত, তাহার নিদর্শন ফরাসী দেশে দোর্দ্দোন প্রদেশে আবিষ্কৃত হইয়াছে। (The Ancient Hunter, by W. G. Sollas, London 1924 pp. 365—67, Fig. 178,) ক্রীটদ্বীপে ও মিশরদেশে ঠিক এই রকম করিয়াই কঠিন প্রস্তর হইতে পুঁতি বা মালার দানা কাটা হইত। তাম্রের যুগে ভারতবর্ষের মণিকারেরা প্রবাল, রক্তমণি, নীলমণি এবং নানাবিধ বহুবর্ণের প্রস্তর কাটিয়া প্রথমে সরু, লম্বা ও পরে গোল করিয়া যেমনভাবে পুঁতি বা মালার দানা তৈয়ারী করিত, তাহার নিদর্শন মুহেন-জো-দড়োতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুবর্ণ বা সোনার ব্যবহার দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় যে, তখন এই ধাতু এখন হইতে সুলভ ছিল, কিন্তু রূপা মুহেন-জো-দড়োতে বা হরপ্পায় অধিক পরিমাণে পাওয়া যায় নাই। অলঙ্কারনির্ম্মাণকালে অনেক বহুমূল্য

নালে আবিষ্কৃত চিত্রিত কৌটা

স্পষ্ট দেখা গেলেও—মাটী হইয়া গিয়াছিল। তাম্রের যুগে ভারতবর্ষের অনেক দূর হইতে সিন্ধু দেশে শ্বেতপাথর লইয়া আসিয়া ছোট ছোট থাম, হোমকুণ্ডের নালি ও নানাবিধ বাসন তৈয়ারী করিত। তাহারা তাম্রের পাত্র ও অস্ত্র ব্যবহার করিত বটে, কিন্তু তাহাদের বড় লোকরা

নালে আবিষ্কৃত চিত্রিত ভাণ্ড

লিখিবার সময় সোনার কলম ব্যবহার করিত। এই সমস্ত কলম উড়িষ্যার তালপাতে লিখিবার লোহার কলম এবং প্রাচীন রোমের মোমের উপরে লিখিবার কলম বা Stylusএর ন্যায়।

যে সমস্ত শীলমোহর আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, এখন হইতে অন্ততঃ পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে হস্তী, ব্যাঘ্র ও গণ্ডার সিন্ধুদেশের লোকের নিকট সুপরিচিত ছিল। কিন্তু গত হাজার বৎসরের মধ্যে এই তিনটি চতুষ্পদ সিন্ধুপ্রদেশের লোকের নিকট একবারে অপরিচিত।

মুহেন-জো-দড়ো ও হরপ্পায় তাম্রের যুগের উৎকর্ষের যে
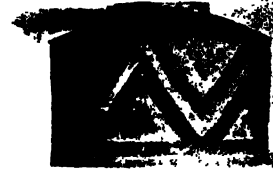
নালে আবিষ্কৃত বক্রকণ্ঠ চিত্রিত ভাণ্ড

সকল নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, সে যুগের ভারতবাসী ঋগ্বেদসংহিতা যুগের আর্য্যজাতি হইতে অনেক উন্নত ছিল, তাহারা গোচারক আর্য্যগণ অপেক্ষা ধনী এবং জ্ঞানী ছিল। কেহ কেহ মনে করেন যে, বৈদিক সাহিত্যে যে আঢ্য পনিজাতির উল্লেখ আছে, তাম্রের যুগের ভারতবাসীরা তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ। কিন্তু এই কথা প্রমাণ করিবার কোনও উপায় এখনও পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।
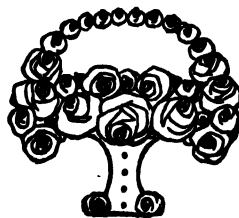
শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

বিজয়িনী

১

ঝুপ্ ঝুপ্ ঝুপ্!—ঝম্ ঝম্ ঝম্!—মেঘমেদুর শ্রাবণ-গগন ভেদ করিয়া অবিশ্রান্ত বারিধারা তৃষ্ণার্ত ধরণীর বুকে ঝরিয়া পড়িতেছে। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রকৃতির এই বৈচিত্র্য-হীন বর্ষণলীলা হৃদয়-মনকে অশান্ত করিয়া তুলিয়াছে। আর ভাল লাগিতেছে না।

স্ফটিক-স্বচ্ছ কাচের গ্লাসে দ্রাক্ষাসুন্দরীর দেহ-নিষিক্ত কনককান্তি তরলাসার ফেণপুষ্পিত হইয়া উঠিল। নিয়মিত তৃতীয় পাত্র নিঃশেষপীত রাখিয়া সিগার ধরাইয়া লইলাম। যৌবনের অপরাহ্নে সঙ্গোপনে যাহাকে জীবনসঙ্গিনীর পদে বরণ করিয়া লইয়াছিলাম, সে কখনও আমার প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করে নাই। ক্রীতদাসীর ন্যায় সে আমার স্ফূর্ত্তি-বিধান করিয়াই আসিয়াছে, অথচ লোক-সমাজে এক দিনের জন্যও আমাকে উচ্ছৃঙ্খল করিয়া তুলে নাই—আমার সুনাম ধূল্যবলুণ্ঠিত করিবার জন্য কোনও দিন অহার 'আবদার' আত্মপ্রকাশ করে নাই। এ জন্য তাহাকে আমি বড় ভালবাসি।

সারাদিন বাড়ী হইতে বাহির হইতে পারি নাই, দশাশ্বমেধ ঘাটে নিত্যস্নান আজ বন্ধ ছিল। সে জন্য দুঃখ নাই; কিন্তু স্নানার্থিনী তরুণীদিগের যৌবন-সুষমা, বিচিত্র লীলায়িত গতিভঙ্গীর মাধুর্য্যদর্শনে তৃষিত নেত্রযুগল আজ বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে, ইহারই জন্য আজিকার বর্ষাকে অভিসম্পাত করিতে ইচ্ছা হইতেছে।

কিন্তু এখন বৃষ্টি থামিয়া আসিতেছে না?—বাতায়নের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলাম। কাহার মায়াদণ্ড স্পর্শে ঘনকৃষ্ণ জাল সত্যই অন্তর্হিত হইয়াছিল। ও কি! শুক্লপক্ষের ! পর্য্যন্ত আকাশে দেখা দিয়াছে! পশ্চিমের আকাশে ! হয় বটে।

"বাবু সাব্! কেমন আছেন?"

রঘুবীরের দীর্ঘদেহ দ্বারপ্রান্তে দেখা দিল। কাশীধামে এই ব্যক্তি আমার বিশেষ বিশ্বাসভাজন। যখনই এখানে আসিয়াছি, রঘুবীর আমাকে নানাভাবে পরিতুষ্ট করিয়াছে। বাঙ্গালীর সাহচর্য্যে আসিয়া লোকটি বাঙ্গালাভাষায় চমৎকার কথা বলিতে শিখিয়াছিল। সাহস, বুদ্ধিমত্তা এবং কার্য্য-কুশলতার জন্য ইহাকে আমি অত্যন্ত ভালবাসিতাম। প্রায় বিশ বৎসর ইহার সহিত আমার পরিচয়। আমার অগাধ ঐশ্বর্য্যের কাহিনী ইহার নিকট গোপন ছিল না। অতুল ঐশ্বর্য্যের মালিক হইয়াও বিপত্নীক অবস্থায় দেশবিদেশে সুখের সন্ধানে আমি দীর্ঘকাল ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, এ সংবাদ সে রাখিত এবং আমি যে নারী-সৌন্দর্য্যের একান্ত ভক্ত, সে জন্য সে প্রকাশ্যে অথবা অপ্রকাশ্যে কোনও দিন আমার নিন্দা করিয়া বেড়ায় নাই। বরং উৎসাহ সহকারে সে আমার অভীষ্টসিদ্ধির জন্য প্রাণপণ যত্ন ও পরিশ্রম করিত। প্রচুর অর্থদানে আমিও তাহাকে প্রসন্ন রাখিতাম।

"বাবুজি! আজ বড় বাদল?"

"হাঁ, রঘুবীর, মেজাজটা তাই ভাল নেই।"

"আকাশ বেশ্ ধরে গেছে, একটু বেরুবেন না কি?"

চন্দ্রালোকে কাশীধাম হাসিয়া উঠিয়াছিল। শ্রাবণের আকাশকে বিশ্বাস করা যায় না সত্য; কিন্তু সহসা বৃষ্টি আসিবার সম্ভাবনা নাই বুঝিতেছি। বেড়াইবার জন্য মনটা ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

"চল, বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের দিকে যাওয়া যাক্।"

রঘুবীর প্রস্তুত হইল। প্রসাধন সারিয়া লইলাম। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে—কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিস্থলে বেশেঃ পারিপাট্য ও প্রসাধনে যে মনোবৃত্তির বিকাশ ঘটিয়াছিল, এখনও তাহা অব্যাহত আছে। সৌন্দর্য্যচর্চ্চা যে সভ্য মানব জাতির একটা বিশেষ লক্ষণ, তাহা আমি কায়মনো বাক্যে বিশ্বাস করি। সর্ব্বদা সুন্দর, সসজ্জ থাকাই কর্ত্তব্য [illegible] পাতল [illegible]

ভালবাসে। শুনিয়াছি, ভগবান চিরসুন্দর, চিরনবীন। বয়সে মানুষ বুড়া হয় বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না। মৃত্যু-কাল পর্য্যন্ত আমি সৌন্দর্য্যের পূজা করিয়া চলিব।

কাশী বড় চমৎকার স্থান। বৃষ্টি ধরিয়া গিয়াছে, অমনই দলে দলে দর্শনার্থীরা দেবমন্দিরে চলিয়াছে। ভক্তিপ্রবণ হিন্দু নরনারীকে আমি শ্রদ্ধা করি। কিন্তু সত্য বলিব, ভক্তি-নত হৃদয় লইয়া আমি বিশ্বেশ্বর দর্শনে যাইতেছি না। আমি হিন্দু, হিন্দুর পূজা অর্চনায় আমি অবিশ্বাস করি না—আমার কলিকাতার পৈতৃক বাড়ীতে বার মাসে তের পার্ব্বণ হইয়া থাকে, আমিও পূজাক্ষেত্রে উপস্থিত থাকি, কিন্তু ভগবানে ভক্তি? তাহা এ পর্য্যন্ত আমার মানসক্ষেত্রে, সহস্রদলে ফুটিয়া উঠে নাই। আমি সৌন্দর্য্যের পূজারী, শুধু তাহারই সন্ধানে চলিয়াছি। দেবতার মন্দির—চির-সুন্দরের লীলাভূমি, সেখানে সৌন্দর্য্যের অভাব কখনই থাকিবে না।

'হর হর ব্যোম্ ব্যোম্! মহাদেও শঙ্কর!'—মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলাম। দর্শনার্থীর সংখ্যা মন্দ নহে—বেশ ভীড় হইয়াছে। তখন বিশ্বনাথের আরতি আরম্ভ হইয়াছিল। রঘুবীর পাণ্ডাদিগের অন্যতম। সে আমাকে একটি ভাল জায়গায় দাঁড় করিয়া দিল। দর্শকের দল মুগ্ধ-নেত্রে বিশ্বনাথের দেশবিশ্রুত আরতি দেখিতেছিল। বিশ্বে-শ্বরের বন্দনাগান মন্দির-প্রাঙ্গণের সীমা ছাড়াইয়া চন্দ্রা-লোকিত গগনপথে উত্থিত হইতেছিল। মুহূর্ত্ত আমারও হৃদয় যেন আনন্দে শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু বন্দনাগান শুনিবার জন্যই ত আমি আসি নাই। আমার রূপপিপাসু অন্তর, নূতন সৌন্দর্য্যের আধার অন্বেষণ করিতেছিল।

কে ঐ তরুণী?—চমৎকার! বাস্তবিক এমন অপূর্ব্ব সুন্দরী দীর্ঘকাল কোথাও দেখি নাই! কাশ্মীর হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত বিলাসভ্রমণ কত বারই ঘটিয়াছে। শত শত বিভিন্ন জাতীয় সুন্দরীর সংস্পর্শে আসিয়াছি; কিন্তু এমন গঠনভঙ্গী, এমন রূপ-মাধুর্য্য, এমন লীলায়িত যৌবন হিল্লোলের একত্র সমাবেশ দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না! আমার রূপপিপাসু চিত্তের বিনোদনের জন্যই কি ভাগ্যচক্র এই তরুণীকে আমার নয়নপথে আনিয়া দিল? 'তন্বী, শ্যামা শিখরিদশনা' এ সকল বর্ণনা শুধু কাব্যেই লিখিত হয় না, জীবনে দেখিয়াছি; উপভোগ করিয়াছি; কিন্তু ঐ স্থিরা সৌদামিনীর ন্যায় রূপবতী, অমন আয়ত লোচনের রসরাগোজ্জ্বল দৃষ্টি, দেহ-লতিকায় এমন অনবদ্য যৌবন-সুষমা সহসা দৃষ্টিগোচর হয় না। নয়ন মুগ্ধ হইল, লুব্ধ চিত্ত অধীর হইয়া উঠিল। আমার সমগ্র ঐশ্বর্য্যের বিনিময়েও কি ইহাকে লাভ করা যাইবে না?

রঘুবীর পার্শ্বেই দাঁড়াইয়া ছিল। সে আমার দৃষ্টি দেখি-য়াই বোধ হয় আমার অন্তরের কথার আভাস পাইয়াছিল।

আরতি শেষ হইলে তরুণী যুক্তকরে দেবতাকে প্রণাম করিয়া সঙ্গীদিগের সাহায্যে ভীড় হইতে বাহিরে যাইবার চেষ্টা করিল। দেখিলাম, তাহার ললাটে, সীমন্তে সিন্দূরের চিহ্নমাত্র নাই।

চত্বরে নামিয়াই রঘুবীরকে সন্ধান লইতে বলিলাম। যদি অর্থের প্রয়োজন হয়? রঘুবীর জানাইল, সে পরে চাহিয়া লইবে।

কিন্তু শেষে ব্যর্থকাম হইলে চলিবে না। যেমন করি-য়াই হউক, তরুণীকে হস্তগত করা চাই।

রঘুবীর বলিল, "যেমন করেই হোক্, বাবুজী?"

না, না, বল-প্রকাশের দ্বারা নহে। জীবনে কাহারও প্রতি বলপ্রকাশ করি নাই। আমি সুন্দরের পূজারী। বল-প্রকাশ—পাশব শক্তির প্রকাশে সৌন্দর্য্যের মাধুর্য্য রস নষ্ট হইয়া যায়। আমি বলের ভক্ত নহি।

কল্য সন্ধ্যার মধ্যে রঘুবীর সংবাদ লইয়া জানাইবে প্রতি-শ্রুতি দিল।

জনতার মধ্যে রঘুবীর অন্তর্হিত হইল। একাকী বাসায় ফিরিলাম।

২

আজও আকাশে মেঘ জমিয়া আছে, কিন্তু বৃষ্টি নাই।

আমারও অন্তরাকাশ মেঘে ছাইয়া গিয়াছে। আজ সর্ব্বপ্রথম আমার জীবনে ব্যর্থতার তীব্র জ্বালা অনুভব করিলাম। রঘুবীর বলিয়া গিয়াছে, কোন আশা নাই। তরুণী ধনী পিতার সন্তান—কুমারী; এখনও বিবাহ হয় নাই। তবে আমাদের স্বজাতীয়া।

বিদ্যালয়ে পড়িয়াছিলাম, লর্ড মার্লবরো বলিয়াছিলেন প্রত্যেক মানুষকেই ক্রয় করা যায়, মূল্য বেশী আর কম, জীবনেও তাহার যাথার্থ্য শত শত বার পরীক্ষিত হইয়াছে। রঘুবীরকে বলিয়া দিয়াছি, তবে বিবাহই করিব।

সুন্দরীকে আমার প্রয়োজন। যদি সকল উপায় ব্যর্থ হয়, তবে বিবাহ-বন্ধনেই তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিতে হইবে। আমার মত পাত্রে কন্যাদান কি প্রার্থনীয় হইবে না?

বিদ্যা?—তাহা কি আমার নাই? কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর এম্, এ। তাহার উপর সারা জীবন ধরিয়া য়ুরোপীয় সাহিত্য মন্থন করিয়া আসিতেছি। রসজ্ঞ—সাহিত্য-রসিক বলিয়া কলিকাতার সমাজে সুনাম ত আছে।

অর্থ?—তাহার অভাব কোথায়? কলিকাতার কোন সুপ্রসিদ্ধ এটর্ণীর একমাত্র সন্তান। মৃত্যুকালে পিতা ব্যাঙ্কে ৩০ লক্ষ টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন, সুদে আসলে তাহা বাড়িয়াছে বই কমে নাই। তাহা ছাড়া বৎসরে ৫০ হাজার টাকা মুনাফার বিস্তৃত জমীদারী এবং মাসিক ৬।৭ হাজার টাকা শুধু বাড়ীভাড়া হইতেই আসিয়া থাকে। পৈতৃক এটর্ণীর ব্যবসায় ভাগে অপর অংশীর তত্ত্বাবধানে চলিয়া আসিতেছে। তাহাতেও লাভের অংশ নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে।

যশঃ?—তাহা ত প্রচুর পরিমাণে আছে বলিয়াই জানি। কোনও চাঁদার খাতা কখনও শুধু ফিরাইয়া দেই নাই। বাঙ্গালার যাবতীয় সাধারণ প্রতিষ্ঠানে বিনয়কুমার চৌধুরীর ধনভাণ্ডারের সংস্রব আছেই।

রূপ?—যৌবনের গৌরকান্তি ভোগায়তন দেহে লুপ্ত হইবার কখনই অবকাশ পায় নাই। সৌন্দর্য্যকে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য আজীবনের প্রচেষ্টা এখনই ব্যর্থ হইবে? তার পর যৌবনের উত্তেজনা—এখনও দেহে প্রচুর শক্তি এবং মনে অফুরন্ত উৎসাহ বিদ্যমান।

সৌন্দর্য্যের পূজারী, সুখের উপাসক আমি, সে কথা সত্য; কিন্তু বুদ্ধির প্রাখর্য্য ও অর্থের প্রাচুর্য্য মানুষের সুশৃঙ্খল ব্যভিচারকেও জনসমাজে তেমনভাবে প্রচারিত হইতে দেয় না। অবশ্য নিন্দকের রসনাকে কেহ চাপিয়া রাখিতে পারে না, তবে অনেক ক্ষেত্রে শত্রুপক্ষ ছাড়া অপরে তাহা বিশ্বাস করিতে চাহে না। যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই আমি নিঃসঙ্গ জীবনের পক্ষপাতী, এ জন্য পরিচিতের সংখ্যা বহু হইলেও, আমার বন্ধু-বান্ধব ছিল না বলিলেই চলে। সুতরাং ব্যবহারিক জগতে আমার অনাদর হইবার কথা নহে।

সদা আলবোলায় তামাকু সাজিয়া দিয়া গেল। কুণ্ডলীকৃত ধূমরাশির সঙ্গে অন্তরের মেঘকে সরাইয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। রঘুবীর শেষ কি জবাব লইয়া আইসে, দেখা যাউক। আমার নাম ধাম প্রকাশ করিতে তাহাকে নিষেধ করিয়া দিয়াছি। শুধু গুণগ্রাম ও ঐশ্বর্য্যের পরিচয় শুনিয়া যদি চারে মাছ আসে, তাহার পর আত্মপ্রকাশ করাই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। নহিলে অহেতুক আত্মপরিচয় দিয়া নিন্দকের সমালোচনায় প্রশ্রয় দেওয়ার পক্ষপাতী আমি নহি। এমনই কৌশল সহকারে জীবনপথে অগ্রসর হইয়াছি বলিয়াই আমি জনসমাজের শ্রদ্ধা হারাই নাই।

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। ভৃত্য আলো জ্বালিয়া দিয়া গিয়াছিল। একখানি বই লইয়া পড়িবার চেষ্টা করিলাম। মন বসিতে চাহিতেছে না।

বিবাহ?—এতকাল পরে আবার বিবাহ-বন্ধনের মায়াজালে বদ্ধ হইবার বাসনা প্রবল হইল! প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বের একখানি লাবণ্য-ঢলঢল সুন্দর মুখের ছবি মনে পড়িল। সতের বৎসর তাহার সহিত একত্র বসবাস করিয়াছিলাম। আমি কি তাহাকে ভাল বাসিতাম? বলিতে পারি না। কিন্তু আমার ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্য ও ভোগবিলাসের মধ্যেও তাহার সেবাপরায়ণ পবিত্র হৃদয়ের মাধুর্য্য ও একাগ্রভক্তির প্রবাহধারা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত, তাহা উপলব্ধি করিতাম।

বিবাহের এক বৎসর পরে, পিতা ও মাতা ছয় মাসের ব্যবধানে ইহলোকের সংস্রব ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। তরুণী পত্নীকে সেই বয়সেই গৃহিণীর আসন গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। আমার সৌন্দর্য্যপিপাসু হৃদয়, সুখপ্রয়াসী চিত্ত, পৈতৃক বাসভবনের কোলাহলের মধ্যে তৃপ্তি খুঁজিয়া পাইতেছিল না। তাই চৌরঙ্গীতে নূতন বাড়ী নির্ম্মাণ করাইয়া পত্নীসহ তথায় নির্জ্জনবাস করিতে গিয়াছিলাম। ক্রিয়াকলাপ পৈতৃকভবনেই হইত; সেই সময় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া পূর্ব্ব-পুরুষগণের নির্দ্ধারিত ব্যবস্থা মত কায করিয়া যাইতাম।

২৩ বৎসর বয়সে কন্যাসন্তানের পিতা হইলাম। উহাই প্রথম এবং উহাই শেষ। গৃহিণী আর সন্তানের জননী হন নাই। আমার গৃহের নির্জ্জনতার সুখ সুতরাং বহু পুত্র কন্যার উপদ্রবে অন্তর্হিত নাই। ভাদ্রের কূলভরা নদীতে পাল তুলিয়া সুখের তরী তর তর বেগে বহিয়া চলিয়াছিল।

ত্রয়োদশ বর্ষীয়া কন্তাকে সুপাত্রে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। ধনী পিতার শিক্ষিত সন্তান—ব্রহ্মদেশে কোন ডিষ্ট্রিক্টের এঞ্জিনিয়ার পদে প্রতিষ্ঠিত ছিল। কন্তা সেই-খানেই চলিয়া গিয়াছিল। সন্তানসম্ভবা কন্তা দুই বৎসর পরে গৃহিণীর কাছে ফিরিয়া আসিয়াছিল। পুত্র কোলে লইয়া সে স্বামীর কাছে চলিয়া যাইবার কিছুদিন পরেই গৃহিণী অকস্মাৎ মহাপ্রস্থান করেন। নির্জ্জনতাপ্রয়াসীর সকল স্নেহবন্ধনই ঘুচিয়া গেল। মহা সমারোহে তাঁহার পারলৌকিক ক্রিয়া করিয়াছিলাম। সেই শোক-সম্মেলনে সপুত্র কন্তাও আসিয়াছিল।

ব্যস্, তার পর মহামুক্তি! বন্ধনহীন জীবন ভোগ-সাগরে ভাসিয়া চলিয়াছে। অনেকে পুনরায় বিবাহ করিতে পরামর্শ দিয়াছিল। কন্তাদায়গ্রস্ত বহু পিতা আমার দ্বারস্থ হইয়াছিলেন; কিন্তু কে এমন নির্ব্বোধ আছে যে, বন্দি-দশা হইতে মুক্তি পাইয়া স্বেচ্ছায় আবার কারাজীবনকে বরণ করিতে চাহে?

মন যখন যাহা পাইতে চাহে, অবাধে করিয়া যাও। বাধা দিবার কেহ নাই—কৈফিয়তের দাবী কেহ করিবে না। এমন মুক্তজীবনকে কেহ শৃঙ্খলিত করিতে চাহে?

ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র পরিদর্শনের সুযোগ পাইয়া ধন্ত হই-য়াছি। মাঝে মাঝে কলিকাতায় গিয়া কিছুদিন থাকিবার পর আবার বাহির হইয়া পড়ি! মাঝে মাঝে কন্তা পত্র লিখিত, তাহার ওখানে আমি কেন যাই না। সে পত্রে করুণ রস যথেষ্ট থাকিত; কিন্তু আমি যে সুখপথের যাত্রী, তাহাতে কন্তার ওখানে কি যাওয়া পোষায়? না, তাহাদের সংস্রব হইতে দূরে থাকাই আমার বাঞ্ছনীয়। প্রথম প্রথম দুই একখানা পত্র লিখিয়াছিলাম; তাহার পর আর পত্রের উত্তর দিতাম না। অনেক সময়, বহু বিলম্বে তাহার পত্র হস্তগত হইত। প্রায়ই আমি বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াই-তেছি।

দেখিবার বাসনা?—না, সত্যই বলিব। কোনও দিন কন্তাকে স্নেহভরে কাছে ডাকি নাই। বালক কাল হইতে আমি শিশুদিগকে এড়াইয়া চলিয়া আসিয়াছি। সুতরাং কন্তাকে দেখিবার জন্য আগ্রহ আমার ছিলই না। ভাল আছে—সুখে আছে, যথেষ্ট।

আকাশের মেঘমালার মধ্যে বুঝি ইন্দ্রজাল আছে! নহিলে আজ যত পুরাতন স্মৃতি মনে আসিতেছে কেন? ইহা কি মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা, না আর কিছু? কই নিয়মিত তিন পেয়ালার অধিক ত পান করি নাই? তবে?

বাতায়নপথে বাহিরে দৃষ্টিপাত করিলাম। অন্ধকার আকাশপথে ও কাহার জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে! বিশ বৎসর পূর্ব্বের সেই প্রেমপূর্ণ, ভক্তিবিহ্বল আননে মমতাভরা, দীর্ঘ, দীপ্ত নয়নযুগল! মৃদু হাস্যরেখা রক্তাধরে ফুটিয়া উঠিতেছে। পুনরায় বিবাহ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি বলিয়া কি এই হাসি? বিবাহ ত একটা পবিত্র সামাজিক বন্ধন। সে বন্ধনের পবিত্রতা স্বীকার না করিয়াও এত কাল ধরিয়া নানা কামিনীকে তোমার আসনে বসাইয়া আসি-য়াছি, কই তখন ত তোমার মূর্ত্তির প্রকাশ দেখি নাই?

কিছু না, কিছু না—সদা, তামাক দিয়ে যা।

রাত্রি কত? মণিবন্ধের ঘড়ির দিকে চাহিলাম। না; বেশী রাত্রি হয় নাই।

"বাবুজি!"

চমকিয়া উঠিলাম। রঘুবীরের কণ্ঠস্বরে এমন নৈরাশ্যের বেদনা কখনও ধ্বনিত হইতে শুনি নাই।

"কি খবর, রঘু?"

"ভাল না, হুজুর।"

জোরে আলবোলার নলে টান দিলাম। গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি বল্লেন তাঁরা?"

"সে কথা না শোনাই ভাল—তাঁরা কাল সকালের গাড়ীতেই কলকাতায় ফিরে যাচ্ছেন।"

বিনয়কুমার চৌধুরী! অর্থ, সম্ভ্রম, যশঃ, প্রতিপত্তি—কিছুই আজ কাযে লাগিল না? প্রত্যাখ্যান আজ সব ভাসাইয়া দিল?

৩

শয্যাত্যাগ করিয়া যখন উঠিলাম, রৌদ্রে তখন ঘর ভরিয়া গিয়াছে। সারা রজনী নিদ্রা যাইতে পারি নাই—ভোরের দিকে তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম।

সদা, তামাক দিয়া গেল। ঘড়ীর দিকে চাহিয়া দেখিলাম, বেলা প্রায় দশটা বাজে। গঙ্গাস্নানে যাইতে হইবে; কিন্তু আজ যেন কোন উৎসাহ, কোন আগ্রহ, কোন সঙ্কল্পই নাই!

বড় ডাকঘর হইতে আমার লোক প্রত্যহ চিঠি-পত্র লইয়া আসিত। টেবলের উপর আজিকার ডাক পড়িয়াছিল। অন্তমনস্কভাবে চিঠিগুলি তুলিয়া লইলাম। একখানা পত্রের শিরোনামার নীচে ঠিকানা কাটিয়া লেখা। পত্রখানি অনেক ঘুরিয়া আসিয়াছে—ডাকঘরের অনেকগুলি ছাপই তাহার পরিচয়। কাশী আসিবার পূর্ব্বে কিছু দিন লক্ষ্ণৌএ ছিলাম। সেখানকার ডাকঘরে আমার কাশীর ঠিকানা দিয়া আসিয়াছিলাম। এ কাহার পত্র? এমন হস্তাক্ষরের সহিত আমি পরিচিত নহি। বেশ স্পষ্ট করিয়া মেয়েলী ছাঁদে ইংরাজীতে শিরোনামা লেখা। বার কয়েক ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া খাম ছিঁড়িয়া ফেলিলাম।—এ কে লিখিয়াছে?—

"দাদু!"—এ শব্দটার মধ্যে চমৎকার মাদকতা আছে দেখিতেছি!

কৌতূহল জাগিয়া উঠিল। পত্রের ভাষার মধ্যে যেন একটা নূতন—সম্পূর্ণ অভিনব সুরের আভাস পাইলাম।

"দাদু,

তুমি আমাকে কখনও দেখ নাই—আমিও তোমাকে দেখি নাই। তুমি আমার মা'র বাবা, আমার পূজনীয়, তোমাকে আপনি বলিলে হয় ত শোভন হইত। কিন্তু মন বলিল, না।

মার কাছে, বাবার কাছে তোমার কথা প্রায়ই শুনি। তুমি আমার দাদু; কিন্তু দাদু যে কেমন, তাহা ত এত দিনে জানিতেও পারিলাম না। দিদিমণি চলিয়া যাইবার পর হইতেই তুমি না কি সন্ন্যাসীর মত দেশ-বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছ? মার পর্য্যন্ত কোন খোঁজ লও না। পত্র লিখিলেও উত্তর দাও না। অথচ মা তোমার একমাত্র সন্তান! আমার অনেক সময় ইচ্ছা হইত তোমায় পত্র লিখি; কিন্তু অভিমান আসিয়া বাধা দিত। কেন? যে দাদু, তাঁহার নাতি, নাতিনী, মেয়ে জামাইয়ের কোন সংবাদ লন না, যাচিয়া কেন তাঁহার কাছে পত্র দিব? কিন্তু এতকাল পরে, আজ না লিখিয়া পারিলাম না। খুব গোপনে এ পত্র লিখিতেছি। মা, বাবা কেহ জানেন না।

দাদু, শুনিয়াছি তুমি না কি বড় সুন্দর! মা না কি দেখিতে তোমার মত? হাঁ দাদু, তুমি কি আমার মার মত এত সুন্দর? মাকে সকলে জগদ্ধাত্রীর মত সুন্দরী বলেন। তোমার ফটো মার কাছে আছে। তাতে তোমার শুধু চেহারা দেখি। যন্ত্র ত রূপের ছবি তুলিতে পারে না!

তুমি আমাদের ভুলিয়া আছ; কিন্তু আমরা তোমাকে ত ভুলিতে পারি না। আমাদের ত আর দু'টা দাদু নেই! তোমার সঙ্গে সারাজীবন আড়ি করিয়াই চলিব ভাবিয়াছিলাম; কিন্তু আজ পারিলাম না। কারণ আমরা কলিকাতায় যাইতেছি। বাবা ৮ মাসের ছুটী লইয়াছেন। কলিকাতায় আমাদের বাড়ী ঠিক হইয়াছে। শ্যামবাজারে ৯নং—ষ্ট্রীট। না, তোমার বাড়ীতে আমরা কখনই যাইব না। তুমি ত কখনও আমাদের ডাক নাই; কেন যাইব? তবে তোমাকে দেখিতে বড় সাধ, সেটা লুকাইব না। যদি সাধিয়া না লইয়া যাও, কখনও যাইব না।

তুমি ত কোন খবর লও না, লইবার প্রয়োজনও নাই। কিন্তু একটা সুখের সংবাদ দিয়া রাখি। আমার দাদা তোমার মত লেখাপড়া শিখিয়াছে। এবার সে এম্, এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে।

খুব হয় ত বিরক্ত হইতেছ? গায়ে-পড়া মেয়েটাকে শাস্তি দিবার সাধও বোধ হয় তোমার হইতেছে। সবাই আমাকে মুখরা বলে। তা কি করিব, সত্য কথা বলিতে আমার কখনও ভয় হয় না।

প্রণাম দিলাম, লইবে কি না জানি না। যদি সত্যই রাগ হইয়া থাকে, দুষ্ট রমাকে ক্ষমা করিও। ইতি"

দ্রুত তালে, নৃত্যচ্ছন্দে হৃদয়ের উপকূলে এ কাহারা আসিয়া দাঁড়াইল? অনেক উপন্যাস, কাব্য পড়িয়াছি, কিন্তু এমন অপূর্ব্ব উন্মাদনা কোনও গ্রন্থের বর্ণনা পড়িয়া পাই নাই। বাঃ! বাঃ!—একটা নূতন সুর, অভিনব ব্যঞ্জনা! তুমি রমা? আমার একমাত্র সন্তানের কন্যা তুমি কেমন, - দেখিতে হইবে।

হাঁ, আজ এই নানাসুখপ্রয়াসী চিত্তকে তুমি যেন একটা অপরিচিত আনন্দরাজ্যের বার্ত্তা—আভাস আনিয়া দিতেছ!

আমার কন্যা উমার একটি পুত্র সন্তান হইয়াছিল দেখিয়াছি। তারপর আবার সন্তান হইয়াছে? এই রমার জন্মের কথা ত শুনি নাই! না, সে জন্য দোষ দিব কাহাকে?

ওঃ! সে কত যুগের কথা!

শুধু স্বপ্ন—বিস্মৃতপ্রায়, স্বপ্নে দেখা চিত্রপট ধীরে ধীরে কেন আর খুলিয়া খুলিয়া তুলিয়া ধরিতেছ? কিন্তু—

দাঁড়াও! ভাবিয়া দেখি।—আমি বিনয়কুমার চৌধুরী, লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক। টাকার বস্তা খুলিয়া ছিনি-মিনি খেলিতে পারি! আজ রৌদ্রালোকিত কাশীধামের এই সুসজ্জিত কক্ষে বসিয়া কখনই স্বপ্ন দেখিতে পারি না। বাস্তব জীবনের রূপ, রস, আমোদ-প্রমোদ যে ব্যক্তি নিয়ত উপভোগ করিয়া আসিয়াছে—বাসনার তৃপ্তিসাধনে যে কদাচিৎ ব্যর্থতার দেখা পাইয়াছে, সে অলীক স্বপ্ন দেখে না। তবে?

কিন্তু 'দাদু';—কি মিষ্ট এই সম্বোধন! মিথ্যা বলিব না, অফুরন্ত সুখ—আনন্দ ও মাধুর্য্যের রসসাগর উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে!

হে অপরিচিতা, হে মাধুর্য্যময়ী! অপেক্ষা কর, আমি আসিতেছি! জীবনের এই অপরিচিত, অপঠিত অধ্যায়ের পাঠ লইতে হইবে!—

"বাবু সাব্। আজ এখনও স্নানে যান নি?"

স্থির দৃষ্টিতে রঘুবীরের দিকে চাহিলাম। সে আমার বিশ্বাসভাজন এবং প্রিয় সন্দেহ নাই; কিন্তু ঠিক এই সময়ে সে না আসিলেই ভাল হইত।

আলবোলার নলে জোরে টান দিলাম। অগ্নি অনেকক্ষণ নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছিল।

"কি খবর, মিশিরজী!"

"ভাল খবর, বাবু সাব! গণেশ মহল্লায়—ভারী খাপসুরৎ—"

চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

"এখন ও-কথা থাক্, মিশিরজী—গঙ্গাস্নানে যাচ্ছি।"

রঘুবীরের বিস্ময়-বিহ্বল মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম, "তোমার ছেলে মেয়ে আছে, পাণ্ডাঠাকুর?"

"আছে বৈকি, বাবুজী। দুই মেয়ে, ছেলে নেই।"

"নাতি, নাতিনী আছে?"

"পাঁচটি নাতি-নাতিনী—তারাই আমার সব। তাদের জন্যেই দুঃখ-ধন্ধা করে বেড়াই, বাবু সাব!"

রঘুবীরের দীর্ঘশ্বাস কি আমার বক্ষপঞ্জরে গিয়া আঘাত করিল?

নাঃ, রূপ ও রূপার বাহাদুরী আছে! শঙ্করাচার্য্য! তোমার মোহমুদ্গর শুধু শব্দের ঝঙ্কার তুলিয়া শ্লোকের ছন্দের মধ্যেই নির্ব্বাসিত হইয়া থাকিবে! মানুষ তোমার নীতিবিজ্ঞানের নীরস তত্ত্ব মানিতে চাহে কি?

"বাবু সাব, আপনার তবিয়ত আজ ভাল নেই? ভাল ঘুম হয়নি বুঝি?"

"হাঁ, মিশিরজী।—এখন একটু নিরিবিলি থাক্‌তে চাই।"

রঘুবীর উঠিয়া দাঁড়াইল।—"আচ্ছা, আপনি স্নান করে আসুন। আমি বিকাল বেলা আস্‌ব।"

"দাঁড়াও, রঘুবীর।—"

ট্রাঙ্ক খুলিয়া একশত টাকার দশখানা নোট পাণ্ডার হাতে দিয়া বলিলাম, "আজ বিকেলে আমি কলিকাতায় যাচ্ছি। টাকাটা তোমার নাতি নাতিনীদের দিলাম। ভাল কাপড় চোপড় কিনে দিও।—আচ্ছা এস।"

হস্তসঙ্কেত দেখিয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও রঘুবীর বাহিরে চলিয়া গেল। আমার প্রকৃতির সহিত তাহার পরিচয় ছিল।

হাঁ, স্নান সারিয়া একবার বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণার মন্দিরে যাইতে হইবে।

৪

পল্লীর নগ্ন তৃণ-হরিৎ-শ্যাম-শোভা সৌধ-কিরীটিনী কলিকাতার সুসন্নিবিষ্ট, শৃঙ্খলিত দেহে না থাকিলেও কবির ভাষায় বলিতে ইচ্ছা করে—

"নমো নমো নম, সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি।
গঙ্গার তীর শান্ত সমীর জীবন যুড়ালে তুমি!"

উদ্দাম উচ্ছ্বাসে সারা ভারতবর্ষে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি—এমন কতবার! কিন্তু যখনই বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসিয়াছি, মনে হইয়াছে বুঝি এমন মনোহারিণী ভূমি আর কোথাও নাই! আজও ফিরিয়া মনে হইল, বুঝি স্বর্গধামে প্রবেশ করিতেছি। কিন্তু আবার কয়দিনেই বিরক্তি জন্মিবে, ইচ্ছা হইবে সব ছাড়িয়া আবার সমুদ্রের কূলে, হিমালয়ের অঙ্কে, বিন্ধ্যগিরির শৃঙ্গে ফিরিয়া যাই। কিন্তু যেখানেই যাই না কেন, অদৃশ্য আকর্ষণে আবার শ্যামা মায়ের বুকে ফিরিয়া আসিবার জন্য ব্যাকুলতা অনুভব করি। এমন কতবার ঘটিয়াছে। কেন, জানি না।

সমগ্র অন্তর আজ যেন আকুল, অধীর হইয়া উঠিয়াছে—এমন অধীরতা জীবনে পূর্ব্বে কখনও অনুভব করিয়াছি কি? ভিতর হইতে কে বা কাহারা যেন অনুক্ষণ ঠেলা দিয়া বলিতেছে—ওঠ, ওঠ! চল্, চল্! কে যেন হাতছানি দিয়া

ডাকিতেছে, আয় আয়! বাতাসে কাহার মধুর কণ্ঠ যেন শত সঙ্গীতের সুরে বলিতেছে—দেখ, দেখ!

বাড়ীখানা পূর্ব্বের মতই সযত্ন-রক্ষিত। ম্যানেজার এ বিষয়ে আমার আদেশ সকল সময়েই পূর্ণমাত্রায় পালন করিয়া থাকেন। আমি কখন ফিরিব, তাহা কাহারও জানা থাকে না। কিন্তু শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য্যের সম্মানরক্ষায় আমার কি খরদৃষ্টি, তাহা আমার কর্ম্মচারীদিগের অবিদিত ছিল না।

প্রত্যেক কক্ষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আছে। উদ্যানে একটিও অতিরিক্ত তৃণগুল্ম নাই। সমস্ত অট্টালিকা প্রতিক্ষণই যেন তাহার গৃহস্বামীর অভ্যর্থনার জন্য সাজিয়া রহিয়াছে। ভাল।

কিন্তু অকস্মাৎ একটা বিরাট শূন্যতা আজ এমন ভাবে আমার সমগ্র অন্তরকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল কেন? এমন অনুভূতি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত—অন্তত: বিশ বৎসরের মধ্যে কখনও এমন ঘটে নাই ত!

আহারাদির পর চুপ করিয়া 'ড্রইং রুমে' বসিয়া রহিলাম। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এমন ভাবে সঙ্গী-হীন অবস্থায় অতিবাহিত করা পূর্ব্বে আমার পক্ষে কোনও দিন ক্লান্তিজনক মনে হয় নাই। ঘড়ির কাঁটা ৩টার ঘর পার হইয়া গেল। সঙ্কল্প স্থির করিয়া উঠিলাম।

প্রসাধন শেষে একবার অভ্যাসবশে আলমারীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলাম। দরজা খুলিয়া মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। প্রসারিত হস্ত গেলাসের অঙ্গ পরিত্যাগ করিল।

না—আজ দীর্ঘদিনের সহচরীর সঙ্গ ত্যাগ করিয়াই তাহার কাছে যাইব। সমস্ত দিনটাই যদি তাহার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিয়া থাকি, আর কয়েকঘণ্টার জন্য পারিব না?

মোটর হু হু শব্দে শ্যামবাজারের দিকে ধাবিত হইল। বিশেষ অনুসন্ধান করিতে হইল না। ৯ নং বাড়ীর দ্বারে মোটর আসিয়া থামিল।

বিনয়কুমার চৌধুরীর চরণ কম্পিত হয়? সঙ্কোচের সহিত যাহার কোনও দিন পরিচয় ঘটে নাই—এ কি তাহার দুর্ব্বলতা!

"আপনি কোথা থেকে আস্‌ছেন?—"

দীর্ঘাকার গৌরকান্তি সুদর্শন যুবকের মুখের দিকে মুহূর্ত্তমাত্র সবিস্ময়ে চাহিলাম। আমারই যৌবন কি আজ আমারই সম্মুখে নূতন মূর্ত্তি ধরিয়া আবির্ভূত হইয়াছে?

"আমি বিনয়কুমার চৌধুরী।"

মুহূর্ত্ত—মুহূর্ত্ত মাত্র যুবকের সদানন্দমুখে বিস্ময়ের দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল। পর মুহূর্ত্তে তাহার উন্নত মস্তক আমার পদতলে লুটাইয়া পড়িল।

"দাদামশাই—দাদু!"

আলিঙ্গনপাশ হইতে সসম্ভ্রমে আপনাকে ধীরে ধীরে মুক্ত করিয়া যুবক আমার হাত ধরিয়া অন্তঃপুরের দিকে অগ্রসর হইল।

ঝড়ের সময় সমুদ্র-হৃদয় কি এমনই ভাবে ক্ষুব্ধ, আলোড়িত ও উদ্দাম হইয়া উঠে? বাম হস্ত বুকের উপর চাপিয়া ধরিলাম।

"মা, মা, দেখবে এস, কে এসেছেন! ওরে রমা, তুই কোথায়?"

অদূরে—বোধ হয় কলতলার ঘর হইতে তরুণ কণ্ঠে কেহ বলিয়া উঠিল, "আমি আস্‌ছি, দাদা!"

দ্বিতলের একটি সুসজ্জিত কক্ষে প্রবেশ করিয়া আর দাঁড়াইতে পারিলাম না। সম্মুখের একটা আসনে বসিয়া পড়িলাম।

সত্যই জগদ্ধাত্রীর মত রূপে ঘর আলো করিয়া প্রসন্নাননা জননী ঘরে প্রবেশ করিল। আমার সেই কিশোরী কন্যা আজ সংসারপালনকারিণী মাতা!

অশ্রু?—এই কঠোর শুষ্ক নয়নে ইহারও উপদ্রব সুরু হইল না কি? মুদিত নয়নে কন্যার নত মস্তকে দক্ষিণ পাণি রক্ষা করিলাম। রসনা কোন শব্দ উচ্চারণ করিতে পারিল না।

"কে, দাদা?—" বলিতে বলিতে উচ্ছল নদীর মত, দীপ্ত বিদ্যুৎশিখার ন্যায় এক তরুণী চঞ্চল চরণে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

নয়নকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলাম না। বিশ বৎসর পূর্ব্বে যাহাকে জন্মের মত হারাইয়াছি, যে সর্ব্বদা আমার গৃহে, প্রাঙ্গণে—সর্ব্বত্র এক অপূর্ব্ব শোভা, মাধুর্য্য ও প্রীতির অলকনন্দা প্রবাহিত করিয়া আমার জীবনকে পবিত্র রাখিয়াছিল, সে কি আজ তাহার কিশোর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ধরাধামে ফিরিয়া আসিয়াছে?

স্তব্ধচরণে কিশোরী—আমার মায়ের মা, মুহূর্ত্তমাত্র সবিস্ময়ে আমার পানে চাহিয়া রহিল। পরক্ষণে সে বলিয়া উঠিল, "দাদু?"

দুই হস্তে তাহার মস্তক তুলিয়া ধরিয়া মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিলাম।

"তোর দিদিমণির সবটুকুই কি তোর মধ্যে ফুটে উঠেছে, ভাই?"

তিন জোড়া নয়নের প্রসন্ন দৃষ্টি আমাকে পবিত্র করিয়া দিল। ইহারই নাম কি ত্রিবেণী-সঙ্গম?

উত্তমর্ণের কাছে আসল অপেক্ষা সুদ এবং সুদের সুদ আরও মিষ্ট কেন, আজ বোধ হয় তাহা বুঝিতে পারিলাম।

কথার ত শেষ নাই। কন্যা বলিল, "আপনি বসুন বাবা, আমি আস্‌ছি।"

দৌহিত্র সুরেশ বলিল, "আমি বাবাকে ফোন্ করে আসি। তিনি মিঃ গুপ্তের বাড়ীতে এখন আছেন।"

রমা বলিল, "দাদু, আজ তোমাকে এখানেই আটকে রাখব। যেতে পাবে না।"

তাই রাখ, তাই রাখ! এত তৃপ্তি, এমন আনন্দ হেলায় হারাইয়া হতভাগা, এত দিন কোন্ সুখের পশ্চাতে—মরীচিকার সন্ধানে ঘুরিয়া মরিয়াছিস্!

আমার মুখের দিকে দীর্ঘায়ত নেত্র স্থাপন করিয়া তরুণী রমা বলিয়া উঠিল—"হ্যাঁ দাদু, তুমি মা'র মতই সুন্দর। ঐ দেখ তোমার ফটো থেকে দাদা নিজের হাতে কত বড় ছবি এঁকেছে। কিন্তু—কিন্তু তুমি বুড়ো হয়ে গেছ!"

অকস্মাৎ আমি চমকিয়া উঠিলাম। বুড়া!—সত্যই আমি জরাজীর্ণ বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি? না, না, মিথ্যা কথা! আমার দেহে এখনও প্রচুর শক্তি, জঠরে প্রচণ্ড ক্ষুধা; মনে রস-পিপাসা প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। তথাপি আমি বুড়া হইয়া গেলাম! যৌবন কি তবে এখন স্বপ্নালোকের বিষয়?

মিথ্যা বলিব না। আমার সমগ্র চিত্ত এই কথায় যেন নিদারুণ ব্যথাভরে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

কিন্তু কামনাদর্পণে আমার যথার্থ রূপ এতদিন যদি ধরা না-ও পড়িয়া থাকে, তরুণী নারীর নয়ন-দর্পণে প্রকৃত রূপ ফুটিয়া উঠিবেই—তথায় যে প্রতিবিম্ব উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, লক্ষ মিথ্যা তাহাকে ঢাকিয়া রাখিতে পারিবে না।

অকস্মাৎ দ্বারপ্রান্তে অলঙ্কারের মধুর নিক্কণে চাহিয়া দেখিলাম। সত্যই কি আমি জাগ্রত? স্বপ্ন দেখিতেছি না?

না, স্বপ্ন নহে! কাশীধামে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে ধ্যানরতা যে তরুণীর লোক-মোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম, এ সে-ই! বাণ-বিদ্ধ মরণপথযাত্রী রাজহংস, বিকশিত শতদল পরিশোভিত স্নিগ্ধ শীতল সরোবরের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য যেমন তাহার দুর্ব্বল পক্ষ মেলিবার শেষ প্রচেষ্টা করিয়া মৃত্যুর ক্রোড়ে স্তব্ধ হইয়া পড়ে, আমারও হৃদয় ঠিক তেমনই ভাবে উত্তেজিত হইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে অবসাদভরে ম্লান হইয়া পড়িল।

না, বিনয়কুমার! তুমি বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছ! তরুণীর দৃষ্টি অভ্রান্তরূপে নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে, জরা ও বার্দ্ধক্য তোমার দেহে দেখা দিয়াছে। শীত কখনও বসন্তের সহযাত্রী হইতে পারে না—অমাবস্যা তিথিতে চন্দ্রোদয় অসম্ভব! মিথ্যা যৌবন-স্বপ্নবিভোর বিনয়কুমারের মৃত্যু হইয়াছে।

সঙ্কোচনম্রা সুন্দরীকে রমা আহ্বান করিল, "সই, লজ্জা কি? আয়, আমার দাদু।"

তরুণী ধীরে ধীরে আসিয়া আমাকে প্রণাম করিল। আশীর্ব্বাদ করিলাম, "সাবিত্রী সমা হও—সুখী হও।" মৌখিক নহে—এ আশীর্ব্বাদ আমি সর্ব্বান্তঃকরণেই করিলাম।

"দাদু, আমার সইয়ের নাম গৌরী। কাকাবাবু—ওর বাবাকে আমরা কাকাবাবু বলে ডাকি—রেঙ্গুনে এডভোকেট—উকীল। বাবার সঙ্গে বড় বন্ধুত্ব। আমরা দুই সই এক স্কুলে পড়েছি। কাকাবাবু গৌরীর বিয়ে দেবেন ব'লে দেশে এসেছেন।"

গৌরী নতদৃষ্টিতে তাহার পার্শ্বেই দাঁড়াইয়াছিল। সত্যই এই তরুণী গৌরীর ন্যায়ই মনোহারিণী।

"দাদু, একটা মজার কথা শোন—তোমার সঙ্গে প্রথম আলাপ, তবু দেখছ মোটে আমার লজ্জা নেই—যেন কতদিনের পুরানো দাদু! কেমন সত্যি নয়? ভাল কথা, যা বল্‌ছিলুম ভুলে গেলুম। মজার কথা শোন। গৌরীরা কাল কাশী থেকে এসেছে। সেখানে কত মজা হয়েছিল—"

গৌরী সতর্ক দৃষ্টি দ্বারা রমাকে যেন কি বলিতে গেল। আমার হৃৎপিণ্ড সবলে স্পন্দিত হইয়া উঠিল।

"তুই থাম্! দাদুর কাছে লজ্জা কি? শোন দাদু, সেখানে কে একটা বুড়ো গৌরীর রূপে পাগল হয়ে ওকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। লোকটা না কি খুব ধনী! আচ্ছা, কি বিশ্রী বল ত! বুড়ো হ'লে লোভ বেশী হয়, না দাদু?"

লজ্জায়, ধিক্কারে, অনুশোচনার একটা সীমা নাই কি? রুমালে স্বেদধারা মুছিয়া ফেলিলাম। পাপ, অন্যায়, অবৈধ আচরণের শাস্তি না কি মানুষ কখনও এড়াইতে পারে না। এ শাস্তি ঠিকই হইয়াছে। সন্তানের সন্তান!—তোমাকে কখনও স্মরণ করি নাই, প্রভু!—তোমার এ দান বজ্রাঘাতের মত ভীষণ হইলেও উপযুক্ত আধারের মধ্য দিয়া পাঠাইয়াছ। মাথা পাতিয়া লইতেই হইবে।

জ্বালা মর্ম্মান্তিক, আঘাত কঠোরতর, বেদনা অপরিসীম। তবু, তবু যেন একটা শান্তির তরঙ্গ অতি ধীর গতিতে হৃদয়-বেলায় গড়াইয়া পড়িল।

প্রাচীরগাত্রে আমার যৌবনের চিত্র এবং পার্শ্বে আমার সহধর্ম্মিণীর আলেখ্য দুলিতেছিল। নিবিষ্ট চিত্তে তাঁহার দিকে চাহিয়াছিলাম। তোমার চিরপ্রসন্ন হাস্যরেখা শিল্পী কি ওখানে অনন্তকালের জন্যই তুলিকার স্পর্শে সজীব করিয়া রাখিয়াছে!

দৃষ্টি ফিরাইয়া দিদিরাণীকে বলিলাম, "গৌরীদিদির বিয়ের সম্বন্ধ কোথায় ঠিক হ'ল?"

তরুণী গৌরীর সুন্দর আননে লজ্জার রক্তিম রাগ স্পষ্ট হইয়া উঠিল। কিশোরী চলিবার উপক্রম করিতেই রমা তাহার হাত চাপিয়া ধরিল।

"এখনও ঠিক হয় নি, দাদু! তবে এক জন বড় জমীদারের এম-এ, পাশ ছেলের সঙ্গে কাকাবাবু কথা পেড়েছেন। সম্ভব সেখানেই হবে। ওঁরা বড় লোক ছাড়া এমন সুন্দরী মেয়ের বিয়ে দেবেন না।"

রমা অতি সন্তর্পণে যে শ্বাসটি ফেলিল, তাহা আমার বক্ষঃপঞ্জরে গিয়া আঘাত করিল।

"দাদু, দাদু, বাবা এখুনি আস্‌ছেন—"

তরুণ সহসা দ্বারপথে থমকিয়া দাঁড়াইল। সেই চিরপুরাতন, সনাতন, সর্ব্বদেশের সর্ব্বশ্রেণীর নরনারীর শ্রেষ্ঠ কাম্য—রসলীলার চিরাকাঙ্ক্ষিত রূপতরঙ্গ, কিশোর-কিশোরী আনন্দে ললিত ছন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। দুই জোড়া নয়নের চকিত, চঞ্চল দৃষ্টি আমার চির অভিজ্ঞ নয়নকে প্রতারিত করিতে পারিল না।

রমার শিথিল করবন্ধন হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া গৌরী ত্রস্ত চরণে ভিন্ন দ্বারপথে অন্তর্হিত হইল।

"দাদু, আমার কাছে এস।"

তাহাকে কাছে বসাইয়া—তাহার বলিষ্ঠ করপল্লব বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া নয়ন নিমীলিত করিলাম।

মুহূর্ত্তে কর্ত্তব্য স্থির হইয়া গেল।

৩

কন্যা জামাতা সহজেই রাজি হইয়াছিল। আমার প্রস্তাবে একটু অভিনবত্ব থাকিলেও আমার ঐকান্তিক কামনাকে তাহারা উপেক্ষা করিতে পারে নাই। রেঙ্গুনের এড্‌ভোকেট বন্ধুর নিকট আমার পরিচয় সম্পূর্ণ গোপন রাখিতে হইবে—এ সর্ত্তও তাহারা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া আমার চৌরঙ্গীর বাড়ীতে উঠিয়া আসিয়াছে। তাহারা মালিক, আমি তথায় এখন অতিথি!

মেধাবিনী রহস্যময়ী রমা আমার নির্দ্দেশ মত তাহার সখী গৌরী ও তাহার মাতাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছে। জামাতা তাহার বন্ধু অক্ষয় বাবুর সহিত একটু পরেই আসিতেছেন।

ঐশ্বর্য্যের বিলাস দেখাইবার একটা মাদকতা আজ আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল। বিনয়কুমার চৌধুরী যখন সত্যই বুড়া হইয়া পড়িয়াছে, কালের আহ্বান যখন বাঁশী বাজাইয়া জানাইয়া দিয়াছে, গাড়ী ছাড়িবার বেশী বিলম্ব নাই, শেষ ঘণ্টা পড়িলেই যাত্রা সুরু হইবে, তখন রঙ্গমঞ্চে ভাল করিয়া অভিনয়টা দেখাইয়া লই!

আজ সমস্ত দিনটা মনে মনে শুধু হাসিয়াছি। সে হাস্য উপভোগ করিবার আর কেহ ছিল না! আপন মনে শুধুই একাই হাসিয়াছি। কি চমৎকার এই জীবন-নাট্যশালা! মেঘে মেঘে বেলা বাড়িয়া ক্রমে অপরাহ্নের সূর্য্য পাটে বসিয়াছে, অথচ মূর্খ মন তাহার কোন হিসাবই রাখে নাই?

রমা শতবার আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছে, "দাদু, আজ তোমার হয়েছে কি? বাড়ীটাকে যেন থিয়েটারের মত করে সাজিয়ে ফেলেছ!"

হাঁ, যে চিরন্তন পঞ্চাঙ্ক নাটকের অভিনয় মানবজীবনে চিরকাল অভিনীত হইয়া আসিতেছে, আজ তাহার

পুনরভিনয়ের প্রথম দৃশ্য এইখানে দেখা যাইবে! সুতরাং মহাসমারোহে তাহাকে অভ্যর্থনা না করিলে চলিবে কেন?

"কিন্তু দিদি, তোর সইকে আমার সব পরিচয় দিস্ নাই ত?"

"না দাদু, রেঙ্গুনে থাক্‌তে তোমার কোন পরিচয় আমরা কাউকে দিতাম না। মা, বাবার নিষেধ ছিল। শুধু নিজেরা আলোচনা ক'রতাম্।"

"ভাল, ভাল।—এখন তোর সইকে আবার সাবধান করে দিবি, সে যেন তার মা বাবাকে এখন আমার কথা না জানায়। এ বাড়ীটা তোদের তা বলেছিস্? কথাটা ত আর মিথ্যে নয়।"

অক্ষয়বাবু শুনিয়াছি মেয়েটিকে খুবই ভালবাসেন! ঐশ্বর্য্যশালী জমীদার, সুন্দর ও সুশিক্ষিত পাত্র তাঁহার কাম্য।

কিন্তু কাশীতে আমার প্রেরিত প্রস্তাবে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন কেন? আমি বৃদ্ধ বলিয়া?

আচ্ছা, বিনয়কুমার চৌধুরী প্রতিশোধ লইতে জানে। এ পর্য্যন্ত তাহার কোনও কামনা নিরর্থক—ব্যর্থ হয় নাই!

সন্ধ্যার অবগুণ্ঠন নামিয়া আসিয়াছে। চারিদিকে যেন সহস্র সহস্র নক্ষত্র জ্বলিয়া উঠিল। উদ্যানে—পল্লবঘন বৃক্ষদেহে, লতাকুঞ্জে নানা আকারের কাচের ফানুসের মধ্যে সৌদামিনীর রূপপ্রভা হাসিয়া উঠিল।

এইবার আসিবার সময় হইয়াছে বোধ হয়। ধীরে ধীরে অদূরবর্ত্তী একটি লতাগুল্মের অন্তরালে আশ্রয় লইলাম।

রমার নয়নদর্পণে দেখিয়াছি, আমার কেশে পাক ধরিয়াছে, জরা আসিয়াছে। তাহা মিথ্যা নহে, কিন্তু অন্তরে যৌবনের চাপল্য ত এখনও পঙ্গু হইয়া পড়ে নাই। পরিপূর্ণ যৌবনেও যে খেয়াল কখনও অপরূপ মূর্ত্তিতে দেখা দেয় নাই, আজ স্তিমিত অপরাহ্নে সে এমন বিচিত্ররূপে আবির্ভূত হইল কেন?

শৃঙ্গধ্বনিতে বুঝিলাম, মোটর আসিতেছে। অভিনয় আরম্ভের আর বিলম্ব নাই। সাবধান বিনয়কুমার! তুমি কত বড় দক্ষ অভিনেতা, আজ তোমার ভূমিকায় প্রকাশ পাইবে!

পাঁচ মিনিট পরে, ধীরে ধীরে বিস্তৃত 'ড্রয়িংরুমে' প্রবেশ করিলাম। প্রসাধনের পারিপাট্য পূর্ণমাত্রাতেই বেশ দেখিয়া বলিয়াছিল, "দাদু, তোমাকে কি সুন্দরই মানিয়েছে। ঠিক যেন আমারই দাদু!"

সেই দিনই আমার দীর্ঘকালের ভ্রান্তি দূর করিয়া দিয়াছ, রাণি! তোর এই উপকার, এই স্নেহ ভুলিতে পারিব না।

ধীরে ধীরে আলোকিত কক্ষে প্রবেশ করিলাম। পূর্ব্বশিক্ষামত জামাতা আমাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল। অক্ষয়বাবুর সহিত পরিচিত হইলাম, অবশ্য ভিন্ন নামে—আমার রাশ নাম কেহ জানিত না।

অর্দ্ধ দণ্ডের মধ্যে আলাপ বেশ জমিয়া উঠিল। সাধারণতঃ নির্জ্জনতার ভক্ত হইলেও গল্প বলিবার শক্তি—মানুষকে কথায় আকৃষ্ট করিবার ক্ষমতা নিতান্ত অল্প ছিল না। জামাতা ভিতরের দিকে কি একটা কাযে চলিয়া গেল।

"অক্ষয়বাবু, আপনার একটি সুন্দরী অবিবাহিত মেয়ে আছে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ! মেয়েটি বড় হয়ে পড়েছে, তার জন্যে বড়—"

অর্দ্ধপথে বাধা দিয়া হাসিয়া বলিলাম, "তা বেশ ত! মেয়েটি আমাকে দিন না?"

অক্ষয়বাবু পলকহীন নেত্রে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। সম্ভবতঃ তিনি ভাবিতেছিলেন, আমি প্রকৃতিস্থ কি না। তাঁহার বন্ধু অবিনাশ কি তাঁহাকে একটা পাগলের কাছে রাখিয়া গেল!

প্রশান্তভাবে হাসিয়া বলিলাম, "তা'তে আপনার আপত্তি কি? আমার যথেষ্ট ধন-দৌলত আছে। আপনার কন্যা অসুখী হবে না।"

অক্ষয়বাবু তিক্তস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "কি বল্‌ছেন, আপনি?"

ভ্রূক্ষেপ না করিয়া পূর্ব্ববৎ মিষ্টস্বরে বলিলাম, "ঠিক কথাই বল্‌ছি। আপনার মেয়েটিকে দেখে আমার ভারী পছন্দ হয়েছে—ওকে আমার চাই, অক্ষয়বাবু!"

অক্ষয়বাবু উঠিয়া যাইতেছিলেন। আমি তাঁহার হাত ধরিয়া বসাইলাম।

"রাগ করবেন না। আচ্ছা, আপনি কি চান বলুন ত?"

অক্ষয়বাবু যে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছে

আত্ম-সরংবরণ করিতে হয়। বিশেষতঃ আমার ব্যবহারে অভদ্রতাসূচক কোন ইঙ্গিতই প্রকাশ পায় নাই।

"দেখুন, আমার মেয়ের বিবাহ প্রায় ঠিক হয়েছে। পাত্রটি এম্ এ পাশ, বাপের একমাত্র ছেলে। জমীদারীর আয় প্রায় ২৫।৩০ হাজার টাকা। দেখতে সুন্দর।"

"এখনও পাকা কথা দেননি ত? সুতরাং সে না হওয়া-রই মধ্যে। দেখুন, এম্, এ আমিও পাশ করেছি। ব্যাঙ্কে কিছু বেশী ৪০ লক্ষ টাকা জমা আছে। জমীদারীর আয় ৫০ হাজার। তা ছাড়া মাসে ৬।৭ হাজার টাকা বাড়ীভাড়া পেয়ে থাকি। আরও অন্য উপায় আছে। এ সম্বন্ধ আপনার পছন্দ হচ্ছে না?"

অক্ষয়বাবু চমকিয়া উঠিলেন। এবার সত্যই তিনি মনে করিলেন, আমার মস্তিষ্ক কখনই প্রকৃতিস্থ নাই। তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"অবিনাশ দা গেল কোথায়?"

মনে মনে আমি খুব হাসিয়া লইলাম।

এমন সময় সুরেশ একখানি স্বর্ণপাত্রে পাণ লইয়া প্রবেশ করিল। এ ব্যবস্থা আমারই পূর্ব্ব নির্দ্দেশ অনুসারে হইয়াছিল।

অক্ষয়বাবু সোফার উপর নড়িয়া চড়িয়া বসিয়া বলিলেন, "অবিনাশদাকে পাঠিয়ে দিও ত, সুরেশ।"

তাহার সুন্দর মূর্ত্তি দ্বারপথে অন্তর্হিত হইলে আমি বলিলাম, "এ পাত্রটি আপনার কেমন মনে হয়?"

বিমর্ষভাবে অক্ষয়বাবু বলিলেন, "পাত্রটি ত ভাল; কিন্তু পয়সা-কড়ি তেমন নেই। অবিনাশদার পৈতৃক ২০।২৫ হাজার টাকা ছাড়া বিশেষ কিছু নেই। যা রোজগার করেন, সবই খরচ হয়ে যায়। তবে জীবনবিমা হাজার দশেক আছে। আমার স্ত্রীর ইচ্ছা থাক্‌লেও, আমার ইচ্ছা গৌরীকে ধনবানের হাতে দেই।"

অক্ষয়বাবুর করযুগল সহসা গ্রহণ করিয়া আমি সবিনয়ে বলিলাম, "মেয়েটি আমায় দান করুন, অক্ষয়বাবু! অত নিষ্ঠুর হবেন না।"

"আঃ, আপনি আচ্ছা পা—"

"দাদু! কাকাবাবুকে কি বল্‌ছ তুমি?"

রমা গৌরীর হাত ধরিয়া রাজ্ঞীর ন্যায় মন্থরগতিতে আমার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।

অক্ষয়বাবুর বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্র দেখিয়া গৌরী স্নিগ্ধ-কণ্ঠে বলিল, "উনি রমার দাদামশাই—জ্যেঠীমার বাবা!"

"হ্যাঁ, অক্ষয়বাবু, আমার ৪০ লক্ষ টাকার জমিদারী, এই বাড়ী—সবই সুরেশ ও রমার। আমার আর কেউ ত নেই! এবার গৌরীদিদিকে আমায় ভিক্ষা দেবেন না? আমার দাদুর জন্য ওকে যে চাই!"

অক্ষয়বাবু পদধূলি লইয়া স্খলিতকণ্ঠে বলিলেন, "আপনি পিতৃতুল্য, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। গৌরী—আপনারই।"

প্রাচীরবিলম্বিত, আবেষ্টন-সীমার মধ্যে বসিয়া, কল্যাণি! বড় হাসিই হাসিতেছ! তোমারই জয় হউক। বিজয়িনি! অনন্তকাল তোমাদেরই বিজয়বার্ত্তা মর্ত্ত্যধামে ঘোষণা করিয়া কবি ধন্য হইবে!

বন্ধু-সম্মিলন

ইউনিভার্সিটির কন্‌ভোকেশন। পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের ডিপ্লোমা দেওয়া হয়ে গেছে; সভা ভঙ্গ হয়েছে। কালো গাউন, চৌকা টুপী ও বিবিধ বর্ণের হুড প'রে ছাত্র-ছাত্রীরা দলে দলে সভাগৃহ থেকে বেরিয়ে আস্‌ছে, বারান্দায় জড়ো হচ্ছে এবং নানান্ দিকের সিঁড়ি দিয়ে নেমে বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে ছড়িয়ে পড়্‌ছে। চ্যান্‌সেলার লাট 'সাহেব' তাঁর সোনালি-রূপালি জরির কাষ করা গাউন ছাড়তে সভা-গৃহের বাহিরের বারান্দার ধারে এক কক্ষে প্রবেশ করেছেন; তাঁর প্রকাণ্ড মোটরকার সভা-সৌধের মার্ব্বেল পাথরের সিঁড়ির নীচে অপেক্ষা করছে, সিঁড়ির দু-পাশে লাট সাহেবের এডিকং, প্রাইভেট সেক্রেটারী ও ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্‌সেলার, অধ্যাপক ও সদস্যগণ দুই সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে চ্যান্‌সেলারকে বিদায় দিবার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কাযেই যে সব সমাগত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলারা গাড়ীতে এসেছেন, তাঁরাও বারান্দার এক ধারে স্থানে স্থানে ছোটো ছোটো দলে মিলিত হ'য়ে অপেক্ষা করছেন, লাট সাহেবের ও তাঁর পুত্র-কন্যা ও পারিষদদের গাড়ী চ'লে না গেলে অপর কারো গাড়ী ত সিঁড়ির নীচের পথের উপর আস্‌তে যেতে পারবে না।

কয়েকটি ছাত্রীও গাড়ীতে এসেছিলো; তারাও একটি দল ক'রে বারান্দার এক পাশে অপেক্ষা করছে। যেহেতু কয়েকটি তরুণী অপেক্ষা করছে, সেইহেতুই কয়েকজন ছাত্রও তরুণীদের নিকটেই দল বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে—চুম্বকের আকর্ষণে লোহার মত তারা সেই স্থান ত্যাগ ক'রে যেতে পারছে না।

তরুণীদের রেশমী রঙীন শাড়ীর উপর কালো গাউন ও মাথায় কালো চৌকা টুপী এবং পিঠের উপর লাল-নীল রঙের হুড্ তাদের তারুণ্যের সহজ শ্রীকে সুন্দরতর ক'রে তুলেছে; তাদের সাফল্যের আ[illegible] ও [illegible]ক্ষুর গোচর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার লজ্জা একত্র মিশ্রিত হয়ে তাদের মুখে লাবণ্য মাখিয়ে দিয়েছে। শীতান্তের স্নিগ্ধ রৌদ্র সোনালি আভায় বারান্দার মার্ব্বেল পাথরের মেঝের উপর লুটিয়ে পড়েছে এবং সেই স্বচ্ছ মেঝে থেকে প্রতিফলিত স্বর্ণপ্রভা তরুণীদের গোলাপী হাসিতে সোনালি রঙের তুলি বুলিয়ে দিচ্ছে। কন্‌ভোকেশন-হলের সম্মুখের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে সবুজ ঘাসের আস্তরণের উপর সোনালি রৌদ্র ছড়িয়ে পড়েছে; সেখানেও কত লোক, কত ছাত্র দল বেঁধে দাঁড়িয়ে লাট সাহেবের বিদায় নেওয়া দেখ্‌বে ব'লে অপেক্ষা করছে। শষ্পাস্তীর্ণ প্রান্তরের বুকের উপর দিয়ে শুরকী ফেলা লাল পথ ললিত-ভঙ্গীতে সুন্দর বক্ররেখায় বৃক্ষকুঞ্জের মধ্যে হারিয়ে গেছে। পথের ধারে ধারে জারুল গাছের সারির মাথায় নীল ফুলের স্তবক ফুটেছে, যেন বসন্ত-লক্ষ্মীর আগমনীর গান রূপের সুরে শূন্যময় ছড়িয়ে পড়েছে; যেন বসন্ত-লক্ষ্মীর আবাহনের জন্য ফুলের স্তবক সাজিয়ে সাজিয়ে মরণোন্মুখ শীত-ঋতু ফুলের মন্দির গ'ড়ে তুলেছে। দূর থেকে বন-কদম্বের ঘন গন্ধ উত্তুরে বাতাসে ভেসে আস্‌ছে। একটা নরুণ-লেজা কাজল-চোখী পাখী প্রকৃতির বুকের এক টুক্‌রা জমাট-বাঁধা আনন্দের মত বিনা প্রয়োজনে মাঠের উপর রোদ-মাখানো খোলা হাওয়ায় বিচিত্র ভঙ্গীতে ঘুরে ফিরে কাত হ'য়ে পাশ ফিরে উড়্‌তে পারার কায়দা দেখাচ্ছে; সোনালি রোদ লেগে তার সবুজ রঙের পালকগুলি ঝিক্‌মিকিয়ে চ'ম্‌কে চ'ম্‌কে উঠছে। একটা ফিঙে কালো কুচ্‌কুচে চিক্কণ তীর-কাটা লেজ ঝুলিয়ে টেলিগ্রাফের তারের উপর ব'সে মিহি সুরে শিস দিচ্ছে; একটা নীলকণ্ঠ পাখী আকাশ-ভাঙ্গা টুক্‌রোর মত উড়ে এসে ফিঙের পাশে বস্‌লো।

পূজার্থিনী

[ভাস্কর—শ্রীপ্রমথনাথ মল্লিক]

প্রকৃতির এই বিচিত্র বাহুল্যের দিকে নজর দেবার অবসর তখন কারও ছিল না। তরুণদের মন জুড়ে ছিল কোন উপায়ে তরুণীদের মনোযোগ নিজেদের দিকে আকর্ষণ ক'রে নিজের সম্বন্ধে তাদের মনে একটু পক্ষপাত, একটু অনুরাগ উদ্রেক করবার দুরাশা; আর তরুণীদের মন জুড়ে ছিল, কয়েকটি তরুণের দর্শনীয় হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকার লজ্জা, কাযেই তাদের উভয় দলের চোখ অপর কিছু দেখেও দেখছিল না।

তরুণরা তরুণীদের শুনিয়ে শুনিয়ে রঙ্গরসিকতা কর্‌ছিল আর তরুণীদের মুখ থেকে থেকে লজ্জিত হাসির প্রভায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌ছিল; তরুণীদের মধ্যে একটি মেয়ে ছিল ফর্সা রঙের, তার কর্ণমূলে আর প্রফুল্ল কপোলে মনোভব থেকে থেকে মুঠি মুঠি আবীর ছড়িয়ে হোলী খেলে বেড়াচ্ছিল।

লাট-সাহেব চ'লে গেলেন। অভ্যাগত ও অধ্যাপকরাও একে একে চ'লে যেতে লাগ্‌লেন। ভিড় পাত্‌লা হ'য়ে এল। আর দাঁড়িয়ে থাকা শোভন হচ্ছে না দেখে একটি যুবক অপর এক জনের পিঠে চাপড় মেরে বল্‌লে—এই সুবন্ধু, এখন চল্—তুই যে এ জায়গায় 'লেপ্‌টে রইলি আটার মতন!'

সুবন্ধু আড়চোখে সেই ফর্সা মেয়েটির দিকে এক বার দেখে নিয়ে হাসিমুখের উপর বিষাদের ছায়া ফেলে বল্‌লে—আরে ভাই, একটু দাঁড়া না; এতদিন একসঙ্গে পড়্‌লাম, আজ এই তো একেবারে ছাড়াছাড়ি হ'য়ে যাবে; কাল থেকে তো আমরা পৃথুলা পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়বো; আর কখনও দেখা-শোনা হবে কি না, তা কে জানে—

সুবন্ধুর সতীর্থ সঙ্গীদের মুখের হাসি বিষাদাচ্ছন্ন হ'য়ে উঠ্‌লো। তরুণীরা কি কথা নিয়ে হাসাহাসি কর্‌ছিল, তাদেরও কথা থেমে গেল, মুখের হাসি নিষ্প্রভ হ'য়ে এল; ফর্সা মেয়েটির মুখ যে মলিন হ'য়ে গেল, তা তার গৌরবর্ণ গোপন করতে পার্‌ল না; সে চোখের কোণ দিয়ে সুবন্ধুর দিকে চকিত দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে এল, সঙ্গিনীদের কাছে ধরা পড়্‌বার ভয়ে সে বুকের মধ্যে ঠেলে ওঠা দীর্ঘনিশ্বাসটা বুকের মধ্যেই গোপন ক'রে রাখ্‌ল।

সুবন্ধুর কথা শুনে তার সতীর্থ বন্ধু সতীশ তার কাঁধে হাত দিয়ে বল্‌লে—সত্যি ভাই, তোমাকে ছেড়ে যেতে আমাদের সকলেরই কষ্ট হচ্ছে—তুমি ছিলে বাস্তবিক আমাদের সু-বন্ধু!

সুবন্ধু মুখের ম্লানিমার উপর হাসি ঢাকা দিয়ে বল্‌লে—আর তোমরাও তো ছিলে ভাই আমার সু-মিত্র!

সুবন্ধুর চোখের তারা তখনই একবার কোণের দিকে স'রে গিয়ে তরুণীদের মধ্যে বিশেষ ক'রে সেই গৌরাঙ্গীকেই দেখে নিলে।

সুবন্ধুর কথা শুনেই তরুণীরা খিলখিল ক'রে হেসে উঠ্‌ল—যেন খাঁচার দরজা খোলা পেয়ে এক ঝাঁক টুন্‌টুনি পাখী গলায় গাঁথা রূপার ঘুঙুর বাজিয়ে উড়ে গেল। তরুণীদের মধ্যে সবচেয়ে যে মেয়েটি কালো, আর যার শ্রী-ছাঁদ তেমন দৃষ্টিচোরা নয়, সে হাস্‌তে হাস্‌তে গৌরাঙ্গীকে বল্‌লে—এই সুমিত্রা, শুন্‌ছিস্? তোর সু-বন্ধু কি বল্‌ছে? ও হচ্ছে সুবন্ধু মিত্র, আর তুই হলি সুমিত্রা বন্দ্যো; দুজনের নাম তো একই; নাম মিলেছে, নামের মালিকরা মিল্‌লেই এখন ঠিক হয়!

সুমিত্রার মুখ লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠ্‌ল—যেন একটি মুক্তাফলের উপর জবার আভা পড়ল। সে কোনও কথা বল্‌তে পারলে না।

সুমিত্রার সঙ্গিনী সুরেখা হাসিমুখে সুমিত্রাকে বল্‌লে—সুমি, তুই বলিস্ তো আমরা না হয় বিয়ের ঘট্‌কালি করি।

এবার সুমিত্রা লজ্জিত লালিমামাখা মুখে কুণ্ঠিতকণ্ঠে জড়িতস্বরে বল্‌লে—নামের মানে মিল্‌লেই কি মনের মালা বদল করা চলে? এক সঙ্গে চার বচ্ছর পড়েছি, কিন্তু যার সঙ্গে একটা কথাও কই নি, তার কোন্ পরিচয়ে জীবন বিনিময় কর্‌বো? তোমাদের নিজেদেরই বুঝি স্বয়ম্বরা হবার সাধ হয়েছে, তাই আমার বেনামি মনের কথাটা ব'লে নিচ্ছ!

সুমিত্রার সঙ্গিনীরা ব'লে উঠ্‌ল—আহা রে! বড় দুঃখ! একটা কথাও কইতে পাও নি!——তুমি একটা কথাও কও নি; আমরাই কয়েছি নাকি!——আমাদের মনের মানুষ ঠিক করা আছে, তোমার বাঞ্ছিতের উপর আমাদের একটুও লোভ নেই।

সুমিত্রা লজ্জিত স্মিতমুখে বল্‌লে—উনি যে আমার বাঞ্ছিত, এমন অনুমান কর্‌লে কি লক্ষণ দেখে? ওঁর সঙ্গে তো আমার বরাবর প্রতিদ্বন্দ্বিতাই লেগেছিল…

কোনো বিষয়ে তিনি ফার্ষ্ট হয়েছেন কোনো বিষয়ে আমি—ওঁকে সব বিষয়ে পরাস্ত করবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছি আমি, আর আমাকে সব বিষয়ে পরাস্ত করবার বিস্মিত চেষ্টা করেছেন উনি—

সুরেখা হাসিমুখে বল্‌লে—আরে ঐ জন্যেই তো তোরা দুজনেই দুজনকে ভালবেসে ফেলেছিস! কংস যেমন কৃষ্ণের শত্রুতা করতে গিয়ে জগৎ কৃষ্ণময় দেখ্‌ত, তেমনি তোরাও পরস্পরের প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে তন্ময় হয়ে উঠেছিস—

ললিতা হেসে বল্‌লে—যেমন তেলাপোকা কাঁচপোকার কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে কাঁচপোকা হয়ে যায়, তেমনি সুবন্ধুকে পরীক্ষায় পরাস্ত করবার চিন্তায় তোমার মন সুবন্ধুময় হয়ে উঠেছে, আর সুমিত্রাকে পরীক্ষায় জয় করবার চিন্তায় সুবন্ধুর চিত্তও সুমিত্রাময় হয়ে উঠেছে। এ খবর কি আমাদের কাছে গোপন আছে মনে কর?—

সুমিত্রার সখীরা যখন একে একে রঙ্গ ক'রে সুবন্ধুর প্রতি সুমিত্রার অনুরাগ নানা ভাবে প্রমাণ করতে চাইছিল, তখন সুমিত্রার শ্রবণ সেই সব কথার দিকে ছিল না, তার মন আকৃষ্ট হয়েছিল সুবন্ধুর বন্ধুদের কথার দিকে।

জগবন্ধু বল্‌লে—আচ্ছা ভাই, এক কায করা যাক। ফি বছর আমরা এক দিন এক জায়গায় মিল্‌তে পারলে ভাল হতো, কিন্তু তা হবে না হয় তো; আমরা অন্ততঃ পাঁচ বছর অন্তর গুড্‌-ফ্রাইডের ছুটীতে সবাই এক জায়গায় মিলতে পারলে বেশ হয়।

সতীশ এই প্রস্তাব শুনে উৎসাহিত হয়ে বল্‌লে—বেশ কথা! এই হলের এই বারান্দায় আমরা পাঁচ বছর অন্তর এসে মিল্‌বো। সুবন্ধু, তুমি আসবে?

সুবন্ধু সমবেত তরুণীদের দিকে চকিতে একবার চেয়ে নিয়ে সতীশকে বল্‌লে—তোমরা সবাই যদি আসো, তা হলে তোমাদের একবার শুধু দেখ্‌তে পাবার লোভেই আমি আস্‌ব।

সুবন্ধুর কথার মধ্যে সবাই শব্দটি একটু বিশেষ ঝোঁক দিয়ে উচ্চারিত হোলো।

সুমিত্রার মুখ অকস্মাৎ প্রফুল্ল ও উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

সুমিত্রার সখী সুরেখা এই সময় ব'লে উঠ্‌ল—আর দাঁড়িয়ে থাকা ভাল দেখাচ্ছে না ভাই। ভীড় পাতলা হয়েছে, এবার চ'লে চলো………

সুরেখার প্রস্তাব মত সকলে অগ্রসর হয়ে চল্‌ল। যুবকদের পাশ দিয়ে যেতে যেতে যুবতীরা শুনলে সতীশ বল্‌ছে—তা হ'লে কথা রইল, গুড্‌ফ্রাইডের দিন আমরা সকলে পাঁচ বছর অন্তর এই জায়গায় সকাল সাতটায় এসে সম্মিলিত হবো………

এই কথা শুনে প্রতিভা চুপি চুপি বল্‌লে—আমাদেরও এই রকম মিল্‌তে পার্‌লে বেশ হয়।

সুরেখা ব'লে উঠ্‌ল—আর আমাদের কে কোথায় থাক্‌বে, তার কি ঠিক থাক্‌বে? মেয়েমানুষ পরাধীন, এক জন পুরুষ-মানুষ সঙ্গে না থাক্‌লে আমরা একলা এক পা চল্‌তে পারি না; কারও কারও বিয়ে হয়ে যাবে, তখন পদে পদে স্বামীর অনুমতি চাই; ছেলেপিলে হয়ে পড়্‌লে তো দস্তুর মত কয়েদী………

প্রতিভা খিলখিল ক'রে হেসে উঠে বল্‌লে—ঠিক ব'লেছিস ভাই। আমি শীগ্‌গির বিয়ে কর্‌ছি নে………

তারা সকলে গিয়ে গাড়ীতে উঠ্‌ল। সুমিত্রা সখীদের কথাপ্রসঙ্গে একটি কথাও না ব'লে গাড়ীতে উঠে বস্‌ল। যখন গাড়ী চলতে আরম্ভ কর্‌ল, তখন সুমিত্রা গাড়ীর জান্‌লা দিয়ে মুখ বা'র ক'রে যেখানে যুবকরা দাঁড়িয়ে ছিল, সেইখানটায় একবার দৃষ্টিপাত ক'রে নিলে। গাড়ী দেবদারুবীথির মধ্যে দিয়ে ছুটে বৃক্ষ-কুঞ্জের আড়ালে চ'লে গেল।

* * * * *

পাঁচ বছর পরে। গুড্‌ফ্রাইডের দিন। সকাল বেলা সাড়ে ছটা বাজ্‌তে না বাজ্‌তে কন্‌ভোকেশন হলের সাম্‌নের মাঠে জনতা জমেছে। ইউনিভার্সিটি হোষ্টেলের ছেলেরা ও অধ্যাপকরা এসে জড় হয়েছে, তাহাদের প্রাক্তন বন্ধু ও ছাত্রদের মধ্যে কে কে আজ আস্‌ছে দেখবার জন্য; নবাগত ছাত্ররাও কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে দলে দলে এসে সমবেত হচ্ছে; আগন্তুক ছাত্রদের আত্মীয়-স্বজনরাও এসেছে; কৌতুক দেখবার জন্য সাধারণ লোকেরও সমাগম কম হয় নি; লোক কেন জ'মেছে না জেনেও কেবলমাত্র জনতা দেখেই পথিক লোকরাও সেখানে আকৃষ্ট হচ্ছে এবং পূর্ব্বাগত লোকদের কাছে ভীড় জম্‌বার কারণ কি জিজ্ঞাসা কর্‌ছে।

সতীশ এল। জগবন্ধু এল। মহীতোষ আর পবিত্র একসঙ্গে এল। সাতটা বাজ্‌তে আর পনেরো মিনিট মাত্র বাকী। আজাদ আর ইদ্‌রিসও এল।

সতীশ জগবন্ধুকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—আর কেউ আস্‌বে না নাকি?

জগবন্ধু বল্‌লে—কি জানি? হিমাংশু তো লিখেছিল সে আস্‌বে............

পবিত্র জিজ্ঞাসা কর্‌লে—সুবন্ধুর খবর জানো কি?

জগবন্ধু বল্‌লে—না, তার তো কোনও খবর জানি না। হিমাংশু এলে জান্‌তে পারা যাবে; হিমাংশু সুবন্ধুর মামার বাড়ীর গাঁয়ের লোক.........

কোন এক বন্ধুর অকস্মাৎ আগমনের প্রতীক্ষায় উৎসুক চিত্তে প্রত্যেক সেকেণ্ড গুণে গুণে আরও দশ মিনিট কাটল। জলের কলের কারখানায় কারিগরদের আহ্বান-সঙ্কেত সাতটা বাজ্‌তে পাঁচ মিনিটের ভোঁ বাজল। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে ইউনিভার্সিটি কম্পাউণ্ডের রেলিং-ঘেরা মাঠের মাঝে লাল শুর্‌কী-ফেলা পথের উপর দেবদারু-বীথির ভিতর দিয়ে দু'খানি গাড়ী ছুটে আসছে দেখা গেল। সেই দু'খানি গাড়ীতে কে আসছে যথাসম্ভব সত্বর ও অপরের পূর্ব্বে দেখ্‌বার জন্য সকলে উচ্চকিত দৃষ্টিতে গাড়ীর দিকে তাকিয়ে রইল।

বসন্তের শুভাগমনে বনলক্ষ্মী পুষ্পাভরণে ভূষিতা হয়ে উঠেছেন; গুল্‌-মোহর ফুলের লালিমার অন্তরে হরিদ্রার আভা, জারুল-ফুলের নীলিমা ও কামিনীফুলের শুভ্রতা যেন আজ শুভ সম্মিলনের জন্য পথের মাথায় মাথায় আল্‌পনা দিয়ে রেখেছে, সেই পথ বেয়ে গাড়ী দৌড়ে এগিয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল।

মহীতোষ উল্লসিত স্বরে ব'লে উঠল—এই যে হিমাংশু এসেছে.........

সতীশ উৎসুক স্বরে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—পরের গাড়ীতে কে?

কেউ তো জানে না কে? কে কেমন ক'রে বল্‌বে কে আসছে? কাজেই সকলে কৌতূহলী দৃষ্টি গাড়ীর দিকে নিবদ্ধ ক'রে চুপ ক'রে রইল।

সকলে অবাক্‌ বিস্ময়ে দেখলে গাড়ীর মধ্যে সুমিত্রা! এই অপ্রত্যাশিত আগমনে সকলের মুখ আনন্দে উজ্জল হয়ে উঠল। সুমিত্রার গরদের শাড়ীর চওড়া লাল পাড় তার কপালের উপর জলজল কর্‌ছিল, আর লজ্জায় লাল মুখের উপর সেই লাল পাড়ের আভা পড়েছিল।

সতীশ ব'লে উঠল—সুমিত্রা আসছেন। ওঁরা যে কেউ আস্‌বেন, এ তো আমরা স্বপ্নেও ভাবি নি!

সুমিত্রার গাড়ী এসে মার্ব্বেল-পাথরের সিঁড়ির পাশে দাঁড়াল। সুমিত্রা মর্ম্মর-সোপানে পদার্পণ কর্‌তেই জলের কলের পেটা ঘড়ীতে ঢং ঢং ক'রে সাতটা বাজতে আরম্ভ কর্‌ল।

অমনি সমবেত প্রাক্তন ছাত্ররা সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল—থ্রি চিয়ার্শ ফর আওয়ার আল্‌মা মেটার!

অমনি সমবেত ছাত্ররা সমস্বরে আনন্দোল্লাস ক'রে চেঁচিয়ে উঠল—হিপ হিপ্‌ হুর্‌রে! হিপ্‌ হিপ্‌ হুর্‌রে! হিপ্‌ হিপ্‌ হুর্‌রে!

তার পর পুরাতন ছাত্ররা আবার চীৎকার ক'রে বল্‌লে—থ্রি চিয়ার্শ ফর্‌ আওয়ার ডিয়ার কমরেডস্‌।

আবার জনতার জয়োল্লাসে আকাশ প্রকম্পিত হ'তে লাগল। অভ্যাগত ছাত্ররা সকলে এসে সুমিত্রাকে নমস্কার ক'রে বল্‌লে—আপনি যে এসেছেন, এতে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। এ আমাদের আশাতীত।

সুমিত্রার সুন্দর মুখখানি অধিকতর লজ্জারুণ হয়ে উঠল।

ইউনিভার্সিটির ভাইস্‌ চ্যান্‌সেলার অগ্রসর হয়ে এসে প্রথমে সুমিত্রার ও পরে একে একে অভ্যাগত পুরাতন ছাত্রদের সকলের কর-স্পর্শ করলেন ও সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। তার পর অধ্যাপকরা একে একে এসে সকলের অভিনন্দন করলেন।

সুমিত্রার সম্মুখে এক একজন অধ্যাপক আসছেন আর প্রত্যেক বার তার মুখ আরক্ত হয়ে উঠ্‌ছে। এত বড় জনতার মধ্যে একাকিনী নিঃসঙ্গিনী রমণী সে, সে সকলের দৃষ্টির আঘাতে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে পড়ছিল।

সকল অধ্যাপকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার শেষ হয়ে গেলে ভাইস্‌ চান্সেলার অভ্যাগত ছাত্র-ছাত্রীদের হলের ভিতর অভ্যর্থনা ক'রে আহ্বান কর্‌লেন।

সুমিত্রাকে পুরোবর্ত্তিনী ক'রে পুরাতন ছাত্ররা অধ্যাপকদের অনুসরণ ক'রে হলের ভিতর চল্‌ল।

সুমিত্রার লজ্জা-কুণ্ঠিত দৃষ্টি কিন্তু চঞ্চল হয়ে ক্ষণে ক্ষণে চারিদিকে চকিত ভাবে সঞ্চারিত হচ্ছিল, সে যেন কাকেও খুঁজছে, তার দৃষ্টি কাউকে দেখবার জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছে, অথচ কোথাও তাকে দেখ্‌তে পাচ্ছে না। বারান্দা পার হয়ে হলের মধ্যে প্রবেশ ক'রেই সুমিত্রার একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল; তার মুখের উপর লজ্জার লালিমা ভেদ ক'রে বিষণ্ণতার কালিমা ও শুষ্কতা ফুটে উঠ্‌ল।

হলের ভিতর ছোট ছোট টেবল পেতে চা আর জলযোগের আয়োজন সজ্জিত ছিল। এক এক টেবলে চার ধারে চার জন ক'রে বস্‌তে লাগল। এক টেবলে বস্‌লেন ভাইস-চ্যান্সেলার ও অপর দুজন প্রধান অধ্যাপক এবং সুমিত্রা। চা খেতে খেতে সকলে গল্প করতে আরম্ভ করলেন। অধ্যাপকদের কথোপকথনের উত্তর যতটুকু না দিলে নয়, ততটুকুই যথাসম্ভব সংক্ষেপে দিয়ে সুমিত্রা নত নেত্রে ব'সে রইল, পানাহারের দিকে তার বিশেষ প্রবৃত্তি প্রকাশ পেল না।

সুমিত্রার পাশের টেবিলে ব'সেছিলো হিমাংশু, সতীশ, মহীতোষ ও জগবন্ধু। তারা এখন কে কি করছে, তার পরিচয় জানার পর সতীশ হিমাংশুকে জিজ্ঞাসা করলে—সুবন্ধু এলো না যে? সুবন্ধুর খবর কি?

এই প্রশ্ন সুমিত্রার কানে যেতেই সে সোজা হয়ে বসল, তার চোখ উজ্জ্বল ও মুখ প্রফুল্ল হয়ে উঠল।

হিমাংশু বিষণ্ণ ব্যথিত স্বরে বল্‌লে—সুবন্ধু মারা গেছে।

সুবন্ধুর বন্ধুরা সমস্বরে ব'লে উঠল—সুবন্ধু মারা গেছে! কবে?

সুমিত্রার মুখ একবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেল; তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল; তার ঠোঁট দুখানি থরথর্‌ ক'রে একবার কেঁপে উঠল; তার সর্ব্বাঙ্গ অবশ হয়ে ঝিম-ঝিম্‌ করতে লাগল। সে শক্ত ক'রে চেয়ারের হাতল চেপে ধরলে।

ভাইস্‌-চ্যান্সেলার সুমিত্রার অকস্মাৎ ভাবান্তর লক্ষ্য ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার কি কোনো রকম অসুখ বোধ হচ্ছে?

সুমিত্রা অতি কষ্টে অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বল্‌লে—না······

তার পরেই সে উন্মনা হয়ে গেল, তার সকল মনোযোগ শ্রবণেন্দ্রিয়ে কেন্দ্রীভূত হল, সে শুন্‌তে লাগল সুবন্ধুর বন্ধুদের আলাপ।

সুমিত্রা শুনলে হিমাংশু বল্‌ছে—বছর খানেক হবে।

—কি হয়েছিল?

—সে এক রোম্যান্টিক ব্যাপার!

—বিয়ে ক'রেছিল?

সুমিত্রার শ্রবণ আগ্রহে উৎসুক হয়ে এই প্রশ্নের উত্তরের প্রতীক্ষা ক'রে রইল।

সুমিত্রা শুনলে হিমাংশু বল্‌ছে—বাধ্য হয়ে বিয়ে ক'রে-ছিল, আর সেই বিয়ের জন্যেই তো সে মারা পড়ল···

এই কথা শুনে সুমিত্রার সর্ব্ব শরীর একবার থরথর করে কেঁপে উঠল, তার সর্ব্বাঙ্গে মূর্চ্ছা সঞ্চরণ ক'রে তার চেতনা আচ্ছন্ন করবার উপক্রম করল, কিন্তু সে প্রবল চেষ্টায় নিজেকে সম্বরণ ক'রে আড়ষ্ট হয়ে ব'সে রইল। কিন্তু তার মুখের পাংশুবর্ণ ও বিশুষ্কতা তার অন্তর-বেদনা গোপন রাখতে দিলে না।

ভাইস-চ্যান্সেলার উৎসুক দৃষ্টিতে সুমিত্রার মুখের দিকে তাকিয়ে চিন্তান্বিত স্বরে বল্‌লেন—তোমার নিশ্চয় শরীর সুস্থ নেই·········

সুমিত্রা মৃদু স্বরে বল্‌লে—না, আমি ভালই আছি।

এবং সে যে ভাল আছে তা প্রতিপন্ন করবার জন্য একটা কেক ভেঙ্গে অল্প অল্প মুখে দিতে লাগ্‌ল, কিন্তু তার মুখের গ্রাস আর গলা দিয়ে নাম্‌তে চায় না।

সুমিত্রা যদিও খাওয়ার ভাণ কর্‌ছিল, তথাপি তার সমস্ত মনোযোগ ছিল হিমাংশুর কথার দিকে।

হিমাংশু বল্‌ছিল—সুবন্ধুদের গাঁয়ে একটি অল্পবয়সী সুন্দরী বিধবা ছিল। তার নাম জয়ন্তী। গাঁয়ের মুসলমান জমিদার সেই মেয়েটিকে পাবার জন্যে অনেক রকম চেষ্টা করে, প্রলোভন দেখায়, ভয় দেখায়, তাকে নিকা কর্‌বার প্রস্তাবও করে; কিন্তু সেই বিধবাটি কিছুতেই জমিদারের প্রস্তাবে সম্মতি দেয় নি। তখন অন্য উপায় না দেখে জমিদার গুণ্ডা লাগিয়ে মেয়েটিকে চুরি ক'রে নিয়ে গিয়ে পাশের এক গাঁয়ে লুকিয়ে রাখে। এই ঘটনার অল্প দিন পরেই সুবন্ধু ছুটী নিয়ে বাড়ীতে আসে—সুবন্ধু তখন মাদারীপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট।

সতীশ জিজ্ঞাসা করলে—সুবন্ধু ডেপুটি হয়েছিল বুঝি ?

হিমাংশু বললে—হ্যাঁ।—

জগবন্ধু সুবন্ধুর ইতিহাস জানবার আগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে—তার পর ?

হিমাংশু বলতে লাগল—সুবন্ধু জয়ন্তী-হরণের ব্যাপার শুনেই গাঁয়ের ছেলেদের নিয়ে এক সার্চ পার্টি বা সন্ধানীদল তৈরি করলে। তার পর রীতিমত ডিটেক্‌টিভের মত সন্ধান ক'রে ক'রে তারা বিধবার ঠিকানা জানলে আর গোপনে তাকে খবর দিয়ে রাখলে যে, একদিন তারা ওকে উদ্ধার করবে। চোরের উপর বাটপাড়ী ক'রে সুবন্ধু মেয়েটিকে উদ্ধার ক'রে আনে।

জগবন্ধু উৎসাহিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলে—কেমন ক'রে উদ্ধার করলে ?

হিমাংশু বললে—সে এক ডিটেক্‌টিভের গল্প।

সতীশ বললে—সে গল্প পরে শুনবো, আগে মোট ব্যাপারটা সংক্ষেপে শুনে নি। তার পর কি হল ?

হিমাংশু বলতে লাগল—তার পর আমাদের দেশে যা হয়ে থাকে, তাই হল—মেয়েটির বাপ-ভাই মেয়েটিকে ঘরে নিতে রাজী হল না; মেয়ের জাত গেছে, তাকে ঘরে নিলে সকলেরই জাত যাবে। তখন সুবন্ধু বিপদে পড়ল, মেয়েটিকে কোথায় রাখবে। অগত্যা সে নিজের বাড়ীতেই তাকে রাখলে। অমনি গাঁয়ের লোক তাকে একঘ'রে করলে, আর তার নামে কুৎসিত অপবাদ ঘোষণাও করতে লাগল—

সুমিত্রার মুখ থেকে সমস্ত রক্ত আর একবার স'রে চ'লে গেল।

হিমাংশু বলতে লাগল—এমন কি সুবন্ধুর মাও তাকে ছেড়ে ভাইয়ের বাড়ী চ'লে গেলেন। তখন সুবন্ধু জয়ন্তীকে বললে—"দেখো জয়ন্তী, আমি এক জন মেয়েকে ভালবাসি; কিন্তু তিনি আমাদের জাত নয় ব'লে আমি তাঁকে বিয়ে করবার কথা ইঙ্গিতেও জানাতে পারি নি, কারণ আমি জানতাম যে, আমাদের বিয়েতে তাঁর সম্মতি পেলেও মা কখন সম্মতি দেবেন না। কিন্তু দৈবদুর্ঘটনায় মা তো আমাকে ত্যাগ ক'রে গেলেন, তবু আমি তোমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার ক'রে আবার ত্যাগ করতে পারলাম না। তুমি একলা আমার বাড়ীতে আছ ব'লে লোক অপবাদ রটনা করছে···"এই কথা শুনে জয়ন্তী বললে—"আপনি এখন বিয়ে ক'রে তাঁকে নিয়ে আসুন, আমি দাসী হ'য়ে আপনাদের দু'জনের সেবা করব—" তার উত্তরে সুবন্ধু বললে—"কিন্তু তাতেও আমাদের অপবাদ ঘুচবে না; আর যাঁকে আমি আমার পত্নী করব, তিনি যদি এই সব মিথ্যা কথার একটুও বিশ্বাস করেন, তা হ'লে তো আমাদের জীবনটাই বিষময় হ'য়ে যাবে। তাঁকে বিয়ে করার আশা আমি ত্যাগ করেছি। এখন তুমি যদি সম্মত হও, আমি তোমাকে বিয়ে ক'রে লোকের অপবাদ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারি। কিন্তু একটি সর্ত্তে আমাদের এই বিয়ে হবে—কেবল নামে মাত্র আমাদের বিয়ে হবে, কিন্তু আমরা দু'জনে চিরজীবন নিঃসম্পর্ক ভাবেই থাকব।" তার পরে তাদের বিয়ে হ'ল। বিয়ের পরদিনই সুবন্ধুর বাড়ীতে জমিদারের লোকরা ডাকাতী করতে আসে, জয়ন্তীকে কেড়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে। সুবন্ধু ডাকাতদের বাধা দিয়ে তাড়িয়ে দেয়, কিন্তু সে সেই রাত্রেই মারা যায়। সুবন্ধু ও জয়ন্তী দু'জনে ডাকাতদের এমন জখম ক'রে দিয়েছিল যে, পুলিশ সহজেই তাদের ধরতে পারে। জমিদারের পর্য্যন্ত জেল হ'য়ে গেছে। জয়ন্তী এখনও সুবন্ধুর বাড়ীতে আছে, কিন্তু তার ভয় দূর হয় নি, জমিদার ফিরে এলে আবার যে তার কি বিপদ ঘটবে, এই ভয়ে সে আড়ষ্ট হ'য়ে আছে। অথচ তার আশ্রয়ও আর কোথাও নেই।

সতীশ জিজ্ঞাসা করলে—সুবন্ধুর মা কোথায় আছেন এখন ?

হিমাংশু বললে—তিনি এখনও ভাইয়ের বাড়ীতেই আছেন, ভাই মারা গেছেন। তাই তাঁরও খুব কষ্ট হয়েছে। জয়ন্তীরও দিন চলা ভার হয়েছে। কোন দিন খাবার জোটে, কোন দিন উপোস ক'রেই থাকতে হয়—

এই পর্য্যন্ত শুনেই সুমিত্রা হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে ভাইস্-চ্যান্সেলারকে মৃদু কম্পিতস্বরে বললে—আমার অসুখ বোধ হচ্ছে, আমি চ'লে যাবার অনুমতি চাইছি।

ভাইস্-চ্যান্সেলার বললেন—হ্যাঁ, আমি তো আগেই টের পেয়েছিলাম যে, তোমার অসুখ করছে। তোমার আগেই চ'লে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এখন তুমি কি একলা যেতে পারবে ? কোথাও একটু বিশ্রাম ক'রে যাবে কি ?

সুমিত্রা বললে—না, আমি যেতে পারবো, তেমন বেশী কিছু অসুখ নয়—

সুমিত্রা গমনোন্মুখতা হল।

সুমিত্রাকে গন্তকামা দেখেই উপবিষ্ট অনেকে উঠে পড়েছিল। সম্মিলন থেকে এক জন উঠলেই সম্মিলনে ভাঙ্গন ধরে, সকলের মনে সভাভঙ্গের সঙ্কেত সঞ্চারিত হয়। সুমিত্রাকে যেতে দেখেই সভাভঙ্গ হ'য়ে গেল, আবার জনতা বিশৃঙ্খল হ'য়ে পড়ল।

সুমিত্রা দ্রুতপদে গিয়ে গাড়ীতে উঠল। তার সহ-পাঠীরা দৌড়ে গিয়ে তাকে নমস্কার ক'রে বললে—আপনি যাচ্ছেন?

সুমিত্রা কম্পিত মৃদুকণ্ঠে শুষ্কমুখে বললে—হ্যাঁ—

সতীশ স্মিতমুখে বললে—আবার পাঁচ বছর পরে দয়া ক'রে আসবেন—

সুমিত্রা চলন্ত গাড়ী থেকে বললে—আসব···

গাড়ী ছুটে একটু অগ্রসর হ'তেই সুমিত্রার দুই চোখ ছাপিয়ে জল পড়তে লাগল, তার বুক রুদ্ধ কান্নায় ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। সুমিত্রা তাড়াতাড়ি গাড়ীর কপাট টেনে বন্ধ ক'রে দিলে ও গাড়ীর গদীর উপর মুখ চেপে প'ড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

* * * *

আবার পাঁচ বচ্ছর পরের গুড-ফ্রাইডের প্রভাত। প্রাক্তন ছাত্রদের শুভ সম্মিলনের দিন। অধ্যাপক ও নূতন ছাত্ররা সমবেত হ'য়ে পুরাতন ছাত্রদের অভ্যর্থনা করবার জন্য অপেক্ষা করছে। একে একে ছাত্রদের সমাগম হচ্ছে। এবারও এল সতীশ, জগবন্ধু, প্রদোষ, বিমল, ইরফান, কাদের, তাহের। সকলেই উৎসুক হ'য়ে পথ চেয়ে আছে, এ বছর সুমিত্রা আসছে কি না। হিমাংশুও তো এখনও আসে নি।

একখানা গাড়ী ইউনিভার্সিটির হাতার মধ্যে প্রবেশ করল। সকলের উৎসুক দৃষ্টি আগ্রহে সেইদিকে আকৃষ্ট হ'ল।

গাড়ী পথের একটা বাঁক ফিরতেই সকলে দেখলে গাড়ীর মধ্যে বসে আছে সুমিত্রা! কিন্তু এবার তার মাথার উপর শাড়ীর লাল পাড় জল জল করছে না; বিধবার শুভ্র থান ধুতির নির্ম্মম নির্ম্মলতা তার বিষণ্ণ অথচ প্রশান্ত মুখখানিকে বেষ্টন ক'রে আছে।

সকলের মনের মধ্যে এক সময়ে এই কথাই সবিস্ময়ে জাগ্রত হয়ে উঠল—সুমিত্রা বিধবা হয়েছে! কবেই বা কোথায় কা'র সঙ্গে তার বিয়ে হল কেউ তো জানে না।

সুমিত্রার গাড়ী এসে সিঁড়ির সামনে থামল। সুমিত্রা মর্ম্মর-সোপানে অবতরণ করলে। আজ কিন্তু কেউ তাকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করতে পারলে না, সকলে বিষণ্ণ মুখে নীরবে নমস্কার করলে। সুমিত্রা স্মিতমুখে প্রতিনমস্কার ক'রে সোপানে আরোহণ করতে লাগল।

সেই সময় জনতার ভীড় ঠেলে হিমাংশু সম্মুখে অগ্রসর হ'য়ে এল। তাকে দেখেই তার বন্ধুরা উল্লসিত স্বরে ব'লে উঠল—এই যে হিমাংশু এসেছে?

তখন সকল বন্ধু একত্র হয়ে নিজেদের জীবনের পাঁচ বৎসরের সংবাদ বলতে ও জানতে ব্যাপৃত হল; যারা এসে উপস্থিত হতে পারে নি, তাদের সংবাদও তারা পরস্পরের কাছে প্রশ্ন ও সন্ধান করে জানতে লাগল। এই পাঁচ বছরে কা'র কতখানি উন্নতি হয়েছে, কা'র স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে, কা'র সন্তান হয়েছে বা মারা গেছে, কোন্ বন্ধুর মৃত্যু হয়েছে ও তার পরিবারের অবস্থা এখন কেমন—এই সংবাদের আদান-প্রদানে বন্ধুদের মনে সুখদুঃখের গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম চলছিল।

জগবন্ধু জিজ্ঞাসা করলে—সুমিত্রা বিধবা হয়েছেন দেখছি। কা'র সঙ্গে ওঁর বিয়ে হয়েছিলো—

হিমাংশু বললে—তা তো জানি না। তবে উনি এখন স্কুল ইন্‌স্পেক্‌ট্রেস্·········সুবন্ধুর মাকে আর স্ত্রীকে নিজের কাছে নিয়ে গিয়ে রেখেছেন···········আমি সুবন্ধুর মার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, দেখলাম সুমিত্রার বসবার ঘরে একটা কাচের ফ্রেমে সুবন্ধুর ডিপ্লোমা আর মেডেল গুলি বাঁধানো আছে·········

সতীশ বললে—সুবন্ধু যে ব'লেছিল যে সে এক জনকে ভালোবাসত, সে বোধ হয় এই সুমিত্রাই হবে······

হিমাংশু সতীশের সন্দেহের সম্ভাবনীয়তা চিন্তা করতে করতে উন্মনস্ক ভাবে বললে—তাই হতে পারে········

জগবন্ধু সম্ভ্রমভরা দৃষ্টিতে সুমিত্রার দিকে একবার তাকিয়ে সম্মানের স্বরে বললে—সে যাই হোক, সুমিত্রা যে সুবন্ধুর যথার্থ সু-মিত্রা তা সে সুবন্ধুর অনাথা মাকে ও স্ত্রীকে

আশ্রয় দিয়ে প্রমাণ করেছে…………আমরা বন্ধুর বিপদে কিছুই করতে পারি নি…………

এই সময় ভাইস-চ্যান্সেলার সুমিত্রাকে বল্‌ছিলেন—আমি ভাব্‌ছি প্রত্যেক বছর প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের সম্মিলন কর্‌বার ব্যবস্থা কর্‌ব—ওল্ড ষ্টুডেন্টস্‌ রি-ইউনিয়ন বছরে বছরে হবে। তোমরা বন্ধু-প্রীতির যে দৃষ্টান্ত দেখালে, এটিই পরবর্ত্তীদের কাছে আদর্শ হয়ে থাকবে……

সুমিত্রা ম্লানমুখে হেসে বল্‌লে—কিন্তু স্পেনের প্রসিদ্ধ নাট্যকার জাসিন্তো বেনেভান্তে বলেছেন—বন্ধু হচ্ছে এমন একটি বস্তু যা সকলেরই থাকে, কিন্তু ঠিক যে সময় তার দরকার হয়, তখন আর তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না !

ভাইস্‌-চ্যান্‌সেলার বল্‌লেন—আশা করি, তোমাদের মধ্যে কেউ না কেউ ঐ কথা মিথ্যা প্রতিপন্ন কর্‌তে পারবে।

সুমিত্রা লজ্জিত হয়ে মুখ নত কর্‌লে, কিন্তু তার মুখ আত্মপ্রসাদের স্নিগ্ধ অনাবিল আনন্দের প্রভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

(স্বাক্ষর)

বন্দনা

নমি—বৃন্দাবনমনোমন্থ-নবনীত
কান্ত সুন্দর ইন্দু।
প্রেম—মুগ্ধ-গোপীজন-চিত্তবিগলিত
দুগ্ধরসধারা-সিন্ধু।
তুমি—ভক্ত-বৎসল হরি হে।
জয়—জীবন-বল্লভ, ভুবন-দুর্ল্লভ
চরণ-পল্লব স্মরি' হে ॥ ধ্রু ॥

নমি—সিদ্ধ বেণুকর, হৃদ্য রাধাধর-
পদ্মরেণুহর ভৃঙ্গ।
তুমি—নন্দ-যশোমতী-মর্ম্ম-গৌরবে
তুঙ্গ গিরিবর শৃঙ্গ।
তুমি—গোষ্ঠপালিকার কণ্ঠ-মালিকায়
শ্রেষ্ঠ নীলমণি রত্ন,
চির—তীর্থ-গোকুলের মূর্ত্ত স্নেহাকুল
আর্ত্তি মমতার যত্ন।
কল—বিম্ব-বিলসিত অম্বুকেলি-রসে
হংসরাজ সমতুল্য।
দোল—যমুনা-নীল-জল-সন্তরণ-চল
কান্ত শতদল ফুল্ল।

তুমি—নেত্র-মনোহারী বেত্র-বনচারী
চিত্র-চূড়াধারী রম্য।
নমি—তিলক-বননীপ-পুলক-সন্দীপ,
বালক ব্রজাধিপ সৌম্য।
তুমি—হিরণ-ধটীপট-শোভন-কটিতট,
মোহনপটু নট কুঞ্জে।
তব—অব্জ-পদতল গুঞ্জ-ঝঙ্কৃত
মঞ্জু মঞ্জীরপুঞ্জে।
ক্ষীর—নবনী-সর-চোর অবনীভার-হর
নবীননীরধর-কান্তি,
ধ্রুব—লক্ষ্যে দাও মতি, মোক্ষে দাও গতি
বক্ষে প্রেমরতি শান্তি।

তুমি—মোহন বেণুতানে ডাক' হে।
বাতুল অশরণ আতুর মূঢ়জনে
রাতুল শ্রীচরণে রাখ' হে ॥ ধ্রু ॥

(স্বাক্ষর)

চিরদিনের সুর

১

বৰ্দ্ধমান জিলায় আদিত্যপুর এক সময় একখানি বৰ্দ্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল বটে, তবে এখন তাহার সেই আগেকার ক্রম-বৰ্দ্ধমানশ্রী সৌন্দর্য্যটুকু ক্রমশই হ্রাসের দিকেই নামিয়া চলিয়াছে; বৃদ্ধির সহিত কোনই সংস্রব দেখা যায় না। গ্রামের মধ্যে ম্যালেরিয়ার উপদ্রব নেহাৎই মন্দ নাই। ম্যালেরিয়ার উপকরণেরও বড় অভাব নাই। যথা,—পচা ডোবা, তাহার ধারেই ঘনসন্নিবিষ্ট বড় বড় বাঁশঝাড়। ঐ বাঁশের পাতা ঝরিয়া ডোবার জলে সহজেই পড়িতে পায় এবং তাহার পচা জলকে সমধিক পরিমাণেই পচাইয়া তুলে। এ ছাড়া গ্রামখানিতে মানুষের বাস যতই হ্রাস পাইতেছে, কালকাসন্দা, কচু ও ঘেঁটুবনের বৃদ্ধিটা ঠিক সেই হিসাবেই দ্রুততর বৰ্দ্ধিত হইতেছে। তবে না কি, মানুষের অপেক্ষা ইতর প্রাণী এবং তদপেক্ষাও উদ্ভিদ্ রাজ্যের প্রজনন-শক্তিটা পারসেণ্ট ধরিয়া হিসাব করিলে অনেক গুণই উপরে উঠিয়া পড়ে, তাই সেই হিসাবের অনুপাতে মানুষ কমার চাইতে জঙ্গলাংশটাও বাড়িয়া চলিয়াছিল।

গ্রামের মধ্যে মিত্তিররা, চৌধুরীরা, বাচপোত (পূৰ্ব্বতন বাচস্পতির উত্তরপুরুষ)রা এবং চাটুয্যেরা পূৰ্ব্বে এ গ্রামের মধ্যে গণ্যমান্য এবং কেহ কেহ বেশ বদান্যও ছিলেন। চাটুয্যে-গিন্নীর প্রতিষ্ঠিত পুষ্করিণীতে এখনও অবশিষ্ট গ্রামবাসীর পানের জলের সঙ্কুলান চলিতেছে, চৌধুরীদের আধভাঙ্গা প্রতিমা-আগমনশূন্য পূজার দালানে এখনও তাঁহাদের স্থাপিত পাঠশালা বর্ষা-শরতে ম্যালেরিয়ার জ্বালায় বন্ধ থাকিয়া শীত-গ্রীষ্মে কোন মতে টিম্‌টাম করিয়া চলিয়া যাইতেছে। বাচ-পোতরা তেমন নাম-রাখার হিসাবে কোন একটা স্থায়ী কীৰ্ত্তি করিতে পারেন নাই বটে, তবে মিত্তির বাবুর সংস্থাপিত ডাক্তারখানাটাই আপাততঃ এ গ্রামের পক্ষে সৰ্ব্বাপেক্ষা হিতকারী হওয়ায় আপামর জনসাধারণের আশীৰ্ব্বাদের ভাগী তাঁহারাই সৰ্ব্বাপেক্ষা বেশী হইতে পারিয়া—বোধ করি বা সেই পুণ্যবলেই কলিকাতায় বসিয়া বড় আফিসে মোটা মাহিনা এবং মার্ব্বেল পাথরের কক্ষভূমি ইলেক্‌ট্রিক লাইটের আলো পাখা এবং প্রকাণ্ড কোল-কার তাঁহারাই ইঁহাদের মধ্যে প্রধানতঃ উপভোগ করিতেছিলেন।

এই হাঁসপাতালে একটি ম্যালেরিয়াগ্রস্ত নেটিব ডাক্তার নিজের অস্থিচৰ্ম্মসার হাতখানিতে সকাল ৭টা হইতে বেলা ৯॥টা পর্য্যন্ত তথায় সমাগত তদবস্থ অতিথি-বর্গকে কুইনিন মিক্সচার বণ্টন করিয়া থাকেন। দেবাসুর যুদ্ধের পরে সুধাবর্ষণ লইয়া দেবতা এবং অসুরের মধ্যে যে রকম হুড়াহুড়ি পড়িয়া গিয়াছিল, তেমনই ঐ দুটি ঘণ্টা সময়ের মধ্যে নিজ নিজ অভীষ্টসিদ্ধির প্রচেষ্টায় রোগগ্রস্ত দেহ ও শুষ্ককণ্ঠ গ্রামবাসী কাড়াকাড়ি লাগাইয়া দিত। বলা বাহুল্য, এই ম্যালেরিয়া-সুধা আহরণার্থ শুধু এ গ্রামের নয়, আরও দুই তিনখানা ভিন্ন গ্রামের লোকও এই মিত্র বাবুদের প্রতিষ্ঠিত সুধাভাণ্ডের চারি পার্শ্বে প্রত্যহ আসিয়া জমা হইয়া ক্রমশই হাঁসপাতালের খরচা বৃদ্ধি করিতেছিল। অবশ্য ইহার জন্য ডাক্তার বাবুর ঘরের পয়সা খরচ করিতে হইতেছিল, এমন কথাটা বলিতে পারিব না। রোগীর সংখ্যা যতই বাড়িতেছিল, মিক্সচারে একোয়া বৰ্দ্ধিত হইয়া কুইনিনের মাত্রা ততই কমিতেছিল। উপায় কি? এক প্রকারে সামঞ্জস্য করিয়া লইতে হইবে ত? কাহাকেও বঞ্চিত না করিয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দেওয়াও ত ভাল। আর ইহারা ত ভোজের নিমন্ত্রিত নয়, নিত্য-পোষ্য। তা' এ বিষয়ে

ছদ্মবেশিনী মোহিনীর তুলনায় আমাদের ডাক্তার বাবুটি লোক ভাল!

আদিত্যপুরের প্রসিদ্ধি কিন্তু তাহার ম্যালেরিয়ার প্রচণ্ড প্রকোপ অথবা ডাক্তার বাবুর তৈয়ারী ম্যালেরিয়া-সুধায় জলাধিক্যের জন্য নহে, এই পূর্ব্বতন সুসমৃদ্ধ এবং ইদানীন্তন শ্রীভ্রষ্ট গ্রামের মধ্যে এক সুপ্রাচীন দেবমন্দির থাকাতেই ইহা প্রায় ইতিহাসে প্রসিদ্ধিলাভের দাবী তুলিতে সমর্থ। হয় ত বা অদূর ভবিষ্যতে কোন দিন না কোন দিন তাহা তুলিবেও। ঐ মন্দিরের নাম আদিত্যেশ্বরের মন্দির। আদিত্যেশ্বর মহাদেবের নাম। জগজ্জনবন্দিত ভগবান্ সূর্য্যদেব যে শৈব ছিলেন, এই মন্দিরেই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কবে, কি উপলক্ষে তিনি শিবভক্তিপরায়ণ হইয়াছিলেন, ইতিহাস-পুরাণে সে কথা লিখিত না পাওয়া গেলেও প্রত্নতত্ত্ব ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ যখন উপস্থাপিত করিতেছে, তখন ইহা নিশ্চয়ই অবিসম্বাদী সত্য বলিয়া স্বীকারও করিয়া লইতে হইবে। পুরাকালে না কি গরুড়পক্ষী যখন গজ-কচ্ছপ লইয়া আকাশে উড়িয়া সূর্য্যমণ্ডলকে আচ্ছাদন করিয়াছিল, তখন দ্বিতীয় রাহু মনে করিয়া এবং এই নূতন রাহুর বিশালতায় সবিশেষ ভীত হইয়া সূর্য্যদেব না কি এইখানে আসিয়া, নির্জ্জন শতরূপা নদীতীরে বহু বর্ষের কঠোর তপস্যায় দেবাদিদেব মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়া মহাভয় ভঞ্জন করেন। সূর্য্যদেবের প্রতিষ্ঠিত সেই মন্দির ও দেবমূর্ত্তিই আজ পর্য্যন্ত এই আদিত্যেশ্বর নামে বিখ্যাত। এখানে পূর্ব্বে নিকটবর্ত্তী ও দূরস্থ অনেক যাত্রীর ভিড় বার মাসই লাগিয়া থাকিত। ঠাকুরের দেবোত্তর ভূমিও নেহাৎ কম নহে, তাহার উপর যাত্রীর আয়েও টাকা উঠিত। এখন কলির ও ম্যালেরিয়ার প্রবলতায় যাত্রিসমাগম অর্দ্ধেকও নাই, তবে শিবরাত্রির সময় একটি বড় রকম মেলা হয় এবং সেই সময় এখনও দুই চারি হাজার যাত্রিসমাগম হইয়া থাকে। দেবোত্তরের আয় না কি পূর্ব্বে সত্তর হাজারের কাছে ঘেঁষিয়াছিল, এখন নানা কারণে আবাদ প্রভৃতি নষ্ট হওয়ায় ততটা নাই, তবু পঁচিশ হাজারের কম হইবে বোধ হয় না।

অন্যত্রও যেমন এখানেও তেমনই মোহান্ত-মহারাজের চেলা মহারাজদের মধ্য হইতেই এক জন মোহান্ত গদীতে বসেন। যিনি ভাবী মোহান্ত, তিনি পূর্ব্বাবধিই এক রকম মোহান্ত দ্বারা জনসাধারণে চিহ্নিত হইয়া থাকেন, এ ক্ষেত্রে এবার সে রকম কোনটিকেই দেখা গেল না।

মহেশ্বরানন্দ বলিয়া বহু পূর্ব্বে যাহার নামকরণ করা হইয়াছিল, সে নিজেও অনেকটা এবং সাধারণ লোক সম্পূর্ণরূপেই একদা মনে করিয়াছিল যে, ইনিই ভবিষ্যৎ মোহান্ত।

কিন্তু ইদানীং সত্তর পার হইয়া এবং অজীর্ণ প্রভৃতি রোগের দ্বারা একবারে অসমর্থ হইয়া পড়িবার পরে যখন হইতে ভবানন্দ পুরী নিছক ধর্ম্মপথে মনোযোগী হইয়া পড়িলেন, তখন হইতেই তাঁহার এই মহেশ্বরানন্দের পরেই যেন কেমন একটা বিশেষ বিরাগ দৃষ্ট হইতে লাগিল। যে মহেশ্বর তাঁহার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিল, সে এখন একটা আঙ্গুলের দরকারেও লাগে না। কিন্তু তাই বলিয়াই তিনি যে মহেশ্বরানন্দকে খর্ব্ব করিয়া আর কাহাকেও তাহার যায়গায় উঠাইয়া লইলেন, তাহাও নহে; ও জায়গাটা খালিই থাকিল।

মোহান্তজী তাঁহার সমস্ত সাঙ্গোপাঙ্গ, চেলা ইত্যাদির ভিড় কাটাইয়া একটুখানি নির্জ্জন কোণের ভিতর নিজেকে কোণঠাসা করিয়া ফেলিলেন। এতদিন যাহারা তাঁহার কাছে কাছে ফিরিয়াছে, এখনও কাছে কাছেই ভিড় করিয়া থাকিতে চেষ্টা করিতে তাহারা নিবৃত্ত হইল না, তবে ঠিক কাছাকাছি পৌছিতেও যে পারা যায় নাই, সেইটুকুই তাহাদের মনে সর্ব্বদা স্পষ্ট হইয়াই থাকিল এবং ইহার জন্য অস্বস্তিও তাহাদের মনের মধ্যে নেহাৎ কম জমিয়া থাকিল না।

মোহান্তের এই হঠাৎ বৈরাগ্যকে অনেকেই তাঁহার আগতপ্রায় বাহাত্তর বৎসরের পূর্ব্ব লক্ষণ বলিয়াই খুব জোরের সঙ্গে প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিল। অনেকেই আশা করিল, এতটা অস্বাভাবিক প্রকৃতি-পরিবর্ত্তনের ফলে তাঁহার এইবার এই নশ্বর দেহটারও বিবর্ত্তন ঘটা কিছু বিচিত্র নাও হইতে পারে; অতএব এই সময় হইতেই নিদানের বিধান লওয়ার সুযুক্তি গ্রহণ অবশ্য-কর্ত্তব্য! অবশ্য এই কর্ত্তব্য শিক্ষাটা শিক্ষকগণ নিজেদের মধ্যেই প্রচার করিতে লাগিলেন, শিক্ষার্থীর সম্মুখে এ কথার উল্লেখ করা অবশ্য একটুও সম্ভব ছিল না।

এই সময় সহসা একটি নূতন শিষ্যকে জনপূজ্য মোহান্তের পদে বসাইয়া দিয়া সত্য সত্যই ভবানন্দ

মহারাজ জনমতকে সার্থক করিয়া তুলিয়া শিবলোক অথবা অশিবলোকে যাত্রা করিলেন। নূতন মোহান্তের নাম হইল মহেশানন্দ। মহেশানন্দ শিক্ষিত, বিনীত, সুচরিত্র; তবে একান্তই অল্পভাষী এবং লোকসঙ্গবিমুখ। তাই জনপ্রিয় হইতে পারিলেন না।

এই সময় একটা নূতন কিছু ঘটিল। বর্ষা চলিয়া গিয়াছে। শরতের হল্‌দে আলো এবং সাদা কাশ এক সঙ্গে প্রচুর হইয়া দেখা দিয়াছে। শতরূপার দুইটি তীর ভরিয়া সবুজ লতায় ছোট ছোট বেগুণী রংয়ের অজস্র ফুল ফুটিয়া কুঁড়ি ধরিয়া রহিয়াছে। বাঁশঝাড় কোথাও ডোবার উপর, কোথাও বৃষ্টি-জমা জলের ধারে, কোথাও নদীজলে নত হইয়া পড়িয়াছে। কচুপাতা বাতাসে তর্ তর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। এ-দিক ও-দিক বর্ষা-জলপুষ্ট ঝোপের গায়ে তেলাকুচার লতা উঠিয়া তাহাদের যেন নাগপাশে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। উহারই গায়ে গায়ে তাহার রাঙ্গা সবুজ ফল এবং সাদা সাদা ফুল বাহারের হিসাবে মন্দ দেখাইতেছিল না। বটগাছের ঝুরির খুঁটাতে দোলনা বাঁধিয়া রাখাল ছেলেরা ঝুলনপর্ব্বের পুনরভিনয় করিয়াছে—তাহারই চিহ্ন প্রকটিত। গাছের ডালে শালিক পাখীর ঝাঁক কিচির-মিচির করিয়া সবুজ ঘাসের মখমলে চিত্রকরা চড়ুইগুলার ঘাসের বিচি খুঁটিয়া লওয়ার আনন্দ-ভোজের চিক্‌চিকানীর সঙ্গে সঙ্গত করিতেছিল।

চারিদিক্ দিয়া একটা ভালয় মন্দয় মিশ্র গন্ধ জলধৌত প্রসন্ন বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল।

আদিত্যেশ্বরের নূতন মোহান্ত এখন আর নূতন নাই, তাহার পর সুদীর্ঘ দ্বাবিংশ বৎসর চলিয়া গিয়াছে, আজ তিনি পঞ্চাশোর্দ্ধ বয়স্ক প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ। এ পর্য্যন্ত তাঁহার জীবনটাই নিঃসঙ্গ নিরানন্দ ভাবে কাটিয়া গিয়াছে। আজও সেই সুখহীন নিস্পৃহ জীবনেই তিনি অভ্যস্ত।

মোহান্ত মহেশানন্দ তাঁহার বসিবার ঘরের সামনের 'দৌড়দার' বারান্দায় একখানি ইজি চেয়ারে অর্দ্ধশায়িত ছিলেন। পূর্ব্বে এখানিতে যাহাই থাক, এখন সেই নরম ভেলভেটের উপর একখানি হরিণের ছাল আঁটা, গায়ে তাঁহার পূর্ব্বমোহান্তর মত কোমল ফ্রেঞ্চ শিল্কের গেরুয়া আলখাল্লা ও তাহার ভিতর ঐ জিনিষেরই অন্তর্ব্বাস নাই এবং এগুলিকে এখন প্রত্যহ ধোলাই করিয়া প্রত্যহ নূতন গেরুয়া রংয়ে ছোপানও হয় না, তিনি এগুলি বড় জোর হপ্তায় একবার করিয়া সাবান দিয়া কাচাইয়া লয়েন। উহা মোটামুটি ভাবেই মোটাকাপড়ে প্রস্তুত। ধোপা বাড়ীর ধোয়া জিনিষ মোহান্তজী তাঁহার নিজের শরীরে ঠেকিতে দেন না, উহা মোহান্তদের নিয়ম নহে, তবে গুরু মোহান্তের কথা ছাড়িয়া দাও!

বারান্দার বাহিরে দুই পাশে দুইটি কদম গাছ যেন সুখকণ্টকিত শরীরে একরাশ ফুলের ভারে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। ইহাদের দুই পাশে ফুলগাছের কেয়ারি সার বাঁধিয়া চলিয়া গিয়াছে। করবীর রাঙ্গা সাদা ফুলে যেন আপনা হইতেই তোড়া বাঁধা হইয়া আছে। কিন্তু স্থলপদ্মের রঙ্গের উজ্জলতায় তাহাদেরও অতটা রূপ যেন জলুষ হারাইয়া ছিল, প্রজাপতিগুলা নানাবর্ণের রেখা গায়ে টানিয়া দিয়া মুক্তোজ্জ্বল প্রকৃতির মাঝখানে নিজেদের রূপ বিলাইয়া বেড়াইতেছে।

কিন্তু এতটা যে সৌন্দর্য্য চারিদিকে ছড়ান রহিয়াছে, সে দিকে মোহান্তের দৃক্‌পাতই ছিল না। তাঁহার জড়তাময় চিত্ত নিজের মনের জীর্ণতায় আজও নিখিল প্রকৃতিকেই যেন জীর্ণ ও পুরাতন বলিয়াই বোধ করিতেছিল। ফুলফোটা ফল-ধরা, কিছুই যেন আর সেই বিস্ময়বিহীন-স্তিমিতদৃষ্টি নেত্রের সমক্ষে নূতনত্বের সমাবেশ করিতে পারে না, যে দিকেই তাঁহার চির-অস্বচ্ছন্দ মনের দ্বারা পরিচালিত হইয়া চোখ ফিরিতেছিল, মনে হইতেছিল, উহারাও যেন তাঁহারই মত রিক্ত ও চির-পুরাতন মন-প্রাণ লইয়া একঘেঁয়ে পড়িয়া আছে।

এখানকার সম্পত্তিতে বেশ রীতিমত বড় একটা জমিদারীর আয়। একটা বাঁধা আয় থাকিলেই, সেটা ভোগ করার জন্য লোক চাই। এই দেবোত্তর ভোগ করিবার জন্যও সেই মন্দির প্রতিষ্ঠা-কাল হইতে অথবা তাহার অনতিবিলম্বিত দিন হইতে সেই বিপুল অর্থরাশির এক জন উপভোক্তাও স্থির করিয়া রাখা হইয়াছিল। অবশ্য এ রকম স্থলে যেমন হইয়া থাকে, বিধানকর্ত্তা বোধ করেন যে, ভোক্তাকে একখানা গেরুয়া পরাইয়া দিতে পারিলে আর তাহার উপভোগের উপায় থাকিবে না, অতএব তখন নিশ্চিন্ত হইয়া সমস্ত দেবোত্তরের উপস্বত্ব তাহার হাতে ফেলিয়া দিতে পারা যাইবে এবং ঐ অর্থরাশি লইয়া তিনি শুদ্ধ-সত্ত্ব-চিত্তে কদলীপত্রে কাঁচকলা দিয়া হবিষ্যান্ন ভক্ষণ করিতে করিতে সাধারণের জন্য

অসাধারণ পুণ্যকার্য্যাদি নির্ব্বাহ করিতে থাকিবেন। দেবতার সম্পত্তি নানারূপ দৈবকার্য্যে অতি সাত্ত্বিকভাবেই নিয়োজিত হইতে পারিবে। কিন্তু মানুষ যদি অতি সহজ পশু হইত, তাহা হইলে ইতর প্রাণীদের সমাজের মত মনুষ্য-সমাজটাও সম্পূর্ণ বৈচিত্র্যবর্জ্জিত হইয়া যাইত। মানুষ নিজেকে অত সহজেই বঞ্চিত করিতে পারে না। ডেন্‌জার-সিগনাল্ স্বরূপ গৈরিক বাসখানা যদিও এ পুরীর মোহান্ত মহারাজদের পারিবারিক সুখসম্ভোগে বঞ্চিত রাখিয়াছিল, তথাপি তাঁহাদের মধ্যের অধিকাংশই প্রকাশ্য বিবাহের পরিবর্ত্তে এমন কতকগুলি ব্যবস্থা করিয়া লইয়া চলিতেন, যাহাতে তাঁহাদের গেরুয়ার সম্মানটা বজায় রাখিয়াই তাঁহাদের ঘর-করণার সাধটাও মিটিতে থাকে। তা' বিবাহের গণ্ডীবদ্ধ জীবনের অপেক্ষা এমন ধারা সন্ন্যাস করা যে আঠারোগুণেই প্রার্থিত, সে কথাটা তাঁহারাও বুঝিতেন, নতুবা ঠাকুরবাড়ীর প্রথম দলিলেই ত লেখা আছে, যে মোহান্ত মহারাজ বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইবেন, তিনি তাঁহার প্রথম চেলার হস্তে মোহান্তী সঁপিয়া দিয়া অনায়াসেই তাহা করিতে সমর্থ, কিন্তু আবহমানকালের ইতিহাসে এ রকম ঘটনা ঘটিবার একটিও নজীর নাই। অথচ সেই আবহমানকাল ধরিয়াই দেশের মধ্যে ইঁহাদের সম্বন্ধে এমন সব কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায় যে, সময় সময় সে সব কথায় কানে আঙ্গুল না দিয়া থাকা যায় না এবং এ সব আলোচনায় বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীর দুইটি দল তৈয়ারী হইয়া কদাচিৎ লাঠালাঠিরও জোগাড় করিয়া তুলিয়া থাকে, এমনও জানা গিয়াছে। যাক্, সে সব অমন অনেক দেবস্থানেই ঘটিয়া থাকে। দেবতার পার্শ্বেই দানব থাকে, মানবের ভাগ্যে এ সৌভাগ্যটা দৈবাৎ ঘটিয়া উঠিতে দেখা যায়। এই দেখুন না, বাঙ্গালার তারকনাথ হইতে বেহারের বোধগয়া—আবার উত্তরাখণ্ডের ভুবনবিখ্যাত যোশীমঠ, স্বনামধন্য উখীমঠ এবং গোপেশ্বর ইত্যাদি বিখ্যাত বড় বড় মঠ—আরও কতই না অখ্যাত ছোট বড় মঠের মঠাধীশদের ভাগ্যে এ সব কু-যশ কু-কীর্ত্তির মালা পরার অবসর ঘটিয়াছে, তাহার ঠিক কি? এক আধ জনকে ব্যতীত তাই বলিয়াই ত আর স্থানচ্যুত হইতে হয় নাই! বড় জোর সরকারের একটুখানি চোকরাঙ্গানি দেখিতে হইয়াছে বই ত নয়। তা হউক, পেটে খাইলে পিঠেও সহ্য করা যাইতে পারে।

কিছু দিন আগে এই আদিত্যেশ্বরের যিনি প্রধান পাণ্ডা বা মোহান্ত ছিলেন, তাঁহার সম্বন্ধেও জনমতটা বেশ অনুকূল ছিল না। সম্মুখে যাহারা সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া সর্ব্বাঙ্গে ওই সাক্ষাৎ শিবাবতারের চরণরেণুকণা প্রলিপ্ত করিত, অন্তরালে তাহারাই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী কুৎসা করিয়া বেড়াইত। নিন্দাটা অবশ্যই মুখের উপর হইলে কাহারও রুচিকর হয় না এবং এ দেশে একটি প্রবল প্রবাদ বাক্য আছে যে, আড়ালে রাজার মাকেও ডাইন বলা যায়। তখন রাজার মা না হইলেও স্বয়ং রাজতুল্য ঐশ্বর্য্য-ভোগপরায়ণ হইয়া যে মোহান্তঠাকুর কাহারও নেপথ্য আলোচনারও অযোগ্য হইয়া উঠিবেন, এতদূর তুচ্ছ তাঁহাকে আমরা মনে করি না।

মোহান্ত ভবানন্দপুরী ইদানীং অকালবৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য তখনও বৎসর বৎসর তাঁহাকে প্রচুরতররূপেই উপস্বত্ব যোগাইয়া দিতেছে, ভোগের আকাঙ্ক্ষাও না কি মানুষের কোন দিনই নিবৃত্ত হইবার জিনিষ নয়, কাযেই সেটাও ঠিক বজায় আছে; তবে বিপদ ঘটিয়াছিল ভোগ করার শক্তিটাকে লইয়া। সে না কি ধরা-বাঁধা দেবোত্তর সম্পত্তিও নহে এবং অতি সূক্ষ্ম পদার্থও এক প্রকার অবস্তু স্বরূপ আকাঙ্ক্ষাও নহে। কাযেই তাহার একটা সীমা নির্দ্দেশ করা আছে, ইহার বাহিরে সে এক পাও হাঁটিতে অসমর্থ। মোহান্ত ভবানন্দ যদিও সত্তরের কোঠায় চলিতে চলিতে আপনার ভোগ-দেহটাকে ভিতরের তীব্র আগ্রহ ও বাহিরের অজস্র উপকরণ দ্বারা অনেকটা ভোগক্ষম রাখিয়াছিলেন, যে দিন সে সত্তরটা পার হইল, সেই দিনই কিন্তু সে সজোরে এই চেষ্টার জবাব দিয়াছিল। খাওয়া আর হজম হয় না, ব্রহ্মচারী মোহান্তের পক্ষে যে জিনিষটা সর্ব্বাপেক্ষা নিষিদ্ধ, তাহাদের সম্বন্ধীয় সেই নিষেধটা এত দিনে পালন করার কথা স্মরণে আসিয়াছে। দেখিতে দেখিতে এত দিনের ঘোর বিলাসী ভবানন্দ হঠাৎ একটি নৈষ্ঠিক সাধুসন্ত ধার্ম্মিক মোহান্তে পরিবর্ত্তিত হইয়া উঠিলেন। তবে বেশী দিন এই বিড়ম্বনা তাঁহাকে ভোগ করিতে হইল না, এইটুকুই তাঁহার শান্তি!

আদিত্যেশ্বরের মোহান্তরা দশনামী সম্প্রদায়ের মধ্যস্থ পুরী উপাধিধারী। ব্রহ্মচর্য্য ইঁহাদের সকলের জন্যই বিশেষ-বিধি, ভগ্নস্বাস্থ্য ভবানন্দ নিজের মহাযাত্রার রথচক্রের

মহা নির্ঘোষ শুনিতে পাইয়া সহসা একান্তভাবেই চিন্তিত হইয়া উঠিলেন যে, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের এই মহা নির্দ্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন না করিলে যে মহাপাতকগ্রস্ত হইতে হইবে, তত বড় পাপ হইতে বিরত থাকিবে, তেমন একটি ভাবী মোহান্ত কোথায় পাওয়া যায়? নিজের আশে পাশে চোখ বুলাইয়া তেমন কাহাকেও দেখিতে পাওয়া গেল না, যাহাকে এই কঠিন কার্য্যের উপযুক্ত বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন। সৌভাগ্যক্রমে এই সময় একদা মহেশানন্দের অভ্যুদয় ঘটায় এই মহাচিন্তার হাত হইতে তিনি মুক্তিলাভ করিলেন। মহেশ ঠিক গুরুর বিপরীত স্বভাবের লোক। অতি কঠোরভাবেই জীবন কাটাইয়া এতদিন পরে মহেশানন্দও যেন তাঁহার অভ্যস্ত জীবনে কিছু ক্লান্তি অনুভব করিতেছিলেন।

একটা অজানা নূতনের জন্য প্রাণ তাঁহার এতদিন পরে যেন মধ্যে মধ্যে হায় হায় করিয়া উঠিতেছিল। এ জীবন যেন আর সহ্য হয় না।

সে দিন অকস্মাৎ এই চিরপুরাতনদের মধ্যে এক নূতনের অভ্যাগম ঘটিয়া গেল। অনতিবিলম্বিত সন্ধ্যায় একটি অচেনা পথিক আসিয়া হঠাৎ তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল, বলিল, "আমি একটুখানি আশ্রয় চাই; পাব কি?"

ভিখারী অতিথি। ইহাদের এতটা দূর পর্য্যন্ত আসিতে দেওয়া কোনকালেই এখানকার বিধি নহে। এই লোকটি সেই সনাতন বিধির বিধান হইতে কেমন করিয়াই যে মুক্তিলাভ করিয়া একবারে এই খাস দরবারে আসিয়া পৌঁছিল, ইহা একটুখানি বিস্ময়ের বিষয় বটে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মোহান্তকে সে সম্বন্ধে বিস্মিত হওয়ার অবসর দিল না যে জিনিষটা, তাহা ইহা অপেক্ষা বিস্ময়কর বলিয়াই। সেটা এই আশ্রয়-প্রার্থীর কণ্ঠস্বর হইতে তাহার সমস্ত চেহারাটা! এই যে ছেলেটি একটুখানি তুচ্ছ আশ্রয় প্রার্থনা করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল, ইহার গলার স্বরে কিন্তু যথেষ্ট বিনয় থাকা সত্ত্বেও ইহাকে এত তুচ্ছ যাচ্ঞাকারী বলিয়া কোনমতেই প্রমাণ দিতে পারিল না। আর মানুষের চেহারা যে এত সুন্দর হয়, এ যেন বিশ্বাস করাই যায় না!

গায়ে একটা মুটিয়ার আলখেল্লা, সেটার একবারে আনকোরা গেরুয়ার রং। সে রং তাহার সেই রংয়ের সঙ্গে মিশিয়া পড়া গায়ের উপর জায়গা-জায়গায় উঠিয়া আসিয়াছে। মাথায় ঐ রংয়ের ঐ জিনিষেরই একটা প্রকাণ্ড পাগড়ী, হাতে একগাছা মোটা লাঠী। এই সাজ-পোষাকেই লোকটি যেন অপরূপ! সাধারণতঃ এ রকম সাজে কমবয়সী ছেলেদের একটু যেন গুণ্ডা গোছেরই দেখায়, কিন্তু এই নিতান্ত কিশোরবয়স্ক এবং অত্যন্ত সুরূপ চেহারার ছেলেটিকে এই পোষাক এত সুন্দর মানাইয়াছিল যে, উহাকে একবার দেখিলে যেন আর চোখ ফিরাইয়া লওয়া যায় না; মনে হয়, শত চক্ষু হইয়া জন্ম জন্ম ধরিয়া ইহাকেই চাহিয়া দেখি! প্রৌঢ় মহেশানন্দ নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে এই তরুণ কিশোরের অপূর্ব্ব-দর্শন মূর্ত্তিটির সমুদয় রস যেন তাঁহার লোলুপ পিপাসিত দৃষ্টি দ্বারা শুষিয়া লইতে লাগিলেন। আগন্তুকের প্রার্থনাটুকু পূর্ণ হইল, কি হইল না, এ সম্বন্ধে যে তাঁহার একটা জবাব দেওয়াও দরকার ছিল, সে কথাটা তাঁহার মনেও পড়িল না। এ দিকে ছেলেটি এমন করিয়া নিজেকে দ্রষ্টব্য হইতে দেখিয়া অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিল এবং বিব্রত নতমুখে মৃদু-কণ্ঠে কহিয়া ফেলিল, "যদি আপনার সুবিধে না হয়, আমি চ'লে যাচ্ছি।"

এই বলিয়া সে যেন একটুখানি অনিচ্ছা-মন্থর পদে অত্যন্ত ধীরে ধীরেই পিছন ফিরিল।

আকাশে যতক্ষণ চাঁদ থাকে, যে ভাবুক ব্যক্তি-নির্ণিমেষে তাহার দিকে চাহিয়া থাকে, হঠাৎ তাহাকে মেঘঢাকা হইতে দেখিলে সে যেমন নিজের এতক্ষণকার রূপ-তন্ময়তা হইতে চমকিয়া জাগিয়া উঠে, তেমনই সেই বিস্ময়কর কিশোর-সৌন্দর্য্যকে সহসা প্রত্যাবর্ত্তনোন্মুখ দেখিয়া মহেশানন্দের চট্‌কা ভঙ্গ হইয়া গেল। তিনি উহাকে ফিরিতে দেখিয়া ঈষৎ যেন উৎকণ্ঠা-শঙ্কিতভাবে ব্যগ্র হইয়াই কহিলেন,—"যেও না, আমি তোমায় রাখবো।"

ছেলেটি তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইল। তাহার সুন্দর মুখে এতক্ষণ যে একটা গভীর উৎকণ্ঠার ছায়া পড়িয়াছিল, সেটা হঠাৎ সরিয়া গিয়া তাহার সেই অপরূপ মুখ যেন রাহুগ্রাসমুক্ত চন্দ্রের মুখের মতই সমুজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছিল।

ছেলেটি ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার পায়ের কাছে গড় করিয়া প্রণাম করিতেই তিনি তাহাকে দুই হাত বাড়াইয়া দিলেন, এই নিতান্ত অচেনা অথচ বিশেষরূপে সম্মানিত লোকটির সাগ্রহ আলিঙ্গনে আত্মসমর্পণ করিতে বোধ করি কিশোর ঈষৎ

কুণ্ঠানুভব করিতেছিল, বোধ করি, সেই জন্যই সে একটুখানি সন্ত্রস্তভাবে নিজেকে দূরে রাখিয়া তাঁহার পায়ের ধূলা তুলিয়া লইয়া নিজের কপালে ঠেকাইল। মাথাটা তাহার সেই দীর্ঘ পাগড়ীতে একবারে এমনভাবে চাপা পড়িয়া গিয়াছিল যে, মাথায় মনঃকল্পিত ধূলার মত সূক্ষ্মবস্তুরও প্রবেশ-পথ ছিল না।

মহেশানন্দের প্রথম আবেগ তরুণের এই কুণ্ঠিত ব্যবহারে ঈষৎ যেন বাধা প্রাপ্ত হইল, কিন্তু বাধা পাইলেই নিজেকে প্রত্যাহৃত করা সকল বস্তুরই ধর্ম্ম নহে। জল যেমন বাধা পাইলে চারিদিক্ দিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, তাঁহার এই নূতন আগ্রহ তেমনই করিয়াই যেন বর্দ্ধিতবেগে এই অপরিচিত ছেলেটিকে কেন্দ্র করিয়া উছলিয়া উঠিল। তিনি তাঁহার অকালবার্দ্ধক্যে তেজোহীন দৃষ্টি দিয়া তাঁহার সম্মুখে নতমুখে উপবিষ্ট তরুণের মুখখানি গভীর প্রীতিভরে দেখিতে দেখিতে আবেগোত্তেজিত কণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন,—"আমি কি তোরই পথ চেয়ে এত দিন বসেছিলেম রে? কোথায় ছিলি এত দিন?"

তাঁহার চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া বাতাস-লাগা গাছের পাতায় জমা বৃষ্টিজলের মতই অশ্রুবিন্দু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। সে অশ্রু যে কত সুখের—কত দুঃখের, সে কেবল এক তিনি এবং তাঁহার অন্তরের যিনি নিত্য অধিষ্ঠাতা, সেই তিনিই জানিলেন। ছেলেটি হয় ত ভাল করিয়া কিছু না বুঝিলেও সে যে এখানে তাহার দরকারের অতিরিক্ত ভাবেই গৃহীত হইয়াছে, ইহা বুঝিতে তাহাকে কোন কষ্ট পাইতে হইল না। কে জানে কেন সে-ও কাঁদিয়া ফেলিল।

৩

ঐ যে ছেলেটিকে সে দিন সন্ধ্যাবেলায় মোহান্তজী তাঁহার কাছে আশ্রয় দিলেন, তাহার নাম না কি ভবেশ! নামটি শুনিয়া মহেশানন্দ মুখে কিছু না বলুন, মনের মধ্যে তাঁহার এই কথাটাই তখন প্রবল হইয়া উঠিল যে, এই ছেলেটিকে ভগবান্ নিশ্চয় আমার জন্যই তৈরি করিয়া রাখিয়াছিলেন। এ না হ'লে যার নাম কার্ত্তিক, বিনোদ, অথবা সুকুমার হইতে পারিত, সে ভবেশ হইল কেন? এক বার তাঁহার মনে হইল, এটি যদি তাঁহার নিজের সন্তান হইত! কিন্তু এই কথা তাঁহার মনে হইবামাত্র মনটা তাঁহার ছাঁৎ করিয়া চমকিয়া উঠিল,"—ভগবান্ রক্ষা করুন! ভাগ্যে তাহা হয় নাই! তাঁর ছেলে হইলে এর পরিণাম সম্বন্ধে কিছুরই ত নিশ্চয়তা ছিল না, এ তবু পরের ছেলে হইয়াছে বলিয়া শিষ্যত্বে আসিয়া পৌঁছিয়াছে! এই ঢের, ইহার অধিক লোভে কায নাই। আদিত্যেশ্বর এইটুকুই এখন বজায় রাখিলে বাঁচা যায়।

ছেলেটি মোহান্তের কাছেই রহিল। অতিথিশালা, অথবা অন্য পরিজনবর্গের মধ্যে সে নিজের স্থান লইতে গেল না। মোহান্তও তাহাকে এ সম্বন্ধে একটি কথাও বলিলেন না, তিনি যেন মনে মনে এইটুকুই চাহিতেছিলেন, অথচ সে নিজে হইতে এই ব্যবস্থায় না আসিলে তাহাকে এ সম্বন্ধে কিছু মুখ ফুটিয়া বলিতে তাঁহার যেন কোন্‌খানটায় বাধিতেছিল, বোধ হয়, সেটা সন্ন্যাসীর বাহ্যাড়ম্বরের খাতিরে অথবা গাম্ভীর্য্যময় মোহান্তীয় মর্য্যাদায়। যাহা হউক, ভবেশ যখন আপনা হইতে বলিল যে, সে এইখানেই একটুখানি নিরিবিলিতে থাকিতে চাহে, অত লোকের মধ্যে সে যাইবে না, তখন যেন কৃতার্থমন্য হইয়া সেই চিরগম্ভীর-প্রকৃতি ব্রহ্মচারী, সর্ব্বত্যাগী হইয়াও পাইবার আকাঙ্ক্ষায় আকণ্ঠ পরিপূর্ণ সন্ন্যাসী, সম্পূর্ণরূপে বর্ত্তাইয়া গিয়া তাহার আবেদন অনুমোদন করিলেন। ফলে খুব অল্পদিনের মধ্যেই সকলে দেখিল যে, এই নূতন আসা আগন্তুকটি তাহাদের সকলকার একান্ত প্রার্থিত স্থানটিতে যে রকম ভাবে দখল লইয়াছে, দস্তাবেজের লেখায় ইহাকেই মৌরসী পাট্টা বলা যাইতে পারে।

সকলেরই বুক কম বেশী ঈর্ষার জ্বালায় জ্বলিতে লাগিল, মোহান্তজীর চেলাদের ভিতর প্রধান প্রধান জন কয়েকের, বিশেষতঃ গুরু-ভাই মহেশ্বরানন্দের এবং শিষ্য উমেশানন্দের মুখ ঈর্ষ্যায় কালো হইয়া উঠিল। না জানি কোথা হইতে এই দুগ্ধপোষ্য শিশু সহসা বামন-মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া দেখিতে দেখিতে তাহার ছোট ছোট দুইটি পদে স্বর্গমর্ত্ত্য ঢাকিয়া ফেলিয়া তৃতীয় পদে এখন আরও কিছু চাপা দিতে চাহে। এ যেন একটা বিপ্লব, যেন আকস্মিক ভূমিকম্পের অগ্ন্যুৎপাত, জলপ্লাবন। কোথাও কিছু নাই, একবারে হু হু করিয়া আসিয়া পড়িয়া পুরাতনকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিতে চাহে। এ আপদের কি কোন শাস্তি হয় না?

চৌধুরীরা এ দেশ ছাড়িয়া অবধি এ দেশে আলোচনার জিনিষটা কিছু কম পড়িয়াছিল; কারণ, ক্রিয়াকর্ম্ম, ব্রাহ্মণ-ভোজন, এ সব করার লোক আর কই? সংসারের নিয়মই

এই যে, যাহার কাছে পাওনা আছে, তাহারই কাযের খুঁৎ ধরিয়া পাওনাদাররা খুঁৎ খুঁৎ করে, যেখানে পাওয়ার আশা একবারেই ব্যর্থ, সেখানে মিথ্যা কেহ কথা কহে না।

দেশে বড় লোক থাকিতে আলোচনাও বড় বড় হইত। এখন যেমন দরের লোক, তাহাদের বিতর্কও তদনুরূপ। দিন-কতক পূর্ব্ব-মোহান্ত যখন প্রথম ধার্ম্মিক হন, সেই সময়টায় কিছুদিন ধরিয়া গাঁয়ের লোক মেয়ে-পুরুষে ছইটা কথা কহিয়া বাঁচিয়াছিল, আর বর্ত্তাইল এখন।

মোহান্ত এই বুড়া বয়সে একটা পাগড়ী-বাঁধা পাঞ্জাবীদের ছেলেকে যে পুষ্যি বানাইয়াছেন, এই খবরটা দেখিতে দেখিতে আদিত্যপুর ছাড়াইয়া কাছাকাছি যে কয়খানা গাঁ ছিল, সব কয়খানাতেই ছড়াইয়া পড়িল। আজকাল মেয়ে-পুরুষের জলস্থলের সকল বৈঠকে কেবলমাত্র ঐ একটিমাত্রই আলোচনা যে, মোহান্ত ঠাকুর তাঁহার পুরানো চেলাদের বঞ্চিত করিয়া, এক নূতন চেলা খাড়া করিয়াছেন। এই সঙ্গে অনেকেই আবার অনেক রকম জল্পনা-কল্পনা করিলেন, বড় বড় টীকা, ভাষ্যকারদের হারাইয়া অনেক রকম টীকা-টিপ্পনীও চলিতে লাগিল। কেহ বলিল, "ভিতরের কথাটা যে না বোঝা গেছে, তা নয়, তত বোকা কেউ নেই। উইল করে দে'বার ত আর উপায় নেই, তাই চেলা বানিয়ে ওয়ারিশানটাকে বজায় রাখতে হচ্ছে!"

কেহ বলিল,—"ও কথা কাযের কথা নয়! সে রকম যে এ মোহান্ত ঠাকুরের কেউ আছে, তা ত কোন দিনই কেউ শোনে নি, সে বরং আগের মোহান্তের সময় বল্‌লে সাজতো, এ ত সে রকম মানুষ নয়। তা' নয়,—কুড়নোই বটে; তবে ছেলেটার কি ব্যাপার, সেইটেই ঠিক যেন বোঝা যাচ্ছে না! এত সুন্দর আর অত কম বয়সী ছেলে, সন্ন্যাস নে'বার ওর এর মধ্যে কি হলো যে, ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো?"

অপর ব্যক্তি বলিলেন, "ও যে কে, সে আমি ঠিক ধ'রে ফেলেছি, সাপের হাঁচি বেদে বই কি আন্‌লোকের চেন্‌বার সাধ্যি আছে! কোন দিন তোমরা কেউ ওর গান শুনেছ? শোন নি? তা হ'লে বুঝতেই পারবে না। ও রকম সুর এক কল্‌কাতা, দিল্লী আর লক্ষ্ণৌএর বাইজীদেরই গলায় আছে! যখন গান করে, মনে হয়, লক্ষ্ণৌ ঠুংরি আপনি বেরিয়ে এসে সাম্‌নে দাঁড়িয়েছে!"

শ্রোতৃবৃন্দ এ সংবাদে একবারে বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া পড়িল, "বল কি? এমন ধারা? তা ত আমরা জানি নে, আর জান্‌লেই বা করব কি? তোমার মত আমাদের ত মহারাজের কাছে যাওয়া আসা নেই। তা' একটা দিন নিয়ে যেয়ে শুনিয়ে আনো না,—কেমন গায়, ছুটো শুনে আস্‌বো।"

যিনি ভবেশের গান গাওয়ার খবর দিয়াছিলেন, তিনি মুখ বিকৃত করিয়া উত্তর দিলেন, "ছোকরাটা তেমনই কি না! সে দিন আমি হঠাৎ গিয়ে পড়েছি, তাই শুনতে পেয়ে গেছলাম, তার পর কত সাধ্যি-সাধনা করা হলো, কোনমতেই আর গান শেষ করলে না। মোহান্ত পর্য্যন্ত বল্লেন, 'গাও না, তাতে ক্ষতি কি!' তবু না! ভয়ঙ্কর একরোকা ছেলে।"

শ্রোতাদের মধ্যের এক জন প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা, ঐ যে তুমি তখন কি বল্‌ছিলে যে, ও কে, তা জান্‌তে পেরেছ, তা কৈ বল্‌লে না ত? ও কে, বলবে কি?"

আর একটি লোক ঐ সময়েই প্রশ্ন করিলেন, "আচ্ছা, গান যে গাইছিল, তার ভাষাটা কি? হিন্দি? না ফার্সি?"

বক্তা এক জনের কথার উত্তরে কহিলেন, "ও কোন নামওলা বাইজীর ছেলে, ওর রূপ দেখে আর গলা শুনে আমি ধ'রে ফেলেছি, ওর মাকে আমি কলকাতার এক রাজ-বাড়ীতে মুজ্‌রো করতে দেখেছিলুম কি না, তাই একে দেখেই চিন্‌তে পারলুম, আর ঠিক সেই গলাটি যেন বসানো আছে।"

"সে কত দিন হবে গা, চক্কোত্তী মশাই? এখনও তোমার ঠিক মনে আছে? আমার ত এক বছর আগে দেখা লোকের মুখ মনে থাকে না, গলাও কানে থাকে না।"

চক্রবর্ত্তী একটুখানি কৃপার সহিত হাসিলেন, "এ চক্কোত্তীর বেটার মাথাটা ভগবান্ হাইকোর্টের জজের মাথার মালমসলা দিয়ে গ'ড়ে ছিলেন যে! কেবল ঐ ছ দিনের রাতে মা বেটী আমার ঘুমিয়ে মরেছিল ব'লে কপালের লেখন-খানিই অন্যের সঙ্গে বদ্‌লে গেছে। আমি যখন দিল্লীওয়ালী বাইজীর গান শুনি, তোরা তখন কেউ হামা দিচ্ছিস্, কেউ হয় ত মায়ের গর্ভে যোগাসনে আছিস্, তবু যা এক বার এই কানের তারে ঘা দিয়েছে, সে একবারে ঐখানে কায়েম হয়ে ব'সে গেছে। বলি, এই কলের গান শুনেছিস্ ত? ঐ এক বারই না ওর মধ্যে গাওয়া হয়েছে, অথচ সুরটা সেখানে রয়েই গেছে! আমারও ঠিক তেম্‌নি।"

একটি কমবয়সী শ্রোতা কহিল, "আর ঠাকুর্দ্দার চোখে বোধ হয় ফটোগ্রাফের প্লেট বসানো আছে ?"

ঠাকুর্দ্দা সোৎসাহে যুবার দিকে চাহিয়া হাসিমুখে কহিলেন, "ঐ যা বলেছিস্ ভাই ! হ্যাঁ, তার পর নব্‌নে কি জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলি রে ? গান হিন্দি না ফার্সি ? তা কেন ? খাসা পরিষ্কার বাঙ্গালা গানই ত গাচ্ছিল। কি যে ঐ গানটা—আমাদের খুবই ত জানাশুনো রে ! বেশ যে কথা-গুলি, সুরটিও একটু গম্ভীর গম্ভীর, ঐ সাঁওতালদের মাদল বাজানোর মত, হ্যাঁ, ভাল মনে পড়েছে,—

'গাও হে তাঁহারই নাম, রচিত যাঁর বিশ্বধাম,
দয়ার যাঁর নাহি বিরাম, ঝরে অবিরত ধারে।'

খাসা গাইছিল, কিন্তু আমায় দেখে চুপ করলে, কিছুতেই আর গাইলে না। মা মাগী পয়সা নিয়ে গাইতো কি না, ছোঁড়া কি কম ! যেখানে কোন পাওনা নাই, সেখানে গাইবে কেন ?"

শশী ইহার প্রতিবাদ করিল, "বাঙ্গালা গায়, তা হ'লে দিল্লীওয়ালী বাইজীর ছেলে কি বল্‌লেন ?"

এই অপ্রতিদ্বন্দ্ব আবিষ্কারের মধ্যে এবম্প্রকার প্রতিবাদে ঈষৎ চটিয়া উঠিয়া চক্রবর্ত্তী কিছু রুষ্টস্বরে কহিয়া উঠিলেন, "তার আর আশ্চর্য্যিটা কিসের রে শশে ? ওদের কি কোন জাত আছে না ভাষা আছে ? আরে তাই, যদি থাকবে, তা হ'লে মহম্মদ সার নাতির অন্নপ্রাশনেও নাচলে, আবার কলকাতার ওই মহারাজার পৌত্তুরের বিয়েতেও মুজরো করতে এলো কি ক'রে ? ওরা ত ঐ রকম ভোল ফিরিয়ে ফিরিয়েই বাদশা থেকে বাবু পর্য্যন্ত বশ ক'রে রেখেছে।"

তরুণটি কহিল, "তা' যেন মানলুম, তবে বাইজী-পুত্র হঠাৎ সাধু হ'ল কেন, এর কি ঠিক করেছেন বলুন ত ?"

চক্রবর্ত্তী তখন নিশ্চিন্ততার হাঁফ ফেলিয়া, নিজের বহুদর্শিতার আনন্দ দন্ত দ্বারা প্রকটিত করিয়া, মৃদু মৃদু হাস্যের সহিত মিশাইয়া দিয়া মীমাংসাটাকে প্রকাশ করিতে লাগিলেন,—

"তা—ওই রকমই ত সংসার-ক্ষেত্রে ঘটে থাকে রে ভাই ! ও যদি না সাধু হবে, তা হ'লে তুমি আমি কি হবো ? মনের ধিক্কার রে দাদা ! মনের ধিক্কারে মানুষকে যে কোন্ দিকে টেনে নিয়ে গিয়ে ফেলে, তার কি কিছু ঠিক ঠিকানা আছে ? ভেবেছে, এই রকম সাধু হয়ে একটি কোণের ভেতর লুকিয়ে থাকলে ওর আসল পরিচয়টা আর বুঝি কেউ জান্‌তে পারবে না ! শাস্তরেও ত আছে কি না, মায়ের আর শ্বশুরের নামে যে পরিচয়—সে অধম।"

একটি লোক এতক্ষণ কোন কথাই কহে নাই, সে এতক্ষণ সব কথা শুনিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিল, "ছোঁড়াটা আসল জোচ্চোর ! বুড়টাকে তুতিয়ে-পাতিয়ে গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে শেষে ওর মাথায় হাত বুলুবে, সেই ফন্দি-তেই এসে ঢুকেছে।"

"থিয়েটারের অ্যাক্টর হওয়াও বিচিত্র নয় !"

"হতেও পারে বোমার দলের পলাতক কেউ। তা যদি হয়, তা হ'লে মোহান্ত ঠাকুরটি শুদ্ধ ফাঁসবেন এবার ! একেই গবর্ণমেণ্ট এই সব মোহান্ত-হন্তীর পক্ষপাতী নয়, এটাকে যদি সিডিসনীষ্টদের আড্ডা ব'লে সন্দেহ হয়, তা হ'লে বুড়ো বয়সে ভদ্রলোককে পুলিপোলাও না ক'রে দেয় !"

"দেখ, এখন কার বরাতে কি নাচছে। মোদ্দা মহেশ্বর ঠাকুর আর মহেশ্বর পুরী হ'তে পাচ্ছেন না, এটুকুন ঠিকই হয়ে গেছে। আবার ইহারও প্রতিবাদ উঠিল।"

"তাই কি কেউ বল্‌তে পারে ? শাস্তরে বলেছে, 'স্ত্রিয়-শ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ'।"

তা দেব মানব যিনি যাহা জানুন বা না-ই জানুন, ভবেশের প্রতি মহেশানন্দের প্রগাঢ় আনুরক্তির সংবাদটা কাহারও জানিতে বাকি রহিল না। সে এমন আকর্ষণ,—সে যদি ভবেশ একটি ছেলে না হইয়া তার উল্টা জাতের কেহ হইত, তবে তাহা লইয়া আর বলিতে বা কহিতে কাহারও কোন কিছুই বাধা পড়িত না। পূর্ব্ব-মোহান্ত ভবানন্দ তাঁহার পক্ষে অসঙ্গত জানিয়াও পূর্ব্বে বেশ একটুখানি বেলায় উঠিতেন, তাহার পর ঘণ্টাখানেক সময়ও জন চার পাঁচ ভৃত্য তাঁহার প্রসাধনের সাহায্য করিত, তাহার পর তাঁহার প্রাসাদের অন্তর্গত একটি সুবৃহৎ মর্ম্মর-গৃহে তিনি উপাস্যকে স্মরণার্থ প্রবেশ করিতেন। কোমল শয্যায় সুখস্পর্শ ব্যাঘ্র-চর্ম্ম বিছাইয়া ফুল-চন্দন ধূপ-ধূনা কস্তুরী-কেশর ও তাহার সঙ্গে মিশাইয়া ফ্রেঞ্চ পুষ্পসারের গন্ধে ভারাক্রান্ত সেই হর্ম্ম্যতলে দেবতা বা বিলাস-সঙ্গিদল কাহাকে বেশী মনে পড়িত, তিনিই জানেন। মহেশানন্দের অভ্যাস ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত।

ভবেশ মহেশানন্দের ঠিক পাশের ঘরেই শোয়, অতি প্রত্যূষে ঘুম ভাঙ্গিয়া সে আপনি জাগিয়া উঠে, অমনই সেই সঙ্গে এ ঘরের মধ্যে আসিয়া মহারাজেরও ঘুম ভাঙ্গাইয়া দেয়। তাহার পর চাকর-বাকরের কোন সাহায্য না লইয়া কেবলমাত্র ভবেশের সাহায্যেই মোহান্তজীকে তাঁহার সমস্ত প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিয়া লইতে হয়। ইহার পর তাঁহারা দুই জনেই গিয়া উপাসনা-গৃহে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেন। কিছুক্ষণ ভবেশের গুরু-গিরি করিয়া, তাহার পর তাহার সঙ্গে পাশাপাশি বসিয়া এই বৃদ্ধকালে তিনি যে রকম নিশ্চিন্ত শান্তির সহিত ভগবানের উদ্দেশ্যে জপ-তপ-ধ্যান-ধারণা, আসন-প্রাণায়াম করিয়া যান, তেমন তাঁহার জীবনে কোন দিন তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল বলিয়া কোন রাত্রি-স্বপ্নেও দেখিতে পান নাই। দীর্ঘজীবনটা শুধুই শুষ্ক কঠোরভাবে তপস্যা করিয়া গিয়াছেন, ফল আজই যেন ফলিয়া উঠিয়াছে।

মহেশানন্দের গুরু উমেশানন্দ পুরী মহারাজ মানুষটা ডাকসাইটে বিদ্বান্ ছিলেন বলিয়া একটা নাম আছে। দুরূহ শঙ্করভাষ্যের একখানা ভাষ্য টীকা তিনি না কি লিখিয়া ছাপাইয়াছিলেন, ভবানন্দকেও তিনি পড়াশুনা নেহাৎ মন্দ করান নাই, তবে তাঁহার মৃত্যুর পর স্বয়ং মোহান্ত হইয়া পূর্ব্ব-শিষ্য আর সে সকলের চর্চ্চা বড় একটা করিতেন না। তাহা শুধু তিনি কেন? একজামিন পাশ হইয়া চাকরীতে ঢুকিবার পর লেজার বুক বা জুরিস্‌ডিকস্‌ন্, এই ধরণের জিনিষ ছাড়া ভূতপূর্ব্ব ছাত্রগণ আর কে কাহার সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিয়া চলিয়া থাকেন? মহেশানন্দ বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, তিনি পড়ার মধ্যে ঢুকিয়া থাকেন।

আজকাল এই নূতন শিষ্যের পাল্লায় পড়িয়া এই বয়সে আবার তাঁহাকে নূতন করিয়া পুথি-পত্র খুলিয়া বসিতে হইয়াছে। মহেশানন্দের এই নূতন ছাত্রটি একবারে সংস্কৃত ভাষার স-টি পর্য্যন্ত জানিতেন না। এই বয়সে ক খ গ ঘ করিয়া অক্ষর-পরিচয় করানো বড় সোজা কথা নহে! বিশেষ যাহাকে ভাই-ভাইপো, ছেলেমেয়ের জন্য কোন দিনই ও কায করিতে হয় নাই, যিনি এম, এ, ক্লাশের ছাত্র পড়ান, তাঁহাকে হঠাৎ যদি পাঠশালার গুরুমহাশয়গিরি করিতে হয়, তাঁহার যে দশা ঘটে, ইঁহারও তাহাই হইল! ভবেশ কিছু কুণ্ঠিত হইল। বলিল, "গোড়ায় না হয় আর কারু কাছেই পড়া নিই? তাকে কিন্তু এইখানে বসেই পড়াতে হবে।"

মহেশানন্দ এ কথায় ব্যস্ত হইয়া উত্তর করিলেন, "তাও কি হয়? ওরা না কি কোন যত্ন নিয়ে পড়াবে? তুমি আমার কাছেই শেখো না, শিখবে কি?"

ভবেশ মনে মনে খুসীই হইল, প্রকাশ্যে একটুখানি দ্বিধা জানাইয়া বলিল, "আপনার ভারি কষ্ট হবে।"

মহেশানন্দ বাধা দিয়া কহিলেন, "আহা, হয় একটু, তাই হোক না। কষ্টও ত একটু পাওয়া ভাল। নিছক মিষ্টি খেতে কি ভালই লাগে! মুখটা না হয় তেতো দিয়েই বদ্‌লাবে।"

মনে মনে বলিলেন, "ওরে আমার কুড়িয়ে পাওয়া মাণিক! তোর জন্যে সকল কষ্টই যে আমার মাথার মুকুট করে নিতে পারি। এই যে আমার পরম সুখ।"

সকাল, বিকাল, দুপুর, সন্ধ্যা, যখন তখন শিক্ষক-ছাত্রের মধ্যে পঠন-পাঠন চলিতে লাগিল। মহেশানন্দ একদিকে বর্ণ-পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে আর একদিক দিয়া, তাঁহার এই অত্যন্ত জ্ঞান-পিপাসু ও মেধাবী ছাত্রটিকে দর্শনশাস্ত্রের অনেক দুরূহ ব্যাপার মুখে মুখেই শিক্ষা দিতে লাগিলেন। বঙ্গাক্ষরে লিখিত কালিদাসের কাব্য লইয়া তাহাকে তাহা এতই যত্নে বুঝাইয়া দিতেন যে, ব্যাকরণের সন্ধি-বিচ্ছেদ শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই ভবেশ সংস্কৃত কাব্য ও দর্শনশাস্ত্রের সহিত অর্দ্ধ-পরিচিত হইয়া আসিল, এ ভিন্ন আরও নানা কথার আলোচনা তাহাদের মধ্যে হইত। মহেশানন্দ ইংরাজী ভালরূপই জানিতেন। কিন্তু তাহার কোন ব্যবহার করিতেন না। ভবেশও কিছু কিছু জানে। একখানা নামজাদা ইংরাজী দৈনিক তাহার জন্য আসিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, উহা হইতে ভবেশ তাঁহাকে বাছিয়া বাছিয়া সংবাদ জানাইত। কোন সারগর্ভ প্রবন্ধ থাকিলে কাগজ-পেনসিল লইয়া সেটি বাঙ্গালায় তরজমা করিত। তাঁহাকে তাহা শুনাইত। মহেশানন্দ যত না তাহাদের প্রতি আকর্ষণে, শুধু ভবেশের তুষ্টির জন্যই অত্যন্ত আগ্রহের ভাণ করিয়া সেই সব তন্ময় হইয়া শুনিতেন। এই তন্ময়তাটুকুও তাঁহার আসিয়া পড়িত ভবেশের সেই মৃদু গম্ভীর অথচ সুসংযত সুললিত কণ্ঠস্বরের সুপ্রাচুর্য্যে। ভবেশ যে তাঁহার জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিয়াছে, এই কথাটাই ইহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় হইয়া তাঁহার মনের

ভিতরটাকে বাপীজলে বাসন্তী সমীরোৎপন্ন মৃদু মৃদু বীচি-বিক্ষেপের মতই সুধীরে আন্দোলিত করিত। কখন কখন সহসা দুই চোখ ভরিয়া জলের আভাস দেখা দিয়া অন্তরের অভ্যন্তরে একটা সুদীর্ঘতর দীর্ঘশ্বাস জমাইয়া তুলিত। পূর্ব্বস্মৃতির চকিতোদয়ে অনুতপ্ত চিত্ত, প্রাণ যেন এই বলিয়া নিজের কার্য্যফলের ভারকে কতকটা হাল্কা করিয়া লইতে চাহিত যে, যদিই ইহাকে দিলে, বছর কতক আগে দিলেই হইত!

৪

এমনই করিয়া দুঃখের মেঘে সুখের বর্ষণ লাভ করিয়া, মহেশানন্দের দিন কাটিতে লাগিল। ভবেশের এখানে আসার পরে প্রায় দুই বৎসর কাল কাটিয়া গিয়াছে। দুই বৎসর সময় নিতান্ত অল্প নহে। এই দুই বৎসরে জগতের আগাগোড়া সমস্তটাই বদলাইয়া যাইতে পারে। তা আগাগোড়া নাই হউক, এই দুই বৎসরে আদিত্যপুরের অনেক কিছুই বদলাইয়াছিল। প্রথমতঃ দেশের লোকের কাছে এখন ওই রহস্যময়—অজ্ঞাত-পরিচয় বালকাকৃতি কিশোর আর নিতান্ত দুর্গ্রহের প্রেরিত প্রতিনিধির মতই আতঙ্কের বিষয় ছিল না!

যদিও ভবেশ পূর্ব্বের মত আজও সেই কোণের ভিতরেই আধ-ঢাকা হইয়া একমাত্র মহেশানন্দের অধীনেই জীবন যাপন করিতেছিল, তথাপি আজকাল মহেশানন্দের মধ্যে কত বড় পরিবর্ত্তনটা ঘটিয়া গিয়াছে, তাহা এই ক্ষুদ্রাকৃতি তরুণটিরই যে সাহচর্য্যের অনিবার্য্য ফল, সে বিষয়ে এই গ্রামের ছোট বড় ভাল মন্দ সকলকারই মনে কিছুমাত্র সংশয় ছিল না।

একটি পাঠশালামাত্র এত দিন আদিত্যপুরের একমাত্র সম্বল ছিল, বর্ণপরিচয় প্রথম ও দ্বিতীয় এবং শুভঙ্করের সটীকে, নামতা, কড়াঙ্কে, পণকিয়া, বুড়িকিয়া পর্য্যন্ত এখানকার বিদ্যাশিক্ষার সীমা ছিল। আজি প্রায় এক বৎসর হইতে যায়, তাহার স্থানে একটি মিডল্ ইংলিশ স্কুল এবং মহেশানন্দ বালিকা-বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। অর্থাভাবে মিত্তিরদের প্রতিষ্ঠিত যে দাতব্য চিকিৎসালয়টির কার্য্য বন্ধ হইবার উপক্রম করিয়াছিল, এখন সেখানে এক জন ভাল পাশকরা এম, বি ডাক্তার আসিয়া, জলের পরিবর্ত্তে কুইনিন, পিল, পুরিয়া, মিক্শ্চার প্রভৃতি নানাকারের বিশুদ্ধ কুইনিন্ অজস্র পরিমাণে বিতরণ করিতেছেন। পূর্ব্বতম ক্যাম্বেলপাশ ডাক্তারটি ইঁহার কম্পাউণ্ডারীতে লাগিয়া গিয়াছে। আর সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা হইয়াছিল, গ্রামের মধ্যে পাকা রাস্তা ও দুইটি সুবৃহৎ পুষ্করিণী খনন করায়। বর্ষাকালে এ দেশে পথ চলা একটা দুর্দ্দৈবেরই সামিল হইয়া পড়িয়াছিল। কাঁচা রাস্তা পাযে পায়ে যেন কাদা—ঘোল হইয়া যায়, জল-নিকাশের ব্যবস্থা নাই, বর্ষার জল অবিরল ধারায় পথের উপর দিয়াই চলিতে থাকে, ফলে কোনখানের কাদা ধুইয়া প্রকাণ্ড গর্ত্ত বাহির হইয়া পড়ে, কোথাও পিচ্ছিল—পথিককে আছাড় খাইতে খাইতে চলিতে হয়। ইহার উপর গরুর গাড়ীর কৃপায় সে রাস্তায় আরও কি দুর্দ্দশা না হয়, তাহা বলা যায় না। এই সমস্ত রাস্তাটি খোয়া দিয়া পিটাইয়া, রোলার দিয়া ঘষিয়া যখন পাকা করা হইল, তখন দেশের লোক মোহান্তকে আশীর্ব্বাদ করিতে গিয়া তাহার বেশীর ভাগটাই খরচ করিয়া বসিল—তাঁহার শিষ্যটিরই উপরে। কে জানে,কেমন করিয়াই তাহাদের মনে দৃঢ়বিশ্বাস দাঁড়াইয়াছিল যে, এই যে সমস্ত সদনুষ্ঠান আজকাল মোহান্তজীর দ্বারা সংঘটিত হইতেছে, মোহান্তজীর নির্লিপ্ত উদাস চিত্তটিকে সংগঠিত করার মূলে কিন্তু আর একখানি কোমল তরুণ চিত্ত কার্য্য করিতেছে। সে আর কেহ নহে—ভবেশ।

দুই এক জন এ সম্বন্ধে প্রথমটায় ঈষৎ সংশয় প্রকাশ করিতে গেলে, সত্তের পক্ষ হইতে তীব্র প্রতিবাদ উঠিয়াছিল, "যে তাই যদি না হবে ত এত দিন এ সব হয় নি কেন?"

অপরপক্ষ ইহাতেও হটিয়া যায় নাই, উহারা বলিয়াছিল, "হয় ত ঠিক সময়েই তাঁহার মনটা এই দিকে চ'লে এসেছিল। ও না এলেও—হয় ত এ সব হতো।"

প্রতিবাদকরা হাসিল, "কাকতালীয় ন্যায়! কাকটা বসলো আর তালটাও পড়লো, কাকে ফেল্লে না আপনি পড়লো! না মশাই! যেটা প্রত্যক্ষ, সেইটেই বিশ্বাস করতে রাজী আছি, এত সূক্ষ্ম ভেবে 'হয় ত'কে বিশ্বাসের আসনে বসাতে পারছি নে।"

তবে এক বিষয়ে দেশের লোক অনেকটা একমত। ভবেশ লোকটি যে বিষম গর্ব্বিত,—এ সম্বন্ধে কাহারও ভিতর মতদ্বৈধ ছিল না।

সাধন-ভজন, আর পঠন-পাঠন ত অনেকেই করে, তাহা বলিয়া এতটাই প্রচার সবাই করে না, মোহান্তের যত্ন সেবা যাহা এত দিন তাঁহার চাকররাই করিত, অথবা তাহারাও ঠিক করিত না, এবং তিনিও তাহা লইতে চাহিতেন না, সে সমস্তই এখন প্রায় ভবেশ একচেটে করিয়া লইয়াছে। কেহ দেখা করিতে আসিলে, নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলে উত্তর দেয়, "এখন আমার অমুক কাযটা করিতে বাকি, এখন আমি অমুক কায করিব।" কেন রে বাপু, এতটা খোসামোদ না হয় না-ই করিতিস্! ওগুলা যাহাদের হাতে ছিল, তাহাদেরই ফিরাইয়া দিয়া একটু লোকালয়ে মুখ বাহির কর্ না কেন? তাহা ত মতলব নহে, ও একটা ছুতা, আসল কথা তিনি নিজের রূপের, বয়সের এবং বিদ্যার গৌরবে কাহাকেও নিজের যোগ্য মনে করেন না, তা' মিশিবেন কাহার সঙ্গে? অথচ লোকটির মধ্যে এমনই একটা আকর্ষণী শক্তি আছে যে, হাজার সে তুচ্ছ করুক, তথাপি একবার তাহাকে যে চোখে দেখিয়াছে, তাহাকে ঘুরিয়া ফিরিয়া মধ্যে মধ্যে পাঁচ সাত দিন পরে পরেও একবার অন্ততঃ শুধু চোখের দেখা দেখিতেও আসিতে হইবে! তা কথা যদি বা সে না-ও কহে।

মোহান্তর মধ্যে বাস্তবিকই একটা বড় রকম পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল! তাঁহার মনে হইত, তাঁহার জীবনের এই যেন সকালবেলা। পূর্ব্বদিকটাকে এই সবেমাত্র কাঁচা সোনায় রঞ্জিত এবং উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়া তরুণ অরুণ স্মিত-প্রফুল্লমুখে দেখা দিয়াছেন। রাত্রির অন্ধকার-তমোরাশি সেই সমুজ্জ্বল আলোক-সম্পাতে যেন নিজের হীনতার অভিমানে একবারে নিঃশেষে মরিয়া গিয়া সেই দারুণ লজ্জাকে ঢাকিতে পারিতেছে না,—সম্মুখে নবরবিকিরণোজ্জ্বল দিন।

সেই যে দিনটা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছে, সেটা বাস্তবিকই দিনের বা গোধূলির রক্তরাগোজ্জ্বল অভিনব শ্রী—সেইটুকুই শুধু এই মুগ্ধ-লুব্ধ অকালবৃদ্ধের চোখে ধরা পড়ে নাই।

তবে একবারেই যে পড়ে নাই, তাহাও ঠিক বলিতে পারি না। অনাস্বাদিত আনন্দে পরিপূর্ণ পাত্র হইতে সুধাস্বাদ করিতে করিতে কখন বা চকিতে মনে হইয়াছে—না জানি, সহসা কোন্ সময় তাঁহার এই চির-বঞ্চিত জীবন দুই দিনের সুখটুকুকে হারাইয়া ফেলিবে! মৃত্যুর কথা মনে আসিলে আজকাল তাঁহার শুষ্কনেত্রে জল ভরিয়া উঠে। ভবেশকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে, মনে পড়িলেই মরণকে যেন দুই হাতে ঠেলিয়া রাখিতে মন চাহে, দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ভিক্ষুক যেমন অন্নসত্রের দ্বাররোধের আশঙ্কায় অস্থির হইতে থাকে, চিরবৈরাগী মহেশানন্দেরও সেই দশা ঘটিয়াছিল।

কিন্তু এত করিয়াও মহেশানন্দ ভবেশের প্রকৃত স্বরূপকে যেন ভাল করিয়া খুঁজিয়া পাইলেন না। সে যেন এত কাছাকাছি থাকিয়াও দূরে—বহু দূরেই থাকিয়া গেল। সে যে কে, কেন এই তরুণ বয়সে এত রূপ-গুণের সঞ্চয় লইয়া এমন করিয়া বিবাগী—ঘরছাড়া হইয়া বেড়াইতেছে, এইটুকু জানিবার জন্য আর সকলের মতই তাঁহারও মনের মধ্যে বড় কম কৌতূহল জাগ্রত ছিল না, কিন্তু সে যেটুকু বলে, তাহাতে ঠিক যেন মন ভরে না। সে শুধু এই বলে যে, তাহার বাপ-মা মারা গিয়াছেন, ভাই, বোন্, আত্মবন্ধু কেহ কোথাও বর্ত্তমান নাই, তাই সে সংসারে বীতস্পৃহ হইয়া শূন্য ঘর ছাড়িয়া আসিয়াছে। ইহার বেশী পরিচয় তাহার নাই।

কিন্তু ইহার অপেক্ষা ঢের বেশী পরিচয় যে তাহার আছে, এই কথাটা মহেশানন্দের অনুভূতি তাঁহাকে জোর করিয়াই শুধু একবারমাত্র নয়, বার বারই বলিয়াছে। এই যে কয়টি কথার ক্ষুদ্র পরিচয়, এই একটুখানি জিনিষ—সীমার ভিতরকার জিনিষ, ইহাকে ত সহজেই খুঁজিয়া পাওয়া যায় এবং সানন্দেই মানিয়া লওয়া চলে, বড় জোর ইহার উত্তরে মনের মধ্যে মনের ভাবটাকে চাপা দিয়া মুখে বলা যায়—"আহা!" ইহার বেশী ত ইহার মধ্যে কিছুই করিবার নাই। কিন্তু যেটা সীমার বাহিরের বস্তু, সেটাকে সীমা দিয়া মাপিতে গেলে তাহার ফাঁকিটা ধরা পড়িতে সময় লাগে না। ভবেশ ছেলেটির ঐ শান্ত, মৌন, সেবা-শুভ্র, জ্ঞান-পিপাসিত বুকের মধ্যে কিছু একটা লুকোনো আছে, সেটা তাহার অনাথ জীবনের বেদনার অপেক্ষা আরও একটু কিছু বেশী, এটুকু মহেশানন্দ তাঁহার বোধের মধ্য দিয়া বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু সে যে কি, সেইটুকুই জানা গেল না এবং এই জানা এবং না-জানার মাঝপথটায় দাঁড়াইয়া মহেশানন্দের চুরি করিয়া পাওয়ার সমস্ত আনন্দটুকুই যেন কেমন একটা আশঙ্কার ছায়ায় বিবর্ণ হইয়া রহিল। অথচ আনন্দেরও যেন

শেষ নাই, সেই আনন্দেই চিরদিনের নিশ্চেষ্ট জড়ীভূত জীবনটাকে স্রোতের টানে ভাসাইয়া লইয়াছিল।

৪

সারা মধ্যাহ্নটা বিবেকচূড়ামণির আনন্দময় কোষ লইয়া শিক্ষকে ছাত্রে কোথা দিয়া যে কাটাইয়া ফেলিয়াছেন, দুই জনেরই সেটুকু খোঁজ-খবর ছিল না। বেলাটা যে আর শেষ হইতে বাকি পড়িয়া নাই, সেইটুকু দুজনকারই একসঙ্গে হঠাৎ হুঁস্ হইল। পশ্চিমের দিক্ হইতে সামনের প্রকাণ্ড বারান্দাটা পার হইয়া আসিয়া, ঘরের মধ্যে সুখাসীন উভয়ের মুখের উপর সুপ্রসন্ন স্বর্ণোজ্জ্বল রৌদ্র হাসিমুখে চাহিয়া দেখামাত্র ভবেশ ঈষৎ কুণ্ঠিত মুখেই তাড়াতাড়ি আলোচনার মাঝখানে আলোচ্য বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া গেল, কিন্তু মহেশানন্দ তখনও পূর্ব্বালোচিত বিষয়েরই অনুসরণে কহিতে লাগিলেন :—

"এই যে শ্লোকটি, এটি অতি চমৎকার প্রয়োগ হয়েছে,—'কস্তাং পরানন্দরসানুভূতিং'।"

বই বন্ধ করিয়া ভবেশ বলিল, "আজ অনেকক্ষণ ধ'বে পড়া হয়ে গেছে। পাঁচটা বাজে, চলুন, এখন আমরা একটুখানি বাইরে যাই—"

মহেশানন্দ একবার চকিতনয়নে বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, বেলা পড়িয়া গিয়াছে বটে, সূর্য্যের আলো আছে, তাহাতে তেজ নাই। সে আলো শুধুই স্মিত-শুভ্র-নির্ম্মলতায় ভরা, দহন-বিহীন অগ্নির মত। পুনশ্চ দৃষ্টি সরাইয়া লইয়া ভবেশের দিকে চাহিলেন,—

"কিন্তু শোন ভবেশ! যদিও—"

উঠিয়া পড়িয়া ভবেশ কহিল, "আজ আর নয়, একে আপনার শরীরটা তেমন সুস্থ নেই, তার পর প্রায় তিন ঘণ্টা এই সব নিয়ে বকৃতে হয়েছে, আবার! আসুন, আমরা বাগানে একটু বেড়াই গে।"

উদ্যানে যেখানে ভবেশের উদ্যোগে একটি মর্ম্মর-বেদিকায় ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, দুই জনে ধীরপদে পরিক্রমণ করিতে করিতে সেই দিকে গিয়া পড়িলেন। অদূরে শতরূপার নীরব নির্জ্জন তটভূমি, শ্যামল শষ্পাস্তীর্ণ তীররেখার প্রান্তে তাহার স্বচ্ছ নীলাভ জলরেখা দেখা যাইতেছে।

শঙ্করমূর্ত্তির পাদপ্রান্তে বসিয়া পড়িয়া ক্লান্তস্বরে মহেশানন্দ বলিয়া উঠিলেন, "বাতের বেদনাটা একটু বেড়েছে দেখছি, ভবেশ! চল্‌বার ফির্‌বার আর বেশী ক্ষমতা নেই, বাবা!"

"তবে এইখানেই বসা যাক্, আসুন। আচ্ছা, তার চেয়ে যদি নদীতে একটু বোটখানা নিয়ে বেড়িয়ে আসা যায়, তা হ'লে কি রকম হয় বলুন দেখি? যাবেন?"

সূর্য্যের আলো আরও স্নিগ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, মঠোদ্যানের গাছপালারা হাওয়ার তালে সেই সোনার আলোয় ক্রমাগতই ঝিল-মিল করিয়া উঠিতেছিল। পাখীর গানে মঠের সীমানার শেষে পলাশ ও পাকুড়-বন ও আমবাগান ঘন-মুখরিত। সন্ধ্যা-সমাগম-পূর্ব্বের একটি শান্তি-স্নিগ্ধ পবিত্রতায় সমস্ত প্রকৃতি যেন বিনম্রাবনত।

মনের মধ্যে যে ভাগটা নির্জ্জীব, সে দিক হইতে একটুখানি আপত্তির সুর উঠিলেও তাহার যে বড় অংশটা এই সুদর্শন এবং অনন্য-সেবাপরায়ণ যুবকটি নিজের জোরে টানিয়া লইয়াছিল, তাহার দিক্‌কার নিরুপদ্রব বাধ্যতার আদেশই পালন করিতে বাধ্য করিল। বলিলেন, "এস, তাই যাই, কিন্তু ভবেশ! তোমার বেহালাখানা নিয়ে যাবে ত?"

ভবেশ তাহার কণ্ঠস্বরের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াই এই যন্ত্রালাপটাও এত ভাল করিত যে, অন্ততঃ মহেশানন্দের মনে হইত, তাহার গানের মত তাহার বাজনা শুনিয়াও বুঝি পুরাকালের সেই শ্যামের বাঁশীর সুরে যমুনার মতই এই শতরূপাও উল্টা দিকে উজান বহিবে!

এক দৌড়ে বেহালাখানা টানিয়া ভবেশ লঘু-ক্ষিপ্রচরণে পুনশ্চ বাড়ীর ভিতর হইতে বাহির হইয়া ফিরিয়া আসিল। মহেশানন্দ নির্নিমেষ-নেত্রে তাহার সেই ক্রীড়া-চঞ্চল হরিণশিশুর মতই চাঞ্চল্যময় লীলাগতি লক্ষ্য করিয়া মুগ্ধচিত্তে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

হাল্কা বাতাসে যে ছন্দের যে তালে তালে আমলকীগাছের পাতাগুলি সির্‌সির্ করিয়া কাঁপাইতেছিল, জীবন্ত স্কন্দপ্রতিম ভবেশের স্কন্ধচুম্বিত গভীর কালো ও ঘন কুঞ্চিত কেশের স্তরগুলি তাহার দ্রুত ধাবনের সঙ্গে সঙ্গে তেমনই করিয়া নাচিয়া নাচিয়া দুলিতেছিল। সূর্য্যের এই শেষ আলোর মতই তাহার সেই স্নিগ্ধোজ্জ্বল আশ্চর্য্য বর্ণচ্ছটা। ঐ প্রস্থিত মূর্ত্তিটি গভীরতর স্নেহের সহিত নিরীক্ষণ করিতে

করিতে মহেশানন্দের সহসা গায়ের মধ্যে কাঁটা দিয়া উঠিল; তাঁহার হঠাৎ মনে হইল, এ যেন মানুষ নয়, এই অস্তাচলগমনোন্মুখ সূর্য্যেরই একটা রশ্মিমাত্র! মাথায় তাহার—নিবিড় বিপুল ঘন মেঘের স্তর, হাতে পায়ে গায়ে সূর্য্যরশ্মির সমুদয় বর্ণচ্ছটা ক্ষণে-ক্ষণে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িতেছে। এক দিন এই সূর্য্যাস্তের মাঝখানেই সে তাঁহা হইতে এইখানে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়া গিয়াছে, আবার হয় ত—হয় ত আবার—সহসা কোন দিন এই পথহারা বাঁধন ছেঁড়া সূর্য্যের আলোটুকু তাহার আধারের সঙ্গে এই এমনই এক সূর্য্যকরোজ্জ্বল গোধূলির মধ্যেই মিলিয়া যাইবে!

এ কথা মনে হইতেই এই নিঃসম্বল বৃদ্ধের বুকের ভিতর থর্-থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল,—ওঃ, তবে সেই দিনই তাঁহারও শেষ সূর্য্যাস্ত! ওঃ ভবেশ! না না, তোমায় যেন আমি হারাই না।

৫

নদীধারের সবুজ ক্ষেতে শেষবেলাকার যে রৌদ্র এতক্ষণ ঝলমল্ করিতেছিল, তাহার স্থানাধিকার করিয়া বেশ একটি শান্ত স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার জাল পড়িয়া গিয়াছে। আকাশে খণ্ড লঘু শরতের মেঘ শিথিলিত অলস তনু স্বচ্ছ সুনীল মহাকাশে এলাইয়া দিয়া ইচ্ছামুখে ভাসিয়া যাইতেছিল, আর নীচে নিস্তরঙ্গ নদীজলে ঠিক তেমনই ইচ্ছাসুখে ভাসিতেছিল মহেশানন্দের ক্ষুদ্র তরণী। বকশুভ্র ছোট তরীটি ভেলার মতই হাল্কা, স্তব্ধ নদীর বিশ্রামসুখে কিছুমাত্র সে ব্যাঘাতের কলরব তুলে নাই। দেখিতে দেখিতে ধীরে ধীরে সে লোকাবাসের সীমানা ছাড়াইয়া একবারে জনহীন প্রান্তরের মধ্যে আপনাকে ভাসাইয়া লইয়া আসিল। এইখানে আসিয়া দাঁড় টানা বন্ধ করিয়া দিয়া ভবেশ তাহার বেহালাখানা তুলিয়া লইল।

নদীর এক পাশে মুক্ত প্রান্তরের শেষ সীমা সুদূরাবস্থিত দিক্চক্রের গায়ে গিয়া মিশিয়া গিয়াছে, আর এক দিকে ঘনগাছের সারি জোনাকীপুঞ্জের আলো হাতে লইয়া রাত্রিচর প্রহরীর মতই স্তব্ধ, স্থির, দাঁড়াইয়া আছে। ওপারের মাঠে সবুজ হইয়া আমন ধান ফলিয়া রহিয়াছিল; তীরে একবারে জলের ধারের উপর সেই ঘন জমীর সবুজ শাড়ীর কলহংসবৎ সু-শুভ্র সাদা পাড়খানির মতই কাশের ফুল অজস্র ফুটিয়া আছে। বাতাস যেন হঠাৎ পড়িয়া আসিল; আকাশের সেই খণ্ড মেঘগুলা পরস্পর যেন গায় গায় জড়াজড়ি, গলায় গলায় গলাগলি করিল। চাঁদ যে উঠিয়াছিল, এখন আর তাহার কোন চিহ্ন রহিল না। এক-খানা কালো মেঘ সুন্দরী বধূর মুখের নীলাম্বরী-অবগুণ্ঠনের মতই তাহাকে ঢাকিয়া ফেলিল। আকাশের সেই নির্ম্মল নীলাভা একটা অস্বচ্ছ আবরণে যেন বাঁধা পড়িল। অন্ধকার যদিও সেই শুক্লা রাত্রিকে একবারেই গ্রাস করিতে পারিল না, তথাপি কেমন যেন একটা কোয়াসার ঝাপসার মত কিছু-ক্ষণের জন্য তাহার সেই সমুজ্জ্বল শ্রীটুকুকে আড়াল করিয়া রহিল। মহেশানন্দ প্রকৃতির এই সহসা নিরানন্দ পরিবর্ত্তনে মনের মধ্যে কি যেন একটা অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতে-ছিলেন। কিন্তু ভবেশ এ সবের কিছুই লক্ষ্য করে নাই। সে নিজের মনের ভিতরকার সমস্ত উপচিত আনন্দের রসে সরস করিয়া তুলিয়া নিজের অত্যন্ত সুমধুর কণ্ঠের সহিত তেমনই শিক্ষিত হস্তের বেহালার ঝঙ্কার তুলিয়া চলিয়াছিল। বাগ্বাদিনীর বীণার তার হইতে বাহির হওয়া গানের মতই তাহা যেন সমস্ত আকাশকে ছাইয়া ফেলিয়াছিল। বোধ করি, যেন এই সুরের হাওয়ায় অভিভূত হইয়াই এই নির্জ্জন নদীতীর ও নদী-নীর, ওই ব্যথাভরা মুক্ত আকাশ—সকলেই বিস্ময়-স্তব্ধ হইয়া পড়িয়াছিল! নদীনীর তাহার স্বাভাবিক আনন্দমধুর কলতান ভুলিয়া স্তম্ভিত—নির্ব্বাক্ হইয়া পড়িয়া আছে। অথচ এই সুরের আলোয় কত দিনই যে এখানকার বিশ্ব-প্রকৃতি আপনাকে আলোকিত পুলকিত করিয়া তুলিয়া এই গায়ককে অভিনন্দিত করিয়া লইয়াছে, এমন করিয়া রুদ্ধশ্বাস হইতে ত কোন দিনই দেখা যায় নাই!

ভবেশ আত্মহারা হইয়াই গাহিতেছিল,—

"সময় যেন হয় গো এবার, ঢেউ খাওয়া সব চুকিয়ে নেবার,
সুধায় এবার তলিয়ে গিয়ে, অমর হয়ে রব মরি।"

মহেশানন্দের গায়ের ভিতরে এই বায়ুহীন রাত্রি যেন একটা শীতের শিহরণ জাগাইয়া দিয়া গেল। "চুকিয়ে নেবার?"—"চুকিয়ে নেবার?" না না, চুকিবে কি? এ কি কখন চোকান যায়? এ কি গান! এ ভাল না। প্রাণটা তাঁহার কি যেন একটা অজ্ঞাত শঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল।

ভবেশ গাহিতে লাগিল—

"যে গান কানে যায় না শোনা, সে গান যেথায় নিত্য বাজে,
আমার, প্রাণের বীণা লয়ে যাব, সেই অতলের সভার মাঝে;
চিরদিনের সুরটি সেধে, শেষ গানে তার কান্না কেঁদে,
নীরব যিনি তাঁহার পায়ে, নীরব বীণা দিব ধরি।"

এ সব কি ভাল কথা! "অতলের সভায়" যাবার কথা এই বর্ষায় ভরা নদীবক্ষে বসিয়া কেন ও গাহিল? মহেশানন্দ অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, ডাকিলেন—

"ভবেশ!"

"আজ্ঞে।"

"চল, বাড়ী ফিরি।"

"এর মধ্যে?"

"না, রাত অনেক হয়ে গেছে বই কি, তা ছাড়া আকাশটায় কেমন মেঘ মেঘ করছে, দেখছো না?"

বাস্তবিকই ভবেশ তাহা দেখে নাই। চোখ তুলিয়া সেই দিকে চাহিয়া দেখিয়া সে বলিল, "ও কিছু না," বলিয়াই পুনশ্চ গানের দিকেই মন ফিরাইল,—

"ঘাটে ঘাটে ঘুরবো না আর ভাসিয়ে আমার জীর্ণতরী,
রূপ-সাগরে ডুব দিয়েছি, অরূপ-রতন আশা করি।"

"ভবেশ!"

"আজ্ঞে!"

"আমার আর এখানে ভাল লাগছে না, ভবেশ! বাড়ী ফিরি, এস।"

"আচ্ছা"—বলিয়া বেহালা নামাইয়া রাখিয়া ভবেশ এবার দাঁড় তুলিয়া লইল। সেই স্তব্ধ, নিঃশব্দ, নিস্তরঙ্গ নদীজলে ছপাৎ করিয়া দাঁড়পড়ার শব্দে মহেশানন্দ হঠাৎ ভয়ানকভাবে চমকাইয়া উঠিলেন—

"ভবেশ!"

"আজ্ঞে।"

"ওঃ, না, কিছু না।"—একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস মহেশানন্দের নাসাপথে বাহির হইয়া গেল। তিনি অন্যমনস্ক হইয়া একবার আকাশ ও একবার নদীবক্ষে চাহিয়া দেখিলেন। আকাশের জমা মেঘ খণ্ডিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে অতি গভীর নীল আকাশে নূতন-কাটা হীরার মতই সমুজ্জ্বলতর নক্ষত্রসমূহ দেখা যাইতেছে। কোন সময়ে চাঁদের উপরকার ঢাকনাখানাও হঠাৎ খসিয়া পড়িতেছিল। বর্ষায় পরিপূর্ণ স্ফীতবক্ষ নদীর জলকে যেন জলের অপেক্ষা আর কিছু মনে হইতেছিল,—যেন তেলের নদী। নদীর ধারের সেই অশ্বত্থ, বট, পাকুড় ও নিমগাছের সারি এখনও তেমনই স্তব্ধ। মনে হইতেছিল, যেন উহারা কাহারও মৃত্যু-গৃহের দ্বারের কাছে রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করিতেছে।

"ভবেশ! আজ যেন কিছু ভাল লাগল না, কেবলই মনে হচ্ছে যেন",—মহেশানন্দ নীরব হইলেন।—ঠিক যে কি তাঁহার মনে হইতেছিল—তাহা প্রকাশ করিয়া বলাও দুঃসাধ্য! যেহেতু, তেমন সুস্পষ্ট করিয়া কিছুই ত মনেও হয় নাই। এ যে একটা ভিত্তিহীন কারণ-নির্দ্দেশশূন্য অতি অস্পষ্ট ভয়! ইহার ত কোথাও কোন মূল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না! অতি অজ্ঞ শিশু যে ভয়ে অন্ধকার সহিতে পারে না, এই বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ বৃদ্ধেরও এ যে সেই একই প্রকারের অসহিষ্ণুতা।

ক্ষণকাল নীরবে গুরুর বাক্যসমাপ্তি প্রতীক্ষা করিয়া থাকিয়া শেষে তাঁহাকে একবারেই বাক্য-বিমুখ দেখিয়া অবশেষে তরণী বাহিতে বাহিতে ভবেশ মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "কি মনে হচ্ছে বলছিলেন?"

মেঘ তখন প্রায় কাটিয়া আসিয়াছে। নূতন মাজা-সোনার থালার মত চাঁদকে অতি উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে আবার দেখা গিয়াছে। চন্দ্রকরে নদীর সেই তৈলাক্ত-মলিনীকৃত কুশ্রীতা ঘুচিয়া আসিয়া এখন আবার তাহার স্বাভাবিক শ্রীটি প্রকাশ পাইয়াছে। রজতময় জ্যোৎস্নার জালে আবার সমস্ত ঘুমন্ত প্রকৃতি ধীরে ধীরে বাঁধা পড়িতেছেন।

সেই দিকে চাহিয়া থাকিয়া গুরু কহিলেন, "মনে হচ্ছে, আজ যেন কি একটা ঘটবে। কি যেন গভীর রহস্যময়, কোন কিছু!"

তাহার পর একটুখানি থামিয়া পুনশ্চ কহিলেন, "কিন্তু ও ভাবটা এখন যেন ক'মে আসছে। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের মনের কি নিবিড় যোগ দেখ দেখি! এতক্ষণ কেবলই মনে হচ্ছিল, আজ রাত্রিতে কি যেন আমার একটা খোয়া যাবে।"

পুনশ্চ হাসিয়া কহিলেন, "অথচ আমার আছেই বা কি?"

ভবেশ চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া উৎফুল্ল স্মিতহাস্যে তাহার দ্বিতীয় চাঁদের মতই সুন্দর মুখখানাকে উদ্ভাসিত

করিয়া তুলিয়া হাসিয়া কহিল, "আপনার এই অমূল্যনিধিই হয় ত হারাবেন, মনে হচ্ছিল!"

"ভবেশ! ভবেশ! ওঃ—"এমনই একটা মর্ম্মার্ত্ত কাতরকণ্ঠে হঠাৎ মহেশানন্দ এই আর্ত্তরব করিয়া উঠিলেন; বোধ হইল, যেন ভবেশ কোন শব্দভেদী তীক্ষ্ণ শর তাঁহার বুকের উপরেই ছুড়িয়া মারিয়াছে। ভবেশের স্মিতমুখ এই শব্দে আশঙ্কাপীড়িত হইয়া উঠিল, সে ত্রস্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিতে গেল, "কি হ'ল! ব্যথা ধরল কি? না বিছে-টিছে কামড়াল"—

কিন্তু এইটুকু বলিতে বলিতে সে যে একটানা স্রোতের বিপরীতে দাঁড় টানা ছাড়িয়া উঠিয়াছে, ইহা ভুলিয়া যেমন ত্রস্তভাবে মহেশানন্দের দিকে অগ্রসর হইতে গেল, অমনই সহসা পাক খাইয়া-ঘুরিয়া-পড়া নৌকায় দাঁড়াইয়া সে টাল সামলাইতে পারিল না। নৌকাখানাও এক পাশের ভারে হেলিয়া পড়ায় সে-ও সেই সঙ্গে ঝুপ করিয়া জলের মধ্যে পড়িয়া গেল।

সঙ্গে সঙ্গে একটা বুক-ফাটিয়া-পড়া আর্ত্তনাদের সহিত বৃদ্ধ, অসুস্থ মহেশানন্দ হাহাকার শব্দে সেই নৈশ-নীরবতায় ভরা প্রকৃতির সুপ্তবক্ষকে চিরিয়া দিয়া নিজেও নদীবক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

৬

ভবেশকে পাওয়া গেল। সাঁতার না জানিলেও তাহার হাল্কা লঘুদেহ জলে পড়িয়া তলাইয়া যায় নাই এবং সন্তরণ-বিদ্যায় অসাধারণ শিক্ষিত মহেশানন্দের সাহায্য এত শীঘ্র পাইয়া, সে কোনমতে নিজেকে তাঁহার হাতে তুলিয়া দিতে পারিয়াছিল, কিন্তু যেমনই তিনি তাহাকে "ভবেশ!" বলিয়া টানিয়া লইলেন, অমনই গভীর শ্রান্তি ও আসন্ন মরণের অনিবার্য্য নিষ্ঠুর আতঙ্ক তাহার শেষ চৈতন্যটুকুকে সম্পূর্ণ-রূপেই আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সে মহেশানন্দের পিঠের উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

জল সেখানে বেশী ছিল না। বর্ষাকাল ব্যতীত অন্য অন্য সময়ে নদীর এ যায়গাটা হাঁটিয়া পার হওয়া যায়। বৃদ্ধ অশক্ত মহেশানন্দের শরীরে সে দিন কি আসুরিক শক্তির, অথবা দৈববলের সমাবেশ হইয়াছিল! ধীরে ধীরে সাঁতার দিয়া অতি কষ্টে অবশেষে তীরে আসিয়া পৌছিলেন। পিঠের উপর ভবেশের মূর্চ্ছিত দেহ।

যতক্ষণ জলের মধ্যে ছিলেন, যথেষ্ট কষ্টকর হইলেও ভবেশকে বহন করা মহেশানন্দের পক্ষে অসাধ্য ছিল না, কিন্তু এইবার তাহা অসম্ভব হইয়া উঠিল। নিজের এই শ্রম-শ্রান্ত আর্দ্র দেহটাকে টানিয়া তুলা তার মনে হইতেছে, তাহার উপর এই মূর্চ্ছাবসন্ন নবীনকে এই পঞ্চাশোর্দ্ধ প্রবীণ বহন করিয়া তীর ভাঙ্গিয়া বাড়ী লইয়া যাইবে, সে এক-বারেই অসম্ভব! কোনমতে তাহাকে নদীতীরের উপর কাশবনের তলায় শোয়াইয়া দিয়া, নিজেও তিনি শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় মাটীর উপর লুটাইয়া পড়িলেন।

প্রথমতঃ জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া মহেশানন্দ ভবেশের কোন চিহ্নই খুঁজিয়া পান নাই। বর্ষার নদীতে টানও বেশ বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার তখনকার সেই মনের অবস্থা সর্ব্বান্তর্যামী ভিন্ন অপর কেহই বুঝিতে পারিবে না। সে হয় ত সময়ের পরিমাপের হিসাবে বড় বেশী সময় নহে, কিন্তু সেই কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই মহেশানন্দের ভীত অন্তরাত্মা যে ভীষণ যন্ত্রণা অনুভব করিল, তাহা অবর্ণনীয়। ভগবান্! এই জন্যই কি—প্রথম জীবনে যাহা হারাইয়া সুখহীন শান্তিহীন নিরানন্দচিত্তে সর্ব্বত্যাগী হইয়া পলাইয়া আসিয়া-ছিলেন, তাহার সেই অনাস্বাদিত অতৃপ্ত সংসার-সুখের সকল আনন্দটুকুর একটি কণা ফিরাইয়া দিতে ইহাকে তাঁহার কাছে আনিয়া দিয়াছিলে? উঃ, এই সমস্ত জীবন ধরিয়া যে আগুনে দগ্ধ হইয়া হইয়া সহসা এত দিনে প্রায়শ্চিত্ত-শেষের শান্তিজলের মতই যাহাকে পাইয়া একটুখানি শীতল হইয়াছিলেন, সেই তাহার সহস্র গুণ জ্বালা বাড়াইবার জন্য?

ও ভবেশ!—ও ভবেশ!—এই করিতে তুমি আসিয়া-ছিলে?

এই ক্ষুদ্র মুহূর্ত্ত কয়টির মধ্যে মহেশানন্দের সাত বৎসরের আয়ুক্ষয় হইয়া গেল। অবশেষে বহু চেষ্টায় ভবেশকে পাওয়া গেল। ধন্য ভগবান্! তাঁহাকে তাহা হইলে তাঁহার একমাত্র প্রিয়তমের মৃত্যুর কারণ হইতে হয় নাই!

তীরে আসিয়া চেতন এবং অচেতন উভয়েই প্রায় সমাবস্থাপন্ন হইয়া পড়িল। আর ত শরীরে এতটুকু সামর্থ্য নাই, যাহার দ্বারা এই সবল সুস্থ তরুণের অচৈতন্য দেহ বহন করিয়া লইয়া যাওয়া যায়। কাহাকে ডাকিয়া আনি-বার জন্যও হাতে পায়ে কিছু বল থাকা চাই, তাহাও আর

নাই। অগত্যা কিছুক্ষণের জন্য মহেশানন্দ সর্ব্বপ্রকার শরীর-মনের চেষ্টারহিত হইয়া পড়িলেন।

মনে হয়, সে-ও যেন একটা যুগ! কোন কিছু করিবার সামর্থ্যমাত্র নাই, অথচ সহসা মনে হইল, ভবেশ হয় ত এতক্ষণ আর বাঁচিয়া নাই! অমনই কোথা হইতে সেই অবসন্ন অসমর্থ শরীরে প্রবল শক্তি ফিরিয়া আসিল। অতি কষ্টে টানিয়া লইয়া কোনমতে তিনি তাহাকে নদীর উপরেই মঠের বাগানে তুলিয়া আনিলেন। তখন রাত্রি দেড় প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। চরাচর সুপ্তি-মগ্ন, কেবল মনিবের প্রত্যাগমন-প্রতীক্ষায় ঘাট-দেউড়ীর চৌকিদারটা ফটকের পাশের কুঠরীতে চারপাইয়ের উপর শুইয়া শুইয়া তুলসীদাস আবৃত্তি করিতেছিল,—

> "সীতাপতি রামচন্দ্র রঘুবর রঘুরায়ী
> রসনা রস নাম লেত, সন্তানকো দরশ দেত,—
> ঈষৎ মুখচন্দ্র মন্দ্র সুন্দর সুখদায়ী"—

অর্দ্ধস্ফুট স্খলিত বাক্যে অদূর হইতে কে যেন ডাকিল, "মিশির!"

স্বর অনেকটা মহারাজ-জীর মত, তবে সম্পূর্ণ নহে. এত রাত্রিতে উঁহারা ভিন্ন আর কেই বা এখন ডাকিতে আসিবে? বিশেষ মহারাজ তো তাহাকে ডাকেন না, ফটক বন্ধ করিয়া আলো দেখাইবার জন্য ভবেশই তাহাকে আহ্বান করে, সে বলে, "মিশিরজী!"

কাযেই মিশ্র ঠাকুর তাহার ভজনগানেই মজিয়া রহিল, উত্তর দিল না;

> "মতিয়ন্‌কে কণ্ঠমাল, তারাগণ অতি বিশাল,
> হরষে নিরখ তুলসীদাস, চরণ-রজ-পায়ী।"

"মিশির— !"

নাঃ! আজ নিশ্চয়ই কিছু উল্টা রকম ঘটিয়াছে! এ কণ্ঠ তাহার মনিবেরই বটে। ভবেশের অসাড় অস্পন্দ দেহ মিশিরের সাহায্যে ঘরের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়া, মিশিরকে খানিকটা আগুন করিতে আদেশ দিয়া, মহেশানন্দ প্রথমেই ভবেশের ভিজা কাপড় জামা ছাড়াইবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার ঘরের পাশেই ভবেশের শয়নাগার। নিজেই তথা হইতে উহার একটা গেরুয়া আলখেল্লা লইয়া আসিয়া পরিহিতটাকে খুলিয়া ফেলিবার জন্য চেষ্টা করিতে করিতে দেখিলেন, ভবেশের এতক্ষণকার নিস্পন্দ শরীরে এইবার স্পন্দন ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহার শীত-শীর্ণ ঠোঁট দু'খানি বাতাস-লাগা ফুলের পাপড়ীর মত মৃদু মৃদু কম্পিত হইতেছে, সে যেন সজোরে একটা নিশ্বাস ফেলিল। একটা গভীর আনন্দের উচ্ছ্বাস-লহরী মহেশানন্দের ভয়ার্ত্ত চিত্ত-প্রাণকে একবারে প্লাবিত করিয়া দিয়া বহিয়া গেল। তিনি গভীর স্নেহে উন্মত্তের মতই সেই অর্দ্ধচেতন নরদেহ নিজের বুক দিয়া সবলে আলিঙ্গন করিয়া ধরিলেন, বিপুল সুখে তাঁহার মুখ দিয়া বহির্গত হইল,—

"ভবেশ! ভবেশ! আমার ভবেশানন্দ! আমার পুত্র! আমার শিষ্য! আমার সর্ব্বস্ব ধন!"

ভবেশের হৃতচৈতন্য প্রত্যাবৃত্ত হইতেছে। শীতে সে কাঁপিতেছিল। তাড়াতাড়ি আত্ম-সংবৃত হইয়া মহেশানন্দ তাহার গায়ের ভিজা কাপড়টা টানিয়া খুলিয়া দিলেন। শুষ্ক বস্ত্র প্রথমে সর্ব্বাঙ্গে জড়াইয়া লইয়া তাহর পর সেটা ভাল করিয়া পরাইয়া দিতে গিয়া সহসা তিনি চমকিয়া উঠিলেন,— "মহাদেব!"—

অত্যন্ত আহত না হইলে মানুষের কণ্ঠে কখন এরূপ স্বর বাহির হয় না।

ক্ষণকাল বজ্রাহতবৎ স্তম্ভিত থাকিয়া,অতি কষ্টে নিজেকে মৃত্তিকার গ্রাস হইতে ছিন্ন করিয়া লইয়া, মহেশানন্দ প্রশস্ত ঘরটার শেষ পর্য্যন্ত একবার পরিক্রমণ করিয়া পুনশ্চ পূর্ব্ব-স্থানে ফিরিয়া আসিলেন। "না, তাঁহার ভুল হয় নাই! তিনি পাগল হন নাই! ইহা স্বপ্নও নহে! এই সেই ভবেশ! তাঁহার ভবিষ্যৎ আশার ভবেশানন্দ! তাঁহার চক্ষুর সমক্ষেই এই-ই আজ জলে ডুবিয়া গিয়াছিল। তিনিই ইহাকে নিজের প্রাণ-সংশয় করিয়া জলমধ্য হইতে টানিয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু এ কি?"

আবার তাঁহার কণ্ঠ চিরিয়া বিদীর্ণ হৃদয়ের একটি ঝলক রক্তের মতই বাহির হইয়া আসিল,—

"মহাদেব!"

এ কি হইল? তাঁহার সকল আশাই চূর্ণ হইয়া ধূলি-ধূসরিত হইয়া গেল! তাঁহার জীবনের সুখস্বপ্ন জন্মের মতই টুটিয়া গেল? তাঁহার নূতন-গড়া এই ভাঙ্গা প্রাণকে পুনশ্চ দ্বিগুণ বলে চুরমার করিয়া দিয়া তাঁহার অন্তরের অ-নির্ব্বাণ আগুনের স্মৃতিকে শুধু উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিল! এ কে

এ ?—এ কে এ ? কেন সে তাঁহার সঙ্গে অনর্থক এত বড় শত্রুতা করিতে আসিল ?

মহেশানন্দ অবশের মতই সেই প্রতিক্ষণে ফিরিয়া আসা নূতন জীবনের স্পন্দনে চঞ্চল, তাঁহারই প্রিয়—প্রিয়তর, প্রিয়তমের দেহের পাশেই বাণ-বিদ্ধ কুরঙ্গের মত লুটাইয়া পড়িলেন।

তাঁহার সেই বহু পুরাতন ভগ্ন মন্দিরের চূর্ণ করা দেবতার বিকৃত প্রতিমার আবার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া, এই দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর পরে কে আজ তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত করিল ? এ কায কেন করিল ? ওরে, কেন করিল রে! এ যে বড় জ্বালার অসহ্য স্মৃতি! অনেক করিয়া ইহাকে একটুখানি মাত্র চাপা দেওয়া গিয়াছিল, আবার সেই নির্ব্বাপিতপ্রায় আগুনের কুণ্ডে ঘৃতাহুতি কেন দিল ?

আবার অতি কষ্টে উঠিয়া বসিয়া মহেশানন্দ সম্মোহন-মন্ত্রবশীভূতের মতই সেই একদা পবিত্রতর প্রেমাস্পদতমের এবং পরে তাহারই অপবিত্রতর এবং ধিক্কারের সহিত পরিত্যক্তের সহিত ঠিক একই প্রকার মূর্ত্তি ধরিয়া যে আজ তাঁহারই শয্যাতলে লীন রহিয়াছে,—তাহারই দিকে আকৃষ্ট চোখে চাহিয়া রহিলেন। ওঃ, ওঃ—সেই সব! সেই সব! এত বড় দীর্ঘকালটা কি এর কাছেও ঘেঁষিতে পারে নাই ?

ভবেশের শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রমেই স্বাভাবিক হইয়া আসিয়াছিল, এইবার সে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাশ ফিরিয়া শুইতে গেলে মহেশানন্দের বিস্ফারিত আর্ত্ত দৃষ্টির সহিত তাহার উৎসুক দৃষ্টি সম্মিলিত হইল। ইহাতে প্রথমটা ভবেশের ক্লান্তিবিবর্ণ মুখ-চোখ একটা গূঢ় আনন্দের আভায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে গেল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাহার সম্মুখস্থ দৃষ্টির সহিত পুনর্মিলিতদৃষ্টি হইয়াই তাহার সেই—সেই সুখস্মিতমুখ একটা উৎকট সঙ্কোচে শুষ্ক ও ম্লান হইয়া পড়িল, তাহার লজ্জিত দৃষ্টি স্বতঃই আনত হইয়া আসিল। সে তখন কোনমতে নিজের গায়ের উপর কাপড় টানিয়া দিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল। সেই মুহূর্ত্তেই সে-ও বুঝিয়াছিল যে,তাহার সব ফুরাইয়াছে! এই যে পাথরের মত কঠিন চোখ তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছে, ইহার পর আর কি কখন এই চোখে সে তাহার সেই পূর্ব্বকার মত স্নেহে-গলানো, মমতা-মাখানো গভীর বাৎসল্যের রসে ভরা কোমল মধুর দৃষ্টি দেখিতে পাইবে! দুঃখে, লজ্জায়, অভিমানে বুক তাহার বিদীর্ণ হইয়া গেল। ওঃ, আজ যদি সে আর—সেই তাহার সলিল-সমাধি হইতে না উঠিত!

মহেশানন্দ গভীর বলে আত্মস্থ হইয়া উঠিয়া বসিয়া ধীর কণ্ঠে কহিলেন,—

"ভিজে কাপড়গুলো ছেড়ে ফেল, মিশির আগুন আনছে, হাত-পাগুলো গরম ক'রে নাও।—কিছু খাবে কি ?"

ভবেশ শুধু মাথা নাড়িয়া তাহার আহারে অনিচ্ছার কথাটা জানাইয়া দিল। ইহারই মধ্যে মহেশানন্দের কণ্ঠে কি নির্লিপ্ত স্নেহহীনতার পরিচয় ফুটিয়া বাহির হইতেছিল! তাহার দুইটি চোখ ঠেলিয়া জলের উৎস উৎসারিত হইবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিল।

মহেশানন্দ ধীরে ধীরে পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন—প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে ঠাকুরবাড়ীর পেটা ঘড়ীতে এবং দরবার-ঘরের বড় ঘড়ীতে যখন রাত বারোটার ঘোষণা চলিতেছিল, তখন মহেশানন্দ এ ঘরে আবার ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, মিশির অগ্নিকুণ্ড লইয়া চলিয়া গিয়াছে, ভবেশ তাহার দুই বৎসরের পরিচিত মূর্ত্তি লইয়াই তাঁহার বিছানার নীচের খালি জমীতে নতমুখে স্থির হইয়া বসিয়া আছে। ল্যাম্পের আলোয় তাহার সেই অস্বাভাবিক শ্বেতবর্ণ মুখে, অংসবিলম্বী কুঞ্চিত অলকে, রক্তহীন অধরোষ্ঠে, দুঃখার্ত্ত সলজ্জদৃষ্টিতে তাহার সেই কমনীয় রূপ যেন শতগুণে বর্দ্ধিত ও চিত্তহারী হইয়া উঠিয়াছে। তাহার প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই মহেশানন্দের বুকের ভিতরটা সবেগে দুলিয়া উঠিল, যত্নে বাঁধা হৃদয় একবারে গভীর বেগে বিচলিত হইয়া উঠিল।

উহার সম্মুখ হইতে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া থাকিয়া, আপনাকে কিছু কঠিন করিয়া লইয়া, তিনি একটুখানি পরে কথা কহিলেন। বলিলেন,—

"তুমি কিরণের মেয়ে, না ?"

ভবেশ মুখ তুলিয়া তড়িৎস্পৃষ্টের মতই চমকিয়া তাহার বিচারকের মুখের দিকে চাহিল,—

"আপনি আমায় কি ক'রে চিনলেন ?"

মহেশানন্দ এ কথার আর উত্তর দিলেন না, তবে তাঁহার গলার কাছে কি যেন একটা ঠেলিয়া উঠিল মাত্র। তাহার পর আবার একটুখানি সময় গত হইলে পুনশ্চ কথা কহিলেন,—

"এমন ক'রে আসার মানে ?"

জিজ্ঞাসিতও এইবার দুই তিন বারের চেষ্টার পর হঠাৎ সাহস-ভরে বলিয়া ফেলিল,—

"এমন ক'রে না এলে কি আস্‌তে দিতেন ? অথচ না এলেও আমার ত আর দ্বিতীয় আশ্রয় ছিল না।"

মহেশানন্দ বলিলেন, "কেন,—তোমার মা ?"

মেয়েটি তাহার লজ্জাভরা দৃষ্টি আরও বেশী করিয়া নামাইয়া মৃদুকণ্ঠে জবাব দিল,—

"মা ত বেঁচে নেই।"

"আঃ!"—বলিয়া মহেশানন্দ এমনই একটা তৃপ্তি প্রকাশ করিলেন, যাহাতে ঐ তরুণী অপরাধিনীটি হঠাৎ কাঁপিয়া উঠিল।

"কবে গেলেন ?"

"তাঁহার শেষকৃত্য সম্পন্ন করেই আমি এখানে চ'লে এসেছিলেম।"

"ওঃ! আমার পরিচয় পেলে কোথায় ? কেমন ক'রে জান্‌লে, আমি তোমার—আমি তোমার—"

মহেশানন্দ কথাটা শেষ না করিয়া থামিয়া গেলেও ঐ মেয়েটি তাঁহার ঐ অসমাপ্ত পদটির পূরণ সাগ্রহেই করিয়া দিল—"আমার বাবা ? মা-ই আমায় এ কথা বলেছিলেন। তাঁহার জীবিতাবস্থাতেও কতবার আমাদের মধ্যে এ কথা হয়ে গেছলো। আমি আমার জ্ঞান হবার পর থেকেই এখানে চ'লে আস্‌তে চেয়েছি। মা'র শুধু ভরসা হয় নি, বলেছিলেন, আমি এলে আপনি আমাকে ঢুকতে দেবেন না। তাই ভয়ে আসিনি। কিন্তু যখন আমার সবই গেল, আমার কোলের ছেলে কেড়ে নিয়ে আমার স্বামী জন্মের মতই আমায় বিদায় দিলেন, সেই শোক সইতে না পেরে মাও এক মাসের মধ্যে মারা গেলেন। আমার তিন মাসের শিশু মা-ছাড়া হয়ে দুরন্ত লিবারে ভুগে মারা গেল। সে খবর শুনে আমি আর থাকৃতে পারলুম না। জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে বেরিয়ে পড়লেম। শুধু তার মধ্যে এইটুকু হুঁষ আমার ছিল যে, আমি যা, তা আমার প্রকাশ করবার পথ নেই। তাই এই ছদ্মবেশ! এ কি একেবারেই আপনার ক্ষমার অযোগ্য ?"

মহেশানন্দের কঠিন দৃষ্টি কখন্ কোন্ সময় কেমন করিয়া শীতল হইয়া আসিয়াছিল, অথচ তখনও সবটুকু উত্তাপ তাঁহার মন হইতে নিঃশেষ হইয়া যায় নাই। তিনি ঈষৎ রূঢ়কণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন, "কিন্তু তুমি ত সেই বিশ্বাসঘাতিনী কিরণেরই মেয়ে—যাকে আমি নিজের বুকের রক্তের চেয়েও বেশী ভালবাসতেম, আর যে আমার সেই বুকের রক্তকে তার তীব্র গরল দিয়ে বিষাক্ত ক'রে দিয়েছিল! আমার প্রথম জীবনের সুখস্বপ্নকে নির্দ্দয় আঘাতে চূর্ণ ক'রে দিয়ে আমায় যে ঘরছাড়া সর্ব্বহারা পথের ভিখারী করেছিল, তারই গর্ভে তোমার জন্ম, সে কি আমার ভুলে যাবার ?"

এইবার এই তিরস্কৃতা মেয়েটি একবারে ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল,—"তার জন্য কি আমি দায়ী ? যেমন তাঁর, তেমনই আপনারও ত মেয়ে আমি। আমায় আপনারা দুজনেই ফেলে গেলেন, পাঁচ জনের দয়ায় বড় হয়ে রূপের জোরে বড়লোকের বাড়ীর বউ হয়েছিলুম, সেখানেও এই মায়ের কলঙ্ক আমায় আপনার মতই ঘরছাড়া সর্ব্বহারা ক'রে ঠেলে পথে বার ক'রে দিলে। মা মধ্যে মধ্যে খোঁজখবর নিতেন, খেতে না পেয়ে যাতে ম'রে না যাই, সেটাও দেখতেন, ভাল হোক মন্দ হোক, তবু ত সে মা,—সে-ও গেল! যদিও কোন দিনই তাঁকে আমি শ্রদ্ধা করতে পারিনি, ভালও বড় বাসিনি, নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য, দেখা হ'লে অভিশাপই দিয়েছি, তবুও তাঁর দুর্ভাগ্যের জন্য লুকিয়ে লুকিয়ে কেঁদেছি বই কি! কিন্তু আপনি আমায় কি অপরাধে ত্যাগ করেছিলেন ? আর আজও করতে চান ? আমার মা'র পাপে কি আমি পাপী ? আর তা হ'লে এখানেই বা আমি আস্‌বো কেন ? বলতে চান, আপনার উপর আমার কোন দাবী নেই ? আমি আপনার কেউ না ?"

মেয়েটি সহসা মহেশানন্দের পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল, কিছুতেই তাহার সে কান্না যেন শেষ হয় না।—"স্বামী না হয় পর, আমার দুঃখ তিনি বুঝলেন না, কিন্তু আপনি ত আমার বাপ—আমার সব চেয়ে এ পৃথিবীতে বেশী ভরসা আপনার! আপনিই বলুন, আমি এখন কোথায় যাব ? আমার এই ত রূপ, এই ছাব্বিশ বৎসর বয়স,—কে আমায় দেখবে ?"

মহেশানন্দের চোখের দৃষ্টি বিপর্য্যস্ত এবং ক্রমে অস্পষ্ট ও ঝাপ্‌সা হইয়া আসিতেছিল, এইবার তাহা হইতে বড় বড় দুইটি অশ্রুবিন্দু তাঁহার শুষ্ক গণ্ড দিয়া গড়াইয়া পড়িল,—"তোমার নামটা কি ছিল ?—অর্চ্চনা না ?"

"হাঁা—"

"অর্চ্চনা !"

"বাবা !"—বলিয়া অর্চ্চনা তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল।

মহেশানন্দ একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন করিলেন।

"তা হ'লে চল, আমরা দুজনে কাশী কি হরিদ্বার, না হয় ত হৃষীকেশের কোন একটা একান্ত স্থানে, না হয় আরও নির্জ্জনে গিয়ে বাস করি গে। তোমায় নিয়ে এখানে থাকা ত আর যায় না।"

অর্চ্চনা নীরব রহিল। তাহার চোখের জল তখন ধারা-শেষে বিন্দুরূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল।

মহেশানন্দের হয় ত তখনও ভবেশানন্দের শোক মন হইতে সম্পূর্ণরূপে অপগত হইয়া যাইতে পারে নাই। তিনি আবার আর একটা তেমনই দীর্ঘশ্বাস ছাড়িলেন, তাহার পর ক্ষণকাল নীরব থাকার পর বলিলেন,—"কালই মহেশ্বরানন্দের অভিষেকের ব্যবস্থা ক'রে ফেল্‌তে হবে। কিন্তু ভবেশ! না, অর্চ্চনা! না, না, ভবেশই! তুমি আজ থেকে চিরদিন আমার ভবেশ হয়েই থাকবে! কিরণের মেয়েকে আমি ভুলেই গেছি। অনেক কষ্ট পেয়ে শেষকালে সে সব আমার প্রায় চাপা প'ড়ে গেছে। আর কেন সে সব টেনে তোলা? ভবেশ! তোমায় আমি ভুলতে পারবো না! তুমি আমার এই পোড়া বুকে একমাত্র শান্তির প্রলেপ। উঠে এস, মা! না, না, না, বাবা! তুমি আর অমন ক'রে থেকো না, এস, উঠে আমার কাছে এস! আজ থেকে মৃত্যু-মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তুমিই আমার ভবেশ! তোমার হাতে আমি নিজেকে সঁপে দিলুম।"

শ্রীসত্যেন্দ্রপ্রসাদ দেবী [signature]

কেন

কি কার্য্যসাধন তরে পাঠাইলে এ সংসারে
মোরে ভগবান্,
যদি ব্যথিতের দুঃখে ব্যথা না বাজিল বুকে
কেন দিলে প্রাণ?
যদি শোকার্ত্তে সান্ত্বনা দিতে অগ্রসর নাহি হ'ল
কেন দিলে মন?
যদি সুধামাখা হরিনাম দিবানিশি না শুনিল
কেন এ শ্রবণ?
যদি কর্ত্তব্যে অলস হই কেন তবে বহি নিত্য
অকারণ বল,
যদি পরের সৌভাগ্য হেরি ঈর্ষ্যায় জ্বলিয়া মরি
নয়ন (?) বিফল।
'সত্য' 'ধর্ম্ম' 'আত্মত্যাগ' বুঝিতে নারিনু যদি
জ্ঞানে প্রয়োজন?
স্বার্থের মন্দিরে যদি আত্মবলিদান করি
বৃথা এ জীবন
আমার আমার করি দিবানিশি ঘুরে মরি
আমি কে আমার,
ভাবিনে তা একবার (ও) দাও প্রভু দাও আরও
বলি বার বার;

বাকি কি রেখেছ তুমি না চাহিতে অন্তর্য্যামী
দিয়েছ ত সব;
যতই দিতেছ তত বাড়িতেছে অবিরত
'দেহি' 'দেহি' রব।

বাসনার শেষ নাই এক পাই আর চাই
আশার অবধি কোথা আছে,
দাও সুখ শান্তিধন দাও প্রিয় পরিজন
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ দিও পাছে।

অতীতে দিয়েছ শত বর্ত্তমানে দিতেছ ত
ভবিষ্যৎ তরে চেয়ে রাখি,
কিন্তু তবু প্রাণারাম তোমার মধুর নাম
স্বার্থ ত্যজি ভুলেও না ডাকি।

ভিখারীর স্বভাবই ত তাই
যত পাই আরও তত চাই
এত যদি দিলে দান দয়াময় ভগবান্
আরও কিছু দাও;
পরার্থে না পারি যদি আত্মবিসর্জ্জন দিতে
প্রাণ ফিরে নাও।

৺ইন্দিরা দেবী।

১

পঞ্জাব মেল ঝড়ের বেগে উড়িয়া চলিয়াছে। চারিদিকে রজনীর ঘোর অন্ধকার, প্রকৃতি নীরব নিথর, কেবল এঞ্জিনের হুস হুস আর গাড়ীর গুরুগম্ভীর গুম গুম শব্দ নৈশ প্রকৃতির নীরবতা ভেদ করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল।

প্রথম শ্রেণীর একখানি কামরার দুই পার্শ্বে দুইটি প্রাণী আপাদ-মস্তক মুড়ি দিয়া ঘুমাইতেছিল। উপরে বৈদ্যুতিক আলোকাধার রঙ্গীন আবরণে আচ্ছাদিত ছিল, তাই তাহা হইতে স্নিগ্ধ মৃদু আলোকরশ্মি নির্গত হইতেছিল।

একখানা মালগাড়ী বিকট ঘর্ঘর রবে বিপরীত দিকে চলিয়া গেল। বোধ হয়, তাহারই আওয়াজে নিদ্রিতদের মধ্যে অন্যতমের নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে কিছুক্ষণ চক্ষু উন্মীলিত করিয়া সম্মুখের বার্থে নিদ্রিত মূর্ত্তির দিকে তাকাইয়া রহিল, তাহার পর হঠাৎ সেই বার্থের উপরিস্থ বাঙ্কের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতেই বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিল।

প্রথমে সে দুই হস্তে ভাল করিয়া দুইটি চক্ষু রগড়াইয়া লইল, তাহার পর আবার বাঙ্কের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার দৃষ্টি এবার কেবল বিস্ময় প্রকাশ করিল না, ভয় ও ক্রোধ যেন তাহার সহিত মিশিয়াছিল, সে যেন দৃষ্টিকে প্রত্যয় করিতে পারিতেছিল না।

সে মৃদুস্বরে ডাকিল, 'রাধি, রাধি!'

কেহ সাড়া দিল না, অপর বার্থে নিদ্রিত অকাতরে ঘুমাইতেছিল। তখন অগত্যা সে উঠিয়া অতি সন্তর্পণে নিদ্রিত মূর্ত্তির নিকটস্থ হইয়া তাহাকে স্পর্শ করিয়া ডাকিল, "রাধি, ও রাধি! মরণ! ম'রে ঘুমুচ্ছিস্ না কি?"

নিদ্রিত মূর্ত্তিও তাহার মত ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিয়া তাহাকে একরূপ জড়াইয়া ধরিয়া ভীতিবিহ্বল কণ্ঠে বলিল, "এ্যাঁ! কি কি? কি হয়েছে, লীলু?"

'লীলু' নামে সম্বোধিতা নারী বলিল, "তোর ওপরে, ঐ বাঙ্কে কে রয়েছে দেখছিস্?"

'রাধির' তখনও ভয় ভাঙ্গে নাই, তাহার চক্ষুও তন্দ্রাভারক্লিষ্ট, সে অস্ফুট আতঙ্ক-জড়িত স্বরে বলিল, "কে? কোথায়?"

'লীলু' ব্যঙ্গের স্বরে বলিল, "কে? তোর বর—ঐ দেখ!'

'উপরে দৃষ্টিপাত করিয়াই 'রাধি' আতঙ্কে 'লীলুকে' আরও নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া অস্ফুট ভীতিব্যঞ্জক স্বরে বলিল, "মা গো!"

"নে, এখন নেকামি রাখ! আয়, আমরা ওদিকের বেঞ্চিটায় বসি গে যাই। ফিরিঙ্গীটার কি সাহস, মেয়ে-গাড়ীতে এসে উঠেছে!"

"কি হবে লীলু?"

"হবে আবার কি? দেখ না, ওর মেয়ে-গাড়ীতে ওঠা বার করছি! চেনটা টানলেই গাড়ী থামবে।"

কথাটা বলিয়া 'লীলু' শিকল টানিতে হাত বাড়াইল, কিন্তু ঠিক সেই সময়ে যাহাকে লইয়া এই কাণ্ড হইতেছিল, সেই 'ফিরিঙ্গীটা' বাঙ্কের উপর উঠিয়া বসিল এবং নিম্নের অপর পার্শ্বস্থ বেঞ্চে দুইটি এ দেশীয় তরুণীকে দেখিয়া একবারে স্তম্ভিত হইয়া একদৃষ্টে তাহাদের দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহাকে উঠিতে দেখিয়া 'লীলুর' উদ্যত হস্তও 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থায় শূন্যপথে উত্থিত হইয়া রহিল। ফিরিঙ্গীটাও মুহূর্ত্তমধ্যে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া মাথার নাইট-ক্যাপটা খুলিয়া ফেলিয়া এক লম্ফে মেঝের উপর অবতীর্ণ হইল। সে কোট-প্যাণ্ট, জুতা-টুপী পরিয়াই বেডিংটা মাথায় দিয়াছিল, তাহার সুটকেশ ও অন্যান্য আসবাবপত্র মেঝের উপর বিস্তৃত ছিল।

তাহাকে নামিতে দেখিয়া 'লীলু' নামে সম্বোধিতা যুবতী বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া বিশুদ্ধ ইংরাজীতে বলিল, "আপনি ভদ্রলোক—কেমন ক'রে লেডিসদের কামরায় উঠলেন, বলতে পারেন?"

ফিরিঙ্গী মুহূর্ত্তকাল তাহার দিকে বিস্ময়বিমূঢ় নয়নে তাকাইয়া রহিল, তাহার পর মৃদু হাসিয়া জবাব দিল, "লেডিস্? সত্যি আমি জানতুম না। অন্ধকারে তাড়াতাড়ি উঠে পড়েছি। আপনাদের কোনওরূপ অসুবিধা করি নি বোধ হয়?"

'লীলু' ব্যঙ্গের স্বরে বলিল, "করেছেন কি না, নিজেই বুঝতে পারছেন। আর যদি তা না বুঝে থাকেন, আপনাকে বোঝাবার যথেষ্ট উপায় রয়েছে জানবেন। নিশ্চয়ই জানেন, লেডিসদের কামরায় উঠলে পুরুষের শাস্তি হয়?"

ফিরিঙ্গী তথনও যে বিশেষ ভয় পাইয়াছিল, এমন বোধ হইল না, সে মৃদু মৃদু হাসিতেছিল,—তাহার সে হাসিতে যেন অবজ্ঞা ও বিদ্রূপের ভাব মিশ্রিত ছিল। কিন্তু কথায় সে সেই ভাব কণামাত্র জানিতে দিল না। সে বলিল, "দোহাই আপনার, শিকল টানবেন না, আমি পরের ষ্টেশনেই নেমে যাব। আমার কথা যদি বিশ্বাস করেন, তা হ'লে শুনুন, আপনাদের দুজনকে আমি মুড়ি দিয়ে শুতে দেখে পুরুষ মনে ক'রে গাড়ীতে উঠে পড়েছিলুম।"

'লীলুর' চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছিল, সে তেজের সহিত বলিল, "দেখুন, বাজে কথা ব'লে বোঝাবার চেষ্টা করবেন না। গাড়ীতে উঠে চারদিকে লেডিসদের ব্যবহারের জিনিষ দেখেও কি বুঝতে পারেন নি এটা লেডিসদের কামরা? ঐ লেডিস ওভার কোটটা? ঐ সুট কেশটা—যাতে লেডির নাম পর্য্যন্ত লেখা রয়েছে? ওটা ত চোখের সামনেই প'ড়ে রয়েছে। বেশী কি—"

বাধা দিয়া ফিরিঙ্গীটা আবার আপনার পক্ষসমর্থন করিতে যাইতেছিল, 'লীলু' অধীর হইয়া পরুষকণ্ঠে বলিল, "বেশী কথা কাটাকাটির ইচ্ছে নেই। পরের ষ্টেশনেই নেমে যাবেন।" তাহার পর হাতের রিষ্টওয়াচটার দিকে তাকাইয়া বলিল, "রাত দুটো বেজে গিয়েছে, মধুপুর ছাড়িয়ে এসেছি। এর পর ত আসানসোলে ষ্টপেজ।" লীলু আপন মনে বলিয়া যাইতেছিল, ফিরিঙ্গীকে জবাব দিবার অবসর না দিয়া 'রাধির' দিকে চাহিয়া এইবার বাঙ্গালায় বলিল, "বুনো চাষা! দেখছিস, দোষ ঢাকবার জন্যে মিথ্যের ওপর মিথ্যে ব'লে যাচ্ছে। ছোট জাত কি না—না এদিক, না ওদিক! আসুক আসানসোলে, ভাল ক'রে শিক্ষা দিয়ে দিচ্ছি জানোয়ারটাকে!"

আশ্চর্য্য! 'লীলুর' কথা সমাপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিঙ্গীটা পরিষ্কার বাঙ্গালায় বলিল,—"আমার ওপর অবিচার করছেন। দোহাই বলছি—"

তরুণী দুইটি এমনই বিস্ময়সূচক চীৎকার করিয়া উঠিল যে, বক্তা মধ্যপথেই কথা সাঙ্গ করিয়া তাহাদিগের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। তাহার দৃষ্টিতে বিস্ময় অপেক্ষা যে আনন্দ উপভোগের ভাবটা প্রবলভাবে দেখা দিয়াছিল, তাহা তাহার মৃদুহাস্যস্ফুরিত অধর দেখিলেই সহজে অনুমান করা যায়।

২

বস্তুতঃ যদি সেই মুহূর্ত্তে গাড়ী হঠাৎ লাইনচ্যুত হইত অথবা গাড়ীতে গাড়ীতে সংঘর্ষ হইত, তাহা হইলেও বোধ হয়, লীলা ও রাধারাণী এত চমকিত হইত না। কি আশ্চর্য্য! ফিরিঙ্গী এত সুন্দর বাঙ্গালা বলিতে পারে?

ফিরিঙ্গী যেন আনন্দে গদগদ হইয়া বলিতে লাগিল, "সত্যই বলছি, আমি চাষাও নই, জানোয়ারও নই, ছোট জাতও নই, আমি আপনাদের মতই বাঙ্গালী, এই দেখুন না, আমার সুটকেশেই আমার নাম লেখা রয়েছে।"

লীলা তাহার অঙ্গুলী-সঙ্কেতে নির্দ্দিষ্ট সুটকেশের দিকে চাহিয়া দেখিল, সত্য সত্যই তাহাতে স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে, দিব্যেন্দু দত্ত। লীলা দৃষ্টি উন্নত করিতেই দেখিল, সেই লোকটা তাহারই উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে। দারুণ ক্রোধ ও ঘৃণায় তাহার সারা অন্তরটা ভরিয়া উঠিল। লোকটা কি ধৃষ্ট, কি অসভ্য! একে ত মেয়ে-গাড়ীতে উঠিয়া অন্যায় করিয়াছে, তাহার উপর যেন তাহাদিগকেই অপরাধী বানাইয়া তাহাদিগের দিকে চাহিয়া অবজ্ঞার হাসি হাসিতেছে! দুই চারিটা স্পষ্ট কথা শুনাইয়া দিবার নিমিত্ত তাহার ওষ্ঠাধর স্ফুরিত হইল, সে স্পষ্ট কথা বলিতে কোথাও কখনও পশ্চাৎপদ হয় নাই, তাহার শিক্ষাদীক্ষা আবহাওয়া তাহাকে তেমন ধাতুতে গঠিত করে নাই।

কিন্তু ধৃষ্ট অসভ্য লোকটা বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া তাহাকে কোনও কথা কহিবার অবসর না দিয়াই সহাস্যে বলিল, "দেখলেন ত আমি বাঙ্গালী, আমার নাম দিব্যেন্দু, অনেক রাত্রিতে মধুপুরে নেমন্তন্ন সেরে গাড়ীটি ছাড়ো ছাড়ো সময়ে ছুটে এসে গাড়ী ধরেছি, কাযেই তাড়াতাড়ি অন্ধকারে

লেডিস কামরা কি না দেখিনি। অবশ্য, এর জন্যে আপনারা আমায় দণ্ড দেওয়াতে পারেন। কিন্তু তাতে কেবল রেল-কোম্পানীর পেট ভরবে মাত্র, আপনাদের বিশেষ লাভ নেই। তার চেয়ে আসানসোলে নেমে গেলেই যখন আপনাদের আর জানোয়ারের সঙ্গে ভ্রমণ করবার দরকার থাকবে না, তখন মিথ্যে আর কষ্ট ক'রে সাজা দেওয়াবার হাঙ্গামা পোয়াবেন কেন?"

লীলা এমন লোক কখনও দেখে নাই। সে সুন্দরী শিক্ষিতা যুবতী—এ যাবৎ পুরুষমাত্রেরই নিকটে—বিশেষতঃ শিক্ষিত তরুণ-সমাজে—সে তাহার রূপ-গুণের যোগ্য সম্মান ও শ্রদ্ধাই প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছে। তাহার কথার ঝাঁঝে বহু পরিচিত যুবক ঝলসিত হইয়াছে বটে, কিন্তু কেহ সে জন্য তাহার সেই ঝাঁঝ হইতে দূরে সরিয়া যাইতে বা ঝাঁঝের উত্তরে ঝাঁঝ দেখাইতে সাহসী হয় নাই। না, এই 'চাষা'কে শিক্ষা দিতেই হইবে!

লীলা তাই ব্যঙ্গের স্বরে তাহার ব্যঙ্গোক্তির জবাব দিল,—"না, সে কষ্ট স্বীকার ক'রে ফলও নেই, কেন না, যে পুরুষ নারীর মর্য্যাদা রেখে কথা কইতে জানে না, তাকে সাজা দেওয়ালে সে সেই সাজার উদ্দেশ্য অনুভবই করতে পারবে না।"

লীলার এই কশাঘাতে দিব্যেন্দু বিচলিত হইল কি না, তাহার মুখচক্ষুর ভাবে কিছুই বুঝা গেল না, কিন্তু রাধারাণী যে বিশেষ অস্বস্তি বোধ করিল, তাহা তাহার কাতর করুণ দৃষ্টিই ব্যক্ত করিয়া দিল। তাহার দৃষ্টি যেন তাহাকে ধরাইয়া দিয়া বলিল, সে-ই যেন এই কথার জন্য অপরাধিনী। দিব্যেন্দু মুহূর্ত্তমাত্র তাহার আনত দৃষ্টির দিকে চাহিবার পর হাসিমুখে পরিষ্কার কণ্ঠে বলিল, "এ যা বললেন, এটা একবারে ঠিক—রাতদিন রেলে থেকে থেকে আমাদের কাছে আপনাদের ন্যায্য প্রাপ্য অপ্রাপ্য কি, তা আজও ঠিক করতে পারি নি—"

লীলা বলিল, "আপনি বুঝি রেলে কায করেন? বসুন না ঐ বেঞ্চে, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?"

দিব্যেন্দু তথাপি দাঁড়াইয়া রহিল; বলিল, "হাঁ, রেলে রেলেই দিন কাটছে বটে—এমন অনেক দিনই কেটেছে।"

লীলা তাহার কথাটা শুনিয়াও যেন শুনিল না, এইরূপ ভাব দেখাইয়া সঙ্গিনীকে উদ্দেশ করিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, "কি লো, তুই যে একবারে কোণে মুখ গুঁজেই ব'সে রইলি! ঢঙ দেখে আর বাঁচি নি!" তাহার পর ঈষৎ উচ্চ স্বরে বলিল, "টাইম-টেবলখানা বার কর দিকি— ঐ সুট-কেশটার মধ্যে আছে। আর দেখ, লেডিস ম্যাগাজিনখানাও ঐখেনে পাবি'খন—ওখানাও আনিস্।" কথাটা বলিয়া সে চাবীর গোছাটা ছুড়িয়া দিল। লীলা যে তাহার আচরণে দারুণ ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট হইয়াছে, বেঞ্চে বসিতে বলিলেও সে বসে নাই, এ জন্য তাহার কথায় কান না দিয়া সঙ্গিনীর সহিত অবান্তর আলাপ করিতেছে, এ কথাটা বুঝিয়া লইতে দিব্যেন্দুর বিলম্ব হইল না।

রাধারাণী লজ্জারক্তবদনে মেঝের উপর দৃষ্টি রাখিয়া 'কোণ' হইতে বাহির হইল, কম্পিত চরণে সুটকেশের সান্নিধ্যে উপস্থিত হইল এবং সেটিকে বাঙ্ক হইতে পাড়িতে হস্ত প্রসারণ করিল।

দিব্যেন্দু এতক্ষণ দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া তাহাদের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল—তাহার কোন কিছুতে একটা বিশেষ আগ্রহ দেখা দেয় নাই। কিন্তু রাধারাণীকে ভারী জিনিষটা নামাইতে দেখিয়া সে দ্রুতপদসঞ্চারে বাঙ্কের সান্নিধ্যে উপস্থিত হইয়া ক্ষিপ্রগতি সুটকেশটা নামাইয়া দিল। রাধারাণী নতমুখে সুটকেশের চাবী খুলিতে বসিল।

লীলার মুখচক্ষু আগুনের মত হইয়া উঠিল। ইহা কি তাহাকেই সরাসরি অপমান করা হইল না! লোকটা এত বড় জানোয়ার যে, সে তাহাকে বসিতে অনুরোধ করিলেও শুনিয়াও শুনিল না, পদে পদে প্রতি কথায় তাহাকে বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গ করিয়া আসিয়াছে, অথচ তাহাকে দেখাইয়া রাধারাণীর প্রতি সৌজন্য দেখাইল। সে যেন ইচ্ছাপূর্ব্বক জানাইল যে, সে নারীজাতির প্রতি মর্য্যাদা প্রদর্শন করিতে জানে, কেবল তাহাকেই জানায় নাই—তাহাকেই ইচ্ছাপূর্ব্বক অপমান করিয়াছে।

রাগে লীলার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু প্রতিশোধ লইবার উপায় নাই, কাযেই তাহার সমস্ত রাগটা গিয়া পড়িল বেচারা রাধারাণীর উপর। রাগের আরও একটা কারণ ছিল, কেন না, লীলা অপরূপ সুন্দরী, আর রাধারাণী সাধারণ বাঙ্গালী গৃহস্থের ঘরের 'পাঁচপাঁচি' মেয়ে। উহাকে সম্মান দেখাইয়া জানোয়ারটা কি সৌন্দর্য্যেরও অপমান করিল না!

পরুষকণ্ঠে চীৎকার করিয়া লীলা বলিল, "তোকে

কতবার বলেছি, জিনিষগুলো অমন ক'রে ঘাঁটিস্ নি। একটা কায করতে গেল ত এ যুগ আর আর যুগ! নে, সর্!"

রাধারাণী থতমত খাইয়া ম্লানমুখে নীচের দিকে চাহিয়া রহিল, লীলা সুটকেশটা টানিয়া লইয়া জিনিষ বাহির করিতে লাগিল।

দিব্যেন্দু বিস্মিত হইল। উভয়েই দেখিতে প্রায় বয়সে সমান বলিয়াই মনে হয়, অথচ এক জন আজ্ঞা করিতেছে, অপরা ভয়ে ভয়ে আজ্ঞাপালন করিতেছে,—উভয়ের কি সম্বন্ধ?

তাহার চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল, লীলা সুটকেশের চাবী বন্ধ করিয়া বই দুখানা লইয়া স্বস্থানে উপবেশন করিল। তাহার পর রাধারাণীকে আলোকের আবরণ অপসারণ করিতে হুকুম দিল এবং রিষ্টওয়াচে টাইম দেখিয়া ও টাইম-টেবল খুলিয়া বলিল, "ওঃ, তিনটে বাজে—তা হ'লে মিহি-জামটাম ছাড়িয়ে এইছি, আসানসোল এল ব'লে।"

দিব্যেন্দু এই সময়ে বলিল, "এখনও রাত আছে, আপনারা আর একটু শুন্ না, আমি দরজার পাশেই দাঁড়াচ্ছি, আসানসোল এলেই নেমে যাব।"

লীলার তখন মনে কি হইতেছিল, তাহা সে-ই জানে! হঠাৎ তাহার মুখের অপ্রসন্নতার ভাব মুহূর্ত্তে তিরোহিত হইল, সে হাসি-হাসি মুখে বলিল, "আসানসোলে দাদা একবার নিশ্চয় খোঁজ নিতে আসবেন। তাঁর সঙ্গে আলাপ ক'রে যাবেন না? পাশের গাড়ীতেই তিনি আছেন।"

এ কথাটায় বিদ্রূপের কথা লুক্কায়িত ছিল কি না, তাহা দিব্যেন্দু বুঝিল কি না, জানিতে দিল না। সে কেবল লক্ষ্য করিল, রাধারাণীর মৃদু ভর্ৎসনার দৃষ্টি লীলার উপর ন্যস্ত হইয়াই চকিতে মিলাইয়া গেল। কিন্তু আর কথার অবসর হইল না, গাড়ী ক্ষণপরেই আসানসোলে আসিয়া পৌঁছিল।

মুহূর্ত্ত পরেই আলষ্টার-আঁটা চশমাধারী একটি বাঙ্গালী যুবক গাড়ীর দরজার নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিল, এক জন য়ুরোপীয় যাত্রী লেডিস কম্পার্টমেণ্ট হইতে নামিতেছে; কুলীরা তাহার মালপত্র উঠাইতেছে। সে বিস্মিত-নেত্রে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল। লীলা জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া বলিল, "দাদা, উনি ভুলে মধুপুরে উঠে পড়েছিলেন। বলছি ভোর হয়ে এল, আর গাড়ী বদলাতে হবে না, গাড়ীতে ত আমরা ছাড়া আর কোন লেডী নেই, একসঙ্গেই হাওড়ায় চলুন। তা উনি শুনলেন না।"

সুরেশচন্দ্রের বিস্ময় আরও বর্দ্ধিত হইল। এই য়ুরোপীয় যাত্রীকে তাহার গাড়ীতে থাকিবার জন্য লীলা অনুরোধ করিতেছে কেন, ইহা সে কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। ইতোমধ্যে 'সাহেব' মাথার ক্যাপটা খুলিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "আমি বাঙ্গালী, মশাই। চলুন আপনার কামরায় যাওয়া যাক, ঐখেনেই কথা হবে'খন।" উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়াই সে পার্শ্বের কামরার দিকে চলিয়া গেল। সুরেশচন্দ্র তাহার চলন্ত মূর্ত্তির দিকে বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে তাকাইয়া রহিল।

৩

"এখানা ঐ তাকে রাখ্। তোর কি কোন বুদ্ধি নেই? মেঘদূতখানা রেখেছে বঙ্কিমের গ্রন্থাবলীর পাশে! যেন খুকীটি! বাঙ্গালা আর সংস্কৃত বই কি এক আলমারীতে রাখ্তে হয়?"

রাধারাণী মুখখানি কাঁচুমাচু করিয়া বলিল, "আমি অত শত জানি নি ভাই। রোদ্দুরে দিতে বলেছিলে, দিয়েছি, কোথায় কি রাখ্তে হয়, জানি নি।"

লীলা বলিল, "জানবি কি ক'রে—পাড়াগেঁয়ে ভূত! নে, ঐ বই ক'খানা পাশাপাশি সাজিয়ে রাখ। আবার এখনই গা ধুয়ে সাজতে গুছতে হবে!"

রাধারাণী অবনতমুখে ভয়ে ভয়ে বলিল, "আজ কোথায় যাবে লীলু? দাদা বলেছিলেন,'চন্দ্রশেখর' দেখতে যাবেন।"

লীলা হো হো হাসিয়া বলিল, "নাও কথা! সে বুঝি আজকে—সে যে শনিবার! তাও জানিস নি? বিয়ে হ'লে ঘর করবি কি ক'রে? আজ যে দিব্যেন্দু বাবু আমাদের 'ওয়ে ডাউন ইষ্ট' দেখতে নিয়ে যাবেন।"

রাধারাণী বিশেষ ব্যস্ততার সহিত বইগুলি ঝাড়িয়া আলমারীতে তুলিতে লাগিল। লীলা বলিয়া যাইতে লাগিল, "করেন ত রেলের চাকরী—না হয় বড় জোর দেড়শ'দু'শ টাকা মাইনেই হবে, কিন্তু ফোতো নবাবীটা দেখিছিস ওর? চালায় কি ক'রে, তাই ভাবি।"

রাধারাণী একখানি কেতাব ঝাড়িতে ঝাড়িতে মৃদুস্বরে বলিল, "পশ্চিম থেকে আসবার পর অনেক দিন হয়ে গেল, ওঁর ছুটী ফুরোয় নি?"

লীলা তাচ্ছীল্যভরে বলিল, "কে জানে! বিষ নেই

তার কুলোপানা চক্কোর! জানিস রাধি, বাবু ত রেলের চাকর, তবু আকাশের চাঁদ ধরতেও সাধ আছে দেখি। এ সব লোকের ভাল ক'রেই শিক্ষা হওয়া উচিত।"

রাধারাণীর বুক গুরু গুরু করিয়া উঠিল, সে কাতর করুণ দৃষ্টিতে লীলার দিকে একবার চাহিয়া দৃষ্টি অবনত করিয়া লইল। ক্ষণপরে মৃদুস্বরে বলিল, "দয়া ক'রে ওঁকে ক্ষমা কর না ভাই। দু'দিন বাদেই যখন চ'লে যাবেন—"

লীলা গর্ব্বিতা হংসীর মত গ্রীবা উন্নত করিয়া সক্রোধে বলিল, "ক্ষমা করব? কাকে? যে আমাকে রেলগাড়ীতে অপমান করেছে? আমাকে তুই জানিস নি, রাধি!"

লীলা ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। রাধারাণী যদিও মাত্র দুই বৎসর পিতৃ-মাতৃহারা হইয়া তাহার নিভৃত পল্লীর অসংায় সাদাসিধা জীবনযাত্রা ছাড়িয়া কলিকাতায় তাহার মাতৃস্বসার বালিগঞ্জের প্রাসাদোপম গৃহে আসিয়া বসবাস করিতেছে, তথাপি এই দুই বৎসরে সে তাহার মাতৃস্বসার দুহিতা লীলাকে জানিবার যথেষ্ট সুযোগ ও অবসর পাইয়াছে। লীলা বিধবা জননীর কনিষ্ঠ সন্তান, শৈশবে পিতৃহারা হইয়া অত্যধিক আদরে-যত্নে প্রতিপালিতা হইয়াছে। জীবনে তাহার কোনও সাধ অপূর্ণ থাকে নাই। অর্থে ও লোকবলে এ জগতে যাহা সম্ভব, সে তাহা পাইয়াছে। বিশেষতঃ তাহার মাতার পরলোকগমনের পর তাহার ভ্রাতা ব্যারিষ্টার হইয়া আসা অবধি তাহাকে যে ভাবে শিক্ষিতা, দীক্ষিতা করিয়াছে, তাহাতে সুদূর পল্লীর অশিক্ষিতা অমার্জ্জিতা রাধারাণীর সহিত তাহার প্রভেদ যে অতিমাত্রায় ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা রাধারাণী কলিকাতায় আসিবার দুই চারি দিন পরই বিশেষরূপে অনুভব করিয়াছিল। সুরেশচন্দ্র বাটীতে মেম শিক্ষয়িত্রী রাখিয়া ভগিনীকে ইংরাজী ও ফরাসী ভাষা এবং নৃত্য-গীত ইত্যাদি শিক্ষা দিয়াছিলেন। লীলা বেথুন কলেজ হইতে একটা পাশও করিয়াছিল।

তাই যখন লীলা গর্ব্বোন্নত মাথা তুলিয়া ক্রোধ-কম্পিত-স্বরে বলিল, "আমাকে তুই জানিস নে, রাধি," তখন রাধারাণীর দুই বৎসরের অতীত ঘটনাগুলির কথা একে একে মানসদর্পণে চিত্রের মত ফুটিয়া উঠিল। সেই দুই বৎসরে লীলার হৃদয়ের সে কি পরিচয় পাইয়াছে! লীলার ভালবাসা ও অনুগ্রহপ্রার্থী কত শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত যুবক তাহার জিহ্বার কঠোর কশাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়াছে। রূপ, ঐশ্বর্য্য, বিদ্যা,—বিধাতার এ সকল দান লীলার উপর অকুণ্ঠিতভাবে বর্ষিত হইয়াছিল। আধুনিক যুগে সমাজের উচ্চ স্তরের কৃতবিদ্য বাঙ্গালী যুবক যাহা জীবন-সঙ্গিনীতে অনুসন্ধান করে, তাহার কোন কিছুরই ত্রুটি লীলাতে পরিলক্ষিত হইত না। কিন্তু তবু! তবু কি জানি কেন রাধারাণী তাহার সঙ্গিনীর মধ্যে কি একটা জিনিষের অভাব অনুভব করিত। সে যে কি, তাহা রাধারাণী ঠিক বুঝিতে পারিত না।

কলিকাতার বাসায় অনুক্ষণ লীলার অনুগামিনী হইতে হইয়া রাধারাণীকে তাহার পাড়াগাঁয়ের খোলস কতকটা বদল করিয়া ফেলিতে হইয়াছিল বটে, কিন্তু দুই বৎসরেও সে ঠিক 'লীলা' হইয়া উঠিতে পারে নাই। সে বিষয়ে তাহার অন্তরায়ও ছিল অনেকগুলি। প্রথম তাহার সৌন্দর্য্যের অভাব, দ্বিতীয় তাহার স্বভাবসুলভ বিষম লজ্জা, তৃতীয় তাহার শিক্ষার অভাব, চতুর্থ তাহার ভয়, পঞ্চম তাহার পুরুষকে আপনা হইতে বড় বলিয়া জ্ঞান করার জন্মার্জ্জিত সংস্কার। তাই সে যখন দেখিত, লীলা তাহার অনুগ্রহ-ভিখারী শিক্ষিত যুবককে নিষ্ঠুর উপেক্ষাভরে জিহ্বার কশা দ্বারা আঘাত করিতেছে, তখন তাহার স্বভাবকোমল নারীসুলভ মনটা ব্যথিত হইত, নয়ন-পল্লব অশ্রুভারাক্রান্ত হইত, সে বুঝিয়া উঠিতে পারিত না যে, লীলা ঠিক পুরুষের সহিত সমান আসন রাখিয়া পুরুষেরই মত কঠিন হইয়া কেমন করিয়া কথার গরল ঢালিতে পারে, কেমন করিয়া আঘাতের পর আঘাত দিয়া পুরুষকে দলিত-পিষ্ট করিতে পারে।

তাই যখন লীলা দিব্যেন্দুকে ক্ষমা করিবে না বলিয়া সদম্ভ উক্তি করিল, তখন অনিশ্চিত একটা ভয়ের ও অমঙ্গলের আশঙ্কায় রাধারাণীর মনটা ভরিয়া উঠিল। সে দিব্যেন্দুর ভবিষ্যৎ শাস্তির কথা ভাবিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল, মিনতির সুরে বলিল, "উনি ত জেনে-শুনে আমাদের গাড়ীতে ওঠেন নি।"

লীলা গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "জেনে-শুনে গাড়ীতে ওঠেন নি, তার কথা ত হচ্ছে না। উঠলে বা না উঠলে, আমাদের তাতে কিছু এসে যেতো না। আমি পুরুষমানুষকে একটা মস্ত জীব ব'লে মনে করি নি; যে বিধাতা পুরুষকে সৃষ্টি করেছে, সেই বিধাতাই আমাদেরও সৃষ্টি করেছে; তখন আমাদের গাড়ীতে একটা পুরুষ উঠলেই যে পৃথিবীটা

উল্‌টে যেত, তা নয়। তবে ঐ লোকটা আমায় বার বার অপমান করেছিল—তাই ওকে শিক্ষা দিতে চাই।"

লীলার চক্ষু অসম্ভব দীপ্তিতে ধক্-ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, তাহার মধ্য হইতে যেন বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। সে ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া ইজি-চেয়ারে দেহ এলাইয়া দিয়া জানালার বাহিরে আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর মৃদু হাসিয়া আবার বলিল, "বেরাল ইঁদুর নিয়ে খেলা করে দেখিছিস্, রাধি? আমি তেমনই ক'রে ওকে নিয়ে একটু খেলা করছি, বুঝলি?"

রাধারাণী ব্যথিতস্বরে পুনরায় বলিল, "উনি ত শীগ্-গিরই চ'লে যাবেন—"

লীলা ক্রোধে একরূপ জ্ঞানশূন্য হইয়া মুখ ঘুরাইয়া বলিল, "দেখিস্! টস্ বেয়ে যে জল ঝ'রে পড়লো! ও তোর কে? কথা কচ্ছিস্ এমনই, যেন মনে হয়, তুই ওকে ভালবাসিস্। সত্যি না কি রে?"

রাধারাণীর মুখখানি লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল, সে তাড়াতাড়ি কেতাবের রাশির মধ্যে মুখ গুঁজিয়া বলিল, "কি যে বল ছাই!"

লীলা এইবার হাসিয়া ফেলিল; বলিল, "তা বাপু, দাদার আমার অন্যায়। পাড়াগাঁয়ে যে বয়েসে মেয়েদের বিয়ে হয়, আমার বোন্‌টির তা হ'লে এত দিন ছেলেপুলে নিয়ে ঘর-সংসার করতে হ'তো। তা নয় এবার দাদাকে ব'লবো—"

"দাদাকে কি বলবি রে লীলি?" বলিতে বলিতে সুরেশচন্দ্র দিব্যেন্দুকে লইয়া একবারে সেই ঘরে হাজির। লীলা ও রাধারাণী বিস্মিত হইল—এমন অসময়ে তাঁহারা কেন?

লীলা বলিল, "আজ কোর্টে যাও নি? আসুন দিব্য বাবু, বসুন। বায়স্কোপ ত সন্ধ্যে ৬টায়।"

সুরেশচন্দ্র পার্শ্বের কক্ষে কোর্টের বস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিতে করিতে বলিল, "আজ জষ্টিশ রেমণ্ড মারা গিয়েছেন ব'লে বেলা ১টার পর কোর্ট বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ভাবলুম, একা বাড়ী ব'সে কি করবো, তাই দিব্যেন্দুকে পাকড়ে নিয়ে এলুম। দু'চার হাত ব্রিজ খেলে, চা'টা খেয়ে বায়স্কোপে যাওয়া যাবে'খন। কি হে দিব্যেন্দু, বোবার মত ব'সে রইলে যে?"

বলা বাহুল্য, সেই রেলে দেখার পর উভয়পক্ষের আলাপ ঘনিষ্ঠ হইয়াছে। দিব্যেন্দু কালীঘাটের দিকে থাকিত, প্রায়ই সুরেশচন্দ্রের গৃহে বেড়াইতে আসিত। দিব্যেন্দু বলিল, "বই দেখছিলুম। আপনার কালেকসান ত খুব বেশী—আলমারীর ভেতর গোছান থাকত ব'লে বুঝতে পারা যেত না।"

লীলা বলিল, "ওর ভেতর এক এক তাকে তিন সার ক'রে সাজান থাকে কি না। রাধি, মাঝের তাকের সামনের সারের দু'চারখানা বই পাড় ত।"

দিব্যেন্দু উঠিয়া আলমারীর দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল, "থাক্, থাক, আমিই পেড়ে নিচ্ছি।"

কিন্তু পাড়িবার কালে একটু গোলযোগ হইয়া গেল, দিব্যেন্দুর হাতের সহিত রাধারাণীর হাতের স্পর্শ হইল। রাধারাণী একবারে মুখ-চোখ রাঙ্গা করিয়া এক পার্শ্বে গিয়া অধোমুখে সরিয়া দাঁড়াইল। লীলা উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল, দিব্যেন্দু অপ্রতিভ হইয়া ফিরিয়া আসিয়া আসন গ্রহণ করিতে করিতে বলিল, "দেখুন, আমি বোধ হয় আর দু'চার দিনের মধ্যে পশ্চিমে যাচ্ছি। হয় ত দু'চার দিন আপনাদের সঙ্গে দেখা না-ও হ'তে পারে, এমন কি, হয় ত হঠাৎ এক দিন কারুর সঙ্গে দেখা না করেই চ'লে যেতে হবে। এই জন্যে আগে থেকেই আপনাদের কাছে ছুটী নিয়ে রাখছি।"

লীলা বিস্ময়োদ্বেগপূর্ণকণ্ঠে বলিল, "সে কি? এ কথা ত এক দিনও বলেন নি আগে? হঠাৎ এত তাড়া এল কেন? আপনি ত বলেছিলেন, হয় ত এক বছর আর রেলে যাওয়া হবে না—ছুটী কি এক বছর নেন নি?"

দিব্যেন্দু কথাটার জবাব দিতে যাইতেছিল, কিন্তু ঐ সময়ে সুরেশচন্দ্র বেশ-পরিবর্ত্তন করিয়া বাহিরের ঘরে আসিয়া বলিল, "তুই ত ভারি বোকা, লীলি! রেলের ছুটী কখনও এক বছর হয়? ও হয় ত মজা করবার জন্যে ও কথা বলেছিল। কেমন, না দিব্যেন্দু?" কথাটা জিজ্ঞাসা করিয়া সুরেশচন্দ্র একটা বর্ম্মা চুরুট ধরাইয়া চেয়ারে বসিয়া সেই দিনের ইংরাজী কাগজখানা উঠাইয়া লইল।

লীলা ঈষৎ কুপিত হইয়া বলিল, "মজাটা এর মধ্যে কি হ'ল? মিথ্যে কথা ব'লে মজা করাটা কোন্ ভদ্রতার শাস্ত্র অনুমোদন করেছে?"

দিব্যেন্দু কোন কথার জবাব না দিয়া রাধারাণীর দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনি কিছু বল্‌বেন না? এখন গোছান

থাক, আসুন, সকলে ব'সে গল্প করা যাক্। আর দু'দিন বই ত নয়।"

সুরেশচন্দ্র বলিল, "হাঁ, তাই চলুক! তবে একফোঁটা চা একবার হয়ে গেলে ভাল হতো না?"

রাধারাণীর মুখখানি ম্লান হইয়া গেল, সে যেন কত অপরাধিনীর মত নিঃশব্দে আসিয়া সুরেশচন্দ্রের পার্শ্বে এক-খানি চৌকী টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িল। কিন্তু লীলার মুখখানি একবারে আগুনের মত লাল হইয়া উঠিল। এ যাবৎ তাহাদের বাড়ীতে তাহার দাদার মত বন্ধু বা পরিচিত ভদ্রলোক আসিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কেহ ত কখনও পূর্ব্বে তাহার কথার জবাব না দিয়া ইতরের মত রাধারাণীকে ডাকে নাই। রাধারাণী তাহাদের বাড়ীতে নগণ্য—তাহার না আছে রূপ, না আছে ঐশ্বর্য্য, না আছে বিদ্যা,—সে ত মানুষের মধ্যেই গণ্য নহে। তবে? তবে এই ইতরটা যে ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহার কথায় সাড়া না দিয়া, রাধারাণীকে সম্মান করিল, ইহার পশ্চাতে তাহার কি দুরভিসন্ধি লুক্কায়িত নাই? ক্রোধকম্পিত স্বরে সে বলিল, "যা না, চেয়ারে এসে থুম হয়ে বস্‌লি কেন? চা-টার যোগাড় করতে হবে না?"

রাধারাণী তাড়াতাড়ি আদেশ পালন করিতে প্রস্তুত হইল।

দিব্যেন্দু লীলার ক্রোধের মাত্রা অনুভব করিয়াছিল কি না, জানিতে দিল না। যেন কিছু হয় নাই, এই ভাবে সে পুনরপি রাধারাণীর দিকে চাহিয়া বলিল, "কৈ, আপনি ত কিছু বল্‌লেন না?"

রাধারাণী যাইতে যাইতে নতমুখে বলিল, "আমি আর কি বল্‌বো?" বলিয়াই সে ভিতরের দিকে চলিয়া গেল।

হঠাৎ সুরেশচন্দ্র কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া বিস্ময়সূচক চীৎকার করিয়া উঠিল, "এঁ্যা! বরেন মারা গেল? আহাহাঃ, পুয়োর ফেলো!"

লীলাও কম চমকিত হইল না—সে তীরের মত চেয়ারে উঠিয়া বসিয়া বলিল, "দেখি, দেখি, কাগজখানা—"

সুরেশচন্দ্র কাগজখানা ভগিনীর দিকে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, "গেল বছরও এমনই সময়ে আমার এখানে কত আমোদ ক'রে গেছে। আহা! বেচারা বাপের সঙ্গে মনান্তর করেই বেঘোরে প্রাণটা হারাল।"

কোন একটা কিছু বলিতে হয়, তাই দিব্যেন্দু বলিল, "কে বরেন?"

"তুমি তাকে জানবে না হে। বড় ভাল ছোকরা ছিল সে! দু'জনে একসঙ্গেই বিলেত থেকে এসেছিলুম, সে ডাক্তারী পড়তে গিয়েছিল।"

দিব্যেন্দু সামান্যমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ, এত কম বয়সে মারা গেল কিসে?"

"আরে, সেইটেই ত দুঃখ, হার্টের শক লেগেই মারা গেল। আহা, বেচারা যখন বিলেত যায়, তখনই তাতে তার বাপের আপত্তি ছিল—কত ভয় দেখিয়েছিল, ত্যাজ্য-পুত্তুর করবে; কিন্তু বরেন দমে নি একটুও, বলেছিল, লেখাপড়া শিখতে যেখানে খুশী গেলে জাত যায় না।"

দিব্যেন্দু কেবল বলিল, "এখনও এমন লোক আছে না কি, যারা কালাপানি পার হ'লে জাত যায় বলে?"

লীলা এতক্ষণে কথা কহিল; হাসিয়া বলিল, "অনেক, আপনাদের পাড়াগেঁয়ে জমীদার—"

সুরেশচন্দ্র বলিল, "হ্যাঁ, বরেনের বাপও পলাশডাঙ্গার জমীদার—"

দিব্যেন্দু চেয়ারে নড়িয়া বসিল, গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথাকার?"

"পলাশডাঙ্গার হে—হুগলী জেলার। লোকটা একবারে অর্থোডক্স—তেলক-টিকিওয়ালা। তবে ছেলে যদ্দিন বিলেতে ছিল, খরচ জুগিয়েছিল—এক ছেলে কি না। কিন্তু দেশে ফিরে আসতেই ছেলেকে ঘরে নিতে চাইলে না, গোঁ ধরলে, গোবর খেয়ে প্রায়শ্চিত্তির করতে হবে। সে আজ ৩ বৎসরের কথা।"

লীলা ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধের সুরে বলিল, "কেমন 'ফানি!' নয় কি দিব্যেন্দু বাবু?"

দিব্যেন্দু বলিল, "হুঁ, 'ফানি' বই কি! তার পর?"

সুরেশচন্দ্র বলিল, "ছেলেও বাপের ওপরে যায়, সে গোঁ ধরলে, গোবর খাবে না। তখন লীলার সঙ্গে ওর বিয়ের কথা হচ্ছিল। দেশে ফিরে সে ত বাড়ী ওঠেনি, আমার এখানেই ছিল, আমিই জোর ক'রে ধ'রে এনেছিলুম।"

দিব্যেন্দু একবার চকিতে লীলার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া বলিল, "দেখি কাগজখানা একবার।"

লীলা কাগজখানা টেবলের উপর রাখিয়া দিল।

চা আসিল। সুরেশচন্দ্র চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল। লীলাও এক কাপ লইল, কিন্তু দিব্যেন্দু চা ছুঁইল না, কাগজপাঠে মন দিল। লীলা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি খেলেন না ?"

দিব্যেন্দু বলিল, "না, বায়স্কোপ যাবার সময় একবারে খাব। ইস্! এ এক রকম আত্মহত্যা বল্‌লেও বলা যায়।"

সুরেশচন্দ্র বলিল, "হাঁ, আত্মহত্যাই বটে; কাগজে যা পড়লে, তার চেয়ে আরও অনেক বেশী কথা আছে। এক বছর বাপ-বেটার মধ্যে মিলনের চেষ্টা করেছিলুম, কিছুতেই কিছু হ'ল না। বুড়ো শেষে সত্যি সত্যি উইল ক'রে তার যথাসর্ব্বস্ব এক জ্ঞাতির ছেলেকে দিয়ে গেল—এত বড় জেদ তার! তাও যদি সেই জ্ঞাতির ছেলেটা মানুষের মত হ'ত। সেও শুনেছি একটা ভবঘুরে।

দিব্যেন্দু জিজ্ঞাসা করিল, "যাক, তার পর ছেলে কি করলে ?"

"বরেন বাপের ত্যাজ্য পুত্তুর হয়ে যখন বিষয় হ'তে বঞ্চিত হ'ল, তখন আর এক মুহূর্ত্ত আমার বাড়ীতে থাকতে চাইল না, কোথায় যে চ'লে গেল, কেউ জানতে পারলে না। শুনছি মধ্যপ্রদেশে এক মেড়ো রাজার ষ্টেটে ডাক্তারী চাকুরী নিয়ে চ'লে গিয়েছিল।"

দিব্যেন্দু বলিল, "কাগজে লিখছে যে ভাবে, তাতে বোধ হচ্ছে, তার আত্মহত্যার কারণ কেবল বাপের সঙ্গে মনান্তর না, প্রণয়ের প্রত্যাখ্যানও বড় রকমের কারণ। সে না কি এ কথা ষ্টেটের আরও দু'জন বড় বাঙ্গালী রাজকর্ম্মচারীর নিকট নেশার ঝোঁকে অনেকবার বলেছিল।"

সুরেশচন্দ্র বলিল, "হাঁ, সে ভেবেছিল, লীলার সঙ্গে যখন তার বিয়ের কথা পেড়েছিলুম, তখন সেটা বুঝি পাকাপাকিই হয়ে গিয়েছে। কিন্তু বাপ যখন তাকে ত্যাজ্যপুত্র ক'রে বিষয় আশয় থেকে বঞ্চিত করলে, তখন ত আর তার সঙ্গে লীলার বিবাহ হ'তে পারে না। আমি বিবাহ দিলেই বা লীলা তাতে রাজী হবে কেন—ওদের দু'জনের মধ্যে ত একটা বাঁধাবাঁধি মনের মিলের মত কিছু হয় নি।"

দিব্যেন্দুর ওষ্ঠের কোণে ঈষৎ হাসি দেখা দিল, সে বলিল, "তা ত ঠিক, কোথায় জমীদারের ছেলে, আর কোথায় পরের মাইনে করা ডাক্তার!"

লীলা কথাটার মধ্যে তীব্র শ্লেষোক্তি অনুভব করিল না, সে তখন অতীতের কথাই ভাবিতেছিল। সে বলিল, "ডাক্তারী চাকুরী নিয়ে যাবার আগে আমায় সেই জঙ্গলে গিয়ে তার ঘরের গৃহিণী হ'তে বলেছিল—এমনই স্বার্থপর লোকটা!"

দিব্যেন্দু বলিল, "শুনে আপনি কি বলেছিলেন, মুখের মতন জবাব দিয়েছিলেন ত ?"

লীলা জবাব দিবার পুর্ব্বেই সুরেশচন্দ্র বলিল, "এ তার অন্যায় আবদার। লীলা যে রকম অবস্থার মধ্যে ব্রট আপ হয়েছে, তাতে—"

দিব্যেন্দু কথাটা শেষ করিয়া দিল,—"তাতে জঙ্গলী ডাক্তারের পক্ষে তাঁর অভাব আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করা সে জঙ্গলের মধ্যে সম্ভব হ'ত না। তা, লোকটা মদ খেয়েই মরল ?"

সুরেশচন্দ্র বলিল, "তাই ত কাগজে লিখেছে। যাক, একটা আন-প্লেসেণ্ট সাবজেক্ট নিয়ে—"

"খাবার হয়েছে, আন্‌ব কি, দাদা?" রাধারাণী দ্বারদেশে দেখা দিয়া কথাটা জিজ্ঞাসা করিল। দিব্যেন্দুর অপ্রসন্ন মুখখানা কি জানি কেন হঠাৎ একটা অজানা আনন্দ-আলোকে হাসিয়া উঠিল। সুরেশচন্দ্র একরাশি চুরুটের ধূম উদ্‌গিরণ করিয়া বলিল, "এইখেনেই দিবি? তা দে, কিন্তু দেরী করিস নি, সাড়ে পাঁচটাও হয়ে এল।"

আহারের পর সকলে যখন বেশ পরিবর্ত্তন করিতে গেল, তখন দিব্যেন্দু একাকী বসিয়া কাগজখানা নাড়া-চাড়া করিতে করিতে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া আপন মনে বলিল, "হতভাগা নিজেও মর্‌ল, বাপকেও মারলে! বাপও কিন্তু ভূভারতে এমন নেই বলতে হবে।"

এই সময়ে রাধারাণী কি একটা কাযে বাহিরের ঘরে আসিয়া পড়িল; কিন্তু দিব্যেন্দুকে একাকী থাকিতে দেখিয়া দ্রুতপদে ভিতরে চলিয়া যাইতেছিল। দিব্যেন্দু তাহাকে সে অবসর না দিয়া যেন আরও অধিক অপ্রস্তুত করিবার অভিপ্রায়ে দুষ্টামী করিয়া বলিল, "এবার কি ফরমাস খাটতে এলেন? আলোবাতি জাল্‌তে, না গাড়ী তৈরী করতে বল্‌তে?"

রাধারাণী কেবল "যান, আপনি ভারী দুষ্টু" বলিয়া দ্রুত-পদে অন্দরে প্রবেশ করিল। কি একটা অব্যক্ত প্রসাদে দিব্যেন্দুর অন্তরটা ভরিয়া উঠিল।

৪

ইহার পর আরও পাঁচ ছয় মাস কাটিয়া গিয়াছে। দিব্যেন্দু এখন নিত্য লীলাদের বাড়ীর যাত্রী। এখন লীলা ও রাধারাণীর সহিত তাহার আলাপ 'তুমিতে' উঠিয়াছে। রাধারাণী দিব্যেন্দুর এরূপ কর্ত্তব্যহীন জীবনযাপনে অত্যধিক বিস্ময় অনুভব করিত, বলি বলি করিয়াও বলিতে পারিত না, কিরূপে এই রেলের কর্ম্মচারী এত দীর্ঘকাল রেলের চাকুরী ছাড়িয়া স্বচ্ছন্দে কলিকাতায় ভাবনাহীন জীবন অতিবাহিত করিতেছে। লীলার এ সকল চিন্তার অবকাশ ত ছিলই না, প্রয়োজনও ছিল না। সে একবারমাত্র দাদার নিকট শুনিয়াছিল যে, দিব্যেন্দু কালীঘাটে এক ধনী আত্মীয়ের গৃহে বাস করে, তাহার রেলের চাকুরীর কি হইয়াছে, কাহাকেও বলে না; তবে কিছু দিন পূর্ব্বে সে তাহাকে বলিয়াছে যে, তাহার কোনও জ্ঞাতির মৃত্যুতে সে কিছু সম্পত্তির মালিক হইয়াছে, তাহার গ্রাসাচ্ছাদনের বা ভবিষ্যৎ সংসারযাত্রার কোনও চিন্তার কারণ নাই।

সুরেশচন্দ্র তাহার ভগিনীর প্রকৃতি অবগত ছিল, এ জন্য সে দিব্যেন্দুর মত যুবককে তাহাদের সহিত মিলামিশা করিতে দিত। সে জানিত, লীলার রূপৈশ্বর্য্য ও শিক্ষার গর্ব্ব তাহার দুর্ভেদ্য রক্ষাকবচ—তাহা ভেদ করিয়া দারিদ্র্যের আক্রমণ কখনও বিজয়সাফল্যে মণ্ডিত হইতে সমর্থ হইবে না। দিব্যেন্দু অপেক্ষা বহুগুণে শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ধনিসন্তানও সেই কবচদুর্গের ভীমকবাটে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া ব্যথাহতমস্তকে পশ্চাদাবর্ত্তন করিয়াছে। আর রাধারাণী? সে ত গণনার মধ্যেই ধর্ত্তব্য নহে। সেই রূপহীনা অশিক্ষিতার জন্য চিন্তার কোনও কারণ ছিল না। তাহার ভগিনী লীলার মধ্যাহ্ন-দীপ্তির নিকটে এই পল্লীর অমার্জ্জিতা খদ্যোতিকার মৃদু আলোকরশ্মি সর্ব্বদাই নিষ্প্রভ হইয়া থাকিত; তাহার দিকে কদাচিৎ কখনও কাহারও দৃষ্টি নিপতিত হইত কি না সন্দেহ। সুতরাং সে দিকে আশঙ্কার কারণ বিদ্যমান ছিল না। তবে সে শিক্ষিত বন্ধুবান্ধবকে আপনার অবসর-বিনোদনের জন্য স্বগৃহে আনয়ন করিবে না কেন—আপনার জনের সহিত পরিচিত করিয়া দিবে না কেন? তাহার অর্থের অভাব ছিল না—তাহার শিক্ষাদীক্ষাও প্রাচীনপন্থীর সীমাবদ্ধ কুসংস্কারের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। তবে কি জন্য সে শিক্ষিত মার্জ্জিতরুচি আধুনিক সম্প্রদায়ের উপভোগ্য রসাস্বাদনে আপনাকে ও আপনার জনকে বঞ্চিত রাখিবে?

প্রথম আলাপেই সুরেশচন্দ্র দিব্যেন্দুর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। আসানসোলে দিব্যেন্দু যে মুহূর্ত্তে লেডিস্ কামরা হইতে তাহার কামরায় আসিয়া স্থান সংগ্রহ করিল, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই সে তাহার কমনীয় কান্তিতে ও সরল নির্ভীক স্পষ্ট আলাপ-পরিচয়ে তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল, পরে হাওড়া পর্য্যন্ত একত্র ভ্রমণের পর সে তাহার কথাবার্ত্তায় এতই মুগ্ধ হইয়াছিল যে, তাহাকে তাহার গৃহে নিমন্ত্রণ না করিয়া পারিল না। পরিচয়ের মধ্যে সে কেবল জানিতে পারিয়াছিল যে, দিব্যেন্দু তাহারই মত কায়স্থকুলোদ্ভব এবং পল্লীবাসী, সম্প্রতি রেলেই কালাতিপাত করিতেছে।

এই আলাপ ক্রমশঃ বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছিল। সুরেশচন্দ্র বুঝিয়াছিল, দিব্যেন্দু সরলপ্রকৃতি ও সত্যবাদী, সে তাহার ও তাহার ভগিনীর বন্ধুত্বে আনন্দ লাভ করে বলিয়া তাহার গৃহে প্রায় আতিথ্য স্বীকার করে। তাহার ও তাহার ভগিনীর আরও পাঁচ জন পরিচিত ও বন্ধুর মধ্যে দিব্যেন্দুও এক জন বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। ইদানীং লীলা তাহার আকর্ষণের জাল যতই বিস্তৃত করিতেছিল, ততই যেন দিব্যেন্দুরূপ মৎস্য তাহার মধ্যে ধরা দিতেছিল। তাহার রূপ, ঐশ্বর্য্য, বিদ্যা এবং শিক্ষা-দীক্ষার অস্ত্রাগারে যত কিছু অস্ত্র ছিল, তাহার কোনটারই প্রয়োগে সে সুযোগ ও অবসর ত্যাগ করিতেছিল না। যাহার সামান্য একটু হাসির জন্য কত কৃতবিদ্য সম্ভ্রান্ত যুবক লালায়িত হয়, যাহার ক্ষুদ্র এক কণা কৃপার ভিখারী হইয়া বহু যুবক অহরহ তাহার আশে-পাশে অগ্নিমুখবিবিক্ষু পতঙ্গের মত ঘুরিয়া ফিরিয়া ক্লান্তি বা বিরক্তি অনুভব করে না, তাহার একটু সলাজ হাসির দৃষ্টিতে—একটু কোমল কম্পিত প্রিয় সম্ভাষণে দিব্যেন্দুর মত যুবক যে বিচলিত হইবে না, ইহা হইতেই পারে না। দিব্যেন্দু ধীরে ধীরে সেই বেড়া জালের মধ্যে আকৃষ্ট হইতেছিল, আর লীলাও অতি ধীরে, অতি সন্তর্পণে সেই জাল গুটাইয়া তটভূমির দিকে টানিয়া তুলিতেছিল।

এই গোপনে দুইটি প্রাণের লুকোচুরি খেলার কথা কেহ জানিতে পারে নাই, কেবল এক জন বুঝিয়াছিল, বুঝিয়া অন্তরে দারুণ ব্যথা অনুভব করিয়াছিল। তাহার কোমল নারীসুলভ মন জানিত, এ খেলায় এক জন আমোদ উপভোগ

করিতেছে বটে, কিন্তু এ খেলায় অন্য জন মৃত্যুকে ডাকিয়া আনিতেছে। এ মৃত্যু দেহ হইতে আত্মার বিচ্যুতি নহে, এ মৃত্যু তাহা হইতেও ভীষণ—এ জীবন্মৃত্যু। রাধারাণী জানিত, সামান্য নগণ্য দরিদ্র দিব্যেন্দুর জন্য লীলার মনের অতি সঙ্কীর্ণ কোণেও এতটুকু সামান্য স্থান নাই—দিব্যেন্দু বৃথা মরীচিকার আশায় লুব্ধ মৃগের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, আপনার মৃত্যু আপনি ডাকিয়া আনিতেছে; কিন্তু উপায় নাই। লীলা যাহা সঙ্কল্প করিয়াছে, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবেই, জগতে এমন কোনও শক্তি নাই যে, তাহাকে উহা হইতে বিচ্যুত করিতে পারে। এক উপায়:—পলায়ন; কিন্তু কে অন্ধ দিব্যেন্দুকে পথ দেখাইয়া দিবে? দিলেই বা সে সত্য পথ বলিয়া তাহা গ্রহণ করিবে কেন? রাধারাণী যখন ভাবিয়া কুল পাইত না, তখন হিন্দুর মেয়ের যাহা সান্ত্বনা, তাহাই দিয়া মনকে বুঝাইত,—বিধাতার মনে যাহা আছে, তাহাই হইবে, সে কে যে সেই বিধানে বাধা দিবে?

ইদানীং কখনও কখনও দিব্যেন্দু দ্বিপ্রহরে সুরেশচন্দ্রের অনুপস্থিতিতেও লীলার সহিত সঙ্গীতের আলাপ করিতে তাহাদের গৃহে আগমন করিত। রাধারাণী দেখিয়াছিল, এই অনুগ্রহ এ যাবৎ কোন বন্ধু বা পরিচিতের ভাগ্যে ঘটে নাই। সে ত নগণ্য, তাহাকে ত উহারা 'গ্রাহ্যের' মধ্যেই আনিত না, কিন্তু তাহাদের দাদা? তাঁহার মতামত লইয়া তাঁহাকে জানাইয়া ত এই মিলামিশা করা সঙ্গত ছিল! কিন্তু—কিন্তু—সে কথা কহিবার সে কে? যে পরের অন্নের ভিখারী, তাহার এ সমস্ত অনধিকারচর্চ্চার কি প্রয়োজন? রাধারাণী মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দিত। সে কত দিন দিব্যেন্দুর প্রতি লীলার সহাস্য কটাক্ষনিক্ষেপ লক্ষ্য করিয়াছে, কত দিন দিব্যেন্দুকে লীলার নবকিশলয়তুল্য চম্পকাঙ্গুলী ধারণ করিয়া পিয়ানোর চাবীতে নূতন সুর তুলিতে শিক্ষা দিতে দেখিয়াছে, কত দিন উভয়ের মধ্যে মধুর কটাক্ষ-বিনিময় হইতে দেখিয়াছে; কিন্তু সে কি করিবে, সে নিরুপায়, সে পরের পোষ্য! এক দিন লীলা ক্ষণেকের জন্য বাটীর মধ্যে গেলে সে আর থাকিতে না পারিয়া মৃদু ভর্ৎসনার সুরে বলিয়াছিল, "দিব্যেন্দু বাবু, আপনি রেলের চাকুরীতে যাবেন না?" দিব্যেন্দু তাহার উত্তরে হাসিয়া বলিয়াছিল, "কেন গো, রাণি! আমায় তাড়াতে পারলেই কি বাঁচ?" রাধারাণী গম্ভীর হইয়া বলিয়াছিল, "না, তা না! তবে গান শেখাতে আসেন, বা যা করেন,তা দাদাকে জানিয়ে করেন না কেন?" দিব্যেন্দু ক্ষণেক বিস্ময়-বিস্ফারিতনেত্রে তাহার দিকে তাকাইয়া বলিয়াছিল, "এতটা লক্ষ্য করেছ, রাণি? আমি ভাবতুম, তুমি এ মাটীর নও। যাক্, তোমার ভাবনা নেই, দাদাকে জানিয়ে শীগ্‌গিরই আমার পাওনা আদায় ক'রে নেব।" আর কথা হয় নাই, লীলা আসিয়া পড়িয়াছিল।

সে দিন লীলা ও দিব্যেন্দু পিয়ানো ও এস্‌রাজের কসরৎ অভ্যাস করিতেছিল। রাধারাণী অসুস্থ, ভিতরে শয়ন করিয়াছিল। দিব্যেন্দু পিয়ানোর চাবীতে লীলার অঙ্গুলী নির্দ্দিষ্ট স্থানে সন্নিবিষ্ট করিতে গিয়া হঠাৎ পুষ্পধন্বার পুষ্পধনুর পুষ্পতুলা সুন্দর অঙ্গুলীগুলি মুহূর্ত্তের জন্য চাপিয়া ধরিয়া একাগ্রচিত্তে লীলার আরক্ত আননের দিকে চাহিয়া রহিল। লীলার নীলোৎপলদল তুল্য আয়ত নয়নের উপর দিয়া তখন কি একটা বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গ চকিতে দেখা দিয়া মিলাইয়া গেল, লীলা চক্ষু অবনত না করিয়াই দিব্যেন্দুর কোমল স্পর্শের প্রতিদান দিল। দিব্যেন্দুর নয়নে তখন কি ভাব বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা সে-ই বলিতে পারে, লীলা সে ভাবসাগরে ডুব দিয়া তাহার অন্ত পাইল না। দিব্যেন্দু এক হস্তে লীলার কোমল হাতখানি আবদ্ধ রাখিয়া অন্য হস্ত তাহার অংসোপরি স্থাপন করিয়া ভাবকম্পিতকণ্ঠে বলিল, "লীলা, একটা কথা কিছু দিন থেকে বল্‌ব বল্‌ব মনে করছি, কিন্তু—"

"কিন্তু কি?"

"কিন্তু বলি বলি করেও সাহসে কুলায় না। কি জানি হাতের পাশা ফেলে দিয়ে যদি সর্ব্বস্বান্ত হই!"

"তবে ফেল্‌তে চাইছ কেন?"

"ভাগ্য পরীক্ষা করতে চাই—শীগ্‌গির চ'লে যাচ্ছি কি না।"

"যে পুরুষের সাহস নেই, সে কেমন পুরুষ?"

"আমিও তাই ভাবি। তবে একটা দিক পরিষ্কার ক'রে রেখেছি আগে থেকে, সুরেশদাকে বলেছি আমার কথা, কেবল তোমার মুখের জবাবের ওপর এখন সব নির্ভর করছে।"

যেন কিছুই বুঝিতে পারে নাই, এমন ভাব দেখাইয়া, লীলা বিস্মিতভাবে বলিল,—"আমার জবাব? সে কি?"

"হাঁ লীলা, তোমার জবাব—সে জবাবের উপর আমার ভবিষ্যৎ, আমার সুখ-দুঃখ, আমার জীবন-মরণ সব নির্ভর করছে।" ভাবের আবেগে দিব্যেন্দুর হাতখানা থর্ থর্ কাঁপিতেছিল, লীলা নিজ হস্ত দ্বারা তাহা স্পষ্টই অনুভব করিতেছিল। কিন্তু তাহার কোনও ভাবান্তর লক্ষিত হইল না, কেবল দিব্যেন্দু বুঝিল, একটা নিশ্চিত বিজয়গর্ব্বের উজ্জ্বল রেখা তাহার বিদ্যুদ্দামদীপ্ত নীলোৎপল নয়ন-তারকায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে কেবল ঈষৎ হাস্য-স্ফুরিত অধরে জিজ্ঞাসা করিল,—"দাদাকে বলেছিলে তোমার কথা? দাদা কি বল্লে?"

"আমার প্রস্তাব তিনি সানন্দে গ্রহণ করেছেন।"

"সবই করেছ, কেবল আমার অনুমতির অপেক্ষা রাখ নি?"

"তাই ত আজ সেই ভিক্ষা চাইতে এসেছি, লীলা!"

হঠাৎ লীলার মুখভাব পরিবর্ত্তিত হইল, সে দিব্যেন্দুর বন্ধন হইতে আপনার হস্ত মুক্ত করিয়া লইয়া স্থির অকম্পিত দৃষ্টিতে মুহূর্ত্তমাত্র তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পর পরুষকণ্ঠে বলিল, "আসলেই ভুল ক'রে ফেল্লে, দিব্যেন্দু বাবু? যার সম্মতি সকলের আগে দরকার, তার কাছেই শেষে এসেছ ভিক্ষে চাইতে? তোমার এ বুদ্ধির আমি প্রশংসা করতে পারলুম না।"

দিব্যেন্দু বিশেষ বিচলিত হইবার ভাব দেখাইয়া ব্যস্ত হইয়া বলিল, "যার অনুমতি সকলের আগে দরকার, তার কাছে অবশেষে যাব বটে, তবে তার আগে তোমার অনুমতি নেওয়াটা আরও দরকার ব'লে মনে করি।"

"কি বল্ছেন দিব্যেন্দু বাবু?" বিস্মিত লীলার মুখে এই প্রশ্ন উচ্চারিত হইল।

"ঠিকই বল্ছি, শেষ ত রাণীর কাছে যাবই—"

চমকিত হইয়া বাধা দিয়া লীলা বলিল, "রাণীর কাছে?"

"হাঁ, রাণীর কাছেই শেষ যেতে হবে বৈ কি!"

লীলা বিরক্তির সুরে বলিল, "তার কাছে অনুমতি নেবার সঙ্গে আমাদের দু'জনের বোঝাপড়ার কি সম্পর্ক থাকতে পারে, বুঝতে পারছি না।" কথাটা বলিয়াই লীলা দাঁড়াইয়া উঠিয়া সগর্ব্বে মাথা তুলিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, "শুনুন দিব্যেন্দু বাবু! আপনার স্পর্দ্ধার দৌড় আরও কত দূর, কিছু দিন আগে মনে করেছিলুম, আরও কিছু দিন পরীক্ষা ক'রে তা দেখবো। কিন্তু আপনিই যখন সে সুযোগের আর অবসর দিলেন না, তখন কথাটা খোলসা করেই আপনাকে বুঝিয়ে দিতে হ'ল। আপনার মত অবস্থার লোক যত-টুকু আশা করতে পারে, আপনি তার অনেক উঁচুতে হাত বাড়িয়েছিলেন, এ কথাটা কি তলিয়ে বোঝবার মত শক্তিও আপনার নেই? আপনার সঙ্গে হাসি, খেলি, দাঁড়াই বলেই কি বুঝতে হবে, আমাদের মধ্যে বন্ধুত্বের বেশী আরও কিছু ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ মাথা কাড়া দিয়ে উঠেছে? পুরুষে পুরুষে যে বন্ধুত্ব হয়, শিক্ষিত পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে সে বন্ধুত্ব হ'তে পারে, এখনকার দিনে সে সম্ভাবনার যুগ উপস্থিত হলেও আপনার শিক্ষার দৈন্য কি তা আপনাকে বুঝতে দেয় নি? যে গণ্ডীর মধ্যে আপনার শিক্ষা সীমাবদ্ধ হয়ে রয়েছে, আপনার উচিত, সেই গণ্ডীর মধ্য থেকে আপনার যোগ্য জীবন-সঙ্গিনীর যোগাড় ক'রে নেওয়া। সে গণ্ডীর মধ্যে আপনি খুঁজলে হয় ত রাধারাণীর মত অনেক পাত্রী পেতে পারেন, কিন্তু ব্যারিষ্টার সুরেশচন্দ্রের ভগিনী লীলাকে পেতে পারেন না।" কথাটা বলিবার সময় লীলার মুখে চোখে যে দর্প ও দম্ভের রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা দিব্যেন্দু তাহারই সমবয়স্কা তরুণীর মুখাকৃতিতে কখনও দেখে নাই।

কিন্তু লীলা যদি মনে ভাবিয়া রাখিয়াছিল যে, এই উত্তরে দিব্যেন্দু একবারে পাংশুবর্ণ ধারণ করিয়া ভূমিশয্যা গ্রহণ করিবে, তাহা হইলে সে বিষম ভুল করিয়াছিল। বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ হওয়া দূরে থাকুক, দিব্যেন্দু পূর্ণ সপ্রতিভভাবেই সহাস্যে জবাব দিল, "বাঃ! তুমি আমার মনের কথাটা টেনে বার করেছ দেখছি যে! আমি ত রাণীর মত পাত্রীর কথাই বলছিলাম তোমাকে। তা কি এতক্ষণ বুঝতে পার নি? হাঃ হাঃ হাঃ!"

লীলার গর্ব্বদীপ্ত কঠোর শ্রী মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, তাহার মুখে তখন বিস্ময় কি ক্রোধের মাত্রা অধিক আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, তাহা বুঝা যাইতেছিল না! শুষ্ক মুখে সে বলিল, "রাণীর মত পাত্রী?—রাধারাণীর মত? সে কি? আপনি তবে এতক্ষণ আমার কাছে কাকে ভিক্ষা করছিলেন?"

দিব্যেন্দু উচ্চ হাস্য করিয়া বলিল, "ও হরি! তাও বুঝতে পার নি এতক্ষণ, লীলা? সুরেশদার কাছে আমি রাণীকে চেয়েছি, এখন তোমার কাছেও চাইছি; তোমরা এর অভিভাবক,

তোমাদের সম্মতি না পেলে ত আর তার কাছে কথা পাড়তে পারি না। আশা করি, এ ভিক্ষায় বঞ্চিত হব না।"

লীলা পড়িয়া যাইতেছিল, চেয়ারের হাতলটা ধরিয়া বসিয়া পড়িল, তাহার মুখে অন্য কথা সরিল না, সে কেবল অস্ফুট স্বরে ভয়কণ্ঠে বলিল, "রাণী? রাধারাণী?"

"হাঁ লীলা, রাণী, তোমাদের রাধারাণী। তাকে আমার হাতে দিতে সুরেশদার কোনও আপত্তি নেই। সবটা শুন্‌লে তোমারও আপত্তি থাকবে না বোধ হয়। আমি নেহাৎ ভবঘুরে নই। পলাশডাঙ্গার দত্তদের আমিও এক জন। শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হলেও দত্তদের ছোট তরফের জমীদার। এত দিন কেবল দেশবিদেশ ঘুরেই কাটিয়েছি, রেলে রেলেই আমার অনেক সময় কেটেছে। যে বরেন দত্তের হঠাৎ মৃত্যুর কথা সে দিন কাগজে পড়ছিলেন, তার বাপ আমারই জ্যেঠতাত, তাঁর বিষয় আশয় ত আমাকে দিয়ে গিয়েছেন শুনছিলুম। কাযেই আমার হাতে রাণীকে দিতে আপনারও কোন আপত্তি হবে না, এ আশা করতে পারি! কি বলেন?"

ব্যর্থ ক্রোধে লীলার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছিল না। সে কোনও জবাব না দিয়াই কক্ষ ত্যাগ করিল। কেবল যাইবার সময় বলিয়া গেল, "ওঃ, তা হ'লে আপনার রেলের চাকুরী-টাকুরী করার কথা সব জুচ্চুরি।"

দিব্যেন্দু একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িল এবং রুমাল দিয়া ললাটের স্বেদাশ্রু মুছিয়া ফেলিল। সে ভাবিতেছিল, ভাল করিলাম, কি মন্দ করিলাম! এ আঘাত দিয়া সে কি সুখানুভব করিয়াছিল? নারীর প্রতি শ্রদ্ধা-প্রদর্শনে সে কাহারও ন্যূন নহে।

কতক্ষণ সে এই ভাবনায় তন্ময় হইয়া ছিল, জানে না, হঠাৎ কাহার প্রশ্নে চমকিত হইয়া সে পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিল।

"লীলার কি হয়েছে দিব্যেন্দু বাবু? সে এ ঘর থেকে গিয়ে মাথা ধরেছে ব'লে, ঘরে দোর বন্ধ ক'রে দিলে। তার চোখে জল কেন?"

দিব্যেন্দুর আঁধার-করা আকাশের মত মুখের মাঝে যেন তৎক্ষণাৎ বিদ্যুতালোকের মত আনন্দ ও হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া রাধারাণীর পথ আগুলিয়া বলিল, "তা ত জানি না, রাণি! তবে তার কাছে একটা বড় রকমের ভিক্ষে চেয়েছিলুম, তাতে যদি সে আমার বামনের চাঁদ ধরার আশা দেখে বিরক্ত হয়ে থাকে, তা সম্ভব হ'তে পারে।"

রাধারাণীর বক্ষঃস্থল দুরু দুরু কাঁপিয়া উঠিল—সে যাহা আশঙ্কা করিতেছিল, তাহাই হইয়াছে। ইঙ্গিতে সে দুই একবার দিব্যেন্দু বাবুকে সাবধান করিয়া দিয়াছে, কিন্তু—কিন্তু—আগুনে ঝাঁপ দিলে দেহ দগ্ধ হয় জানিয়াও পতঙ্গ আগুনে ঝাঁপ দিতে ত দ্বিধাবোধ করে না। সমবেদনায় তাহার কোমল অন্তর ভরিয়া উঠিল। সে অশ্রু-সজল দৃষ্টিতে প্রায় বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "আপনাকে ত আমি আগে আপনার চাকুরীতে চ'লে যেতে বলেছিলুম।"

দিব্যেন্দু অগ্রসর হইয়া গভীর প্রেমভরে রাধারাণীর হাত দুইখানি দুই হাতে ধরিয়া কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "চাকুরীতেই ভর্ত্তি হচ্ছি রাণি—তবে রেলে নয়, আমার রাণীর রাজত্বে! কেবল তোমার অনুমতির অপেক্ষায় আছি।"

রাধারাণী বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া, তাহার হস্ত মুক্ত করিয়া লইল এবং ভিতরে যাইবার জন্য অগ্রসর হইল, অস্ফুট স্বরে বলিল, "পথ ছাড়ুন।"

দিব্যেন্দুর কণ্ঠস্বর আরও গাঢ় হইল, সে বলিল, "কেন, বিশ্বাস হ'ল না? সত্যিই রাণি, আমি তোমায় লীলার কাছে ভিক্ষে চাইতে এসেছিলুম, সুরেশদা এর আগেই সে ভিক্ষা মঞ্জুর করেছেন। বল রাণি, তুমি আমার রাণি, হবে কি না?"

রাধারাণীর মুখখানি লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল, সে মহা ফাঁপরে পড়িয়া বলিল, "দয়া ক'রে পথ ছেড়ে দিন, কি যে বল্‌ছেন—"

দিব্যেন্দু বলিল, "পথ ত ছাড়বার নয়, যে পথেই যাও, আমাদের দু'জনকেই যে সেই পথ ইহজন্মে বেছে নিতে হবে।"

* * * * *

বিবাহের পর যখন দিব্যেন্দু পত্নীকে লইয়া পলাশডাঙ্গায় গিয়াছিল, তখন এক দিন রাধারাণী বলিয়াছিল, "কি যে তোমার পছন্দ! বিদ্যুতের কাছে জোনাকী!" উত্তরে দিব্যেন্দু তাহার মুখখানি বুকে তুলিয়া লইয়া বলিয়াছিল, "বিদ্যুতের আলোয় আমার চোখ ঝল্‌সে যায়, আমার পিদ্দীমের আলোতেই ঘর আলো হবে।"

শ্রীসত্যেন্দ্র কুমার বসু

বৃদ্ধের লালসা

১

কার্টার কোম্পানীর আফিসে আজ শোকের প্রবাহ ছুটিয়াছে। আফিসের বড় বাবু শ্রীল শ্রীযুক্ত অনাদিমোহন ঘোষের স্ত্রীবিয়োগ ঘটিয়াছে। এ দুর্জ্জয় দুঃখের দিনে কেরাণী, মুহুরী, চাপরাশী সকলেই চোখে কাপড় দিয়া দুর্নিবার নয়নবারি নিবারণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। কোন কোন বাবু রুমালে বা চাদরে অশ্রুপ্রবাহ নিবারণ করিতে অসমর্থ হইয়া বাহিরে উঠিয়া যাইতেছেন এবং দুই এক ঘণ্টা পরে ফিরিয়া আসিতেছেন। শোকের বেগ এতই প্রবল যে, যখন বাবুরা আফিস-ঘরে ফিরিতেছেন, তখন তাঁহাদের কথা কহিবার শক্তি থাকিতেছে না—মুখগহ্বর তাম্বুল-দোক্তায় পূর্ণ। তাঁহারা যখন দেখিতেছেন, বড় বাবু তাঁহাদের দিকে নয়ন ফিরাইতেছেন, তখন তাঁহারা বসনপ্রান্ত উঠাইয়া চক্ষু মুছিতেছেন। কেহ বা রুমাল চোখের কাছে ধরিয়াই রাখিয়াছেন, প্রয়োজন হইলে—অর্থাৎ বড় বাবুর দৃষ্টিপাত হইবার উপক্রম হইলে—চক্ষু মুছিতেছেন। কেহ নাক ঝাড়িতেছেন, কেহ চক্ষু মুছিতেছেন, কেহ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছেন। আফিস-ঘর আজ শোকপ্রবাহে প্লাবিত, শোকের ধ্বনিতে মুখরিত। বড় বাবু দেখিলেন, তাঁহার পাদগ্রীবীরা শোকে এতই আচ্ছন্ন যে, তাহারা কায করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। তিনি সশব্দ দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন, "কায কর হে, কেঁদে আর কি হবে?"

অনুগত কালীনাথ কহিল, "কান্না যে আপনা হ'তে আসছে—আহা মা লক্ষ্মী—" বাকিটা শোনা গেল না—শোকোচ্ছ্বাসের মধ্যে বিলীন হইয়া গেল।

অনাদি কহিলেন, "কাঁদলে যদি তাঁকে পাওয়া যেত, তা হ'লে—"

মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া অমৃত কেরাণী কহিল, "তা হ'লে আমরা সাঁড়াসাঁড়ির বান চোখে ডাকাতাম।"

তারাপদ বড় বেশী কথা জানিত না; শুধু কহিল, "হুঁ।"

বড় বাবু। ফিরে যখন তাঁকে পাওয়া যাবে না—

অমৃত। আজ্ঞে না—

বড় বাবু। তখন—

অমৃত। তখন নূতন ক'রে সংসার করাই ভাল।

বড় বাবু। তুমি এ কি বল্‌ছ অমৃত? আমার আটটা ছেলে-মেয়ে, তেরটা নাতি-নাতনী, আমি আবার বিয়ে করব?

অমৃত। আজ্ঞে, তারা ত আপনাকে রোগে, শোকে কেউ দেখবে না—নিজের ছেলে-মেয়ে নিয়ে ব্যস্ত।

বড় বাবু। না, ছোট বউমা আমার খুব সেবা করে।

অমৃত। সে আর ক'দিন? যে ক'দিন না তাঁর ছেলে-মেয়ে হয়। কিন্তু আপনার যদি ব্যামো-স্যামো হয়—মা কালীর ইচ্ছেয় না হোক—কিন্তু যদি হয়—এই হাঁপানি-বহুমূত্র, অর্শ রোগে যে আপনি কষ্ট পাচ্ছেন—

বড় বাবু। তা' ঠিক—

অমৃত। আপনার সেবা করবার এক জন ত চাই।

বড় বাবু। তা ঠিক; কিন্তু এই বুড়ো বয়েসে বিয়ে করা—

অমৃত। বয়েস আর আপনার কি এমন হয়েছে—

বড় বাবু। তা ঢের হয়েছে বৈ কি।

অমৃত। এই যদু খুড়ো ত সাড়ে তিন কুড়ি বয়েসে বিয়ে ক'রে বউ ঘরে আনলে, তার আবার বছর বছর ছেলে—

বড় বাবু। খুড়ো আমার চেয়ে ঢের বড়।

অমৃত। আমিও ত তাই বলছি, আপনার আর কি বয়েস হয়েছে। একটি বড় দেখে মেয়ে নিলে সব মানিয়ে যাবে।

বড় বাবু। ছিঃ, বিয়ের কথা আজ তোলে! পরশু রাতে এই সর্ব্বনাশ ঘটেছে।

অমৃত। আজ না তুলি, কাল ত তুলতে হবে—আপনি কষ্ট পাবেন, একটু জল চেয়ে পাঁচ মিনিট ব'সে থাকবেন, এ আমি চোখে দেখতে পারব না!

বড় বাবু। তোমার মত হিতৈষী বন্ধু আমার কমই আছে অমৃত; তা তুমি যা ভাল বিবেচনা কর—বুঝলে কি না—এখন ত আমার বুদ্ধি-শুদ্ধি নেই—

অমৃত। ক'নে আমি ঠিক ক'রে ফেলিছি।

বড় বাবু। বল কি?

অমৃত। এই তারাপদর বেশ একটি ডাগর মেয়ে আছে—চমৎকার সুন্দরী—আপনার সঙ্গে বেশ মানাবে।

কালীনাথ এ কথাটা আগে বলিতে পারিল না বলিয়া বড়ই মনস্তাপ পাইল। অমৃতটা সব বলিয়া ফেলিয়াছে, বাকি কিছু রাখে নাই। সুতরাং অমৃতকে সমর্থন করা ছাড়া তাহার আর উপায় নাই। কহিল, "চমৎকার মেয়ে, আপনার যুগ্যি বটে।"

অমৃত। তা যদি বল কালীদা, তা হ'লে আমাকে সত্যি কথা বলতে হবে,—বড় বাবুর যুগ্যি মেয়ে কলকাতা সহরে নেই।

বড় বাবু। তা থাকবে না কেন—তা তারাপদর মেয়েটির বয়েস কত?

অমৃত। পনর ষোল বছর হবে।

বড় বাবু। এত দিন বিয়ে হয় নি কেন?

অমৃত। টাকা কোথায় যে বিয়ে দেবে? মাইনে পায় ত মোটে চল্লিশটি টাকা; তা খাবেই বা কি, আর জমাবেই বা কি?

বড় বাবু। আহা, বেচারির বড় কষ্ট ত! তুমি ভেবো না তারাপদ, আমি সায়েবকে ব'লে তোমার দশটি টাকা মাইনে বাড়িয়ে দেব।

তারাপদ। আপনিই ত মনিব,—সায়েব আবার কে?

বড় বাবু তারাপদকে কোন কালেই পছন্দ করিতেন না; আজ সহসা তাহাকে পছন্দ করিয়া ফেলিলেন। যাহার গৃহে চমৎকারিণী ষোড়শী, তাহাকে অপছন্দ করা যায় না।

পাঁচটা বাজিয়া গেল। বড় বাবু তাঁহার বিপুল দেহ কোন রকমে টানিয়া তুলিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। কথা এই স্থির হইল, তিনি এক দিন সদলে মেয়েটিকে দেখিয়া আসিবেন। তারাপদ কোন কথা কহিল না—তাহার মতামত লইবার যে কোন প্রয়োজন আছে, তাহা কেহ মনে করিল না।

২

জমীদার দেবেন্দ্রনাথ বসুর বিশাল অট্টালিকা বাগবাজার রোডের উপর। তাঁহার জমীদারী গয়া জিলাতেই বেশী, কিছু কিছু বারাসতের কাছে আছে। তাহা ছাড়া কলিকাতাতে তাঁহার কয়েকখানা বাড়ী ভাড়া খাটিতেছে। দেবেন বাবুর অর্থ প্রচুর, কিন্তু তাহা ভোগ করিবার লোক খুব কম। স্ত্রী ও পুত্র ছাড়া তাঁহার আপন বলিতে কেহ নাই। বিশাল অট্টালিকায় দুই চারিটি প্রাণী থাকিলে বড়ই ফাঁকা ফাঁকা লাগে, তাই কতকগুলি পোষ্য ও কুপোষ্য আনিয়া গৃহ পূর্ণ করিয়াছেন।

পুত্র হেমেন্দ্রনাথ তিনটা পাস দিয়া বাড়ীতে বসিয়া আছেন। নিতান্ত বেকার থাকা ভাল দেখায় না বলিয়া তিনি বাড়ীতে একটা দাতব্য চিকিৎসালয় খুলিয়াছেন এবং বই দেখিয়া হোমিওপ্যাথি ঔষধ বিতরণ করেন। মাঝে মাঝে গয়া, বারাসত, হুগলী ঘুরিয়া আসেন এবং কিছু টাকাও লইয়া আসেন। কর্ত্তা সে টাকা গ্রহণ করেন না।

জননী সরোজকুমারীর ইচ্ছা, একটি চাঁদপানা বউ আসিয়া তাঁহার ঘর উজ্জ্বল করে। কর্ত্তারও তাহাই ইচ্ছা। কিন্তু হেম বিবাহ করিতে সম্মত নহে। জননী জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া জানিয়াছেন, হেম কোন এক দরিদ্র-কন্যাকে ভালবাসিয়াছে। যদি তাহাকে পায়, তাহা হইলে সে বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছে। সরোজকুমারী একদা সন্ধ্যায় স্বামীকে কহিলেন, "তা হেম কাকে বিয়ে করতে চায়, তারই সঙ্গে বিয়ে দেও না কেন?"

"তা কি হয়?—সে যে গরীবের মেয়ে।"

"হোক গরীব, আমরা ত আর গয়না টাকা চাইছি নে।"

"গরীবমাত্রেই ছোট লোক, ছোট লোকের মেয়ে আমার ঘরের বউ হ'তে পারে না।"

"তুমি মেয়েটিকে দেখ শোন, কি রকম ঘর—"

"সে সব দেখতে হবে না; যখন গরীব, তখন সবই বোঝা গেছে।"

"এ যে তোমার ভারি অন্যায়। মেয়েটিকে দেখলে না, কোন পরিচয় নিলে না—"

"দেখব আর কি, বুঝতেই পারছি, মেয়েটি ডাগর, খুব চতুর, গোল গোল চোখ, বেঁড়ে নাক, মোটরের হুডের মত দরাজ কপাল—ও সব মেয়ে আমার ঘরে ঢুকতে পাবে না।"

এমন সময় হেম আসিয়া কহিল, "মা, আমি থিয়েটারে যাচ্ছি।"

মা। খেয়ে যা।

ছেলে। এসে খাব—বেশীক্ষণ সেখানে থাকব না।

বাপ। তবে পয়সা খরচ ক'রে যাবার দরকার কি?

ছেলে। আজ সাহায্য-রজনী—

বাপ। কার সাহায্য? যাঁরা ফণ্ড খুলেছেন, তাঁদের, না—

ছেলে। উড়িষ্যা যে ভেসে গেছে বাবা, কত লোক নিরাশ্রয়, উপবাসী,—গাছের উপর জলের উপর ব'সে রয়েছে—

বাপ। তবে যাও—সব চেয়ে বেশী দামের টিকিট নিও।

পুত্র প্রস্থান করিল। একটু পরে নীচে গোলমাল শুনা গেল। কর্ত্তা উঠিয়া দেখিলেন, বহু লোক তাঁহার গৃহ-প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া 'মার' 'মার' শব্দে চীৎকার করিতেছে। দেবেন্দ্রনাথ ত্রস্তগতি নীচে নামিয়া আসিলেন। বারান্দায় আসিয়া দেখিলেন, দুই ব্যক্তি তাঁহার সহিস-কোচম্যানকে প্রহার করিতেছে, আর কয়েক ব্যক্তি মারিবে বলিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। দেবেন্দ্র বাবু চকিত উভয় দলের মধ্যে পড়িয়া অনুচ্চাদৃঢ়কণ্ঠে কহিলেন, "স'রে দাঁড়াও।"

আক্রমণকারীরা নিরস্ত হইল। দেবেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে?"

জনৈক আক্রমণকারী।—এরা মুসলমান—মুসলমান দেখলেই আমরা মারব।

দেবেন্দ্র।—এরা আমার সন্তান—সাধ্য থাকে, এগিয়ে এস।

বলিয়া সহিস-কোচম্যানকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া বুকের দিকে টানিলেন। এক ব্যক্তি কহিল, "আপনি হিন্দুর শত্রুকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন?"

"মুসলমানমাত্রেই হিন্দুর শত্রু নয়, যারা অজ্ঞ, বুদ্ধিহীন, তারাই শত্রুতা করে—তোমরা যাও, আর কখন এ দিকে এসো না।"

জনতা প্রস্থান করিল।

দেবেন্দ্র বাবুর বাড়ীর পশ্চাদ্ভাগে একটি অনতিবৃহৎ পুষ্করিণী আছে। সেই পুষ্করিণীর সন্নিকটে কয়েকখানি খোলার ঘর। তাহারই একটিতে তারাপদ সপরিবারে বাস করে। তাহার অর্থ নাই, কিন্তু সন্তান-সন্ততি প্রচুর। সকলের চেয়ে যেটি বড়, সেটি কন্যা—নাম কমলা—বয়স পনর বৎসর। তাহার রূপ অতুলনীয়। যাঁহারা বৈকুণ্ঠের কমলাকে দেখিয়াছেন, তাঁহারা সেই দেবীর সহিত তারাপদদুহিতা কমলার তুলনা করিয়া থাকেন। আমাদের ভাগ্যে দেবীদর্শন ঘটে নাই, সুতরাং এ সম্বন্ধে আমরা বিশেষ করিয়া কিছু বলিতে পারি না।

সপার্ষদ অনাদি বাবু আজ সন্ধ্যার পর কমলাকে দেখিতে আসিবেন, এইরূপ কথা আছে। তারাপদ-গৃহিণী উষার ইচ্ছা নহে, বুড়ার সহিত কমলার বিবাহ হয়। তারাপদরও তেমন ইচ্ছা নাই। কিন্তু কি করেন? বিবাহ না দিলে হয় ত তাঁহার চাকরী যাইবে। সম্প্রতি দশটি টাকা বেতন-বৃদ্ধির আশা পাইয়াছেন, ভবিষ্যতে আরও বাড়িবার সম্ভাবনা। এক দিকে আর্থিক উন্নতি, অন্য দিকে কন্যার ক্লিষ্ট বদন। দুর্ব্বলচিত্ত তারাপদ কিছু স্থির করিতে না পারিয়া গৃহিণীর শরণাপন্ন হইলেন। গৃহিণী কহিলেন, "পিতা হয়ে সন্তানকে ভাসিয়ে দিও না।" ছুটিয়া গিয়া তারাপদ আফিস-বন্ধু অমৃতলালকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি কহিলেন, "সকলের আগে অর্থ, নইলে খাবে কি?" তারাপদ আবার গৃহিণীর শরণাপন্ন হইলেন। এইরূপ করিতে করিতে এক দিন অনাদি বাবুর শুভাগমনের দিন স্থির হইল।

কিন্তু যাহার বিবাহ, তাহাকে কোন কথা কেহ জিজ্ঞাসা করে নাই। কেনই বা করিবে? ছাগশিশুকে যূপকাষ্ঠের নিকটে আনিয়া, সে প্রাণ দিতে সম্মত আছে কি না, কেহ ত তাহা জিজ্ঞাসা করে না। মরিতে আপত্তি করিলেও কেহ তাহা শুনে না—তাহাকে মরিতেই হয়। তবে বধার্থ আনীত পশু একবার কণ্ঠ ছাড়িয়া চীৎকার করে, মুক্তি পাইবার একটু চেষ্টা করে। কিন্তু বাঙ্গালার দরিদ্র পিতার সন্তান

আত্মরক্ষার্থে একবার একটু চীৎকার করিবার অবসর পায় না—তাহাকে অবসর দেওয়া হয় না।

কমলা হৃদয়ে বসাইয়াছিল রূপ-গুণে বাসবতুল্য হেমেন্দ্রনাথকে, তাহার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইতেছিল এক কদাকার হৃদয়হীন বৃদ্ধের সঙ্গে। খড়্গকে হননোদ্যত দেখিয়া ছাগশিশু যেটুকু চীৎকার করে, কমলা সেটুকু চীৎকার করিল না—নীরবে সজ্জিত হইয়া খড়্গের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

খড়্গ আসিল সন্ধ্যার পর। গৃহে স্থান অল্প, দাওয়ায় বসিবার স্থান হইয়াছিল। অনুজ্জ্বল দীপ এক পাশে জ্বলিতেছিল; কিন্তু কমলা যখন ধীরপদে আসিয়া সভাস্থ হইল, তখন সভাতল হাসিয়া উঠিল। সকলে বিস্মিত হইয়া সেই অপরূপ সৌন্দর্য্যপানে চাহিয়া রহিল। অমৃত কহিল, "এ মেয়ে আর দেখতে হবে না, কি বলেন বড় বাবু?"

বড়বাবু যে কে, তাহা মেয়েমহলে বুঝিতে বাকি রহিল না। সপারিষদ অনাদি বাবু প্রস্থান করিলে ঊষা কহিল, "আমি এ বুড়ো মোষের হাতে কিছুতেই এ প্রতিমাকে দেব না।" ও দিকে বড় বাবু কহিলেন, "কমলাকে না পেলে আমি ম'রে যাব। তোমার একশ' টাকা মাইনে ক'রে দেব তারাপদ, আমি ঘর থেকে মাইনে দেব, তোমার দেনা-পাওনা কিছু থাকে, তা-ও আমি মিটিয়ে দেব, কিন্তু কমলাকে আমার চাই-ই চাই—এমন ফুল দুনিয়ায় আছে, তা আমি জানতাম না। অমৃত আমাকে সন্ধান দিলে; অমৃত বড় কাষের লোক। তোমার কত দিন মাইনে বাড়ে নি অমৃত? আচ্ছা, আচ্ছা, এইবার কিছু বাড়বে।"

৪

দেবেন্দ্র বলিলেন, "হেম, শুনছি, তুমি না কি এক গরীবের মেয়েকে খুব সুন্দর দেখেছ?"

হেমেন্দ্র। আজ্ঞে হ্যাঁ।

দে। তাকে না কি বিয়ে করবার ইচ্ছে করেছ?

হে। ইচ্ছা ছিল বটে।

দে। এখন কি তোমার ইচ্ছা নাই?

হে। আপনার অনুমতি না পেলে আমি কোন ইচ্ছাই পোষণ করতে পারি না।

পিতা প্রীত হইলেন; কহিলেন, "গরীবরা দেখতে যেমন কুৎসিত, তাদের মনের ভাবও তেমনই কুৎসিত। সুন্দর দৃশ্য না দেখলে সুন্দর ভাব মনে আসতে পারে না। এখানে হাঁড়ি-কুড়ি, আবর্জ্জনা, ওখানে ছেঁড়া কাপড়, ময়লা বিছানা, এ সকলের মধ্যে থাকলে মনের ভাব সঙ্কুচিত হয়ে আসে। অভাবের মধ্যে মনের উদারতা বা প্রশান্ততা আসতে পারে না। এই দেখ, হরে চাকরটাকে যদি আমার বিছানায় শুইয়ে দেওয়া যায়, তা হ'লে সে সমস্ত রাত ঘুমুতে পারবে না।"

হে। সেটা অভ্যাসের দোষ নয় কি?

দে। অভ্যাসই মনকে গড়ে।

গৃহিণী সরোজকুমারী আসিয়া কহিলেন, "তোমাদের কি কথা হচ্ছে?"

দেবেন্দ্র। এই হেমকে বলছিলাম, গরীবের মেয়েকে আমি ঘরে আনতে পারব না।

সরোজ। কেন, আনলে কি তার গায়ের গন্ধ ছাড়বে?

দেবেন্দ্র। তাই ছাড়বে। কুমারি! বড় ঘরের মেয়ে যেমন গরীবের ঘরে অশোভন, গরীবের মেয়ে তেমনই বড় ঘরে মানায় না। তুমি যে বুদ্ধি ও শক্তি নিয়ে সংসারে কর্ত্তৃত্ব করবে, সে বুদ্ধি ও শক্তি দরিদ্র-কন্যার থাকতে পারে না। যে ভিখিরীর মেয়েকে তোমরা বউ ক'রে ঘরে আনতে ইচ্ছা করেছ—

সরোজ। সে ভিখিরীর মেয়ে কেন হ'তে যাবে? তোমার যেমন কথা।

দেবেন্দ্র। ওই হ'ল—যে পরমুখাপেক্ষী, সেই ভিখিরী। (পুত্র প্রতি)—তা হ'লে হেম, তুমি সে ভিখিরীর মেয়েকে বিয়ে করবার সঙ্কল্প ত্যাগ করেছ?

হে। আপনি যেরূপ আদেশ করবেন, আমি সেইরূপ করব।

দে। আমার অভিপ্রায় তুমি ত শুনেছ—

হে। শুনিছি, আপনার ইচ্ছানুযায়ী কায করব।

দে। বেশ। তা হ'লে অন্যস্থানে তোমার বিয়ের চেষ্টা দেখি?

হে। এখন থাক্।

দে। ইচ্ছা না হয়, পীড়াপীড়ি করব না; তবে তোমার গর্ভধারিণীর ইচ্ছা, একটি টুকটুকে বউ ঘরে আনেন। তা তোমরা বোঝাপড়া কর—আমি এখন নীচে যাই।

কর্ত্তা প্রস্থান করিলেন। তিনি অদৃশ্য হইলে সরোজ-কুমারী চুপি চুপি পুত্রকে কহিলেন, "আমি এক মতলব এঁটেছি।"

"কি মা?"

"আচ্ছা, সে গরীবের মেয়েটি কি খুব সুন্দর?"

"খুব সুন্দর।"

"আমার বোনঝি নিভার চেয়ে সুন্দর?"

হেম একটু হাসিয়া উত্তর করিল, "দুইয়ের মধ্যে তুলনাই হয় না!"

"এত সুন্দর! তবে ও মেয়েকে ঘরে আনতেই হবে।"

"ও কথা আর তুলো না, মা।"

"আমার মতলবটা আগে শোন না—"

"কি বল?"

"মেয়েটিকে একবার চুপি চুপি বাড়ীতে নিয়ে আসব, আমার গয়না-কাপড় দিয়ে সাজাব; তার পর কর্ত্তার সামনে গিয়ে বলব যে, এ খুব বড় ঘরের মেয়ে। তিনি সুন্দর মেয়ে দেখলে পছন্দ ক'রে বসবেন।"

"তা হয় না, মা।"

"কেন বাবা?"

"বাবার সঙ্গে আমি প্রতারণা করতে পারব না।"

"প্রতারণা করা আবার কোথা হ'ল?"

"গরীবের মেয়েকে বড় ঘরের মেয়ে ব'লে পরিচয় দেওয়াটাই প্রতারণা।"

"তা হ'লে কি হবে?"

"কি আর হবে মা, আমি এমনই থাকব।"

"তবে কি বউ দেখা আমার কপালে নেই?"

"তোমাকে সুখী করবার চেষ্টা করব, কিন্তু এখন ত পারছি না মা।"

জননীর নয়ন অশ্রুবর্ষণ করিল; পুত্রের হৃদয় রক্তবর্ষণ করিল।

৮

বড় বাবুর প্রলোভন সত্ত্বেও উষা এ বিবাহে সম্মত হইল না। স্বামী কহিলেন, "বিয়ে না দিলে চাকরী যাবে।"

"তা যায় যাক্।"

"তখন খাব কি?"

"ভগবান্ খাওয়াবেন।"

"সেটা ত গীতার কথা—কাযের কথা নয়।"

"তাই ব'লে কি মেয়েকে বলি দিতে হবে?"

"একটাকে বলি দিলে যদি আর পাঁচটা খেতে পায়, তা হ'লে সে যুক্তিটা কি শ্রেয়ঃ নয়?"

"তোমার স্বার্থপর যুক্তি রেখে দেও—আমি ঐ ঘাটের মড়ার সঙ্গে কিছুতেই মেয়ের বিয়ে দেব না।"

তারাপদ কোন উত্তর না করিয়া মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। বুলাইতে বুলাইতে মাথায় একটা বুদ্ধি আসিল; কহিলেন, "বিয়ে ত এক যায়গায় দিতেই হবে—"

"কে বলছে হবে না? যখনই বিয়ের ফুল ফুটবে, তখনই বিয়ে হবে।"

"তোমার মত আমি ত বেদান্তবাদী নই—আমাকে ত একটু চেষ্টা করতে হবে।"

"তোমাকে ত আমি মাথার দিব্যি দিয়ে চেষ্টা করতে বারণ করি নি।"

"কিন্তু যার সঙ্গতি নাই—"

"যার সঙ্গতি নাই, তাকে কি ঘাটের মড়ার হাতে মেয়ে দিতে হবে?"

বাহিরে কে ডাকিল। তারাপদ উঠিয়া গিয়া দেখিলেন, দ্বারে হেমেন্দ্রনাথ। প্রতিপত্তিশালী জমীদার-পুত্রকে তাঁহার গৃহদ্বারে দেখিয়া তারাপদ বিস্মিত হইলেন; ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "আসুন, আসুন, ভিতরে আসুন।"

"ভিতরে আর যাব না, একটা কথা ব'লে যাব।"

"আজ্ঞা করুন।"

"আপনি অপরাধ নেবেন না—এই—এই আপনার যদি টাকার দরকার হয়, তা হ'লে দয়া ক'রে আমাকে জানাবেন।"

"আমার টাকার দরকার নিয়তই ত লেগে রয়েছে, হেমেন্দ্র বাবু।"

"না, সে রকম দরকার নয়—বড় গোছের দরকার—এই ধরুন, মেয়ের বিয়ে—যা দেবার দরকার পড়লে।"

"সে ত চাড্ডিখানি টাকার কায নয়।"

"আপনাকে ত আমি বলি নি দু'চার শ' টাকার বেশী আমি দেব না।"

"বেশী টাকা দিলে আমি শোধ দেব কোথা হ'তে?

আমার ঘর-দোর চাল-চুলো কিছুই নেই—ভরসা চাকরীটুকু।"

"শোধ নাই দিলেন। আপনার মেয়ের বিয়ের ভার দয়া ক'রে আমাকে নিতে দিন—তবে পাত্রটি ভাল হওয়া চাই—টাকার জন্যে একটুও ভাববেন না।"

বলিয়া হেম দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। ঘরের ভিতর থাকিয়া ঊষা ও কমলা সকল কথা শুনিল।

দণ্ড দুই পরে সন্ধ্যার অন্ধকার যখন পৃথিবী আচ্ছন্ন করিয়াছে, তখন হেমেন্দ্রনাথ তাহাদের বাড়ীর পিছনে পুষ্করিণী-তীরে একটি আমগাছের তলায় বসিয়া অন্ধকার পানে চাহিয়া কি ভাবিতেছিল। কমলা নিঃশব্দ পদ সঞ্চারে আসিয়া অদূরে দাঁড়াইল। হেম উঠিয়া তাহাকে হাত ধরিয়া বসাইতে যাইতেছিল; বাহু প্রসারিত হইয়াছিল, আচম্বিতে বাহুদ্বয় ফিরিয়া আসিয়া বক্ষের উপর আশ্রয় লইল—বুঝি বক্ষকে চাপিয়া ধরিয়া শান্ত করিবার প্রয়াস পাইতেছিল। হেম ধীরে ধীরে কহিল, "বাবা কিছুতেই আমাদের বিয়েতে সম্মত হলেন না, কমলা।"

"তা আমি বুঝেছি।"

"কি ক'রে বুঝলে?"

"একটু আগে আপনি বাবাকে যা বলছিলেন, তা আমি শুনিছি—"

"তা হ'লে কমলা—"

"এই আমাদের শেষ সাক্ষাৎ।"

হেমের বুকের মধ্যে যে ঝড় বহিতেছিল, তাহা সশব্দে নাসিকাপথে প্রবাহিত হইল। কমলা কহিল, "দুঃখ করবেন না, আমার মত কত শত দাসী আপনার চরণসেবা করতে ছুটে আসবে।"

"অতটা নিষ্ঠুর হয়ো না, কমলা।"

"আমার একটি নিবেদন, একটি প্রার্থনা আছে।"

"বল কমলা।"

"আপনি বিয়ে করবেন।"

"আমি যে মনকে বশে আনতে পারছি না, কমলা। বংশলোপ হবে, তা বুঝেছি; মা বাপের আদেশ লঙ্ঘন ক'রে মহাপাপ করছি, তা-ও বুঝেছি, কিন্তু তোমার স্থানে আর কাউকে বসাতে মন কিছুতেই চাইছে না।"

"সময়ে নিশ্চয়ই আমাকে ভুলবেন; আমিও ভুলব। যে দিন আমি পরের ঘরে যাব, সে দিন আপনার চিন্তা মন হ'তে এককালে বিসর্জ্জন দেব। আপনিও কেন আমার মত এ ছেলেখেলা ভুলে যান না?"

"আমার ত এ ছেলে-খেলা নয় কমলা—আমার ইহকাল নিয়ে খেলা; তা নইলে বাপ-মায়ের অনুরোধ উপেক্ষিত হয়? তোমার স্মৃতি—"

"আমি কিন্তু পিছন ফিরে দেখবার একটুও অবসর পাব না—নূতন সংসার আমার ইহকাল হবে।"

"তোমাকে যে বিয়ে করতেই হবে, কমলা।"

"আপনিও কেন আমার উপর রাগ ক'রে বিয়ে ক'রে ফেলুন না?"

"পারব না কমলা—ক্ষমা কর। বিয়ে করবার হ'লে মা-বাপের কথায় করতাম—তাঁদের চেয়ে তুমি বড় নও।"

কমলা নিরুত্তর রহিল। ক্ষণপরে কহিল, "হ্যাঁ, আর একটা কথা,—আপনি বাবাকে টাকা দেবেন না।"

"কেন?"

"আমি এই বড় বাবুকেই বিয়ে করব।"

"সে কি! এই ষাট বছরের বুড়োকে তোমার পছন্দ হ'ল?"

"হ্যাঁ।"

"কেন? চুপ ক'রে রইলে কেন?—তোমাকে বলতেই হবে।"

"আপনি বুঝে দেখুন না—"

"ওঃ, বুঝেছি। তুমি তোমার মা-বাপের দুঃখ দূর করতে চাও।"

"যতটা পারি। ভাই-বোনরা ত দুটো খেতে পাবে।"

"কিন্তু তোমার সুখ—?"

"তাঁরা সুখে থাকবেন, এই চিন্তাতেই আমি সুখ পাব। ওই মা ডাকছেন—ব'লে এসেছি, আমি পুকুরে হাত-মুখ ধুতে যাচ্ছি—আরও যেন কত কথা বলবার ছিল—আমার জন্য একটুও ভাববেন না—আমি বেশ সুখে থাকব—চললুম—বিদায়—"

হেমের পদধূলি লইয়া কমলা ত্বরিতপদে প্রস্থান করিল।

৬

লাথি খাইয়া ফুটবল যেমন একবার এ-দিক আর এক-বার ও-দিক ছুটাছুটি করিয়া থাকে; তেমনই তারাপদকে দুই

দিক হইতে ঘা খাইয়া ছুটাছুটি করিতে হইল। উষা কহিলেন, "আমি ও বুড়ো হাতীর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেব না— তুমি অন্য যায়গায় চেষ্টা দেখ। এখন ত টাকা নেই বললে চলবে না।"

তারাপদ ছুটিয়া অমৃতের কাছে গেলেন। অমৃত কহিল, "বিয়ে তোমাকে দিতেই হবে, নইলে তোমার চাকরী যাবে।"

তারাপদ ফিরিয়া আসিয়া স্ত্রীকে কহিলেন, "ওগো, চাকরী যাবে বলছে যে।"

স্ত্রী উত্তর করিল, "তা যায় যাক্; হেমবাবুর কৃপায় অমন অনেক চাকরী জুটবে।"

তারাপদ ফিরিয়া আসিয়া অমৃতের কাছে কহিল, "তা কি করব ভাই, কিছুতেই গিন্নীর মত করতে পারছি না।"

অমৃত কহিল, "এখন তোমার পেছুলে চলবে না— পাকা দেখা হয়ে গেছে।"

"সে আবার কবে হ'ল ?

"আমরা সকলে গিয়ে মেয়ে দেখে এলুম্ না ? পাকা দেখা আবার কা'কে বলে ?"

"বর-ক'নে আশীর্ব্বাদ হয় নি ত—"

"লোক-দেখানো কিছু হয় নি বটে, কিন্তু মনে মনে কি আমরা ক'নেকে চিরায়ুষ্মতী হও ব'লে আশীর্ব্বাদ করি নি ? না, তুমি জামাইকে আশীর্ব্বাদ কর নি ? দেখ ত একবার কথার ছিরি !"

"আমার স্ত্রী—"

"রেখে দেও তোমার স্ত্রী ; স্ত্রী কি আর কারুর হয় না ? কথা যখন দিয়েছ—"

"আমি কোন কথাই ত এতাবৎ দিই নি।"

"মেয়ে যখন সাজিয়ে এনে দেখিয়েছ, তখনই ত কথা দেওয়া হয়েছে। কথা দেওয়া আবার কা'কে ব'লে ? দেখছি তুমি একটা পাঁড় মুখ্‌খু—আইনজ্ঞান একটুও নাই।"

"তোমরা মেয়ে দেখতে চাইলে, তাই—"

"যাও, যাও—ব'ক না ; এখন তোমাকে বিয়ে দিতেই হবে। পরশু বিয়ে, আজ বলেন কি না বিয়ে দেব না। মগের মুলুক আর কি ?"

বঙ্গদেশ যে মগের মুলুক নহে, তাহা দেখাইবার জন্য নির্দ্দিষ্ট দিবসে সন্ধ্যাকালে অমৃতলাল বরকর্ত্তা হইয়া বর ও দল লইয়া আসিলেন। ভীত ও শঙ্কিত তারাপদ বাহির হইয়া আসিয়া কহিল, "আজ্ঞে, বিয়ে দেব না, আমি ত ব'লে এসেছি।"

অমৃত।—(সরোষে) "বিয়ে দেব না বলছ কি ?— আলবৎ দিতে হবে।

তারাপদ।—বলেছি ত অমৃত বাবু, আমার স্ত্রী এ বিয়েতে সম্মত নয়।

কালীনাথ।—এমন সুপাত্র—রাজ-ঐশ্বর্য্য—আমার মেয়ে থাকলে—

অমৃত।—সে যা হয় হ'ত। এখন এ আহাম্মুকটা বলে কি ?

তারাপদ।—আমার যা বলবার তা' বলেছি।

বর।—ওহে অমৃত, রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা কাটাকাটি করছ কেন ?—চল ভেতরে যাই।

দলবল হুড়মুড় করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। যাঁহার বাড়ী, তিনি পড়িলেন সকলের পিছনে ; নাপিত ও পুরোহিতও তাঁহাকে কনুয়ের গুঁতা মারিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। তিনি আর প্রবেশ-পথ পাইলেন না। ছোট উঠান, সঙ্কীর্ণ পথ, বরযাত্রীতে ভরিয়া গিয়াছে। কাযেই তাঁহাকে বাহিরে থাকিয়া চীৎকার করিয়া পুত্রকে ডাকিতে হইল। পুত্র রাস্তার দিকের জানালায় আসিয়া দাঁড়াইলে তাহাকে কহিলেন, "তোমরা দোর বন্ধ ক'রে থাক—ওদের কথায় ভুলে খুলো না।"

(নেপথ্যে) অমৃত।—আমরা দোর ভেঙ্গে মেয়েকে নিয়ে আসব—পুরুত মশায় কৈ ?

(নেপথ্যে) বর।—আহা, জোরজবরদস্তি করছ কেন অমৃত ? মেয়ের মাকে—আমার পূজনীয়া শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে বুঝিয়ে বল না, তিনি ত আর তারাপদর মত পাগল ন'ন।

তখন অমৃত উঠান ছাড়িয়া দাওয়ায় উঠিল এবং অদৃশ্য শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইল।

৭

এ দিকে তারাপদকে রাস্তা হইতে কে ডাকিল। তিনি দ্বার হইতে সরিয়া আসিয়া দেখিলেন, পথে হেমেন্দ্রনাথ দাঁড়াইয়া তাঁহাকে ডাকিতেছেন। তারাপদ অকূলে কূল পাইলেন। হেম কহিল, "আপনি বাবার কাছে ছুটে যান।"

"দেখুন দেখি কি বিপদ্। আমি মেয়ে দেব না, ওরা জোর ক'রে—"

"আপনি আর সময় নষ্ট করবেন না—বাবার পায়ের উপর আছড়ে প'ড়ে কান্নাকাটি করবেন—যান—ছুটে যান।"

তারাপদ আর দ্বিরুক্তি না করিয়া একবস্ত্রেই ছুটিল। দেবেন্দ্রনাথ তখন বন্ধুগণসহ 'ট্রে' (তিন তাস) খেলিতেছিলেন। তারাপদ কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া কর্ত্তার পা দুইটা জড়াইয়া ধরিল; কহিল, "আমাকে রক্ষে করুন।"

কর্ত্তা চমকিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

"আপনার প্রজা—তারাপদ মিত্র।"

"আমার প্রজা? বারাসতে—"

"আমি পিছনে খোলার ঘরে থাকি।"

"ও তারপর? তোমার কি হয়েছে?

"এক দল লোক জোর ক'রে আমার বাড়ীতে ঢুকে আমার মেয়েকে বিয়ে করবে বলছে—আমাকে রক্ষে করুন।"

"বটে? মগের মুলুক পেয়েছে আর কি!—এটা বৃটিশ রাজ্য—"

প্রতিবেশী নন্দ খুড়ো ঘটনাটি বুঝাইয়া বলিলেন এবং তারাপদর পরিচয় দিয়া কহিলেন, "এই লোকটি অতি সজ্জন, আর যিনি বর সেজে এসেছেন, তিনি নরাকারে পশু।"

তারাপদ ব্যস্ত হইয়া কহিল, "এতক্ষণ কি হয়েছে, জানি না—আপনি কাঙ্গালের বন্ধু, এ নিরাশ্রয় বিপন্নকে রক্ষা করুন।"

আর কিছু বলিবার প্রয়োজন হইল না,—দেবেন্দ্র বাবু হুঙ্কার ছাড়িয়া ডাকিলেন, "দরওয়ান!"

"মহারাজ!"

"তোম্ লোক লাঠি লে কর চলা আও—তেওয়ারি, মিশির, পাঁড়ে, দোবে, সব আও! (ভৃত্যের প্রতি)—দীপন্, ছোট বাবুকে ডাক্।"

"ছোট বাবু বেরিয়ে গেছেন।"

"আচ্ছা, আমিই যাচ্ছি—সহিস-কোচম্যানকে ডাক্—ঘোড়ার চাবুকটা নিয়ে আয়।"

দেবেন্দ্র বাবু উঠিলেন। বন্ধুরা 'ক্যাসাদে' যাওয়া যুক্তি-সঙ্গত বিবেচনা না করিয়া ধূমপানে মনোনিবেশ করিলেন। এ দিকে দেবেন্দ্র বাবু ত্বরিতপদে তারাপদর গৃহদ্বারে সদলে উপস্থিত হইলেন। আসিয়া দেখিলেন, ছোট বাবু হেমেন্দ্রনাথ দ্বারপার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। পিতা কহিলেন, "আমি তোমাকে খুঁজছিলাম হেম। এই সব লোক বাড়ী চড়াও করেছে, আর তুমি চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছ?"

"আপনার হুকুম না পেলে—"

"হুকুম নিতে ত যেতে হয়।"

"তারাপদ বাবুকে আপনার কাছে পাঠিয়েছিলাম।"

দেবেন্দ্রনাথ সন্তুষ্ট হইলেন; তারাপদর পানে ফিরিয়া কহিলেন, "চল, ভেতরে যাই; দেখি কার মরবার পালক উঠেছে।"

"আজ্ঞে, ভেতরে যাবার পথ নেই।"

কর্ত্তা উঁকি মারিয়া দেখিলেন, সত্যই তাই। তখন দরওয়ানদের আদেশ করিলেন, "বিলকুল আদমী বাহার কর্ দেও।"

ছয় জন দ্বারবান্ অগ্রসর হইল এবং এক এক বরযাত্রীকে ধরিয়া বাহির করিয়া দিতে লাগিল। যখন পথ অনেকটা পরিষ্কৃত হইল, তখন দেবেন্দ্র বাবু সদলে অগ্রসর হইলেন। ভিতরে গিয়া দেখিলেন, বর একখানা পিঁড়ি টানিয়া লইয়া বসিয়াছে, আর ক'নে দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া নিকটেই দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কমলা না কি দ্বার খুলিয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বাহিরে আসিয়াছিল। কর্ত্তা সেই বৃদ্ধ বিপুলদেহ বরকে পিঁড়িতে উপবিষ্ট দেখিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং চাবুক তুলিয়া সজোরে তাহার পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিলেন। এরূপ অভ্যর্থনার জন্য বর একটুও প্রস্তুত ছিলেন না; তিনি শ্যালিকার কোমল করস্পর্শ আশা করিয়াছিলেন, তৎপরিবর্ত্তে ঘোড়ার চাবুক বড়ই অপ্রীতিকর ও যন্ত্রণাদায়ক বলিয়া তাঁহার মনে হইল। বেত্রাঘাত পুনঃ পুনঃ তাঁহার পৃষ্ঠে পড়িলে তিনি পলায়ন-তৎপর হইলেন, কিন্তু বিনা সাহায্যে উঠিবার শক্তি তাঁহার নাই। তিনি কাতরস্বরে ডাকিলেন, "অমৃত, আমাকে তুলে দেও না।" অমৃত তখন বাহিরে হেমেন্দ্রনাথের করস্পর্শসুখ অনুভব করিতেছিল এবং জনৈক ভৃত্য প্রভুর ইঙ্গিতে তাহার সর্ব্বাঙ্গে গোময় ও অশ্বপুরীষ লেপন করিতেছিল।

এ দিকে বর পুরোহিতের সাহায্যে কোন রকমে উঠিয়া পড়িয়া বাহিরে আসিলেন এবং ভৃত্যহস্তে অমৃতের লাঞ্ছনা দেখিয়া সকাতরে কহিলেন, "বাবা সকল, এ কায আর কখন আমি করব না—এই বেটা অমৃত যত নষ্টের

গোড়া—ওটাকে খুব গোবর দেও—আমাকে ছেড়ে দেও বাবা—বুড়ো মানুষ—"

ভিতরে দেবেন্দ্রনাথ তারাপদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার মেয়ে কৈ তারাপদ? এই ক'নে? তোমার ঘরে এই মেয়ে?"

কমলা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। দেবেন্দ্র কহিলেন, "বটে! এই তোমার মেয়ে। এত দিন বিয়ে দেও নি কেন?"

"আজ্ঞে, টাকা নেই—"

"তা আমাকে বলনি কেন?—তুমি ত বড় বোকা! (ভৃত্যের প্রতি)—ওরে হরে, দুটো আলো নিয়ে আয়।"

ভৃত্য সত্বর দুইটা বাতি আনিল। কর্ত্তা দ্বারবান্ প্রভৃতিকে বিদায় দিলেন, শুধু হরে রহিল। বিদায় দিয়া তিনি কমলাকে সম্মুখে দাঁড় করাইলেন এবং স্নেহ-কোমল-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি মা?"

"কমলা।"

"কমলা? বাঃ! আমি যে কমলা খুঁজে বেড়াচ্ছি। (তারাপদর প্রতি) তোমার নাম কি বললে? তারাপদ মিত্র? বেশ। আমরা বোস। (ভৃত্যের প্রতি) ওরে হরে, হেমকে ডাক ত।"

হেম আসিল। কমলা একটু জড়সড় হইয়া পড়িয়া পলায়নের উদ্যোগ করিল। কিন্তু কর্ত্তা তাহাকে সরিতে দিলেন না; পুত্র-প্রতি চাহিয়া কহিলেন, "আমার ও তোমার গর্ভধারিণীর বহুকাল হ'তে ইচ্ছে, একটি লক্ষ্মী-প্রতিমা ঘরে আনি। তা তুমি কিছুতেই রাজী নও। কোথায় কোন্ ভিখিরীর মেয়েকে দেখে ক্ষেপে গেছ—যাক সে সব কথা—বল্‌ছি কি, তুমি আর আমাদের অবাধ্য হয়ো না—যা বলি, তাই কর, দেখ দেখি কি সুন্দর মেয়ে—মা লক্ষ্মীকে ঘরে নিয়ে যাবার আমার লোভ পড়েছে—তুমি আর বাধা দিও না।"

"আপনার আদেশ ত আমি কখন লঙ্ঘন করি না।"

"তা জানি—এমন ছেলে—সে সব কথা থাক। তা হ'লে কমলাকে বিয়ে কর্‌তে তুমি সম্মত আছ?"

নতবদনে পুত্র উত্তর করিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

বলিয়াই সে অন্তরালে প্রস্থান করিল। তাহার এত হাসি আসিয়াছিল যে, সে আর তাহা লুকাইতে পারিতেছিল না। কমলারও সেই দশা; সে চঞ্চলপদে ঘরের ভিতর গিয়া মায়ের বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। কর্ত্তা এ দিকে মহানন্দে গৃহে গিয়া স্ত্রীকে কহিলেন, "ছোঁড়াদের কি পছন্দ আছে?—আমি এমন সুন্দর বউ বেছে বেছে ঠিক করেছি যে, ছেলে দেখেই ভুলে গেল।"

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বংশী-ধ্বনি

মনের মাঝে বাঁশী বাজে শোন লো ওলো সই!
চল ত্বরা লুটিয়ে আঁচল, (তারে) দেখবি যদি ওই!
তানে লয়ে সমে সুরে
ষড়্‌ঋতু মরে ঘুরে
(আবার) ধুলার বাহন চ'ড়ে পবন ছোটে ভুবনজই।

কেমন করে বাঁশী ধরা,
কেমন লো তার বাদন-ধারা—
কোন্ ফাঁকে সে সাজায় ধরা কোন্ সমে জল সই!

আমরা নারী শিখতে নারি এমনি নাকি হই,
চল আড়াল থেকে নেব দেখে (তার) গুপ্ত গানের বই
নূপুর-ধ্বনি আসছে কানে,
নাচছে পাগল আপন মনে,
নাগর-ধরা ফাঁদটি মোরা ভুলেছি কি ওই?
মনের মাঝে বাঁশী বাজে শোন লো ওলো সই!

কর্ম্ম-মীমাংসা ও বেদ

ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে কর্ম্ম-মীমাংসা বা পূর্ব্ব-মীমাংসা প্রচার ক্রমেই ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে চলিয়াছে, ইহা ভাল নহে। সনাতন হিন্দুধর্ম্মের ভিত্তিস্বরূপ বেদ ও স্মৃতি, এই বেদ ও স্মৃতির তাৎপর্য্য কি, তাহা বুঝিতে হইলে কর্ম্ম-মীমাংসা একান্ত অপেক্ষণীয়। দেশে সংস্কৃত পরীক্ষার নানা কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে ও হইতেছে, ঐ সকল কেন্দ্রে যে সকল ছাত্র পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইতেছে, তাহাদিগের মধ্যে ব্যাকরণ ও সাহিত্যের ছাত্রসংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। দর্শনের মধ্যে সাংখ্য ও বেদান্তশাস্ত্রের পরীক্ষার্থী ছাত্র অল্প-বিস্তর থাকিলেও ন্যায় ও স্মৃতির ছাত্রসংখ্যা নিতান্তই অল্প; পূর্ব্বমীমাংসার ছাত্র একবারে নাই বলিলেই চলে। ইহা দ্বারাই বুঝিতে পারা যায় যে, আমাদের দেশে পূর্ব্বমীমাংসার প্রচার একপ্রকার উঠিয়া যাইতে বসিয়াছে। ন্যায়শাস্ত্রের ছাত্রসংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প হইলেও এখনও ন্যায়শাস্ত্রের প্রতি সংস্কৃতব্যবসায়ীদিগের সম্মানবুদ্ধি যে কমে নাই, তাহার অনেক প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু পূর্ব্ব-মীমাংসার প্রতি বাঙ্গালার অধ্যাপক ও ছাত্রদের আদর বা গৌরববুদ্ধি যে নিতান্তই অল্প, এমন কি, নাই বলিলেও চলে, ইহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন। ইহা কিন্তু সংস্কৃত-শাস্ত্রের পক্ষে নিতান্তই অনিষ্টকর, ইহা আমাদিগকে ভুলিলে চলিবে না। হিন্দুর ধর্ম্ম কি, বর্ত্তমান সময়ে সেই ধর্ম্মের কাল, দেশ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুসারে কোনরূপ পরিবর্ত্তন হইতে পারে কি না এবং সেই পরিবর্ত্তন হিন্দু-শাস্ত্রকার ঋষিগণের অভিপ্রেত কি না, তাহা নির্ণয় করিবার সর্ব্বপ্রধান সহায় হইতেছে—পূর্ব্ব-মীমাংসা শাস্ত্র বা জৈমিনীয় দর্শন। সুতরাং ইহা স্থির যে, যদি আমরা জৈমিনীয় দর্শনকে উপেক্ষা করি, তাহার সিদ্ধান্ত ও যুক্তিরাশির প্রতি অনাস্থাসম্পন্ন হই, এক কথায় বলিতে গেলে যে ভাবে প্রাচীন ভারতে জৈমিনীয় দর্শনের জ্ঞান আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণের ছিল, তাহা হইতে আমরা যদি বঞ্চিত হই, তবে আমরা সনাতন হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহা বুঝিতে সমর্থ হইব না। ধর্ম্মের স্বরূপ না বুঝিলে তাহার অনুষ্ঠানও সম্ভবপর নহে, সুতরাং মীমাংসাশাস্ত্র-লোপের সঙ্গে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম-লোপের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। ধর্ম্মলোপ হইতে জাতিকে রক্ষা করিতে হইলে, মীমাংসাশাস্ত্রের অনুশীলন যে আমাদের দেশের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের একান্ত কর্ত্তব্য, তাহা কে অস্বীকার করিবে?

মীমাংসা-দর্শনের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমাদিগের এই উক্তির সার্থকতা অনায়াসে সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন, তাই আজ তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

মীমাংসা-দর্শন কাহাকে বলে? ইহার উত্তর এই যে, বেদের অর্থ কি, তাহা বুঝিবার জন্য যে দর্শনের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়, তাহাই মীমাংসা-দর্শন। এই বেদের অর্থ বলিলে বেদের কোন একটি পদের অর্থ বোধ হয় না, কারণ, বেদে যে সমুদয় পদ আছে, তাহার অর্থ জানিবার উপায় হইতেছে—বৈদিক ব্যাকরণ এবং যাস্ক-প্রণীত নিরুক্ত প্রভৃতি বৈদিক শব্দের অভিধান গ্রন্থ। পৃথক্ ভাবে বৈদিক ব্যাকরণ বর্ত্তমান সময়ে প্রচলিত না থাকিলেও মহামুনি পাণিনি-প্রণীত ব্যাকরণ-সূত্রের বৈদিক প্রক্রিয়াংশ এবং তাহার উপর পতঞ্জলি-প্রণীত ভাষ্য, টীকাকার কৈয়ট প্রভৃতির গ্রন্থের সাহায্যে বৈদিক পদ ও তাহার স্বরসমূহের স্বরূপ ও অর্থ আমরা বুঝিতে সমর্থ হইয়া থাকি; সুতরাং বেদের পদসমূহের অর্থ বুঝিবার জন্য মীমাংসা-দর্শনের আবশ্যকতা নাই। বাকি রহিল বেদের বাক্যসমূহ, ইহাদিগের আপাত অর্থ জানিতে হইলে, লৌকিক বাক্যসমূহের অর্থ বোধ করিবার যে সকল উপায় লোকপ্রসিদ্ধ আছে, সেই সকল উপায়ের দ্বারাই বেদবাক্য-সমূহেরও প্রাথমিক অর্থবোধ হইয়া থাকে, ইহা স্থির; সুতরাং বৈদিক ব্যাকরণ ও অভিধানসমূহের সাহায্যে যাঁহারা বেদের পদসমূহের অর্থ বুঝিতে সমর্থ, তাঁহাদিগের পক্ষে বৈদিক বাক্যসমূহের মোটা-মুটি অর্থজ্ঞান মীমাংসাশাস্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে লৌকিক নিয়মানুসারেই হইতে পারে বলিয়া, সে বিষয়ে মীমাংসাদর্শনের আবশ্যকতা নাই বলিলেও চলে। তবে মীমাংসাদর্শন বেদের অর্থ বুঝাইয়া থাকে, এই প্রকার যে মীমাংসকগণের সিদ্ধান্ত, তাহার প্রকৃতস্বরূপ কি, তাহা বুঝিতে হইবে, সুতরাং এক্ষণে তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা করা হইতেছে।

বেদবাক্যের আপাত অর্থবোধ হইবার পর যথার্থ তাৎপর্য্যের বোধ না হওয়া নিবন্ধন মনে যে সমুদয় সংশয়

উদিত হইতে পারে, তাহার নিরাকরণ করিয়া সকল প্রকার অসামঞ্জস্যের পরিহার করাই মীমাংসাদর্শনের প্রধান উদ্দেশ্য। মীমাংসকগণের মতে বেদ স্বতঃপ্রমাণ। কারণ, বেদ অপৌরুষেয়। বর্ত্তমান সময়ে অনেকে হয় ত শুনিয়াই হাসিয়া উঠিবেন যে, বাক্য অপৌরুষেয় কি প্রকারে হইতে পারে? এখনই যে লোক বাক্যের অপৌরুষেয়ত্বে বিশ্বাসপরায়ণ নহে—তাহা নহে। অতি প্রাচীন কাল হইতে বেদরূপ বাক্যসমূহের অপৌরুষেয়ত্ব বিষয়ে সংশয় চলিয়া আসিতেছে। যত দিন মানুষ থাকিবে,তত দিন এ সংশয়ও যে থাকিবে, তাহা স্থির; কিন্তু এইরূপ সংশয় যতক্ষণ থাকিবে, সে পর্য্যন্ত বেদের উপর বিশ্বাস কিছুতেই উৎপন্ন হইবে না, অথচ প্রাচীন ভারতে সনাতনধর্ম্মাবলম্বী আস্তিক পুরুষগণ বেদের উপর দৃঢ়বিশ্বাসসম্পন্ন হইয়াই বেদোক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন এবং তাহা দ্বারা আপনাদিগকে কৃতকৃত্য বলিয়াও বিবেচনা করিতেন, ইতিহাস এ বিষয়ে যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিয়া থাকে। সেই সকল আস্তিক পুরুষের বেদের প্রতি এতাদৃশ দৃঢ় বিশ্বাস যে সকল প্রমাণ ও যুক্তির উপর নির্ভর করিত, সেই সকল যুক্তি ও প্রমাণ পূর্ব্বমীমাংসায় অতিবিস্তৃত-ভাবে আলোচিত হইয়াছে। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহারই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া পরে বেদের অর্থ করিবার যে উপায় মীমাংসাদর্শনে অবলম্বিত হইয়াছে, তাহার স্বরূপ প্রদর্শন করিব।

বেদ বলিলে আমরা যে গ্রন্থসমূহকে বুঝিয়া থাকি, তাহা দুই ভাগে বিভক্ত; প্রথম—মন্ত্র, দ্বিতীয়—ব্রাহ্মণ। মন্ত্রভাগের আর একটি নাম সংহিতা। পাশ্চাত্য প্রত্নতাত্ত্বিকগণের মতে এই সংহিতার ভাগই প্রাচীন,—ব্রাহ্মণভাগ অপেক্ষাকৃত নবীন। সংহিতাভাগের মধ্যে ঋক্-সংহিতাকে তাঁহারা প্রাচীনতম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এই ঋক্-সংহিতা কতকাল পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে, তাহার নির্ণয় এ পর্য্যন্ত কোনও পাশ্চাত্য পণ্ডিতই যে করিতে পারেন নাই, তাহা স্থির। কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন যে, খৃষ্টজন্মের পূর্ব্বে এক হাজার বৎসর হইতে দুই হাজার বৎসরের মধ্যেই ঋক্সংহিতা বিরচিত হইয়াছিল; আবার কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়া থাকেন যে, আরও এক হাজার বৎসর পূর্ব্বেও উহা রচিত হইতে পারে, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে কিছুতেই ইহার রচনা সম্ভবপর নহে। লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক মহাশয় কিন্তু অখণ্ডনীয় যুক্তির দ্বারা প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, খৃষ্টজন্মের পূর্ব্ববর্ত্তী ৬ হাজার বৎসরের মধ্যে যে ঋক্‌বেদ প্রণীত হয় নাই, ইহা স্থির। তাহারও পূর্ব্বে ইহা রচিত হইয়াছিল, কিন্তু কত পূর্ব্বে ইহা রচিত হইয়াছিল, তাহা কেহই নিশ্চয় সহকারে বলিতে পারে না। যাহাই হউক, ইহা স্থির যে, বর্ত্তমান সময়ে মানবসমাজের মধ্যে যে সমস্ত লিখিত গ্রন্থ প্রচলিত আছে, ঋগ্বেদসংহিতা যে সেই সকল গ্রন্থের মধ্যে প্রাচীনতম, তাহাতে বর্ত্তমান সময়ে কোন পণ্ডিতেরই মতদ্বৈধ হইতে পারে না। এই জগতের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম গ্রন্থ যে ঋগ্বেদ, তাহা কোন মনুষ্যের দ্বারা রচিত কি না, এইরূপ সংশয়স্থলে মীমাংসকগণ বলিয়া থাকেন যে, ইহা কোন পুরুষের দ্বারা রচিত নহে, কিন্তু ইহা অনাদিসিদ্ধ। অর্থাৎ আমরা গবেষণার সাহায্যে লব্ধ ঐতিহাসিক দৃষ্টির দ্বারা এমন একটি সময়কে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি না, যে সময়ে এই বেদ বা বেদানুমোদিত সম্প্রদায় এই ভারতবর্ষে বিদ্যমান ছিল না, মীমাংসকগণের এই প্রকার সিদ্ধান্ত যে ভ্রমাত্মক, তাহা এ পর্য্যন্ত কেহই সিদ্ধ করিতে পারে নাই।

এখন যদি বল যে, এই ভাবে বেদের অতিপ্রাচীনত্ব সিদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া তাহা যে কোন মনুষ্যের দ্বারা বিরচিত হয় নাই, সে বিষয়ে কোন প্রমাণ ত দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না প্রত্যুত বেদ যখন বাক্যসমূহরূপই হয়, বাক্য মানুষের দ্বারাই রচিত হইয়া থাকে, সুতরাং বেদবাক্যও যে মানুষের দ্বারাই রচিত হইয়াছে, তাহা অনায়াসেই অনুমান করিতে পারা যায়। সুতরাং ইহা দ্বারা বেদের প্রাচীনত্ব সিদ্ধ হইলেও অপৌরুষেয়ত্ব সিদ্ধ হইতেছে না।

ইহার উত্তরে মীমাংসকগণ বলিয়া থাকেন যে, বেদ যদি লৌকিক বাক্যের ন্যায় কোনও পুরুষপ্রণীত হইত, তাহা হইলে বেদরচয়িতৃরূপে সেই পুরুষের নাম আমাদিগের স্মৃতিপথে বেদের ন্যায় উদিত থাকিত। এই সংসারে যে গ্রন্থ ধারাবাহিকরূপে অধীত ও অধ্যাপিত হইয়া থাকে, সেই গ্রন্থের সহিত তাহার রচয়িতার নামও লোকের স্মৃতিপথে জাগরূক থাকে। এ নিয়মের ব্যভিচার আমরা কোন লৌকিক গ্রন্থেই দেখিতে পাই না। রামায়ণ বা মহাভারত

রচিত হইবার সময় হইতে এ পর্য্যন্ত ধারাবাহিকভাবে অধীত ও অধ্যাপিত হইয়া আসিতেছে। সেই রামায়ণ ও মহাভারতের রচয়িতা বাল্মীকি ও বেদব্যাসের নামও আমরা বরাবর মনে করিয়া রাখিতেছি। শুধু ভারতেই এ অবস্থা নহে, চীন ও য়ুরোপ প্রভৃতি দেশেও যে সকল প্রাচীনতম গ্রন্থ প্রচলিত আছে, তাহাদিগের রচয়িতার নাম এখনও লোক ভুলিয়া যায় নাই। কিন্তু বেদের রচয়িতার নাম আমরা কেমনে ভুলিতে পারি? বাস্তবই যদি কেহ ইহার প্রথম রচয়িতা থাকিত, তাহা হইলে বেদের সম্প্রদায় যখন অবিচ্ছিন্নভাবে চলিয়া আসিতেছে, তখন সেই রচয়িতার নামও আমাদিগের মধ্যে নিশ্চয়ই প্রসিদ্ধ থাকিত, অকস্মাৎ তাহাকে ভুলিয়া যাইবার কারণ কি,তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সুতরাং ইহাই স্থির হইতেছে যে, বেদ কোন পুরুষবিরচিত নহে। মানবের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে বেদ আপনিই প্রকাশিত হইয়াছে, কোন লৌকিক রচয়িতা ইহাকে রচনা করেন নাই। অর্থাৎ মানবসমাজ যেমন ধারাবাহিকরূপে অনাদি, বেদও সেইরূপ ধারাবাহিকরূপে অনাদি। মীমাংসকগণের বেদের অপৌরুষেয়ত্ব সিদ্ধান্ত, এই সিদ্ধান্তের অনুকূল যুক্তির উপন্যাস করিতে যাইয়া তাঁহারা আরও বলিয়া থাকেন—

শব্দ ও শব্দার্থ সম্বন্ধ নিত্য, অর্থাৎ আমরা নিজের মনের ভাব অপরকে বুঝাইবার জন্য শব্দের উচ্চারণ করিয়া থাকি, কিন্তু আমরা যাহা উচ্চারণ করিয়া থাকি, তাহা দ্বারাই অর্থবোধ হইবার সম্ভাবনা নাই;—কেন তাহা বলি, আমাদিগের মুখের দ্বারা যে শব্দ উচ্চারিত হয়, তাহার নাম—"ধ্বনি"; সেই ধ্বনিগুলি যেমন যেমন উচ্চারিত হয়, তেমনই তাহারা বিনষ্ট হইয়া যায়, কণ্ঠ ও তালু প্রভৃতির অভিঘাত হইতে ঐ সকল ধ্বনি উৎপন্ন হয়, ইহা সকলেই জানে। ক, এই ধ্বনিটিকে উৎপন্ন করিতে হইলে যে প্রযত্নবিশেষের আবশ্যকতা হয়, সেই প্রযত্ন হইতেই 'খ' প্রভৃতি অন্য ধ্বনির উৎপত্তি হয় না, তাহাদিগের প্রত্যেকের উৎপত্তির জন্য পৃথক্ পৃথক্ প্রযত্নের আবশ্যকতা আছে। ঐ সকল প্রযত্ন একই ক্ষণে একই পুরুষে সম্ভবপর নহে বলিয়া, উহাদিগের মধ্যে একটা ক্রম অর্থাৎ পূর্ব্বাপরভাব হইয়া থাকে। ইহা আমাদিগের সকলেরই অনুভবসিদ্ধ। এক্ষণে দেখ, যে সকল প্রযত্ন হইতে ধ্বনিগুলি উৎপন্ন হয়, তাহাদিগের ক্রম থাকা নিবন্ধন তাহাদিগের কার্য্যরূপে যে সকল ধ্বনি হয়, তাহাদিগের মধ্যেও ক্রম বা পূর্ব্বাপরভাব থাকিবেই। একই ক্ষণে একই পুরুষের দ্বারা কতকগুলি ধ্বনি উৎপন্ন হইতে পারে না, ইহা স্থির। মনে কর, আমরা অপরকে একটা বাড়ী বুঝাইবার জন্য 'ভবন' এই শব্দ করিয়া থাকি, কিন্তু 'ভবন' এই শব্দটি একটি ধ্বনি নহে; ইহার মধ্যে ভ অ ব অ ন অ এই ছয়টি ধ্বনি আছে; এই ছয়টি ধ্বনি এককক্ষণে উৎপন্ন হইতে পারে না; আমাদিগের কর্ণে যে ক্ষণে 'ভ' এই ধ্বনিটির উপলব্ধি হয়, সেই ক্ষণে তাহার পরবর্ত্তী 'অ' এই ধ্বনিটির উপলব্ধি হয় না; আবার 'অ' এই ধ্বনিটির উপলব্ধি যখন হয়, সেক্ষণে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী 'ভ' এই ধ্বনিটি বিলুপ্ত হইয়া যায়। এই ভাবে শেষের 'অ' এই ধ্বনিটি যখন আমাদিগের শ্রুতিগোচর হয়, তখন পূর্ব্ববর্ত্তী পাঁচটি ধ্বনির বিলোপ হইয়া থাকে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, এই ছয়টি ধ্বনির মধ্যে কোন্ ধ্বনিটি আমাদিগের মনে 'বাড়ী'রূপ অর্থকে স্মরণ করাইয়া দেয়? প্রত্যেক ধ্বনিটি যদি স্মরণ করায়, তাহা হইলে অতগুলি অর্থাৎ ছয়টি ধ্বনি করিবার কোনও আবশ্যকতা থাকে না। যদি বল, ছয়টি ধ্বনি মিলিত হইয়া আমাদিগের মনে ঐ বাড়ীর স্মৃতি জন্মাইয়া দেয়, তাহাও সম্ভবপর নহে, কারণ, ঐ ছয়টি ধ্বনি বিভিন্ন ক্ষণে উৎপন্ন হয়, এবং উৎপন্ন হইয়াই বিলুপ্ত হয় বলিয়া, কোন ক্ষণেই তাহাদের মিলন সম্ভবপর হয় না। সুতরাং প্রত্যেক ধ্বনিটি আমাদিগের অর্থ-স্মৃতির কারণ হয় না, মিলিত হইয়াও তাহারা অর্থ-স্মৃতির কারণ হইতে পারে না, এরূপ অবস্থায় কোন্ শব্দের দ্বারা আমাদিগের ঐ বাড়ীরূপ অর্থের স্মৃতি হইয়া থাকে, তাহার মীমাংসা করিতে হইলে এইরূপ কল্পনাই করিতে হয় যে, ঐ সকল বর্ণ হইতে যখন অর্থের স্মৃতি হইয়া উঠিতেছে না, তখন বাধ্য হইয়া ঐ ছয়টি ধ্বনি হইতে পৃথক্ 'ভবন' বলিয়া একটি নিত্য শব্দ অভিব্যক্ত হইয়া থাকে, তাহারই সাহায্যে আমরা ঐ বাড়ীরূপ অর্থটিকে স্মরণ করিতে সমর্থ হই। এই ধ্বনির দ্বারা অভিব্যক্ত যে 'ভবন'রূপ একটি শব্দ, তাহার উৎপত্তি ও বিকাশ সম্বন্ধে কোনও প্রমাণই দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রত্যুত ঐরূপ শব্দের উৎপত্তি ও বিকাশ কল্পনা করিতে গেলে অনন্ত শব্দের কল্পনারূপ গৌরবের আপত্তি হয়। এই কারণে ঐ 'ভবন'রূপ শব্দের নিত্যতা সিদ্ধ থাকে। শব্দ এই ভাবে যদি নিত্য বলিয়াই সিদ্ধ হইল, তবে তাহার সহিত অর্থের যে সম্বন্ধ আছে, তাহাকেও নিত্য বলিয়াই অঙ্গীকার

করা উচিত। সেই শব্দ ও তাহার সম্বন্ধ যদি নিত্য হয়, তাহা হইলে তাহার সম্বন্ধীয় যে অর্থ, তাহাকেও নিত্য বলিয়াই অঙ্গীকার করিতেই হইবে। যদি বল, শব্দের দ্বারা এই ভাবে যে সকল অর্থ আমাদিগের স্মৃতির গোচর হয়, তাহারাও নিত্য হইতে পারে না, কারণ, 'ভবন' শব্দের দ্বারা যে গৃহরূপ অর্থ প্রতীত হয়, তাহাও নিত্য নহে। ইহার উত্তরে মীমাংসকগণ বলিয়া থাকেন যে, গৃহ, ঘট, পট প্রভৃতি শব্দের দ্বারা আমাদিগের যে অর্থের বোধ হয়, তাহা অনিত্য বস্তু হইতে পারে না। মনে কর, ঘট শব্দের দ্বারা যে আমাদিগের ঘটরূপ ব্যক্তির বোধ হয় বলিয়া ঘট শব্দের ঘটব্যক্তিই যে অর্থ হইবে, তাহা নহে। শব্দের দ্বারা অর্থবোধ হইলে যে অর্থের বোধ ঐ শব্দের দ্বারা হইবে, সেই অর্থের সহিত ঐ শব্দের বাচ্যবাচকভাবরূপ যে সম্বন্ধ, তাহার জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এই বাচ্যবাচকভাবরূপ যে সম্বন্ধ তাহা কোন একটি ব্যক্তির সহিত শব্দের হইতে পারে না; যে ব্যক্তির সহিত ঐ সম্বন্ধ গৃহীত হয়, সেই ব্যক্তিকেই ঐ শব্দ বোধ করাইবে, এইরূপ নিয়ম যদি অঙ্গীকার করা যায়, তাহা হইলে যে ব্যক্তিতে আমার ঘটশব্দের সম্বন্ধ বা সঙ্কেত পূর্ব্বে গৃহীত হইয়াছে, সেই ব্যক্তিটি ছাড়া অন্য ঘটব্যক্তির বোধ সেই শব্দের দ্বারা হইতে পারে না। যদি বল, যত ঘটব্যক্তি আছে, সকল ব্যক্তির সহিতই ঘটশব্দের সম্বন্ধ যাহার জানা আছে, তাহার ঘটশব্দের দ্বারা সকল ঘটব্যক্তিবোধ হইবে—এইরূপ মানিলেই ত চলে।

এরূপ কল্পনাও ঠিক নহে, কারণ, ঘটব্যক্তি অসংখ্য। এ পর্য্যন্ত জগতে কত ঘট উৎপন্ন হইয়া বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে, কত ঘট ভবিষ্যতে হইবে এবং বর্ত্তমান সময়ে কত ঘট জগতে বিদ্যমান আছে, তাহার সংখ্যা কেহই করিতে পারে না। অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমানকালে যত ঘটব্যক্তি আছে, প্রত্যেক সেই ঘটব্যক্তির সঙ্গে ঘটশব্দের সম্বন্ধ বোধ করা কোনও মানুষেরই পক্ষে সম্ভবপর হয় না। সুতরাং প্রত্যেক ঘটব্যক্তিতে ঘটশব্দের সঙ্কেতরূপ সম্বন্ধ জানিয়া যদি ঘটশব্দ দ্বারা প্রত্যেক ঘটকে জানিতে হয়, তাহা হইলে কোনও মানবের পক্ষেই ঘটশব্দের দ্বারা ঘটরূপ অর্থের প্রতীতি হওয়া গগনকুসুমের ন্যায় অলীক হইয়া পড়ে। সুতরাং বাধ্য হইয়া সকলকে স্বীকার করিতে হইবে যে, ঘটশব্দের সহিত প্রত্যেক ঘটব্যক্তির সম্বন্ধ নাই। কিন্তু সকল ঘটের উপর বর্ত্তমান ঘটত্বরূপ যে নিত্য জাতি আছে, তাহারই সহিত ঘটশব্দের বাচ্যবাচকভাবরূপ যে সম্বন্ধ আছে, তাহার জ্ঞান থাকিলেই আমাদের ঘটশব্দের দ্বারা প্রথমতঃ তাহার অর্থ যে ঘটত্বরূপ জাতি, তাহারই জ্ঞান হইয়া থাকে। এখন যদি বল, ঘটশব্দের অর্থ যদি ঘটত্ব জাতি হয়, তবে ঘটশব্দ শুনিবার পর আমাদিগের ঘটব্যক্তি বোধ হয় কিরূপে? কারণ, ব্যক্তির সহিত ত শব্দের বাচ্যবাচকভাবরূপ সম্বন্ধ আমাদের কাহারই জ্ঞাত নহে। ইহার উত্তর এই যে, জাতির স্বভাব অনুসারে ব্যক্তির বোধ আপনা হইতেই হইয়া থাকে, অর্থাৎ জাতির স্বভাব হইতেছে যে, যখনই ইহার বোধ হইবে, তখনই ইহা নিজের আশ্রয়স্বরূপ কোনও একটি ব্যক্তির সহিতই আমাদিগের বুদ্ধির বিষয় হয়। ঘটত্বজ্ঞান হইতে হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার আশ্রয়স্বরূপ কোনও একটি ঘটব্যক্তির হইয়াই থাকে, ইহাই হইল জাতির স্বভাব। ঘটব্যক্তিকে না বুঝিয়া ঘটত্ব জাতির জ্ঞান কখনও কাহার পক্ষে সম্ভবপর নহে বলিয়া ঘটত্বের সহিত শব্দের সম্বন্ধজ্ঞান হইলে সেই সম্বন্ধজ্ঞানের ফলে ঘটত্ববোধ যখনই আমাদিগের হয়, তখনই সেই বোধের সঙ্গে কোনও না কোন একটি বা ততোধিক ঘটব্যক্তির বোধ হওয়া স্বভাবসিদ্ধ। এই কারণে ঘটশব্দের প্রত্যেক ঘটব্যক্তিতে সম্বন্ধ স্বীকার না করিয়া, যদি কেবল ঘটত্বের সহিত সম্বন্ধজ্ঞান হয়, তাহা হইলে অবাধিত ঘটব্যক্তির জ্ঞান স্বাভাবিক নিয়মানুসারে আপনা-আপনি হইয়া থাকে। সুতরাং প্রত্যেক ঘটব্যক্তির সহিত ঘটশব্দের সম্বন্ধ স্বীকার করিবার কোনও আবশ্যকতা নাই।

ইহাই হইল মীমাংসকগণের সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে শব্দ, তাহার অর্থ এবং উভয়ের মধ্যে বাচ্যবাচকভাবরূপ সম্বন্ধ, এই ত্রিবিধ বস্তুই নিত্য বলিয়া সিদ্ধ হইল। তাহাই যদি হইল, তবে অনিত্যত্ব নিবন্ধন বৈদিক শব্দের পৌরুষেয়ত্বরূপ যে সিদ্ধান্ত, তাহা টিকিল না। এ বিষয়ে বিস্তৃত বিচার মীমাংসাদর্শনে করা হইয়াছে। এ স্থলে তাহার আর আলোচনা না করিয়া, বেদের অপৌরুষেয়ত্ব সম্বন্ধে মীমাংসকগণ আরও অন্য প্রকার যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়া থাকেন, এক্ষণে তাহারই কিছু পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

মীমাংসকগণ বলেন, এই পৃথিবীর সৃষ্টি কত কাল হইয়াছে, কত কাল হইতে এ পৃথিবীতে মনুষ্য বাস করিতে

আরম্ভ করিয়াছে, ইহার নির্ণয় করিতে যাওয়া মানুষের পক্ষে বিড়ম্বনা ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না।

তাঁহারা বলেন, "ন কদাচিদনীদৃশম্" অর্থাৎ মানুষ কল্পনার সাহায্যে যত দূর দেখিতে পায়, তাহাতে ইহাই সিদ্ধ হয় যে, আমরা যে ভাবে জগৎকে দেখিতেছি, কোন কালেই ইহা এই প্রকারের ছিল না, ইহা সম্ভবপর নহে। কেমন করিয়া মানুষ এ সংসারে প্রথম জন্মিয়াছে, কোন পণ্ডিতই কোনও প্রমাণের সাহায্যে ইহা বুঝাইতে পারেন না, বুঝিবার উপায়ও কিছুই নাই। বৈজ্ঞানিক কল্পনা করিয়া হয় ত বলিবেন, প্রতপ্ত সূর্য্যপিণ্ড হইতে তাহার কতকটা অংশ তাহা হইতে বিচ্যুত হইয়া অনন্ত আকাশের একদেশে হঠাৎ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, সেই বিক্ষিপ্ত অংশ মাধ্যাকর্ষণের বলে প্রকাণ্ড সূর্য্যমণ্ডলকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছে। ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমশঃ তাহাতে উত্তাপের মাত্রা কমিতে আরম্ভ হইয়াছে। তাহারই গতির বশে বায়ুর জন্ম হইয়াছে, সেই বায়ুর সাহায্যেই তাহা হইতে বাষ্পরাশি মেঘরূপে পরিণত হইয়া বৃষ্টির আকারে জলরূপে পৃথিবীতে দেখা দিয়াছে। সেই জলের কোন অংশ সমুদ্র বা নদীরূপে পরিণত হইয়াছে। এই ভাবে জল-স্থল-সৃষ্টি হইলে স্বাভাবিক নিয়মানুসারে অগ্রে উদ্ভিদের সৃষ্টি হইয়াছে। সেই উদ্ভিদ হইতে ক্রমে জীবদেহের উৎপত্তি হইয়াছে। ক্রমবিকাশের নিয়মানুসারে সেই সকল জীবদেহই ধীরে ধীরে মানবদেহরূপে পরিণত হইয়াছে। আবার সেই সকল মানব প্রথম অবস্থায় বন্যপশুর ন্যায় বিচরণ করিত, তাহারা ধীরে ধীরে কাঠ ঘষিয়া আগুন করিতে শিখিয়াছে; বহু সহস্র বর্ষব্যাপী ভূয়োদর্শনের ফলে কৃষিকর্ম্ম, বাণিজ্য প্রভৃতিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। আগে তাহারা বানর প্রভৃতি পশুর ন্যায় অব্যক্ত শব্দ করিয়াই মনের ভাব পরস্পরকে বুঝাইত, কালক্রমে তাহাদের ভাষা সৃষ্ট হইয়াছে। এ ভাষার সৃষ্টিও যেমন, তাহাদের কার্য্য তেমনই, ভাষার মধ্যে প্রবিষ্ট প্রত্যেক শব্দের সহিত তাহার প্রতিপাদ্য অর্থের সম্বন্ধকল্পনাও তাহারই কার্য্য, ইহা যখন আমরা বৈজ্ঞানিক কল্পনার সাহায্যে বুঝিতে পারিতেছি, তখন কি করিয়া স্বীকার করিব যে, মানবের ভাষার অবয়বস্বরূপ শব্দগুলি নিত্য, তাহাদিগের অর্থগুলিও নিত্য এবং শব্দ ও অর্থের বাচ্যবাচকরূপ যে সম্বন্ধ, তাহাও নিত্য?

এই প্রকার শঙ্কার উত্তরে মীমাংসকগণ বলিয়া থাকেন, বৈজ্ঞানিকগণ পৃথিবীর বা মানবজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে যেরূপ কল্পনা করিয়া থাকেন, বিচার করিয়া দেখিলে তাহার মূলে কোনও প্রবল প্রমাণের সত্তা দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রত্যুত হাজার হাজার বৎসরের ভূয়োদর্শনের ফলে আমাদিগের যে ব্যাপ্তি স্থির হইয়াছে, সেই ব্যাপ্তি দ্বারা যে অনুমান হইয়া থাকে, সেই অনুমানের সহিত বৈজ্ঞানিকগণের এইরূপ কল্পনা বিরুদ্ধই হইয়া থাকে। আমরা দেখিতেছি, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ দেখিয়াছেন যে, মানব হইতেই মানবের সৃষ্টি হইয়া থাকে, স্ত্রী-পুরুষ-সংযোগে যে গর্ভ উৎপন্ন হয়, তাহাই যথাকালে প্রসূত হইয়া শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের মধ্য দিয়া অভিজ্ঞ মানবরূপে পরিণত হইয়া থাকে, এই যে নিয়ম, এই নিয়মের ব্যভিচার এ পর্য্যন্ত এ পৃথিবীতে কেহই দেখে নাই বা দেখিবার সম্ভাবনাও আমাদিগের মনে উদিত হয় না। বৈজ্ঞানিকগণ যে ভাবের সৃষ্টির কল্পনা করিয়াছেন, তাহা যদি মানিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে এ পৃথিবীতে প্রথম মানবের সৃষ্টি কি প্রকারে হয়, তাহা আমরা কল্পনার সাহায্যে কিছুতেই বুঝিতে পারি না।

মানব না হইলে মানবের সৃষ্টি হইতে পারে, এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিছুই নাই। অনুমানের দ্বারা ইহা সিদ্ধ করিতে যাইলে আমাদিগের প্রত্যক্ষমূলক যে 'মানবমাত্রেই মানব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে' এইরূপ অনুমান সর্ব্ববাদিসিদ্ধ ও সকল কালেই অঙ্গীকৃত হইয়া আসিতেছে, তাহার সহিত বিরোধ হয় বলিয়া বৈজ্ঞানিকগণের প্রথম মানব-সৃষ্টি বিষয়ে যে কল্পনা, তাহা কোনও প্রামাণিক ব্যক্তির শ্রদ্ধেয় হইতে পারে না। এই জন্যই মীমাংসকগণ বলিয়া থাকেন, সর্ব্বসাধারণের প্রমাণ বলিয়া অঙ্গীকৃত যে প্রত্যক্ষ অনুমান, তাহার বিরুদ্ধ কল্পনা নিতান্ত দুর্ব্বল, তাহার উপর নির্ভর করিয়া কেহই যথার্থ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারে না। সুতরাং মানব-সৃষ্টি বিষয়ে বৈজ্ঞানিকগণের সিদ্ধান্ত কিছুতেই আদরণীয় হইতে পারে না। এই কথাই—"ন কদাচিদনীদৃশম্" এইরূপ বাক্যের দ্বারা মীমাংসকগণ প্রকাশ করিয়া থাকেন। বেদের আলোচনা এক্ষণে যাঁহারা করিতেছেন, তাঁহারা বেদের নিত্যতাবিষয়ে যে সকল বিরুদ্ধ যুক্তির অবতারণা করিয়া থাকেন, সেই সকল যুক্তি ও তর্কের অবতারণা তাঁহারাই যে নূতনভাবে করিতেছেন, তাহা নহে, জৈমিনি প্রভৃতি মীমাংসক আচার্য্যগণ ঐ সকল যুক্তি ও তর্কের স্বরূপ অতিবিস্তৃতভাবে

আলোচনা করিয়া বহুবিধ সুযুক্তি-সমূহের দ্বারা তাহার খণ্ডন করিয়াছেন। সেই সকল যুক্তি ও তর্কের আলোচনা বর্ত্তমান সময়ে অনেকেই অশ্রদ্ধেয় বলিয়া হয় ত উড়াইয়া দিবেন। বাস্তবিক পক্ষে সেই সকল যুক্তি ও প্রমাণের আলোচনা আমাদিগের পক্ষে বর্ত্তমান সময়ে একান্ত আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়। জৈমিনি কোন্ সময়ে ভারতবর্ষে আবির্ভূত হইয়া মীমাংসাশাস্ত্র রচনা করেন, এ পর্য্যন্ত তাহার কোন নিশ্চয়ই প্রত্নতাত্ত্বিকগণ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বকালে জৈমিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কারণ, জৈমিনি প্রণীত মীমাংসা সূত্রের মধ্যে গৌতম বুদ্ধ প্রবর্ত্তিত বৌদ্ধ সিদ্ধান্তের কোন প্রকার উল্লেখই দেখিতে পাওয়া যায় না। জৈমিনী যে মীমাংসাদর্শন প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা দেখিলে ইহাও স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, জৈমিনির জন্মিবার বহু পূর্ব্বেও ভারতবর্ষে বহু মীমাংসক আচার্য্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সময়ে বেদের ও তন্মূলক ক্রিয়াকাণ্ডের প্রচার প্রচুরভাবে বিদ্যমান ছিল। সেই বেদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনত্ব বিষয়ে তাঁহাদিগের সকলেরই ঐকমত্য ছিল। সকল মীমাংসক আচার্য্যই অতি প্রাচীনতম কাল হইতে বলিয়া আসিতেছেন যে, এই ভারতবর্ষে ঐতিহাসিক দৃষ্টির সাহায্যে এমন কোন সময়ই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, যে সময় এ দেশে বৈদিক সম্প্রদায়ের প্রচলন ছিল না, সেই বেদকে পৌরুষেয় বলিবার অধিকার কাহারও নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমাদিগের ভূয়োদর্শন, আমাদিগের প্রত্যক্ষ এবং প্রত্যক্ষমূলক অনুমান বেদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনত্বই প্রমাণিত করিয়া থাকে, তাহার পৌরুষেয়ত্বসিদ্ধির অনুকূল কোন প্রমাণই ঐ সকল প্রমাণ হইতে প্রবল হইতে পারে না, সুতরাং বেদের অপৌরুষেয়ত্ব মীমাংসকগণের যাহা সিদ্ধান্ত, এ পর্য্যন্ত কেহই তাহা আর খণ্ডন করিতে সমর্থ হন নাই, এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে। আমাদিগের সনাতন হিন্দুধর্ম্মের মূল প্রমাণ হইতেছে—বেদ। ধর্ম্মের স্বরূপ কি, তাহা বেদই প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। প্রত্যক্ষাদিমূলক মানবের জ্ঞান ধর্ম্মের স্বরূপ বিষয়ে কখনই প্রমাণ বলিয়া অঙ্গীকৃত হইতে পারে না। কারণ, ধর্ম্মের স্বরূপ রাগ-দ্বেষ-কলুষিত মানবের অন্তঃকরণে উদিত হইতে পারে না। মানব চিরদিনই অসর্ব্বজ্ঞ ও রাগদ্বেষাদির দোষে কলুষিতচিত্ত হইয়া থাকে। তাহাদিগের প্রত্যেকেরই বুদ্ধির বিভিন্নরূপতা আছে, সেই বিভিন্নরূপ বুদ্ধির সাহায্যে কল্পিত ধর্ম্ম সকল মানবের দৃষ্টিতে অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের সাধন বলিয়া পরিগৃহীত হওয়াও সম্ভবপর নহে। এই কারণে অপৌরুষেয় বেদবাক্য ব্যতীত ধর্ম্মের যথার্থ স্বরূপ নির্ণয়ের অন্য কোন প্রমাণের উপর নির্ভর করা যাইতে পারে না। ইহাই হইল সনাতন ধর্ম্মের মূল বেদ বিষয়ে মীমাংসক আচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত যাঁহারা অঙ্গীকার করেন না, তাঁহাদের দ্বারা সনাতন হিন্দুধর্ম্মের কোন প্রকার সাহায্য হইবার সম্ভাবনা নাই, ইহাই হইল সনাতন হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণের দৃঢ় বিশ্বাস। এই বিশ্বাসকে যুক্তির সাহায্যে আরও দৃঢ়তর করিতে হইলে মীমাংসাশাস্ত্রের বহুল আলোচনা দেশে প্রবর্ত্তিত হওয়া উচিত, হিন্দু সমাজের হিতৈষী ও নেতৃগণ এই মীমাংসার আলোচনা বিষয়ে বর্ত্তমান সময়ে এক প্রকার নিরপেক্ষ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহা কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের পক্ষে নিতান্তই আশঙ্কাজনক।
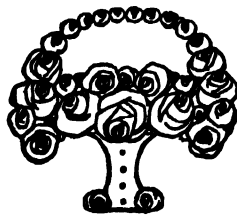
বাপের ব্যাটা

১

বেন্দা মালিকের স্ত্রী বিধবা হইয়া নাবালক ছেলে-মেয়ে দুইটির ভরণ-পোষণের কোন উপায়ই যখন দেখিতে পাইল না, তখন অগত্যা সে হীরু মাঝিকে সাঙ্গা করিয়া তাহার ঘাড়ে নিজের ছেলে মেয়ের ভার চাপাইবার সঙ্কল্প করিল। এমন সময় বেন্দা মালিকের স্ত্রী সখী বিধবা হইলে হীরু তাহার নিকট উমেদার হইয়া পড়িল। তাহার উমেদারীতে ফল ফলিল; সখীও অনন্যোপায় হইয়া তাহার প্রার্থনায় সম্মতি দান করিল।

মেয়েটা খুব ছোট। ছেলে 'খেলার' আট নয় বৎসর বয়স হইয়াছিল, সুতরাং তাহার জ্ঞানও একটু জন্মিয়াছিল। মা পুনরায় সাঙ্গা করিবে শুনিয়া সে যেন অন্তরে অন্তরে একটা লজ্জা অনুভব করিয়াছে। ইহার উপর পাড়ার দুই একটা ছেলে যখন তাহাকে উপহাস করিয়া বলিল, "হাঁ রে খেলা, তোর মায়ের না কি আবার বিয়ে হবে?" খেলা তখন লজ্জায় ঘাড় হেঁট করিয়া মায়ের কাছে আসিয়া কাঁদ-কাঁদ মুখে বলিল, "তুই কক্ষনো সাঙ্গা কত্তে পাবি না, মা।"

সখী দুঃখের একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, "আমি কি সাধে সাঙ্গা কচ্ছি খেলা, না করলে তোদের মানুষ করবো কি ক'রে?"

খেলা মাথা নাড়িয়া অভিমান-ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিল, "কেন, ওই যে গোবরার মা ধান ভেনে, গোবর কুড়িয়ে গোবরাকে মানুষ কচ্ছে।"

সখী বলিল, "ধান ভেনে, গোবর কুড়িয়ে দু'টো ছেলেকে মানুষ করা সহজ কথা নয়, বাছা। গোবরার বাপ মাছের ব্যবসা ক'রে যেথা থেকে হোক্ দু'খানা গয়না, পাঁচখানা পেতল-কাঁসা রেখে গিয়েছে। তার ওপর মাগী দুঃখু মেহনত ক'রে ছেলেটাকে মানুষ কচ্ছে। কিন্তু তোর বাপ যে জলখাবার ঘটীটুকুও রেখে যায় নি।"

দৃপ্তকণ্ঠে খেলা বলিল, "না-ই রেখে যাক্। আমার পেটের ভাবনা তোকে ভাবতে হবে না। কায়েতদের ঘরে থেকে গরু চরালে আমার পেট চ'লে যাবে। তুই আর খুকীটাকে মানুষ কত্তে পারবি না?"

একটু ভাবিয়া সখী বলিল, "পারি তা, কিন্তু শুধু ত পেটের ভাবনা নয়। সুখ-অসুখ আছে, জমার জমীর ওপর ঘর, তার খাজনা কড়ায় গণ্ডায় দিতে হবে। কুঁড়েটুকু না রাখলে এই বর্ষাতেই প'ড়ে যাবে। তার পর পাঁচ দিন যদি বিছানায় প'ড়ে থাকি, তখন তোদের মুখেই বা দেব কি, নিজেই বা কি খাব?"

মাতার আশঙ্কা খণ্ডন করিবার মত উত্তর খেলার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যোগাইল না। সুতরাং সে খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া অভিমানগম্ভীর মুখে বলিল, "কিন্তু ছেলেগুলো বলছিল যে, হীরু মাঝি তোর বাবার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল, সেই হীরু তোর বাবা হবে রে।"

মনে মনে ছেলেগুলার মুণ্ডপাত করিয়া প্রকাশ্যে সখী বলিল, "তা বলুক্ গে বাছা, মারামারি কত্তে গেলেই মার খেতে হয়। আর ওই যে নিতু মালিকের মেয়ে কাদী সাঙ্গা করেছে, বিশে মাঝির বোন সোয়ামী নিয়ে ঘর করে না ব'লে ফকির মালিককে নিয়ে ঘর কচ্ছে। আমাদের জাতে যখন রয়েছে, তখন এতে দোষ কি?"

খেলা আর বেশী কথা বলিতে পারিল না, কিন্তু বেশ প্রসন্নমনে মাতার কার্য্যের অনুমোদনও করিতে পারিল না।

সখীর প্রমুখাৎ খেলার মনোভাব অবগত হইয়া হীরু মিষ্ট কথায় খেলাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিল এবং তাহাকে প্রলুব্ধ করিবার উদ্দেশ্যে একখানা কাপড় কিনিয়া আনিয়া

দিল। কাপড় পাইয়া খেলা কিন্তু একটুও আনন্দ প্রকাশ করিল না, কাপড়খানাকে ভাঁজ করিয়া বেতের পেঁটরায় তুলিয়া রাখিল। সখী তাহাকে নূতন কাপড় পরিতে বলিলে খেলা উপহাস সহকারে উত্তর করিল, "ছেঁড়া কাপড়খানা যদ্দিন চলে চলুক না; তার পর ওখানা পরলেই হবে।"

ইহার পর হীরু যে দিন জাতীয় প্রথামত সখীকে সাঙ্গা করিল, সখীর সীঁথায় সিন্দুর ও হাতে নূতন কাচের চুড়ী পরাইয়া নিজের ঘরে লইয়া গেল, খেলা সে দিন মায়ের সঙ্গে গেল না। সখী সে দিন তাহার দেখাই পাইল না। পাড়ার ছেলেরা বলিল, "সে কায়েতপাড়ার দিকে গিয়েছে, কারও ঘরে থাক্‌বার চেষ্টা কচ্ছে।"

পরদিন সখী খুঁজিয়া খুঁজিয়া খেলাকে কায়েতপাড়া হইতে ধরিয়া আনিল এবং অনেক বুঝাইয়া তাহাকে শান্ত করিল।

মাতার প্রবোধবাক্যে খেলা কতকটা শান্ত হইল বটে, কিন্তু হীরুর ঘরে তাহার মন যেন কিছুতেই টিকিতে চাহিল না। হীরু যে তাহার সহিত একটুও কঠোর ব্যবহার করিত, তাহা নহে, বরং মিষ্ট কথায় তাহাকে বশীভূত করিতে প্রয়াসী হইত। হীরু তাহাকে ভাল ফুলপেড়ে কাপড় কিনিয়া দিল, ছিটের হাতকাটা জামা কিনিয়া আনিল এবং আগামী রথের মেলায় এক জোড়া জুতা আনিয়া দিবে বলিয়া আশ্বাস দিল। এত আদর যত্নেও খেলার মন কিন্তু প্রসন্ন হইল না; হীরুর প্রতি তীব্র বিদ্বেষে তাহার অন্তরটা যেন ভরিয়া রহিল। হীরুর ইচ্ছা খুকীর মত খেলাও তাহাকে বাবা বলিয়া ডাকে। খেলা কিন্তু তাহার সে ইচ্ছা পূরণ করিল না। পিতার সৌম্য-শান্ত মুখমণ্ডলের সহিত হীরুর দীর্ঘ গুম্ফশোভিত মুখের তুলনা করিয়া সে কিছুতেই হীরুকে পিতৃসম্বোধন করিতে পারিল না। হীরুর দস্যুবৎ বিকট মূর্ত্তির দিকে চাহিলেই তাহার শিশুহৃদয় যেন কি এক অব্যক্ত ঘৃণায় উত্তেজিত হইয়া উঠিত।

ছেলে কিছুতেই বশে আসিল না দেখিয়া মা এক এক সময় প্রহার পর্য্যন্ত দিত। হীরু কিন্তু খেলার পক্ষ অবলম্বন করিয়া বলিত, "থাক্ থাক্, নেহাৎ ছেলেমানুষ, জ্ঞান-বুদ্ধি হ'লে আর ও রকম করবে না।"

খেলা মাতার প্রহারে তেমন বিচলিত হইত না, কিন্তু হীরুর এই সদয় উক্তি তাহার অন্তরে যেন ছুরিকা বিদ্ধ করিতে থাকিত।

খেলা প্রায়ই ঘরে আসিত না; সমস্ত দিনটা পাড়ায় পাড়ায় খেলিয়া বেড়াইত। হীরু যদি কোন কায করিতে বলিত, তাহা হইলে খেলা তাহার মুখের উপর স্পষ্ট জবাব দিত, "আমি পারবো না।" তাহার এই জবাবে হীরু মনে মনে বিরক্ত হইলেও মুখে কিন্তু তাহা প্রকাশ করিত না। সে কিছু না বলিলেও সখী কিন্তু চুপ করিয়া থাকিতে পারিত না। হতভাগা ছেলে,—যে মুখে রক্ত তুলিয়া খাওয়া পরা যোগাইতেছে, তাহার একটা কথাও শুনিবে না? লোকটা ইহাতে মনে করিবে কি? সে মানা না করিলেও সখীকে যে এ জন্য লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া থাকিতে হয়। কাযেই সখী খেলার এই স্পষ্ট জবাবে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে তিরস্কার করিত, গালি দিত, মারিতে যাইত। হীরু তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিত, "ছেড়ে দে সখী, ছেলে মানুষের কথা নিয়ে এত কাণ্ড করে না।"

সখী রাগে হাত-মুখ নাড়িয়া বলিত, "ন'বছরের ছেলে, কিসের ছেলেমানুষ গো! ওর বয়সী কত ছেলে পরের ঘরে খেটে খাচ্ছে।"

হীরু বলিত, "তা খাচ্ছে বৈ কি। তবে সব ছেলেই কি সমান হয়? কি জানিস্ সখী, ওকে মারধর করলে পাঁচ জনে আমাকে দোষ দেবে। বলবে, হীরু মাঝি সখীকে সাঙ্গা ক'রে এনে তার ছেলেটাকে দিনরাত ঠেঙ্গাচ্ছে। তা ছাড়া খেলাও মনে মনে দুখ্যু করবে, আমার বাপ থাক্‌লে এত মার খেতে হ'তো না।"

হাত দুইটা জোরে নাড়িয়া কুঞ্চিতমুখে সখী বলিল, "আরে আমার দুখ্যু রে! বাপের মরাই-বাঁধা ধান ছিল। সে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াতো ওকে!"

হীরু বলিত, "সে যা খুসী তাই কত্তো, তাতে কোন কথা হ'তো না। কেন না, খেলা তার নিজের ছেলে। কিন্তু আমি যদি মারধর করি, লোক বলবে, পরের ছেলে ব'লে এমনটা কচ্ছে।"

মুখ বাঁকাইয়া সখী বলিল, "জানি গো জানি, পরের ছেলে ব'লেই আস্কারা দিয়ে ওকে জাহান্নমে দিচ্ছো। নিজের ছেলে হ'লে কক্ষনো এত সইতে না, মেরে হাড় গুঁড়ো ক'রে দিতে।"

সখীর কথা শুনিয়া হীরু মনে মনে হাসিত। সে বেশ জানিত, সখী মুখে যাহাই বলুক, হীরু তাহার ছেলের গায়ে

হাত তুলিলে সখী তাহাতে কথনই সন্তুষ্ট হইবে না। মেয়েরা নিজে ছেলেকে মারিয়া আধ-মরা করে, কিন্তু অপরে একটা কড়া কথা বলিলে কোমর বাঁধিয়া ঝগড়া করিতে যায়। হীরু ইহা জানিত বলিয়াই খেলার অবাধ্যতা চুপ করিয়া সহিয়া যাইত; সখীর অসন্তোষের ভয়ে তাহাকে কিছু বলিতে চাহিত না।

২

এক দিন কিন্তু হীরু না বলিয়া থাকিতে পারিল না। সে দিন খেলা সকালে উঠিয়াই হীরুর সম্মুখ দিয়া খেলিতে বাহির হইতেছিল, হীরু তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "কোথায় যাচ্ছিস্ রে খেলা ?"

খেলা না দাঁড়াইয়াই, হীরুর দিকে না ফিরিয়াই, যেন নিতান্ত অবজ্ঞার সহিত উত্তর দিল, "কোথায় যাব আবার ?"

হীরু বলিল, "কোথাও যাবি না ত যাচ্ছিস্ যে ?"

খেলা উত্তর না দিয়াই চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। হীরু বলিল, "থাম্ না, শোন্।"

খেলা তাহার দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল। হীরু বলিল, "দাঁড়িয়ে রইলি যে ? শুনে যা।"

খেলা বলিল, "কি বলবে, বল না।"

হীরু বলিল, "কাছে স'রে আয় না।"

মুখ বাঁকাইয়া খেলা বলিল, "কাছে না গেলে বলা হয় না বুঝি ?"

খেলার এই স্পর্দ্ধাসূচক উত্তরে হীরু ক্রোধে ভ্রূভঙ্গী করিল; বলিল, "মাঠে খুব ঘাস হয়েছে। গাইটাকে নিয়ে আমার সাথে চল্।"

জোরে ঘাড় নাড়িয়া খেলা বলিল, "এখন যেতে পারবো না আমি।"

"কেন যেতে পারবি না ?"

"পারবো না বল্লুম, তার আবার কেন কি ?"

বলিয়া খেলা প্রস্থানোদ্যত হইল। হীরুর আর সহ্য হইল না। সে তামাক খাইতেছিল; হুঁকাটা নামাইয়া রাখিয়া ছুটিয়া গিয়া খেলাকে ধরিয়া ফেলিল এবং তাহার কানে একটা পাক দিয়া বলিল, "কৈ, যা দেখি আজ খেলা কত্তে।"

খেলা রাগে মুখখানাকে লাল করিয়া গর্জ্জন করিয়া বলিল, "যাব না ত তোমাকে ভয় করবো না কি ?"

খেলার স্পর্দ্ধা হীরুকে ক্রমেই অসহিষ্ণু করিয়া তুলিল। সে খেলার গালে ঠাস্ করিয়া এক চড় মারিয়া বলিল, "ভয় কত্তে হয় কি না হয়, আজ দেখিয়ে দিচ্ছি তোকে।"

পুনরায় এক চড়। মার খাইয়া খেলা কাঁদিল না; তাহার চোখ দুইটা যেন জ্বলিয়া উঠিল। সে ঘাড় উঁচু করিয়া জ্বলন্তদৃষ্টিতে হীরুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "মারলে যে বড় ?"

গর্জ্জন করিয়া হীরু বলিল, "মার এখন কি হয়েছে ? আজ মেরে তোর একগুঁয়েমি ছাড়িয়ে দেব।"

বলিয়া হীরু পুনরায় এক প্রচণ্ড চড় তুলিল। কিন্তু সে চড় গালে পড়িবার আগেই খেলা লাফ দিয়া একটু দূরে গিয়া পড়িল এবং একটা ইটের টুক্‌রা কুড়াইয়া লইয়া হীরুর মস্তক লক্ষ্য করিয়া ছুড়িয়া দিল। ইটটা কিন্তু হীরুর মাথায় পড়িল না, বুকে আসিয়া লাগিল। ইট ছুড়িয়া দিয়াই খেলা বেগে দৌড়াইয়া পলাইল। হীরু খানিক তাহার পশ্চাৎ ছুটিল, কিন্তু তাহাকে তখন ধরা অসাধ্য জ্ঞানে রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে ঘরে ফিরিল।

ঘরে আসিয়া সে সখীকে বলিল, "খেলার আস্পদ্ধা বড্ডই বেড়ে উঠেছে সখী, তাকে এবার রীতিমত শাসন না করলেই নয়।"

সখী বলিল, "সে কথা তোমাকে অনেক দিন ধরেই ত ব'লে আস্‌ছি, মাঝি।"

হীরু বলিল, "কিন্তু ওকে শুধু হাতে মেরে কিছু হবে না, ভাতে মাত্তে হবে। আজ যদি তুই ওকে খেতে দিস্, তবে তোর—"

সখীর পিতাকে উদ্দেশ করিয়া হীরু একটা কটু দিব্য প্রয়োগ করিল। শুনিয়া সখী চমকিয়া উঠিল; বলিল, "একেবারে এত বড় কিরেটা দিয়ে ফেল্‌লে, মাঝি।"

হীরু রাগে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বলিল, "হাঁ, দিলুম। এতেও যদি তুই ওকে ভাত দিস্, তবে বুঝবো, তুই কিন্তু চাঁড়ালের মেয়েই ন'স্।"

বলিয়া হীরু কোদালটা কাঁধে লইয়া মাঠের দিকে চলিয়া গেল। সখী গালে হাত দিয়া নির্ব্বাক্‌ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

৩

হীরু মাঠ হইতে ফিরিবার আগেই খেলা ঘরে আসিয়া মায়ের কাছে গিয়া বলিল, "ক্ষিদে পেয়েছে মা, শীগ্‌গির ভাত দে।"

মরম গীতিকা

[ভাস্কর—শ্রীকিশোরী বন্দ্যোপাধ্যায়

সখী বলিল, "যার ভাত, সে না বল্‌লে আমি ভাত দিতে পারব না।"

"পার্‌বি না ?"

"না।"

"সে যদি ভাত দিতে না চায় ?"

"না খেয়ে থাক্‌তে হবে তোকে।"

খেলা কিয়ৎক্ষণ গুম্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর মাতার মুখের দিকে তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "এই বুঝি তুই সাঙ্গা করেছিস্ ?"

খেলার উক্তির মর্ম্ম সখী বুঝিতে পারিল। বলিল, "তোদের মানুষ করবার জন্যেই সাঙ্গা করেছি, কিন্তু তুই ত কথা শুন্‌লি না।"

রোষ-বিকৃতমুখে খেলা বলিল, "কি কথা শুন্‌তে হবে তোর ? হীরু মাঝিকে বাপ বল্‌তে হবে, তার হুকুম শুন্‌তে হবে, এই ত ?"

সখী বলিল, "যার খেতে হয়, তার হুকুমও শুন্‌তে হয়।"

খেলা বলিল, "শুন্‌তে হয়, তার হুকুম তুই শুন্‌বি। আমি বেন্দা মালিকের ব্যাটা, আমি শুন্‌বো না।"

সখী বলিল, "না শুন্‌লে খেতেও পাবি না।"

দাঁতে দাঁত ঘষিয়া খেলা বলিল, "খেতে না পাই, শুকিয়ে মরি, তবু হীরু মাঝির হুকুম শুন্‌বো না আমি।"

সখী চুপ করিয়া রহিল। খেলা জিজ্ঞাসা করিল, "ভাত দিবি না তুই তা হ'লে ?"

"না।"

"দিবি না ?"

"না।"

"আচ্ছা, আর যদি তোর কাছে ভাত চাইতে আসি, তবে আমি বেন্দা মালিকের ব্যাটাই নই।"

কথা শেষ করিয়াই খেলা দ্রুতপদবিক্ষেপে বাহির হইয়া গেল। সখী নির্ব্বাক্ নিস্পন্দভাবে তাহার গমনপথের দিকে চাহিয়া রহিল।

খানিক পরে হীরু মাঠ হইতে ফিরিয়া স্নান-আহার করিয়া তামাক টানিতে টানিতে জিজ্ঞাসা করিল, "খেলা খেতে আসে নি, সখী ?"

একটু ভারী গলায় সখী উত্তর দিল, "এসেছিল।"

"ভাত খেয়ে গিয়েছে তা হ'লে ?"

"কে তাকে ভাত দিলে যে খাবে ?"

মুখের কাছ হইতে হুঁকাটা একটু সরাইয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সখীর দিকে চাহিয়া হীরু যেন একটু আশ্চর্য্য সহকারে বলিল, "ভাত দিলি না তুই তাকে ?"

সখী বলিল, "তুই শক্ত কিরে দিয়ে গেলি, আমি কি ক'রে ভাত দেব ? আমি কি বাপের বেটী নই ?"

সত্যই ত, হীরু তাহাকে কটু দিব্য দিয়া ভাত দিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছে। হীরু পুনরায় হুঁকাটাকে মুখের কাছে আনিয়া নীরবে তাহাতে টান দিতে লাগিল।

৪

হঠাৎ মুখ তুলিয়া হীরু বলিল, "ছেলেটাকে দেখবো না কি ?"

ভারী মুখে ঝঙ্কার দিয়া সখী বলিল, "না, না, দেখে কি হবে ?"

হীরু বলিল, "দেখবো না, খাবে না কিছু সে ?"

উগ্রকণ্ঠে সখী বলিল, "কি খাবে সে শুনি ?"

হীরুর বুঝিতে বাকি রহিল না যে, তাহার উপর রাগেই সখী ছেলেটাকে ডাকিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছে। তা সখীর রাগিবারই কথা। হঠাৎ রাগের মাথায় সখীকে কটু দিব্য দিয়া হীরু যে অন্যায় কায করিয়াছে, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। আপনার অন্যায় বুঝিতে পারিয়া হীরু একটু অপ্রতিভভাবে বলিল, "রাগের মাথায় এমন শক্ত কিরে দেওয়া আমার ভাল হয় নি, সখী। এই তন্যেই লোকে বলে, রাগ না চণ্ডাল। তা চাঁড়ালের রাগ কি না, রাগ হ'লে জ্ঞানগম্যি সব লোপ পেয়ে যায়।"

অভিমানক্ষুব্ধকণ্ঠে সখী বলিল, "কিরে দিয়ে এমন মন্দ কাযই বা করেছ কি ? সে যেমন হারামজাদা, তেমনই সাজা হয়েছে তার। ক্ষিদের সময় ভাত খেতে এসে ভাত এক মুঠো পেলে না।"

পুত্রের ক্ষুধাক্লিষ্ট মুখখানা মনে পড়িতেই সখীর চোখে জল আসিল। হীরু হাতের হুঁকাটা পাশে রাখিয়া দিয়া দাঁড়াইতে দাড়াইতে বলিল, "আচ্ছা আচ্ছা, তোকে আর দুখ্যু কত্তে হবে না। আমিই কিরে দিয়েছি, আমিই আবার তাকে খুঁজে এনে খাওয়াচ্ছি।"

হীরু পাড়ার ছেলেদের কাছে সন্ধান লইয়া জানিতে

পারিল যে, খেলা তাহাদের সাবেক ঘরের কাছে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

খেলার পৈতৃক ঘরের চাল বৈশাখের ঝড়ে উড়িয়া গিয়াছিল। কেবল পশ্চিমের চালটা উড়ে নাই, কতকটা হুমড়ি খাইয়া কাত্ হইয়াছিল। বর্ষার জলে আর তিন দিকের দেওয়াল ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু চালের আবরণ থাকায় পশ্চিমের দেওয়ালটা তখনও খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। খেলা এই দেওয়ালের পাশে কতকটা মাটী পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছিল। যখনই তাহার খুব রাগ বা দুঃখ হইত, তখনই সে এই স্থানটিতে আসিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত। এখানে আসিয়া তাহার দুঃখের ভার যেন অনেকটা লঘু হইয়া আসিত, প্রাণের মধ্যে কতকটা স্বস্তি বোধ করিত।

হীরু আসিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিতে পাইল, খেলা সেই ভাঙ্গা ঘরের ভিতর ভাঙ্গা দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিয়াছে। দেখিয়া হীরু ডাকিল, "খেলা!"

খেলা চমকিতভাবে তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল। হীরু বলিল,"তুই এখানে ব'সে আছিস্,আমি সারা পাড়াটা তোকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।"

ভ্রূভঙ্গী করিয়া রুষ্টস্বরে খেলা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন খুঁজছো আমাকে?"

হীরু বলিল, "এখনও খাওয়া হয় নি তোর, খুঁজবো না? মাগীর যেমন আক্কেল! ছেলে খেতে গিয়েছে, তাকে ভাত না দিয়ে তাড়িয়ে দিলে। তুই আমার সঙ্গে আয়!"

মুখ খিঁচাইয়া খেলা উত্তর করিল, "আমি যাব না।"

হীরু তাহাকে ধরিয়া লইয়া যাইতে ইচ্ছুক হইয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইল। কিন্তু সে ঘরের ভিতর পা দিবার আগেই খেলা তড়াক্ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং ঘাড় উঁচু করিয়া সক্রোধ আদেশের স্বরে বলিল, "খবরদার, এ ঘরে পা দিও না তুমি।"

বালকের সেই কঠোর আদেশে হীরু থমকিয়া দাঁড়াইল, খেলা তখন ঘরের অপর পাশ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল, এবং হীরু তাহার নিকটস্থ হইবার পূর্ব্বেই সে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইল।

ইহার পর চারি পাঁচ দিন খেলার আর দেখা পাওয়া গেল না। হীরু সারা গ্রামখানা তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও তাহাকে বাহির করিতে পারিল না।

৫

পাঁচ দিন পরে হঠাৎ বেলা দ্বিপ্রহরে গোবরা আসিয়া বলিল, "ও খেলার মা, তোদের খেলা এয়েছে যে।"

সখী সাতিশয় ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "এয়েছে? কোথায় রে?"

গোবরা বলিল, "তোদের ভাঙ্গা ঘরে। খুব জ্বর হয়েছে তার, সেখানে গিয়ে বেহুঁস প'ড়ে রয়েছে।"

সখী রাঁধিতেছিল, উনান হইতে হাঁড়িটা নামাইয়া রাখিয়া খেলাকে দেখিতে ছুটিল। সেখানে গিয়া দেখিল, সেই ভাঙ্গা ঘরের এক পাশে কাদার উপর খেলা চোখ বুজিয়া শুইয়া রহিয়াছে। সখী তাহার মুখের কাছে উপুড় হইয়া পড়িয়া ডাকিল, "খেলা,—খেলা!"

দুই তিন ডাকের পর খেলা চোখ মেলিয়া চাহিল। সখী জিজ্ঞাসা করিল, "এদ্দিন কোথায় ছিলি, খেলা?"

আরক্ত চোখ দুইটা দিয়া যেন অগ্নিবর্ষণ করিতে করিতে দাঁতে দাঁত চাপিয়া খেলা বলিল, "যমের ঘরে ছিলুম। যম কিন্তু নিলে না, এই ঠাঁইটায় মরবার জন্যে পাঠিয়ে দিলে।"

"বালাই, ষাট!" বলিয়া সখী খেলার গায়ে মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে ব্যাকুলকণ্ঠে বলিল, "ও কি অলক্ষুণে কথা কইছিস্, খেলা? তোর হয়েছে কি? কেন তুই আজ ক'দিন পালিয়েছিলি?"

গর্জ্জন করিয়া খেলা বলিল, "কেন? আমি বেন্দা মালিকের ব্যাটা; হীরু মাঝি আমাকে মারলে, তুই ভাত না দিয়ে তাড়িয়ে দিলি। আমার বাবা নেই, তাই আমাকে এত সইতে হ'লো। তাই পাখীগুলোর মত জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে গাছের ফল-পাতা খেয়ে গাছে ব'সে দিন কাটিয়েছি।"

সখীর চোখে জল আসিল। খেলা বলিল, "তুই এখানে এসেছিস্, হীরু মাঝি তোকে বকবে না?"

সখী বলিল, "সে এই ক'দিন তোকে কত খুঁজে বেড়িয়েছে। এখন উঠে ঘরে চল্।"

খেলা বলিল, "ঘরেই ত আমি আছি। আর ঘর কোথায়?"

সখী বলিল, "তোর জ্বর হয়েছে। এই জল-কাদার ভাঙ্গা ঘরে প'ড়ে থাকবি?"

চীৎকার করিয়া খেলা বলিল, "হ্যাঁ থাকবো। এটা আমার বাবার ঘর। তুই হীরু মাঝির ঘরে যা।"

সখী কিছুতেই খেলাকে হীরু মাঝির ঘরে লইয়া যাইতে পারিল না। হীরুও আসিয়া তাহাকে লইয়া যাইবার জন্ত অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু খেলা গেল না। সে এমন কড়া কড়া কথা বলিল যে, তাহা শুনিয়া হীরু সেখান হইতে চলিয়া গেল।

সখী কিন্তু গেল না; সে ছেলের কাছে বসিয়া রহিল। রাত্রিকালে খেলার জ্বর খুব বাড়িয়া উঠিল। জ্বরের ঘোরে সে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "আমি যাব না গো যাব না; বাবার ঘর ছেড়ে কোথাও যাব না।"

কাঁদিতে কাঁদিতে সখী বলিল, "তোকে যেতে হবে না খেলা, আমিও আর সেখানে যাব না। গোড়ায় তোর কথা না শুনে ঝকমারী করেছি আমি। তখন ত জানতুম না, তোর কথা না শুনলে তোকে হারাতে হবে।"

প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে খেলার বাক্‌শক্তি রুদ্ধ হইয়া আসিল, জ্ঞান লোপ পাইল, গলার ভিতর ঘড়্ ঘড়্ শব্দ হইতে লাগিল। হীরু একজন ডাক্তার ডাকিয়া আনিল। ডাক্তার আসিয়া রোগী দেখিয়া বলিলেন, রোগ যতদূর বাড়িবার বাড়িয়া উঠিয়াছে, এখন চেষ্টা বৃথা।

সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই খেলা তাহার বাপের ঘরের কাদা মাটীর উপর পড়িয়া শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। হীরু দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিল, "একগুঁয়েমী ক'রে ছেলেটা মারা গেল।"

প্রতিবেশীরা বলিল, "একগুঁয়ে হোক, কিন্তু বাপের ব্যাটা বটে।"

ঘাটের বেলা

(বাউলের সুর)

আয় লো আয় মিতিন, মকর, বকুল, বেলা—
নাইক বেলা রোদ পড়েছে।
জেগে ঘুম ঘুমস কত, আলস এত
(ঐ যে) কলসী শূন্য, ভরতে আছে॥

থেমে গেছে পাখীর গীতি,
নিজন ক্রমে সজন বীথি,
(ঐ) সামনে আসে আঁধার রাতি—
ঝিল্লী-বাণীর বান্ ডেকেছে॥

আঁধারে ঢাকলো ধরা, আয় লো ত্বরা,
সন্ধ্যা-তারা দেখা দেছে।
দুয়ারে টেনে আগল, আয় রে পাগল—
ঘূর্ণাজলে কূল ছেপেছে॥

শ্রী গিরীন্দ্রমোহিনী

কবি লেখে কেমন ?

১

কবি তার কাব্য লেখে—
বিটপী ফুল ফুটায় যেমন,
ডুবারী সাগর-জলে
মুক্তা তোলে মুঠায় যেমন।

জ্যোতির্ব্বিদ যেমন ধারা
হেরে হায় নূতন তারা,
ধীবর জালের টানে
পুলকে জাল গুটায় যেমন।

২

বরষা যেমন ভাবে
জমায় তাহার মেঘের মেলা,
দীঘি তার কমল হেরে
যেমন ধারা হয় উতলা।
প্রিয় তার পায়রা যাকে
বিলাসী যেমন ডাকে
তৃষিত চকোর কেঁদে
চাঁদকে তাহার উঠায় যেমন।

৩

মৃতেরে জিয়ায় যেমন
উপকথার সোনার কাঠী
লোহারে পরশ-পাথর
কনক করে যেমন খাঁটি।
রেশমের কীটগুলি হায়
যেমন ওই তুঁত-পাতা খায়
আপনার পরাণ দিয়ে
সোনার সুতা জুটায় যেমন।

৪

ফাল্গুনী বাঁধলে যেমন
শরের জালে নীল পারাবার
বাঁধে সে সুরের সেতু
কাল সাগরের এ-পার ও-পার।

শবে শিব জাগেন ধীরে
ভস্মে হর বিভূতিরে
সাধক তার আরাধ্যেরি
চরণতলে লুটায় যেমন।

শ্রী [illegible]